তারাশঙ্কর-রচনাবলী

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

ত্রয়োদশ খণ্ড

মিত্র ও ঘোষ পাব্‌লিশার্স
প্রা ই ভে ট লি মি টে ড
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩

প্রথম প্রকাশ, ১৩৬০ (৩৩০০)
দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৩৯৩ (২২০০)

উপদেষ্টা পরিষদ :
ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার
আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
ডক্টর সুকুমার সেন
শ্রীপ্রমথনাথ বিশী
ডক্টর প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত
শ্রীজিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
ডঃ রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত
ডঃ তারাপদ মুখোপাধ্যায়

সম্পাদক :
শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র
শ্রীসুমথনাথ ঘোষ : শ্রীসনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩ হইতে এস. এন.
রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও আর. রায় কর্তৃক সুব্রত প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
৩১ কামাপুকুর লেন, কলিকাতা-৯ হইতে মুদ্রিত।

॥ সূচীপত্র ॥

ভূমিকা		শ্রীসনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়		৵০
কীর্তিহাটের কড়চা	প্রথম খণ্ড	...	...	১
মঞ্জরী অপেরা	প্রথম পর্ব	...	...	২৫৭
বিপাশা		...	...	৪২৫
গ্রন্থ-পরিচয়		...	...	৫২৬
কীর্তিহাটের কড়চা উপন্যাসের রায়বংশের বংশলতিকা			...	৫৩৪
কীর্তিহাটের কড়চা উপন্যাসে বর্ণিত চরিত্র তালিকা			...	৫৩৫

ভূমিকা

১

সর্বাগ্রে আন্তরিক শ্রদ্ধা ও বিনয়ের সঙ্গে নিবেদন করি যে, যে-কাজ আমি করতে বসেছি তাতে আমার অধিকার নেই। যদিচ আমি এই রচনাবলীর সম্পাদকমণ্ডলীর সর্বকনিষ্ঠজন, তবু এ কাজে হাত দেওয়া আমার উচিত ছিল না। কারণ কোন লেখকের রচনার গুণাগুণ বিচার ক'রে পাঠকের সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দেবার দুর্লভ অধিকার আর যারই থাকুক লেখকের পুত্রের হাতে না থাকলেই ভাল হয়। বিশেষ করে সে পুত্র যদি সে কর্মের যোগ্য না হয়। আমার সে যোগ্যতা নেই, তা সত্ত্বেও এ দায়িত্ব আমাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করতে হয়েছে।

এর কারণ আছে। সেই কারণটিই এখানে সর্বাগ্রে নিবেদন করি। তারাশঙ্কর বহু গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। সেগুলি প্রথমেই স্বাভাবিক রীতি অনুযায়ী সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। পরে সেগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমান মুহূর্তে তারাশঙ্করের গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত রচনা যথেষ্ট থাকলেও উপন্যাস দু-একখানি ছাড়া অপ্রকাশিত নেই।

সেই অপ্রকাশিত উপন্যাসের একখানি 'কীর্তিহাটের কড়চা'। যদিও এ রচনাটি সাময়িক পত্রে প্রায় পনের বছর আগে প্রকাশিত হয়েছিল, এটি তারাশঙ্কর গ্রন্থাকারে প্রকাশ করতে দেননি। প্রকাশ করতে না দেবার কারণ ছিল উপন্যাসখানি পুনর্লেখনের অভিপ্রায়। অথচ এই বিষয়টি তাঁর ধ্যানে অন্তত দশ বারো বছর ছিল এবং বিষয়টি নিয়ে 'কীর্তিহাটের কড়চা' লেখার আগে আরও দুবার লিখেছিলেন। সে রচনাগুলিও গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি।

'কীর্তিহাটের কড়চা' প্রায় আড়াই বছর ধরে স্থূল কিস্তিতে প্রতি সপ্তাহে সাপ্তাহিক 'অমৃতে' প্রকাশিত হয়েছিল। সেও অনেক কাল আগের কথা। বহু পূর্বে লেখা এবং গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি বলেই বিদগ্ধ রসিকজনেরাও স্বভাবতই এর সঙ্গে পরিচিত নন।

সেই কারণেই 'কীর্তিহাটের কড়চা' রচনাবলীতে প্রথম প্রকাশের সময় প্রকাশনের কর্তৃপক্ষ আমাকে এর পরিচয়-পর্বটুকু সম্পন্ন করতে নির্দেশ দিয়েছেন। আমার কাজ রচনাটিকে পাঠকের সঙ্গে শুধুমাত্র পরিচিত করে দেওয়া। এর সাহিত্য-বিচার আমার বিষয় নয়। তবে সেই প্রসঙ্গে রচনার পৃষ্ঠপট-সংক্রান্ত কিছু কথা পাঠকের কৌতূহল পরিতৃপ্ত করতে পারবে।

২

'কীর্তিহাটের কড়চা' তারাশঙ্করের পরিণত জীবনের শেষাংশের শ্রেষ্ঠতম রচনা বলেই আমার বিশ্বাস। শুধু তাই নয়, এ উপন্যাস কলেবরে তারাশঙ্করের সুদীর্ঘ সাহিত্য জীবনের বৃহত্তম রচনা। 'কীর্তিহাটের কড়চা' রচনাবলীর মাপে কম বেশী এগারশো বারশো পৃষ্ঠার গ্রন্থ এবং এটি রচনাবলীতে ক্রমান্বয়ে এই খণ্ড থেকে পরবর্তী আরও তিন খণ্ডে প্রকাশিত হবে।

উপন্যাসখানির কালসীমা কমবেশী দেড়শো বছর, ছেদহীন দেড়শো বছর। 'পার্মানেণ্ট সেটেল-মেণ্ট' উপন্যাসখানির মেরুদণ্ড। উপন্যাসের মূল আখ্যানের আরম্ভ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আরম্ভের সঙ্গে, সমাপ্তি পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় সেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সমাপ্তি ঘোষণা দিয়ে। তবে স্বাভাবিক আরম্ভেরও আরম্ভ আছে, সমাপ্তির পরও যে শেষ থাকে সেই সুশেষ আছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্বে ও পরে সেই অংশটুকুও সেই কারণেই আছে স্বাভাবিকভাবেই।

রাইটার্স বিল্ডিংয়ে লর্ড কর্ণওয়ালিসের শাসনকক্ষ থেকে মেদিনীপুর জেলার 'কংসাবতী বারি-বিধৌততট বনছায়াশীতল' গ্রাম কীর্তিহাট পর্যন্ত এর কাহিনী প্রসারিত। কুড়ারাম ভট্টাচার্য ওরফে কুড়ারাম রায় ভট্টাচার্য থেকে অধস্তন সপ্তম পুরুষ সুরেশ্বর রায় পর্যন্ত এর কাহিনী। সাত পুরুষের কাহিনী। যার আরম্ভ কীর্তিহাটে তার শেষ মধ্য কলকাতার জানবাজারে। সাতপুরুষে রায়বংশে মানুষ কম নয়। পুরুষ স্ত্রীলোক ধরে প্রায় পঞ্চাশজন। রায়বংশের সাতপুরুষের এই প্রায় পঞ্চাশ-জন মানুষকে ঘিরে এর কাহিনীর আবর্তন বিবর্তন। এঁরাই কাহিনীর কেন্দ্রস্থলে। এঁদের মাঝখানে রেখে আরও অন্তত শতাধিক চরিত্র উপন্যাস ও কাহিনীর অংশ হয়ে উপন্যাসের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিচরণ করছে। এরই সঙ্গে আরও অন্তত পঞ্চাশজন পুরুষ, যাঁরা ঐতিহাসিক মানুষ, সত্য মানুষ, যাঁদের আমরা জানি চিনি, তাঁরা একই সঙ্গে এই রচনার পৃষ্ঠাকে উজ্জ্বল করেছেন।

এই দুশোর উপর সত্য ও কাল্পনিক, অলীক ও ঐতিহাসিক মানুষের সম্মেলনে ও সমবায়ে এ উপন্যাসের সৃষ্টি। সত্যের সঙ্গে কল্পনার, ইতিহাসের সঙ্গে অলীকের মিলনে যা সৃষ্টি হয়েছে তার ক্রিয়া বিচিত্র। এই মিলনের ক্রিয়ায় কল্পনাকে ও অলীককে আরও সত্য বলে মনে হয়। মনে হয়, যাদের কথা এখানে বলা হয়েছে তারা আমার আপনার মতই নিজের নিজের সত্য মূর্তিতেই বেঁচে ছিল। মনে হয়, এ উপন্যাস নয়, আমার অজানা কিছু মানুষের জীবন-কথা ও ইতিহাস। আমি নিজে আজও স্পষ্ট স্মরণ করতে পারি, যখন এ রচনাটি সাপ্তাহিক অমৃতে সপ্তাহে সপ্তাহে প্রকাশিত হচ্ছিল, তখন বাংলাদেশের একজন মহামান্য পুরুষ, যিনি একাধারে পণ্ডিত ও রসিক বলে খ্যাত এবং আজও জীবিত আছেন, তিনি তারাশঙ্করকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন এ রচনা প্রসঙ্গে—আপনি কোন্ জমিদার বাড়ির কথা লিখছেন?

উপন্যাসের চরিত্রের সংখ্যাধিক্য, রচনার পৃথু কলেবর বা দীর্ঘকালের ব্যাপ্ত কোন উপন্যাসের পক্ষে একমাত্র প্রশংসার বিষয় নয়। উপন্যাসের প্রথম ও শেষ বিচার রসের বিচারে। যখন প্রকাশিত হয় তখন, এবং তারপরের এই দীর্ঘ কালে আমি উপন্যাসখানি একাধিকবার পাঠ করেছি। প্রতিবারেই মনে হয়েছে, সবিনয়ে নিবেদন করছি, আমার অধিকার-বহির্ভূত বক্তব্য জেনেও নিবেদন করছি যে, এ রচনায় তারাশঙ্করের বহু-অভিজ্ঞ ও পরিণত শিল্পীমন পাকা রসের ভোয়েনে নিজেকে উত্তীর্ণ করেছেন, করতে পেরেছেন। তবে আমার রসবিচার করার প্রয়োজনই বা কি? ব্যঞ্জনের পরিচয় তো তার আস্বাদেই। পাঠক নিজেই সে বিচার করতে পারবেন।

তারাশঙ্কর সম্পর্কে একটি-দুটি তত্ত্ব প্রবাদের মত প্রচলিত হয়ে আসছে। প্রথম তিনি উপন্যাসকার হিসাবে আঞ্চলিক, দ্বিতীয় তিনি সামন্ততন্ত্র বা জমিদারীপ্রথা সম্পর্কে অত্যন্ত সহানুভূতিশীল ছিলেন। এ দুটি প্রচলিত থিয়োরি সম্পর্কে দু-একটি কথা এখানে এই 'কীর্তিহাটের কড়চা'কে অবলম্বন করে বলা প্রয়োজন। এই থিয়োরি দুটিকে স্বীকার বা অস্বীকার না করেই সে সম্পর্কে যা বলবার বলছি।

তারাশঙ্করের জন্ম বাংলাদেশের উত্তর রাঢ়ে এবং তাঁর শিল্পী-জীবনের সমস্ত অভিজ্ঞতা ও উপকরণ সেই রাঢ়ভূমি থেকেই সংগৃহীত হয়েছে। এবং তিনি মূলত সেখানকার মানুষের কথাই লিখেছেন। এ উক্তি বর্ণে বর্ণে সত্য। কিন্তু তা থেকে যদি এই সিদ্ধান্ত টানা যায় যে রাঢ়ের কথাই

লিখেছেন তা হলে বোধহয় সে সিদ্ধান্ত ঠিক হবে না। কারণ সে ক্ষেত্রে আসল কথা যে মানুষ, সেই মানুষই বাদ পড়ে যাবে। তবে এ সিদ্ধান্ত যদি এই হয় যে, তারাশঙ্কর মানুষের কথাই লিখেছেন এবং সে মানুষ রাঢ়ভূমির, তা হলেই বোধহয় সিদ্ধান্তটি সঠিক হয়।

কারণ কোন্ সার্থক ঔপন্যাসিক আঞ্চলিক নন? যে পটভূমিতে কোন উপন্যাসের পাত্র-পাত্রী নিজেদের মানবলীলা প্রকটিত করে সে তো একটি বিশেষ ভূমিখণ্ড, বিশেষ অঞ্চল। যে শিল্পী নিজের উপন্যাসের পটভূমিকে যত স্পষ্ট, যত গাঢ়ভাবে জানবেন তাঁর রচনায় তো সেই বিশেষ পটভূমি ততখানি গাঢ় বর্ণে বর্ণিত হয়ে স্পষ্ট মূর্তিতে দেখা দেবেই। মানুষ তো স্থান-কালহীন প্রাণী নয়। স্থান ও কালে সংস্থিত মানুষকে নিয়েই তো শিল্প! না হলে সে তো নিরালম্ব বায়ুভুক মূর্তিতে দেখা দেবে! তারাশঙ্কর নিজের ভূমিকে ও নিজের কালকে ভাল করেই জানতেন। তা তাঁর কাছে প্রায় করতলামলকবৎ ছিল। এই কারণেই তাঁর রচনায় রাঢ়ভূমি সর্বদাই অতি স্পষ্ট রেখা ও বর্ণে চিত্রিত চালচিত্রের মত বড় স্পষ্ট মূর্তিতে এসে দাঁড়িয়েছে। সেই চালচিত্রকে পিছনে রেখে তিনি আপনার পাত্র-পাত্রীর প্রতিমাকে স্থাপন করেছেন।

কিন্তু 'কীর্তিহাটের কড়চা'য় তিনি তাঁর রচনাকে তাঁর চির-পরিচিত ও অভ্যস্ত উত্তর রাঢ়-ভূমিতে অজয়, ময়ূরাক্ষী কি কোপাইয়ের তীরে স্থাপন করেন নি। তিনি রচনাকে এবার স্থাপন করেছেন কংসাবতী বারিবিধৌত কীর্তিহাটে, যাকে বর্ণনা করেছেন মেদিনীপুর বলে। আমি সঠিক জানি না, আঞ্চলিকতা দোষে দুষ্ট এই অভিযোগ থেকে সহজে অব্যাহতি লাভের জন্যই তিনি এ কাজ করেছিলেন কি না! বরং পাঠক একটু যত্ন করে দেখলেই অনুভব করবেন, এ মানুষগুলি কি মূলত উত্তর রাঢ়ের, বীরভূমের? তারাশঙ্কর কি ছলনা করে তাদের মেদিনীপুরে বসিয়ে দিয়েছেন? না তারা আসলে মানুষই, বীরভূম মেদিনীপুর যেখানেই জন্মাক সেইখানেই তারা সত্য ও সঠিকভাবেই চেহারা পেয়েছে?

এবার দ্বিতীয় তত্ত্বটি সম্পর্কে আসা যাক।

তারাশঙ্কর সামন্ততন্ত্র সম্পর্কে সহানুভূতিশীল এ কথাও প্রবাদবাক্যের মতই চলে আসছে। আমার নিজের ধারণা, এর হেতু তাঁর প্রথম জীবনের রচনা দুটি গল্প, 'রায়বাড়ী' ও 'জলসাঘর'। তারাশঙ্কর অন্তত ষাটের উপর উপন্যাস ও দুশোর কাছাকাছি ছোটগল্প রচনা করেছেন। তার মধ্যে ক'টিই বা জমিদারদের নিয়ে লেখা? 'ধাত্রীদেবতা', 'কালিন্দী', 'পদচিহ্ন' ও শেষ এই 'কীর্তিহাটের কড়চা' উপন্যাসের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। গল্পের মধ্যে 'রায়বাড়ী' ও 'জলসাঘর' ছাড়া পাঠককে এ প্রসঙ্গে 'রাখাল বাঁড়ুজ্জে' ও 'সাড়ে সাত গণ্ডার জমিদার' পড়ে দেখতে অনুরোধ করব এবং সবিনয়ে বিচার করে দেখতে বলব ওজনে জমিদারীর গুণাগুণ দেখানোর পাল্লাটা সমান হয়েছে কিনা!

এ সম্পর্কে বিচার করতে হলে, আমার ধারণা, আমাদের আর একটু এগিয়ে যেতে হবে। তারাশঙ্করের সাহিত্যসৃষ্টিতে জমিদারতন্ত্রের প্রতি সহানুভূতির কথাটা ধরে নিলেও বিচারে অসুবিধা হবে না। তবে তাঁর এ সহানুভূতিকে খণ্ডিত করে দেখলে হয়তো বিচারে ত্রুটি ঘটবে। আমরা যদি তারাশঙ্করের সহানুভূতির ক্ষেত্রটি বিচার করি তা হলে দেখতে পাব তাঁর সহানুভূতির ক্ষেত্র অতি সাধারণ ব্রাত্য মানুষের জীবন থেকে উদ্ভূত হয়ে তা ক্রমপ্রসারিত হতে হতে সমাজের

উচ্চ বর্ণ ও উচ্চ বিত্তের মানুষে গিয়ে শেষ হয়েছে। তিনি যে সংখ্যায় ও যে মমতায় উচ্চবর্ণ ও উচ্চবিত্তের জমিদারকে এঁকেছেন তার থেকে বহুতর সংখ্যায় ও বহু পরিমাণ মমতা দিয়ে সমাজের অন্তেবাসীদের জীবনকে চিত্রিত করেছেন। তবে এ কথাও ঠিক যে, সমাজের উচ্চবর্ণ ও উচ্চবিত্তের মানুষও তাঁর সহানুভূতি, এবং ক্ষেত্রবিশেষে শ্রদ্ধায় বঞ্চিত হয় নি। তা যদি হত তা হলে তা কি শিল্পী তারাশঙ্করের পক্ষে অধিকতর গৌরবের বিষয় হত? শিল্পের একাংশ চোখের জলে ও বুকের মমতার রসে ভিজিয়ে, অপর এক অংশকে মমতা-বঞ্চিত করে আঁকলে তাতে, আর যাই হোক, শিল্পসৃষ্টিও হত না, শ্রদ্ধাবান শিল্পীর পক্ষে তাতে সমদর্শিতাও বজায় থাকত না।

কিন্তু এহ বাহ্য। শিল্পী তারাশঙ্করের যা ধাতুপ্রকৃতি তাতে মমতাহীন হয়ে আঁকা তার পক্ষে সম্ভবই ছিল না। এ তাঁর শিল্পের প্রকৃতিবিরুদ্ধ। আমরা যদি এই মমতার উৎস সন্ধান করি তা হলে একটি বিচিত্র সত্যের সন্ধান পাব। আমার ধারণা, এই মমতার মূল উৎস হল মাটি, দেশের মাটি। দেশের মাটিকে অবলম্বন ক'রে যারা তাঁর চোখের সামনে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কাঠামোর মধ্যে বেঁচে ছিল তাদের সকলকেই তিনি ভালবেসেছেন। সে জমির রায়তই হোক, আর জমিদারই হোক। যার গায়ে পুরু কি পাতলা মাটির প্রলেপ ও গন্ধ আছে তাকেই তিনি অপরিসীম মমতায় ভালবেসেছেন। সেই ভালবাসার সময় রায়ত কি জমিদার তিনি বিচারের অবকাশ পান নি।

এই দিক দিয়ে বিচার করলে 'কীর্তিহাটের কড়চা' তাঁর অনন্য সৃষ্টি। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কাঠামোর মধ্যে ভূমিকে অবলম্বন করে যে যেখানে আছে দেশের মধ্যে সে-ই তাঁর ভালবাসার অংশভাগী হয়েছে। তবে ভালবাসতে গিয়েও, মমতা প্রকাশ করতে গিয়েও যে শাসন ও শোষণ করেছে তার সাধুবাদ করেন নি, আবার যে অত্যাচার পেয়েছে তাকে সহানুভূতি জানাতেও ভোলেন নি।

৪

তারাশঙ্কর তাঁর সাহিত্যজীবনের কাহিনী লিখতে গিয়ে 'জলসাঘর' প্রসঙ্গে একটি উক্তি করেছিলেন সেটি এখানে স্মরণ করি। তিনি 'জলসাঘর' গল্পটি লেখেন ১৩৪১ সনের বৈশাখ মাসে। সেই সময় থেকেই 'জলসাঘরে'র সূত্র ধরে তাঁর তিনটি গল্প লেখার পরিকল্পনা মাথায় আসে। একটি জমিদার বাড়ির উত্থান ও পতনের কাহিনী লিখবেন তিনটি ছোট গল্পে। প্রথম উত্থান, দ্বিতীয় রাজত্ব, তৃতীয় পতন। তৃতীয় গল্পটিই লেখেন সর্বপ্রথম। তারপর এর আড়াই কি পৌনে তিন বছর পর দ্বিতীয় গল্পটি লেখা হয়। নাম 'রায়বাড়ি'। এরপর 'জলসাঘর' বই হিসাবে প্রকাশিত হবার সময় প্রকাশক হিসাবে সজনীকান্ত দাস 'জলসাঘর' গল্প-সংগ্রহের প্রথম গল্প হিসাবে 'জলসাঘর' নামে চিহ্নিত করে তার অধীনে ওই দুটি গল্প সংকলিত করেন। তারাশঙ্করও এ পর্যায়ের প্রথম কাহিনীটি লেখা হবার জন্য আর অপেক্ষা করেন নি। আমার নিজের ধারণা ১৩৪১ সালে 'জলসাঘর' গল্পটি লিখবার সময় যে পরিকল্পনা তাঁর মাথায় এসেছিল তাই এর ত্রিশ বৎসর পরে মূর্তিলাভ করে 'কীর্তিহাটের কড়চা'য়।

কিন্তু মাঝখানের ত্রিশ বৎসর তিনি এই পরিকল্পনাটি নিয়ে কাজ করবার চেষ্টায় একাধিকবার কলম ধরেছেন। নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকেন নি। সময়টা, যতদূর মনে পড়ে, বাংলা বাহান্ন তিপান্ন সাল। সে সময় সে কালের একটি নাম-করা সাপ্তাহিক পত্রিকা ছিল 'সচিত্র ভারত'। 'সচিত্র

ভারত'-এর কর্তৃপক্ষ তাঁকে তাঁদের কাগজে লিখবার জন্য অনুরোধ করেন। যদিও তারাশঙ্কর বহু-সংখ্যক উপন্যাস লিখেছেন তবু বহুপ্রসবের জন্য নিজেকে বার বার তিরস্কার করতেন। কিন্তু না লিখেও উপায় থাকত না। কাগজের চাহিদায় ও তাগিদে তাঁকে লিখতেই হত। তাই মধ্যপথ বেছে নিয়ে তিনি উপন্যাস না লিখে অন্য ধরনের লেখা লিখতেন। 'সচিত্র ভারত'-এর তাগাদায় তিনি লিখতে আরম্ভ করলেন একটি নাটক। তার বিষয়বস্তু দু'পুরুষ জমিদারের সংঘাত। মাঝ-খানে এক তান্ত্রিক ঘটনাচক্রে নাটকের কাহিনীতে জড়িয়ে গিয়েছেন। সে নাটক প্রকাশিত হয়নি। আজও উঠে যাওয়া 'সচিত্র ভারত'-এর পৃষ্ঠায় সে রচনা মহানিদ্রায় নিদ্রিত।

এরপর আরও কয়েক বছর কাটল। ১৩৬৩।৬৪ সালে পূজা সংখ্যা 'উল্টোরথে' তিনি একখানি উপন্যাস লিখেছিলেন। নাম 'জবানবন্দী'। কাহিনী এক জমিদার পরিবারের কয়েক পুরুষের কাহিনী। এই রচনায় সেই নাটকের কাহিনীটি নূতন চেহারা নিয়ে ফিরে এসেছে। সে কাহিনী রচনা আমি নিজের চোখের সামনেই দেখেছি। যা দেখেছি তাতে শিল্পী তারাশঙ্করের এই উপ-ন্যাস লিখবার সময় যে শক্তিমত্তার প্রকাশ দেখেছিলাম তা বিস্ময়কর। তবে সে কাহিনী পৃথক এক কাহিনী। সে লেখার ক্ষেত্র কোনোদিন উপস্থিত হলে তখন বলার কথা বিবেচিত হবে।

'উল্টোরথে' প্রকাশিত 'জবানবন্দী'ও তারাশঙ্কর গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন নি। তা আজও অপ্রকাশিত। সে কাহিনী একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ অপরূপ শিল্পসৃষ্টি। তাতে কয়েক পুরুষ জমিদার বংশ-পরম্পরা আবির্ভূত হয়েছেন। তার সঙ্গে এসেছে গোয়ানদের রঙদার চরিত্র। সেই সঙ্গে নাটকের সেই তান্ত্রিক সন্ন্যাসী উজ্জ্বলতর মূর্তিতে আবার এসে দাঁড়িয়েছেন আপনার পাগল-পাগল ভাবের মাতাল, দুর্দান্ত চেহারা নিয়ে। সে উপন্যাস আজকের বয়স্ক পাঠকদের অনেকেই সেদিনের পূজো সংখ্যা 'উল্টোরথে' পাঠ করেছেন। তার স্মৃতিও হয়তো তাঁদের অনেকের মন থেকে এখনও নিশ্চিহ্ন হয় নি।

তারপর আরও চার পাঁচ বছর কেটে গেল। 'জবানবন্দী' পড়ে রইল অপ্রকাশিত হয়ে। তিনি তখন 'যুগান্তর' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত। সাপ্তাহিক অমৃতের অনুরোধে তিনি 'কীর্তিহাটের কড়চা' লিখতে আরম্ভ করলেন। লিখবার আগে অমৃতের কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছিলেন নূতন উপন্যাস লেখা তার পক্ষে সহজ হবে না। তার পুরনো অপ্রকাশিত লেখা নূতন করে লিখে প্রকাশ করতে আপত্তি না হলে তিনি লিখতে পারেন। অমৃত কর্তৃপক্ষ সানন্দে সম্মতি জানালেন।

এরপর সাপ্তাহিক অমৃতে 'কীর্তিহাটের কড়চা' প্রকাশিত হতে আরম্ভ হল। 'জবানবন্দী' লেখার সঙ্গে সঙ্গে তিনি উপন্যাসের মূল বক্তব্য বিষয় ও কাঠামো দুই-ই পেয়ে গিয়েছিলেন। মাঝ-খানের এই কয়েক বৎসরে সেই কাহিনী কল্পনার রসে ভিজেছে এবং সেই জারিত কল্পনার ভ্রূণ থেকে তখন স্বাভাবিকভাবেই হাজারটা জীবন্ত সূত্র তাঁর মনোলোক থেকে বেরিয়ে আসবার জন্য চঞ্চল হয়ে উঠেছে। 'জবানবন্দী'র সেই পূর্ববর্তী তীরগতি সহজ কাহিনী তখন অসংখ্য চরিত্রের চঞ্চল মিশ্রণে ও আস্ফালনে বৃহৎ ও জটিল হয়ে উঠেছে। মূল কাহিনী ও 'থিমে'র গা থেকে আরও বহুতর ডালপালা গজিয়েছে। কাল্পনিক মানুষদের আশেপাশে তখন ইতিহাসের পাতা থেকে উজ্জ্বল ঐতিহাসিক পুরুষরা তাঁর কল্পনায় মূর্তি ধরে চলাফেরা করতে আরম্ভ করেছেন।

এই মানসিক পরিবেশে তারাশঙ্করের জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্ম 'কীর্তিহাটের কড়চা' রচনা আরম্ভ হল।

৫

এ উপন্যাসে বহু নায়ক-নায়িকা। তবু মূল নায়ক রায়বংশের সপ্তম পুরুষের অন্যতম প্রধান পুরুষ সুরেশ্বর রায়। বাংলা দেশের সমস্ত বড় জমিদারদের যে হাল হয়েছিল কীর্তিহাটের রায়বাড়ী তার থেকে কিছু আলাদা ছিল না। রায়বংশের তৃতীয় পুরুষ বীরেশ্বর রায়ের সময় থেকে রায় বাবুরা কলকাতামুখী হলেন। শেষ পর্যন্ত তাঁরা পাকাপাকি বাস করতে লাগলেন জানবাজারে প্রাসাদোপম বাড়ি করে। সপ্তম পুরুষে সুরেশ্বর রায়ের জন্ম জানবাজারের অভিজাত ও ইংরেজী-ভাবাপন্ন মা-বাপের কোলে। বাপ ইংলিশম্যান কাগজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, ঝকঝকে ইংরেজী লিখতেন পাকা কলমে। সুরেশ্বর রায়ের ক্ল্যাসিক্যাল গানে জন্মগত অধিকার। সে লেখাপড়া শিখলে আপন খেয়ালে। শেষ পর্যন্ত হয়ে দাঁড়াল চিত্রশিল্পী, আর্টিস্ট। সে তখন তখনকার উঠতি বোহেমিয়ানদের একজন।

এই অবস্থায় তার উপর সমন জারী হল কীর্তিহাটে যাবার, সেটেলমেণ্ট অফিসে হাজির। দেবার। যেতে হল সুরেশ্বরকে। কলকাতায় জন্ম, আজন্মলালিত মহানগরীতে, সেই নাগরিক মন নিয়েই সে গেল কীর্তিহাট। তার পরের কাহিনীই কীর্তিহাটের কড়চার কাহিনী। শিল্পী সুরেশ্বর আস্তে আস্তে ভালবাসল কীর্তিহাটকে, তার বংশকে, সেখানকার মানুষকে, সেই সঙ্গে মাটিকে। এই বহুজাল-সমন্বিত কাহিনীর অন্তরালে আধুনিক ও উন্নাসিক নাগরিক সুরেশ্বর রায়ের এই ভালবাসার কাহিনীটিই এর গভীরতম বক্তব্য। তাই এই বৃহৎ উপন্যাসের সমাপ্তি অতি সহজ নম্রসুরে। কোন নাটকীয়তা নেই, কোন ঝকমকানি নেই, সুরেশ্বর রায়ের শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ পত্রের মাধ্যমে এ কাহিনীর পরিসমাপ্তি। একজন লোক ছিল, সে তার দেশের মানুষ ও মাটিকে ভালবেসেছিল, তারপর সে আর নেই। এসেছিল, ভালবেসেছিল, তারপর চলে গিয়েছে। এর মধ্যে কোন বিস্ময় নেই, চমক নেই, কিন্তু মানবসভ্যতার শেষ বেদনাটি হয়তো নিহিত আছে। সুরেশ্বর রায়ের সারা জীবনের নিঃশব্দ ও একক অন্বেষণ তাকে নম্র সহজ করে মাটির একান্ত কাছাকাছি নিয়ে গিয়েছে। দেশের মাটিতে সুরেশ্বরের মন ও দেহ যেন গড়াগড়ি দিয়ে কৃতকৃতার্থ হয়েছে।

'কীর্তিহাটের কড়চা'র এই বোধ হয় শেষ ফলশ্রুতি।

৬

'কীর্তিহাটের কড়চা' রায়বাড়ীর জমিদারদের কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে যদি মানব ও মৃত্তিকার প্রেমের কাহিনী হয়, তা হলে তারাশঙ্করের 'মঞ্জরী অপেরা'র কাহিনীর কেন্দ্রে সংগোপনে আসন নিয়েছে কাম।

'কীর্তিহাটের কড়চা'র মত কলেবর না হলেও 'মঞ্জরী অপেরা'র গঠনে 'কীর্তিহাটের কড়চা'র সঙ্গে সাদৃশ্য আছে। 'মঞ্জরী অপেরা'ও আয়তনে অতি বৃহৎ, এবং বহুসংখ্যক চরিত্রের আনাগোনা এতে। সেই কারণেই রচনাবলীর ভারসাম্য রক্ষার জন্য এ খণ্ডে যেমন 'কীর্তিহাটের কড়চা'র প্রথম চতুর্থাংশ প্রকাশিত হল, তেমনি প্রকাশিত হল 'মঞ্জরী অপেরা'র অর্ধাংশ।

'মঞ্জরী অপেরা' 'কীর্তিহাটের কড়চা'র মত তাঁর পরিপক্ক শেষ বয়সের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি এবং

এর রচনাকাল 'কীর্তিহাটের কড়চা' রচনার সমসাময়িক।

রচনাটি ১৯৬৯ সনে পূজা সংখ্যা 'নবকল্লোলে' প্রকাশিত হয়েছিল। এই রচনাটি লেখা হবার পূর্বের কাহিনীটি এখানে বললে পাঠকের কৌতূহল হয়তো কিছু পরিতৃপ্ত হবে।

তখন তারাশঙ্করের পারিবারিক জীবনে এক মহা বিপর্যয় আসন্ন। সেবার পূর্ব বৎসরের শেষ থেকে তাঁর জ্যেষ্ঠ জামাতা পরিপূর্ণ যৌবনে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। পরের ফেব্রুয়ারী মাসে জানা গেল তিনি পাকস্থলীতে ক্যান্সার রোগাক্রান্ত হয়েছেন। সেই মহা বিপর্যয়কে বুকে নিয়ে তখন তাঁর প্রতিদিনের দিনযাত্রা। সেই যন্ত্রণাকে বুকে নিয়েই তিনি প্রত্যহের কর্ম যাপন ক'রে চলেছেন। সাপ্তাহিক অমৃতে 'কীর্তিহাটের কড়চা' লিখছেন এবং পুজো সংখ্যাতে লিখবার জন্যও মনে মনে প্রস্তুত হচ্ছেন।

তখন তিনি রাজ্যসভার সদস্য। সেটা বোধহয় জুলাই কি আগস্ট মাস। তিনি দিল্লী গিয়েছেন রাজ্যসভার অধিবেশনে যোগ দিতে। এই সময় একদিন রাত্রে দিল্লী থেকে ট্রাঙ্ককলে ডাকলেন। কণ্ঠস্বর বেশ উত্তেজিত। বললেন, ওহে একটা কাজ করো তো। তুমি বিশ্বরূপা থিয়েটারের রাসবিহারী বাবুকে আমার নাম করে বলে রেখো, যাত্রাদলের একজন পুরানো অ্যাকটরকে ঠিক করে রাখেন ও আমার সঙ্গে দেখা করতে বলেন।

দেখা করার তারিখও তিনি আমাকে বলে দিলেন। তারপর বেশ উত্তেজিতভাবে বললেন— এবার যাত্রার দল নিয়ে লিখব হে!

তিনি কলকাতায় ফেরার পর দেখলাম তাঁর লেখার ডেস্কের সামনে, আমাদের দিকে পিছন ফিরে এক গিলে-করা-পাঞ্জাবি-পরা কাঁচা-পাকা চুল ভদ্রলোক বাবার কাছে খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে হৃদ্যভাবে কথা বলছেন। দেখলাম কথা চলল একদিন, দুদিন, তিনদিন। ঘর বন্ধ করে কথাবার্তা। তিনদিন কি চারদিনের পর একটা দুটো দিন বাদ দিয়ে তিনি লিখতে বসলেন। সে লেখা উপন্যাস 'মঞ্জরী অপেরা'।

সে লেখা যখন প্রথম 'নবকল্লোলে' প্রকাশিত হয় তখন তার কলেবর অনেক হাল্কা ছিল। তবে চরিত্রগুলি প্রায় সবই ছিল। ওদিকে লেখার ডেস্কের ওপারে পারিবারিক জীবনে তিনি তখন জীবনের ভীষণতম বিপর্যয়ের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন।

'মঞ্জরী অপেরা' 'নবকল্লোলে' প্রকাশিত হবার পরই আবার ধরলেন পুনর্লেখনের জন্য। পুন-র্লেখনের পর কলেবরে পৃথু চেহারা নিয়ে রসের খনি হয়ে প্রকাশিত হল।

রচনাটির সমালোচনা বা গুণগান করার আমার প্রয়োজন নেই। তবে বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ নূতন, এবং আমার যতদূর জানা আছে তাতে এ জীবন সম্পর্কে তারাশঙ্করের প্রত্যক্ষ কোন পূর্ব-অভিজ্ঞতা ছিল না। যা উপাদান তিনি ব্যবহার করেছেন তা পেয়েছিলেন রাসবিহারী সরকার মশাইয়ের পাঠানো যাত্রাদলের সেই পুরনো 'আসামী'র কাছ থেকে।

এ জীবন সমাজের সাধারণ ধরা-বাঁধা জীবন নয়। এর জাত আলাদা। বাউণ্ডুলে মানুষ এরা। তারাশঙ্করের ভাষাতেই এদের পরিচয় আছে। এরা যত সব আধপাগল মানুষ, কর্মে কুঁড়ে, অভি-নয়-পাগলের দল। রাত্রে রয়াল ড্রেস পরে রাজা সাজে। দিনের বেলা ফকির, ছেঁড়া কাপড়জামা পরে চ্যাটাই পেতে শুয়ে বিড়ি টানে। সেই বাউণ্ডুলের দলের কেউ বাজিয়ে, কেউ গাইয়ে, কেউ

অ্যাক্টর—এ ছাড়া সংসারে তারা কোন কাজ পারে কি না পারে তা কখনও পরখ করে দেখে নি এরা।

এ সংসারে এই অকেজো মানুষের দল কেরানীগিরি করতে পারলে না, কারখানায় কাজ করতে পারলে না, চাষ করতে পারলে না, অন্ন-বস্ত্রের অভাবপীড়িত সংসারে একটি বস্তুকণা সৃষ্টি করে একচুল সাহায্য করতে পারলে না। তাদের নিজেদেরও এর হিসেব নেই, হিসেব করার মনও নেই। তারা এ সব হিসেবের বাইরের মানুষ। তারা কেবল পারে নিজের ময়লা ছেঁড়া জামা-কাপড়ের উপর রঙচঙে পোশাক, পুঁতির মালা পরে, রঙ মেখে রেখাঙ্কিত মুখ পালিশ করে মিথ্যে হেসে, মিথ্যে কেঁদে নেচে গেয়ে কয়েক ঘণ্টার জন্যে অনেক মানুষকে ছেলে-ভোলানোর মত ভুলিয়ে মাতিয়ে হিসেবের খাতায় অপব্যয়ের অঙ্কে বেঁচে থাকতে।

এই মানুষদের নিয়ে গল্প। নর-নারীর পরস্পরের প্রতি আদিম আকর্ষণ এই উপন্যাসের কেন্দ্র-বস্তু। গোরাবাবু, মঞ্জরীর যাত্রাদলের চলমান জীবনযাত্রায় এসে দাঁড়াল অলকা বলে মেয়েটি, তাদের দুজনের জীবনে তৃতীয়জন হয়ে দাঁড়াল।

তারপর অনেক মানুষকে নিয়ে গল্পের বৃহৎ ব্যস্ত ধারা তীব্রবেগে ছুটে চলেছে এখানে ওখানে ঘূর্ণি তুলে। গল্পের গতি কোথাও ক্ষুণ্ণ হয় নি; কোন তত্ত্ব সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। শুধু জীবনের কাহিনী রসের পাকে পাক করা। এ রচনায় এক ধরনের আশ্চর্য নৈর্ব্যক্তিকতার প্রকাশ আছে, যা একে সম্পূর্ণ রসসামগ্রীতে রূপান্তরিত করেছে।

৭

'কীর্তিহাটের কড়চা' ও 'মঞ্জরী অপেরা'র সঙ্গে এ খণ্ডে আর একখানি উপন্যাস সংযোজিত করা হয়েছে। নাম 'বিপাশা'। অতি সুখপাঠ্য রচনা। ঝরঝরে রচনা এবং সুন্দর সুবিন্যস্ত গল্পের সামগ্রী। কিন্তু ওই দুই শিল্পের এ সগোত্র নয়। ওই দুটি রচনায় শিল্পীর যে আশ্চর্য উদ্দীপন লক্ষ্য করা যায়, যে তাপে শিল্পীর প্রাণের শ্রেষ্ঠ রসভাবনা গলে বেরিয়ে এসে কাহিনীতে মূর্তি নিয়েছে তা এ কাহিনীতে অনুপস্থিত। তবু একজন বড় শিল্পীকে জানতে ও বুঝতে গেলে তাঁর সর্বপ্রকার রচনাগুলির সঙ্গেই পরিচিত হওয়া প্রয়োজন। আর সে পরিচয়ে লোকসান নেই। কারণ গল্পের তীব্ররস আপনার জন্যে সেখানে অপেক্ষা করে আছে।

৮

ত্রয়োদশ খণ্ডে যে সব রচনা সংগৃহীত হয়েছে সে সবই তাঁর ষাট থেকে পঁয়ষট্টি বছর বয়সের রচনা। এ সময় শিল্পশক্তি শিল্পীর সম্পূর্ণ আয়ত্ত দীর্ঘ কালের অভ্যাসের সিদ্ধি হিসেবে। কিন্তু বহু সৃষ্টির পর প্রথম বয়সের সেই অনায়াস কবিত্বশক্তি ও উদ্দীপন-ক্ষমতা সময় সময় অনুপস্থিত। যখন পরিণত বয়সের এই কালে সম্পূর্ণ-আয়ত্ত শিল্পশক্তির সঙ্গে শিল্পীর মানসিক উদ্দীপন যুক্ত হয় তখন সৃষ্টি হয় 'কীর্তিহাটের কড়চা' ও 'মঞ্জরী অপেরা'র। কিন্তু যখন বহু আকুল সন্ধানেও সেই উদ্দীপন ঘটে না, শিল্পীর নিগূঢ় মর্মলোকবাসী কবিত্বশক্তি জাগ্রত হয় না, তখন দীর্ঘকালের অভ্যাসে আয়ত্ত করা সিদ্ধির চিহ্নটুকু মাত্রই থাকে, আর কিছু থাকে না। 'বিপাশা'য় সেই 'আর কিছু'র সাক্ষাৎ পাবেন না, তবে দীর্ঘকালের অভ্যাসে আয়ত্ত শিল্পকর্মের আস্বাদ ঠিকই পাবেন।

—সনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

কীর্তিহাটের কড়চা

প্রথম খণ্ড

ভা. গ্র. ১৩—১

আদি পর্ব

কথারম্ভ

মধ্য কলকাতায় জানবাজার। রাণী রাসমনির ঐতিহাসিক স্মৃতিজড়িত বিরাট বাড়ীখানির অনতিদূরে আর একখানা বড় বাড়ী। পুরনোকালের বাড়ী। এখানে এ বাড়ীখানাও এককালে সুপরিচিত ছিল। নাম ছিল রায়কুঠী। গত আটাশ বৎসরে বাড়ীখানা গৌরব হারিয়েছে। পনের বৎসরে বাড়ীখানা স্বামী-পরিত্যক্তার মত ম্রিয়মাণ এবং যেন নিজের পরিচয় গোপন করে বেঁচে আছে।

এই বাড়ীর সামনের দিকে যে পুরনো কালের সওয়াশো ফুট লম্বা এবং পনের ফুট চওড়া দীর্ঘ বারান্দাটা ঘিরে বড় বড় কাচের জানালা দিয়ে আধুনিককালের আমেজ এনে—ঘরে বা হলে পরিণত করা হয়েছে—সেই হলটায় উজ্জ্বল আলোর সারি জ্বলছিল। শীতকালের রাত্রি দশটায়—কাচের জানালাগুলো বন্ধ কিন্তু কাচে সেই আলো প্রতিফলিত হয়ে ঘোষণা করছিল—এতকাল পরে আমি জেগেছি সেজেছি।

ঘরটায় বা ওই হলটায় মুখোমুখি বসে ছিল সুরেশ্বর রায় আর সুলতা ঘোষ। সুলতা অবাক হয়ে হলটায় দেওয়ালে টাঙ্গানো সারিবন্দী ছবির দিকে তাকিয়ে ছিল। উজ্জ্বল আলোর ছটায় তার মুখে-চোখে ফুটে ওঠা প্রশংসা এবং বিস্ময় গোপন ছিল না।

ছবিগুলি সুরেশ্বরেরই আঁকা। বাড়ীখানাও সুরেশ্বরের। শিল্পী হিসাবে সুরেশ্বর আঠারো বছর আগে খ্যাতি অর্জন করেছিল। শুধু স্বদেশে নয়, বিদেশেও। তবে পাগল বা বিকৃতমস্তিষ্ক বা অতি খেয়ালী বেপরোয়া বিদ্রোহী বলত লোকে; যার যেমন ইচ্ছে। আঠারো বছর আগে মানে—১৯৩৫ সাল। যুগটাই বিদ্রোহের। কাজী নজরুলের বিদ্রোহী কবিতার সেই বিধাতার বুকে লাথি মারার আস্ফালন করা বিদ্রোহীদের একজন। সৃষ্টির মধ্যেও তার পরিচয় ছিল—ছবির দুর্বোধ্যতায়। আঠারো বছর আগে—সে সুলতার সঙ্গে অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছিল; সুলতা তখন বি-এ পরীক্ষা দেবে। এই সময়েই সুরেশ্বর হঠাৎ কলকাতা ছেড়ে অজ্ঞাতবাসে ডুব মেরেছিল; সুলতার সঙ্গে অন্তরঙ্গতায়, তার সম্ভাবনাপূর্ণ শিল্পীজীবনে, কলকাতার স্বচ্ছন্দ এবং উত্তেজনাময় জীবনে সব কিছুতে ছেদ টেনে।

আঠারো বছর পরে আবার তাদের দেখা। এ সম্পর্কে সুরেশ্বর সম্বন্ধে অনেক কথা উঠে—মিলিয়ে গিয়ে স্তব্ধ হয়ে গেছে। ধ্বনি প্রতিহত হলেই প্রতিধ্বনি তোলে। না হলে ছড়িয়ে মিলিয়ে যায়। অপবাদের প্রতিবাদ না হলে পঙ্কতলের বায়ু-কণাগুলি বুদবুদ তুলে বাতাসে মিশে যায়—জলের তলায় পাঁক থিতিয়ে পড়ে। সুরেশ্বরের বেলায়ও তাই হয়েছে। লোকে বলেছে—সুলতাও বিশ্বাস করেছে, কীর্তিহাটের জমিদারপুত্রটি ও খেয়ালী শিল্পীটি—দুই সত্তাকে মিলিয়ে কীর্তিহাটের জমিদারীর পঙ্কপঘলে—মহিষ ও বরাহ এই দুই জন্তুর মিশ্রণে একটি অভিনব জন্তুতে পরিণত হয়ে কণ্ঠ ডুবিয়ে পঙ্করস পান করছে এবং সেই পঙ্কে গড়াগড়ি খাচ্ছে।

সুলতা এখন অধ্যাপিকা। ছাত্রী হিসেবে সে কৃতী ছাত্রী ছিল। এম-এতে অর্থনীতি শাস্ত্রে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে অধ্যাপিকা হিসেবে চাকরি নিয়ে তার সঙ্গে রাজনীতির মন্ত্রদীক্ষা

নিয়ে বেশ আনন্দ এবং উৎসাহের সঙ্গেই কাল কাটাচ্ছিল।

হঠাৎ এতকাল পরে দেখা।

সারি সারি ছবিগুলির দিকে তাকিয়ে সুলতা দেখছিল আর ভাবছিল—না, জমিদার-সন্তান সুরেশ্বর মহিষ বা বরাহ যাই হোক—তার ভিতরের শিল্পী তো মরে নি!

ছবিগুলি সুন্দর। সুন্দর ছবি! এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত চোখ বুলালেই ধরা পড়ে—ছবিগুলির ধারা এক নয়। বর্ণবিন্যাসে রেখার ভঙ্গিতে নানান বৈচিত্র্য। টেকনিকও এক নয়। কিন্তু ছবিগুলির বিষয়বস্তুতে একটা ধারাবাহিকতা আছে। পরিবেশ যেন এক। নদী বন গ্রাম। এক নদী এক বন এক গ্রাম। মানুষও আছে। তারাও যেন—অনেকে বার বার ঘুরে ঘুরে এসেছে। রঙ-এর বিন্যাস ভারী সুন্দর। চোখকে যেন ভরে দেয়।

সুরেশ্বরের দিকে সে আবার তাকালে। না, শিল্পী সুরেশ্বর তো মরে নি। এই এতো ছবি সে এঁকেছে! সেই গ্রামে বসে—জমিদারী করতে করতে। চোখে একটা পরিবর্তন পড়ছে। স্পষ্ট পরিবর্তন। সেই খেয়ালী ঝড়ের মত দুরন্ত লোক তো নয়। এ যেন শ্রান্ত। শান্ত।

হঠাৎ সুরেশ্বর একটা ছড়ি দিয়ে প্রথম ছবিখানার ফ্রেমে ঠেকিয়ে বললে—এই আমার প্রথম ছবি। কংসাবতী বারিবিধৌততট বনচ্ছায়াশীতল কীর্তিহাট নামক গ্রাম। সেই গ্রামের পারমানেণ্ট সেটেলমেণ্টের দৌলতে যিনি প্রথম জমিদার—তাঁর নাম সোমেশ্বর রায়। তিনি বিবাহ করে গ্রামে প্রবেশ করছেন।

ছবি একখানি গ্রাম্য পথের। তবে গোটা গ্রামের আভাস আছে। নদী আছে বন আছে—গ্রাম আছে পটভূমিতে—ছবির সম্মুখে গ্রাম্যপথ, সেই পথের উপর একখানা পাল্কী। পাল্কীর ভিতরে বর আর বধূ—বরের হাতে একখানা গুটানো কাগজ। পিছনে গ্রাম্য নরনারী!

সুরেশ্বর বললে—ভদ্রমহিলা ভদ্রমহোদয়গণ—

সুলতা চমকাল এবার।—ভদ্রমহিলা ভদ্রমহোদয়গণ? কি বলছে সুরেশ্বর? সুরেশ্বরের দৃষ্টিও কেমন কেমন হয়ে গেছে।—পাগল?

সুরেশ্বর সামলে নিলে নিজেকে। বললে—না, আমার ভুল হয়েছে। এখানে তো তুমি একা সুলতা—! কিন্তু আমার মনে হল কি জান? এই রকম হয়।—হ্যাঁ হয়।

শঙ্কিত হল সুলতা।

পরিচয়

সুরেশ্বরের পরিচয় মনে পড়ল সুলতার। কীর্তিহাটের কড়চার রেখাচিত্রশিল্পী সুরেশ্বরকে না জানলে ওর কথার মানে ধরা যাবে না, সুলতার মনের আশঙ্কারও স্বরূপ নির্ণয় হবে না। কীর্তিহাটের কড়চারও স্বাদ পাওয়া যাবে না।

এই যে কংসাবতী বারিবিধৌততট—বনচ্ছায়াশীতল কীর্তিহাট গ্রাম—ওই গ্রামেরই জমিদার-বংশের সন্তান। সেই কোম্পানীর আমলের পারমানেণ্ট সেটেলমেণ্টের কাল থেকেই ওরা জমিদার। ওদের বংশে যিনি প্রথম জমিদারী অর্জন করেছিলেন তাঁর নাম ছিল সোমেশ্বর

য়ায়। তাঁর বয়স তখন ষোল। দশ বছর বয়সেই জমিদার হয়েছিলেন সোমেশ্বর রায়। তাঁর বাপের নাম কুড়ারাম ভট্টাচার্য। তিনি ছিলেন গোমস্তা শ্রেণীর মানুষ। তবে যার তার গোমস্তা নয়—গোমস্তা ছিলেন কোম্পানীর দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের—খাস গোমস্তা মুহুরী। দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের সঙ্গে কাগজ নিয়ে কলকাতায় কোম্পানীর সেরেস্তাখানায় কাজ করেছেন, দেওয়ানের পিছনে পিছনে বুড়ো লর্ড কর্ণওয়ালিশের ঘরে গিয়েছেন—কাগজ এগিয়ে দিয়েছেন। পারমানেণ্ট সেটেলমেণ্টের আগে বাংলা বিহার উড়িষ্যার পরগণা-লাট-মৌজার তালিকা করেছেন—তাতে নম্বর বসিয়েছেন; সে সব লাট-মৌজার রাজস্ব নির্ধারিত করেছেন।

দেওয়ানজীর মাতৃশ্রাদ্ধ বাংলাদেশে মহাসমারোহের শ্রাদ্ধ। বাংলাদেশের জমিদারেরা এসে তাঁর কান্দীর বাড়ীতে শুধু আতিথ্যস্বীকার ক'রে ধন্য হন নি—শ্রাদ্ধে তদ্বির-তদারক ক'রে নিজেদের মাথা বাঁচিয়েছেন। দেওয়ানজী সরষের তেল রাখবার জন্যে একটা ডোবা পুকুর কাটিয়ে তাতে তেল ঢেলে রেখেছিলেন। ঘিয়ের কারবার তখন টিনে নয়—বড় বড় হাঁড়ির প্রচলন ছিল—দেওয়ানজীর মাতৃশ্রাদ্ধে একটা ঘর ঘিয়ের বড় বড় জালায় ভর্তি ছিল। কুড়ারাম ভট্টাচার্য ছিলেন ঘিয়ের ভাঁড়ারে। সেখান থেকে দেওয়ান তাঁকে হঠাৎ তলব ক'রে বলেছিলেন—কুড়োরাম, ও ভার নিয়ে তোমার আটকে থাকা চলবে না। তোমাকে নিযুক্ত করলাম কৃষ্ণনগরের কুমার শিবচন্দ্র রায় আসছেন তাঁর পরিচর্যার জন্যে। সাবধান—পান থেকে চুন না খসে।—শোনা গিয়েছিল কৃষ্ণনগরের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় অসুস্থ বলে আসতে পারবেন না। তিনি মার্জনা চেয়ে পত্র লিখেছিলেন—"দরবার অসাধ্য পুত্র অবাধ্য—ভরসা কেবল গঙ্গাগোবিন্দ।" কিন্তু তারপর কুমার হঠাৎ রাজী হয়ে এসেছিলেন নিমন্ত্রণ রাখতে। দেওয়ানজীর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের সময় কুড়ারাম ভট্টাচার্য উপস্থিত ছিলেন। দেওয়ানজী বলেছিলেন—কি কুমার, কেমন আয়োজন দেখছেন? কুমার শিবচন্দ্রের জিহ্বা ছিল প্রখর। ক্ষুরের মত তীক্ষ্ণধার। তিনি উত্তর দিয়েছিলেন—দেখলাম। প্রায় দক্ষযজ্ঞ!

অর্থাৎ লণ্ডভণ্ড হয়ে পণ্ড হবে এই ইঙ্গিত করেছিলেন। কিন্তু দেওয়ানজী তার উপরেও প্রখর—তিনি বলেছিলেন—ভুল হল কুমার। দক্ষযজ্ঞের চেয়েও বেশী!

ভ্রূকুঞ্চিত করে শিবচন্দ্র বলেছিলেন—বলেন কি দেওয়ানজী, দক্ষযজ্ঞের চেয়েও বেশী? অর্থাৎ ঔদ্ধত্য তো কম নয়! কিন্তু দেওয়ানজী তৎক্ষণাৎ উত্তর দিয়েছিলেন—নিশ্চয়। বিবেচনা আপনিই করুন কুমার; দক্ষযজ্ঞে শিব আসেন নি প্রথমে—আমার যজ্ঞে স্বয়ং শিব উপস্থিত—যজ্ঞের আদিতেই।

অর্থাৎ কুমার শিবচন্দ্র নিজে এসেছেন।—এসেছেন দেওয়ানজীকে মান্য করেই এটা মনে করিয়ে দিয়েছিলেন।

আসেন নি শুধু বর্ধমানের মহারাজা। বলেছিলেন—কি, আমি ক্ষত্রিয় হয়ে লালা—অর্থাৎ কায়েতের বাড়ী যাব নিমন্ত্রণ রাখতে? তার শোধ দেওয়ানজী নিয়েছিলেন। অন্য জমিদারদের খাজনা ধার্য তিনি করেছিলেন এগার ভাগের দশ ভাগ। বর্ধমানের মহারাজার পাঁচ হাজার বর্গমাইল জমিদারী—তাঁর উপর খাজনা ধার্য হয়েছিল ষোল আনা—অর্থাৎ এগার ভাগের পুরো

এগার ভাগ। অঙ্ক নিজে বসিয়েছিলেন কুড়ারাম ভট্টাচার্য মশায়। বাহান্ন লক্ষ তিপ্পান্ন হাজার টাকা।

কুড়ি লক্ষ টাকা খরচ হয়েছিল এই শ্রাদ্ধে। হ্যাঁ, তার আগে শোভাবাজারের নবকৃষ্ণ দে মাতৃশ্রাদ্ধে ন লক্ষ টাকা খরচ করেছিলেন। তিনি বাংলাদেশের দেববিগ্রহদের নিমন্ত্রণ করে এনেছিলেন ব'লে দেব উপাধি পেয়েছিলেন। সে গৌরব ম্লান করে দিয়েছিলেন দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ। এ সমস্ত কিছুর মধ্যে কুড়ারাম ভট্টাচার্য ছিলেন তাঁর বিশ্বাসভাজন কর্মচারী। সেখান থেকেই তিনি প্রচুর উপার্জন করেছিলেন। পাকা বাড়ী করিয়েছিলেন; জমিজেরাত অনেক কিনেছিলেন। কিন্তু জমিদারী কেনেন নি। জমিদারী কিনেছিলেন শেষ জীবনে—পুত্র সোমেশ্বরের নামে। সেটা আঠারশো এক সাল। জমিদারী তখন কেনা গেলেও চালানো সহজ ছিল না। এগার ভাগ আদায়ের দশ ভাগ দিতে হ'ত কোম্পানীকে। কিস্তি ছিল বারো মাসে বারো কিস্তি।

প্রজা খাজনা বাকী ফেলত। ইস্তফার পত্র লিখে জমিদারী কাছারীতে দিয়ে যেত, জমিদার নিতে চাইত না—প্রজা ফেলে দিয়ে পালাত। তাছাড়া পারমানেণ্ট সেটেলমেণ্টের পর কোম্পানী সরকার জমিদারদের প্রজার উপর জুলুমবাজীর অধিকার খর্ব ক'রে আইন তৈরী করায় জমিদারী কিনে খাজনা সুসারে আদায় করা কষ্টকর হয়ে উঠেছিল। ফলে পুরনো জমিদারদের জমিদারী রাজস্ব বাকীর দায়ে সূর্যাস্ত আইনে নিলেম হয়ে গেল। বীরভূমের মুসলমান আমলের নবাবদের জমিদারী নিলেম হল। বর্ধমানের মহারাজার মণ্ডলঘাট পরগণা নিলেম হয়ে গেল। এক বর্ধমানের রাজার এস্টেট থেকে তিরিশ হাজার বাকী খাজনার নালিশ দায়ের হল। তখন লর্ড কর্ণওয়ালিশ দেশে গিয়েছেন—লাটসাহেব হয়ে এসেছেন লর্ড ওয়েলেসলী। সব দেখেশুনে তিনি সপ্তম আইন—রেগুলেশন সেভেন তৈরী করে জমিদারদের ক্ষমতা দিলেন যে, বাকী খাজনার দায়ে জমিদার ক্ষেতের ফসল ক্রোক ক'রে নিলেম করাতে পারবে। সেটা ইংরিজী ১৭৯৯ সাল। সেই সময় কুড়ারাম ভট্টাচার্য একদিন দেওয়ানজীর সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন।

দেওয়ান তাঁকে দেখে বলেছিলেন—কি খবর ভটচায্?

—অধীনের একটা আর্জি আছে।

—বল!

—হুজুরের মেহেরবাণীতে সবই হয়েছে অধীনের। শুধু একটি সাধ পূর্ণ হতে বাকী।

—কি সে সাধ? ব্যক্ত কর।

—হুজুর, ভেবেছি মায়ের সেবা প্রতিষ্ঠা করব—

—এ তো সাধু সংকল্প হে! করে ফেল। তোমার অর্থের অভাব আছে বললে তো আমার অবস্থাই ফকিরের অবস্থা দাঁড়ায় হে।

—আজ্ঞে—তা নয়। তবে মা কি আমার কারুর অধীনস্থ রায়ত হয়ে আসবেন মাথা হেঁট করে?

—বেশ তো, লাখরাজ করে দিচ্ছি তোমার সম্পত্তি।

—আজ্ঞে ওর সঙ্গে আর একটুকু চাই।

—সেটা কি ?

—কিছু জমিদারী না হলে মায়ের মাথায় মুকুট পরাব কোন্ লজ্জায় ? গ্রামের লোকের উপর তাঁর হুকুম কায়েম হবে কি করে ?

—বেশ, বল কোন্ লাট কিনবে ? ষোলশো ষাট পরগণার হস্তবুদ কালেকটারী খাজনা তো তোমার কণ্ঠস্থ। টাকারও তোমার অভাব আমি রাখি নি।—বল !

—আজ্ঞে না হুজুর, সামান্য ব্যক্তি আমি, সাধ্য কম। তবে আমার গ্রাম কীর্তিহাট—লাট কীর্তিহাটের সামিল—ওই স্বগ্রামটুকু তার চারপাশে চারখানা গ্রাম—

বেশ, তা হবে। কীর্তিহাট এবার নীলামে উঠবে।

উঠতে বেগ বিশেষ পেতে হয়নি। কীর্তিহাটের জমিদারদের পাঠানো রাজস্ব সেবার পথেই লুঠ হয়েছিল। নিলাম ডেকে নিতেও প্রতিদ্বন্দ্বী জোটে নি। নিলাম ডাক হয়েছিল কুড়ারামের নামে নয়। পুত্র সোমেশ্বরের নামে। এবং উপাধি তাঁর ভট্টাচার্য নয়, হয়েছিল রায়। লেখা হয়েছিল নিলাম ক্রেতা শ্রীসোমেশ্বর রায়—পিতা শ্রীকুড়ারাম রায় ওরফে ভট্টাচার্য। তাই সুরেশ্বরদের বংশের জমিদারী জীবনের ইতিহাসে আদি পুরুষ সোমেশ্বর রায়। তাঁর উপাধির ক্ষেত্রে ওরফে ভট্টাচার্যও আর লেখা হ'ত না। সোমেশ্বর তারপর বিস্তৃত জমিদারী কিনেছিলেন। সোমেশ্বরের পর বীরেশ্বর রায়, তারপর রত্নেশ্বর রায়—তাঁর তিন ছেলে—বড় দেবেশ্বর রায়। তাঁর দুই ছেলে—বড় যজ্ঞেশ্বর, ছোট যোগেশ্বর রায়। সুরেশ্বর যোগেশ্বর রায়ের একমাত্র সন্তান। সে আমলের বিচারে বেশী বয়সের ছেলে সুরেশ্বর, জন্মেছিল ৫ই মার্চ ১৯১০ সাল।

সুরেশ্বর পুরনো জমিদার বাড়ীর ছেলে হলেও জন্মকাল থেকেই ওর কোন সংশ্রব ছিল না জমিদারীর সঙ্গে। সুরেশ্বরের বাবা যোগেশ্বর রায় জমিদারের ছেলে হয়েও পেশায় ছিলেন জার্নালিস্ট। তাঁরও জন্ম কলকাতায়। ছাত্রজীবনে তিনি উজ্জ্বল ছাত্র ছিলেন। তাঁর বাবা দেবেশ্বর রায়—রত্নেশ্বরের জ্যেষ্ঠপুত্র—জমিদারীতে ছ আনা অংশ পেয়েছিলেন, কিন্তু জমিদারী তাঁর ভাল লাগেনি। তিনিও ইংরিজী শিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন। হয়তো সম্পত্তির ক্ষেত্রে দেবতার সঙ্গে বাঁধা না থাকলে দেবেশ্বর ব্রাহ্মই হয়ে যেতেন। অনেকে বলে ক্রীশ্চান হতেও তাঁর আপত্তি ছিল না। কিন্তু সম্পত্তি দেবত্র বলে তিনি তা পারেন নি। তিনি নামে জাত ও ধর্ম বজায় রেখে সম্পত্তির অধিকারই অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। এবং ধর্মকর্ম ক্রিয়াকলাপের ঝঞ্ঝাট থেকে দূরে থাকবার জন্য কলকতাবাসী হয়েছিলেন যাতে তাঁর ইচ্ছামত আচরণ বিচরণের পথে কোন বাধা না-দাঁড়ায়। কলকাতায় তিনি ব'সে ব'সে ভোগ করেননি, কর্ম করেছিলেন। জমিদারীর সঞ্চিত অর্থে ব্যবসা করেছিলেন। অবশ্য চাল ডালের গদী গুদাম নয়, বড় স্টোরস নয়। করেছিলেন কলিয়ারী কিনে কয়লার ব্যবসা। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর তার আগে কারঠাকুর কম্পানী করেছিলেন। রাণীগঞ্জ অঞ্চলে তাঁর খনি ছিল। দেবেশ্বর তাঁর পরবর্তীকালের মানুষ, তাঁর সময়ে কয়লায় নতুন ফিল্ড বেরিয়েছে—ঝরিয়া ফিল্ড। সেই ঝরিয়া ফিল্ডে তিনি কলিয়ারী কিনে কুঠীতে সাহেব ম্যানেজার এবং কলকাতায় আপিসে

সাহেব অফিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট রেখে ব্যবসা চালাতেন। ব্যবসা ভালই করেছিলেন। এর সঙ্গে তাঁর ইচ্ছে ছিল তিনি একখানা খবরের কাগজ করবেন। ইংরিজী খবরের কাগজ। এ ইচ্ছে তাঁর উৎসাহিত হয়েছিল যোগেশ্বরের ছাত্র জীবনের কৃতিত্ব থেকে। যোগেশ্বর ইংরিজীতে এম-এ পরীক্ষায় বেশ ভাল ভাবে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। চেষ্টা করলে অনায়াসে ডেপুটি হতে পারতেন, কিন্তু তার বদলে দেবেশ্বর ছেলেকে নিয়ে গিয়ে অমৃতবাজারের শিশিরকুমারের হাতে দিয়েছিলেন। দেবেশ্বর রায় ছিলেন সে আমলের নামী লোক। ল্যাণ্ড হোল্ডার্স এ্যাসোসিয়েশন, বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন, ইণ্ডিয়া লীগ প্রভৃতি সমিতির সভ্য এবং কলকাতার অভিজাত সমাজে সমাদৃত মানুষ ছিলেন।

রত্নেশ্বর রায় বড় ছেলের প্রকৃতি বুঝেই তাকে কলকাতার জানবাজারের বাড়ীখানাও দিয়েছিলেন। অন্য ছেলেদের জন্যে স্বতন্ত্র বাড়ী কিনে দিয়েছিলেন—অপেক্ষাকৃত ছোট বাড়ী। দেবেশ্বর ব্যবসায়ে ব্যর্থ হন নি, তিনি ব্যবসায় করে কয়েকটা কলিয়ারী এবং বেশ কিছু অর্থ সঞ্চয়ও করেছিলেন। মৃত্যু হয়েছিল তাঁর অকস্মাৎ—কিন্তু দেবেশ্বর তার আগেই উইল ক'রে রেখেছিলেন, বড় ছেলেকে দিয়েছিলেন কলিয়ারী এবং ছোট যোগেশ্বরকে দিয়েছিলেন জানবাজারের বাড়ী এবং নগদ এক লক্ষ টাকা যা থেকে যোগেশ্বর একখানা ইংরেজী কাগজ বার করতে পারবে।

যোগেশ্বর তখন নবযুবক। কালের দিক থেকে তখন উনবিংশ শতাব্দী সবেমাত্র শেষ হয়েছে। বড় ভাই যজ্ঞেশ্বর কলিয়ারী ব্যবসায়ীর কন্যাকে বিয়ে করেছেন—তাঁর চালচলন—রুচির সঙ্গে যোগেশ্বরের রুচির তফাৎ হয়ে গেছে, তিনি স্বতন্ত্র হয়ে গেলেন ; যোগেশ্বর অমৃতবাজার ছেড়ে ইংলিশম্যানে নিজের জায়গা করে নিয়ে দস্তুত মত সাহেব হয়ে উঠেছেন।

জানবাজারের বড় বাড়ীটায় প্রেস করবে যোগেশ্বর কল্পনা করেই দেবেশ্বর বাড়ীটা ওঁকে দিয়েছিলেন। কিন্তু যোগেশ্বর বাড়ীর সামনের যেটা পোষাকী মহল সেটা নিজের জন্যে রেখে বাকীটা ভাড়া দিয়েছিলেন—বেছে বেছে সম্পন্ন ফিরিঙ্গী টেনেণ্ট দেখে। তাঁর নিজের বাড়ীতে তিনি নিজে চাকর বাবুর্চি নিয়ে থাকতেন। বিবাহ অনেক দিন পর্যন্ত করেন নি। অবশ্য সেকালের বিচারে অনেক দিন। নইলে একালে সাতাশ বছর বয়সকে কে বেশী বয়স বলবে। লোকে নানান কথা বলত। এমন কি তাঁর ভাই এবং জ্ঞাতিবর্গেরা প্রমাণ প্রয়োগ সংগ্রহ করতেও শুরু করেছিল যে যোগেশ্বর ধর্মহীন বা জাতিচ্যুত হয়েছেন। যাতে তাঁদের দেবোত্তরের এজমালী সম্পত্তির সেবায়েত স্বত্ব থেকে আইন আদালত করে বঞ্চিত করা যায়। ঠিক এই সময়েই যোগেশ্বর বিয়ে করলেন—করলেন একেবারে ব্রাহ্মণের কন্যাকে—খাঁটি হিন্দুধর্ম মতে—টোপর চেলী প'রে বর সেজে নারায়ণ শিলা সম্মুখে রেখে।

১

একান্তভাবেই ঘটনাচক্রে ঘটল। নইলে যোগেশ্বর এ সব গ্রাহ্য করতেন না। জীবন-ধারণের পন্থায় তিনি সাহেব ছিলেন—মতামতে তিনি মডারেট ছিলেন। নিখুঁত সাহেবী

পোশাক পরে চুরুট মুখে সভায় পার্টিতে ঘুরতেন, রাত্রিকালে ফিটনে চেপে বেড়াতেন। হোটেলে মধ্যে মধ্যে খানা খেতেন। মদ্যপান ছিল নিয়মিত। এবং নামও তখন তাঁর ছড়িয়েছে। বিলেতের কাগজেও লেখা বের হয়। হঠাৎ বাঁধা পড়ে গেলেন সুরেশ্বরের মা হেমলতার কাছে। হেমলতার মামা হাইকোর্টের এ্যাডভোকেট, মাঝারি পশার, কিন্তু থাকতেন ব্যারিস্টারী চালে অর্থাৎ বিলেত-ফেরতের চালে। সেদিক দিয়ে যোগেশ্বরের সঙ্গে মিল ছিল। হেমলতার মা-বাপ দুই-ই ছেলেবয়সে মারা যাওয়ায় সে মামারই পোষ্য হয়ে ছিল, কিন্তু অবজ্ঞার পোষ্য নয়। মামা-মামী দুজনের কাছেই ছিল তার পরম সমাদর। মামী শুধু মামীই ছিলেন না, তিনি তার পিসীমাও ছিলেন—আপন পিসীমা। সুতরাং মামাও একাধারে মামা ও পিসেমশাই ছিলেন। হেমলতাকেই নিজের মেয়ের মত যত্নে মানুষ করেছিলেন। এবং বেশ বেশী বয়সে যখন তাঁদের সন্তান হল—তখন স্নেহ তার উপর পড়লেও হেমলতার উপর তাঁরা নির্দয় হননি। হেমলতা তখন এণ্ট্রান্স পাশ করে কলেজে পড়ছে। সেই সময় যেন ঠিক লগ্নটিতেই যোগেশ্বর রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করেছিলেন। হেমলতার বয়স তখন ষোল। যোগেশ্বর হেমলতাকে দেখে মুগ্ধ হলেন। এবং কিছুদিনের মধ্যেই হেমলতার মামাকে চিঠি লিখে জানালেন যে তিনি হেমলতাকে বিবাহ করতে চান, এবং পাত্র হিসাবে অযোগ্য নন। তাঁর আয় ব্যয় যা কিছু সমস্ত কিছুর বিশদ বিবরণ দিয়ে লিখলেন—"হেমলতার মত নেবার ভার আপনার উপর। বিবাহ হিন্দুমতে হবে যখন, তখন এ পদ্ধতিটাও সেই মতানুযায়ী হওয়াই বাঞ্ছনীয়।"

মামা খুঁত্-খুঁত্ করেছিলেন বয়েসের জন্য এবং যোগেশ্বর সম্পর্কে গুজবের কথা শুনে। কিন্তু হেমলতা যোগেশ্বরকে দেখে সত্যিই মুগ্ধ হয়েছিল। সেকালে, এণ্ট্রান্স পাশ করা হেমলতা একালের এম·এ পাশ মেয়ের থেকেও প্রগতিশীলা। তার উপর বাড়ীর চালটাই ছিল বিলেত-ফেরত না হয়েও বিলেত-ফেরতদের মত। লোকে বলত,—সূর্যের তাপে বালি তাতে—তার চেয়েও বেশী তাতে উনোনের উপর আগুনের তাপে—খোলার বালি। কথাটা খুব রঙচড়ানো নয়। হেমলতা নিজেই মামীকে বা পিসীকে বলেছিল—বয়সের জন্য খুঁত্-খুঁত্ করতে বারণ করো পিসীমা। কি বয়েস? ওর যদি তিরিশে বয়স হয়ে থাকে তবে আমিও ষোল, আমারও তো তা হলে প্রায় বুড়ী হওয়ার কাল হয়ে এসেছে গো। এ দেশে তো কুড়ি পেরোলেই বুড়ি। আর মদ-টদ—অন্য কথা। ও সব আমার ওপর ছেড়ে দাও।

তার প্রমাণও সে দেখিয়ে দিয়েছিল। একখানা চিঠি যোগেশ্বরকে লিখেছিল—আপনার প্রস্তাবে আমি মত দেব ভাবছি মামাকে। কিন্তু আপনি আমার মামার সামনে মদ খাবেন—এটা আমার কেমন লাগছে। মদ-টদ কিন্তু চলবে না। এটার প্রমাণ পেলেই আমার মত মামাকে জানাবো।

যোগেশ্বর এতে অরাজী হননি। হাজার হলেও বাঙালীর ছেলে—ডাল ভাতের সঙ্গে ছেলেবেলায় এইসব সুলভ সৌজন্য এবং শ্রদ্ধা প্রকাশের আচরণগুলিতে অভ্যস্তও ছিলেন এবং এ-সবের একটা মিষ্টি-স্বাদ স্মৃতিতেও ছিল। তিনি প্রস্তাবটিকে রাবিশ বলেননি বা এতে তিনি নিজে খাটো হবেন একথাও তাঁর মনে হয়নি। সুতরাং সেদিন রাত্রেই সাড়ে আটটার পর কাগজের আপিস থেকে বেরিয়ে সটান হেমলতার মামার বাড়ীতে উঠে সিঁড়ির মুখেই চুরোটটা

ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ঘরে ঢুকছিলেন। হেমলতার মামা সামনে হুইস্কির গ্লাস রেখে বসে ছিলেন। যোগেশ্বরকে দেখেই বেয়ারাকে ডেকেছিলেন, "বয়, গ্লাস লে আও।" যোগেশ্বর বলেছিল—নো থ্যাঙ্কস। পেগ নয়—বরং চা এক কাপ! হেসে সোজা মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন—আপনি গুরুজন—মামাশ্বশুর হবেন। ওটা আর আপনার সামনে চলতে পারে না। আমরা হরতন নই ইস্কাপন। ইস্কাপনী ধারাটাই ভাল। তার উপর বিয়ে হলে হবে খাঁটি হিন্দুমতে। রেজেস্ট্রীতে ডাইভোর্স আছে। বিধবা-বিবাহ আছে। জানেন—Spade is always a Spade—আপনাকে চিঠি লিখে অবধি রেজেস্ট্রী বিয়ের কথা ভাবতে গেলেই বুকটা রি-রি করে উঠছে। তার ওপর আমাদের দেবোত্তর সম্পত্তি অনেক বড়, জ্ঞাতি-গুষ্টিরা শুনেছি খুঁত খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছে। রেজেস্ট্রী বিয়ে করলে তাল ঠুকে নালিশ ক'রে বসবে! তবে এটার চেয়ে ওটা বড়। ভারী ভাবতে ভাল লাগছে—আমি মরে গেলেও হেমলতা আমার ফটোয় মালা পরাচ্ছে চন্দন দিচ্ছে।

সুতরাং বিয়ে হতে আর বিন্দুমাত্র বাধা হয়নি। তবে ওই শেষ কথাটার জন্যে হেমলতা রাগ করেছিল, না-ও বলেছিল। যোগেশ্বর রাগ ভাঙিয়েছিলেন। বলেছিলেন—ও কথাগুলো আমি উইথড্র করছি। তার বদলে বলছি—তুমি মরলে আমি কাঁদছি, সিঁথিতে সিঁদুর ঢেলে দিচ্ছি—পায়ে আলতা—আমি না—অন্যকে দিয়ে পরিয়ে দিচ্ছি। বেনারসী কাপড় পরিয়ে খোল-করতাল বাজিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। সমারোহ করে চন্দনধেনু শ্রাদ্ধ করছি।—

হেমলতা হেসে ফেলেছিলেন—তুমি ইনকরিজিবল। থাম!

বিয়ে হয়েছিল ১৯০৯ সালে, মার্চে। সেদিক দিয়ে রোমান্টিক ছিলেন যোগেশ্বর। বসন্তকাল শুক্লপক্ষ দেখে দিন নির্বাচন করেছিলেন—যার কদিন পরেই হোলি। শোলার টোপর গরদের পাঞ্জাবী বেনারসী ধুতি-চাদর গোড়ের মালা চন্দনের তিলক-সজ্জা—বাকী কিছু রাখেননি। বিয়ের পর হোলির সময় দীর্ঘকাল পর কীর্তিহাটে গিয়ে এক সপ্তাহ থেকে মধুচন্দ্রিমা যাপন করে এসেছিলেন। এবং সেবার হোলিতে নিজের খরচে রাজরাজেশ্বরের নাটমন্দিরে কলকাতা থেকে বাঈজীর নাচ করিয়েছিলেন।

এর প্রায় এক বছরের মধ্যেই জন্ম হয়েছিল সুরেশ্বরের। ফাল্গুনের শেষে ওই হোলির দিনই সুরেশ্বরের জন্ম। হেমলতা ওকে ডাকতেন সেই জন্য ফাল্গুনী বলে। এমন সুন্দর নামটা—ভাল নাম হতে বাধা হবার কথা নয়—কিন্তু কীর্তিহাটের কুড়ারাম ভট্টাচার্যের ছেলে সোমেশ্বর রায় নাম গ্রহণ করার পর থেকে ঈশ্বর পরিশেষে যুক্ত না করে নাম রাখবার নিয়ম নেই। যোগেশ্বর যে যোগেশ্বর তিনি ছদ্মনামে লিখবার জন্য যে নাম নিয়েছিলেন তাও ঈশ্বরের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়নি—"ওমনি-পোটেণ্ট" নামে লিখতেন। সেই কারণে ১৯১০ সালে বাংলাদেশের নেতা এবং সংবাদপত্র ক্ষেত্রে তখনকার সিংহ সুরেন্দ্রনাথের নামটাকেই অর্থাৎ সুর-ইন্দ্রকেই সুরেশ্বর করে নামকরণ করেছিলেন। সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে যোগেশ্বরের প্রবল মত-পার্থক্য ছিল—বেঙ্গলী আর ইংলিশম্যানের মতপার্থক্য—তবু তিনি অর্থাৎ যোগেশ্বর তাঁকে বলতেন লায়ন অব বেঙ্গল।

চাকর দারোয়ান ডাকত 'লাল' বাবু বলে। আসলে ফাগুলাল কিন্তু হেমলতার ভয়ে

লালবাবু হয়েছিল।

লাল সত্যই রূপের অধিকারী ছিল, এবং বাপের দুলাল ছিল। মা শাসন করতে চাইতেন কিন্তু বাপ দিতেন না।

মধ্যে মধ্যে এ নিয়ে বাগ্‌যুদ্ধ হত স্বামী-স্ত্রীতে। হেমলতা বলতেন—দেখ সব বিষয়ে তুমি আমাকে দাবিয়ে রেখেছ, ছেলের ক্ষেত্রে তা চলবে না, আমি মানব না।

যোগেশ্বর কপালে হাত ঠেকিয়ে বলতেন—ভাগ্যং ফলতি সর্ব্বত্র ন চ বিদ্যা ন চ পৌরুষং।

—তার অর্থ?

—অতি সরল। তোমাকে আমি দাবিয়ে রেখেছি এ অপবাদও শুনতে হল—এবং হ'ল-হ'ল তোমার মুখ থেকেই হল?

—রাখনি দাবিয়ে? তুমি আমার কোন কথাটা রাখ?

বাধা দিয়ে যোগেশ্বর বলতেন—সে তুমি বললেও হবে না—আমি বললেও হবে না। সাক্ষী মান। বলুক তৃতীয় পক্ষ!

হেমলতা বলেছিলেন—তোমার চাকর-বাকর তো তোমাকে ভয় করে।

—বেশ তো ডাক না, এই বাড়ীর প্রায় সামনে শিককাবাবওলা আবদুল কি বলে—ডেকে জিজ্ঞেস কর!

—আবদুল? কি বলে আবদুল?

—আবদুল বলে—সাদী করকে রায়-সাহেব তো শের সে শিয়ার বন গয়া। সাদীকা পহেলে বারা-এক বাজেতক মায়দানমে ফিটনকে পর ঘুমতা, শেরকে মাফিক আওয়াজ দেতা। কনেষ্টবল লোক সেলাম দেতা। ঘরকে দরওয়াজা পর পৌছছ কর শেরকে মাফিক ফুকারতা—কেয়া বানায়া রে আবদুল? আর সাদীকে বাদ দেখো—নও বাজতা আওর রায় সাহেব ঘর মে পৌছছ যাতা—, আবদুলকো ফুকারতা নেহি—কাবাব ভি খাতা নেহি—ঘর ঘুষ যাতা। বারা বাজতা বাতি বুত যাতা। পহলে—দো-তিন তক বাতি জলতা, রায় সাহাবকো আওয়াজ মিলতা—বোয়! খানা টেবিলসে বর্ত্তন-উর্ত্তন ফেক দেতা—ঝন-ঝন-ঝন-ঝন—! বাস। আব বলো—ঠিক বোলা কি ঝুট বোলা! নেকড়ানি ফিরিঙ্গী ছোকরী লোক তো রোতি হ্যায় উনকো লিয়ে!

হেমলতা এ সবের একটাও অস্বীকার করতে পারতেন না—মুখ টিপে হেসে বলতেন—লোকটাকে আমি বকশিস করব, কিন্তু তার জন্যে আপশোস হয় না কি?

—একবারে হয় না বলতে পারিনে। তবে তার থেকে অনেক বেশী আনন্দ এবং আরাম তাতে সন্দেহ নেই। ছেলেবেলা কীর্তিহাটে চণ্ডী ভটচাজ ছিল তন্ত্রসাধক। দিন-রাত্রি মদ খেয়ে থাকত, টলত। তার ভায়ে অমর মুখুজ্জে গাঁজা খেতো। চণ্ডী ভটচাজ বলতেন—ওরে অমরা, আমি একদিন একছিলম গাঁজা খেয়েছিলাম—তিনদিন হুঁস ছিল না—সেই গাঁজা তুই ব্যাটা দিনে তিনবার টানিস! তা দেখ, বিয়েও আমার কাছে তাই। ওই একবার খেয়ে যে বুঁদ হয়ে গেছি সে বুঁদ নেশা আর কাটল না। রাত্রি নটা হ'তে না হ'তে সেই বিয়ের রাতের চাঁদ ওঠে মনের মধ্যে। কলায় কলায় বাড়তে থাকে মিনিটে মিনিটে! পূর্ণ চন্দ্র

দেখতে ছুটে এসে আমি হাঁ করে চেয়ে থাকি ! তুমি ভেবো না, ব্যাটার ষোল বছর হতে-না-হতে বিয়ে দিয়ে দেব। আমি শেয়াল হয়েছি—ব্যাটা খরগোস হয়ে যাবে।

—কিন্তু তরিবৎ সহবৎ লেখাপড়া—এগুলো চাই না কি ?

—ডোণ্ট ওরি—ডার্লিং, তুমি মা, আমি বাপ, আমার বাপ দেবেশ্বর রায় এম-এ, তার বাপ রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায় বি-এ, তার বাপ বীরেশ্বর রায়,—তিনি নীলকরদের ছেলেদের সঙ্গে মিশতেন, পাদরী হিল সাহেবের কাছে ইংরিজী শিখেছিলেন, কালীপ্রসন্ন সিংহী প্রভৃতির বিদ্যোৎসাহিনী সভায় তাঁর নেমন্তন্ন হত। রত্নেশ্বর মানুষ হয়েছিলেন পিসেমশাইয়ের কাছে। পিসেমশাই বিমলাকান্ত ছিলেন সংস্কৃতে ইংরিজিতে পণ্ডিত। সোমেশ্বর তাদের পূর্বপুরুষ—তিনি সংস্কৃত, পার্সী, উর্দু ভাল জানতেন। এ বংশের সুরেশ্বর তরিবৎ সহবৎ লেখাপড়া সব শিখবে।

যোগেশ্বরের অতিবাৎসল্যের আর একটু কারণ ছিল ; সুরেশ্বরের জন্মের দু বছর পর হেমলতা আবার সন্তানসম্ভবা হয়েছিলেন এবং প্রসবের সময় মরণাপন্ন হন। বহু কষ্টে বহু অর্থব্যয়ে কলকাতার শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকদের অস্ত্রোপচারের ফলে মরা সন্তান কেটে বের করে দেওয়া হয়, এবং সেই সঙ্গে হেমলতারও আর সন্তান ধারণের শক্তি শেষ হয়।

যোগেশ্বর সেটা মনে পড়িয়ে দিতেন—আর তো হবে না। তাছাড়া আমরা যখন আমরা হয়েছি তখন ও-ও তাই হবে, মা ভৈঃ।

নিরস্ত হতে হ'ত হেমলতাকে। হয়তো স্বামী-গরবিণী অন্তরে অন্তরে পুলকিতও হতেন।

* * *

মা ভৈঃ বলতেন বটে যোগেশ্বর কিন্তু এগার বছর বয়সে তিনি ছেলেকে নিজেই ভয় পেলেন। তিনি যে চেয়ারটায় অনড় হয়ে বসেছিলেন ইংলিশম্যান আপিসে ১৯০৫ সাল থেকে, সেই চেয়ারটায় ধাক্কা দিয়ে তাঁকে চমকে দিল এগার বছরের ছেলে সুরেশ্বর। অবশ্য তিনি নিজেই যেন চঞ্চল হয়ে অন্যমনস্ক ছিলেন, ঠিক শক্তভাবে নিজের পুরো চাপ দিয়ে বসে কর্মনিমগ্ন ছিলেন না। সেটা উনিশশো একুশ সাল—অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়েছে। যোগেশ্বর বরাবর ইংরিজীর ভক্ত, ইংরেজ শাসন ও শৃঙ্খলার পক্ষপাতী। এর জন্য ভক্তি ও শ্রদ্ধা সত্ত্বেও সুরেন্দ্রনাথকে তিনি মানেননি। বেঙ্গলীর এডিটোরিয়ালের জবাব লিখেছেন। ১৯০৫ সালে কোথায় এক-টিন বিলিতী বিস্কুট ভেঙ্গে ছড়িয়ে গুঁড়ো করার জন্য তিনি একটা প্যারা লিখেছিলেন—"একটি আবিষ্কার"। তাতে লিখেছিলেন—"আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হলাম যে, ইংরেজের ভারত সাম্রাজ্যের স্বত্বের দলিল নিরাপত্তার জন্য ইংরেজ বিস্কুটের টিনে প্যাক করে রেখে দিয়েছে। সেই সত্য আবিষ্কার করেছেন সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী এবং তাঁর সহকর্মীরা। সম্প্রতি স্থানে স্থানে বিস্কুটের টিন পেলেই ভেঙে দেখা হচ্ছে দলিলখানা পাওয়া যায় কিনা। কিন্তু কর্তারা বিস্কুটগুলো অপচয় করছেন কেন ? সেগুলো খেলে তো পেট ভরে।"

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় সরকার থেকে তিনি মেসোপোটেমিয়া ফ্রন্ট এবং ওদিকে ফ্রান্সে ভার্দুন পর্যন্ত ফ্রন্ট দেখে এসেছিলেন।

গান্ধী যখন কলকাতায় এসে ভূপেন বোসের বাড়ী অতিথি হয়েছিলেন, তখন তিনি তাঁকে

দেখেছেন—আলাপ করেছেন। তাঁর ভাল লাগেনি। বাড়ীতে হেমলতার সঙ্গে আলোচনায় বিদ্রূপ করেছেন। বিদ্রূপ করেছেন তাঁর বেশভূষার জন্য, বিদ্রূপ করেছেন তাঁর ফল খেয়ে থাকার জন্য, তাঁর অদ্ভুত মতবাদের জন্য। এবং যেদিন রাউলাট বিলের প্রতিবাদে হরতাল ডেকে শেষ পর্যন্ত জালিয়ানওয়ালাবাগের মত মর্মান্তিক কাণ্ড ঘটল সেদিন তাঁর যত ক্রোধ হয়েছিল ইংরেজের ওপর এমন কি সার মাইকেল ওডায়ার ও জেনারেল ডায়ারের উপর তার চেয়েও তাঁর ক্রোধ হয়েছিল গান্ধীর উপর। সেই—সেই ব্যক্তিই এর জন্য দায়ী। কিন্তু বিস্মিত হয়েছিলেন ব্যক্তিটির ভারত চিত্ত অনুভবের শক্তি দেখে। এত তাপ এদেশের মাটির মত মানুষের মধ্যে সঞ্চিত ছিল? তারপর ধীরে ধীরে যে বিচিত্র পরিচয়ে এই খর্ব কৃশকায় ব্যক্তিটি নিজেকে উদ্ভাসিত করেছিলেন এবং যার প্রতিচ্ছটায় ইংরেজের নতুন চেহারা দেখিয়েছিলেন, তাতে তাঁর বিস্ময় জেগে উঠছিল। কলকাতার কংগ্রেসে তিনি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে লোকটিকে দেখছিলেন। স্তিমিত কৃশকায় ছোট একটি মানুষ! তেমনি বেশভূষা! অথচ—!

এ নিয়ে ইংলিশম্যানের সম্পাদকীয় বৈঠকে আলোচনা হত। প্রথমদিকে তিনি ছিলেন প্রখর বক্তা। তারপর যত দিন গেল তত তিনি হয়ে উঠলেন নীরব থেকে নীরবতর। ইংলিশ-ম্যানের খোদ সম্পাদক মশায় ছিলেন যোগেশ্বরের বন্ধু এবং গুণমুগ্ধ। সব থেকে ভাল লাগত তাঁর যোগেশ্বরের শ্লেষভরা উক্তি!

তিনি একদিন প্রশ্ন করেছিলেন—মিস্টার রে—

যোগেশ্বর হেসে মুখ তুলে তাকিয়েছিলেন, কথা বলেন নি!

সম্পাদক বলেছিলেন—তুমি এমন নীরব চুপচাপ হয়ে যাচ্ছ কেন?

চুরুটে টান দিয়ে ধোঁয়া উড়িয়ে চেয়ারের পিছন দিকে হেলান দিয়ে বসে যোগেশ্বর বলছিলেন —হয়ে যাচ্ছি, না?

—কি হয়েছে?

—ঠিক জানি না। তবে দেখ, আমার বাড়ীতে একটা কুকুর ছিল, কিছু দুর্ঘটনা ঘটবার হলে সেটা কেমন গুড়িশুড়ি পাকিয়ে কোণ খুঁজে বেড়াত আর মধ্যে মধ্যে মৃদু শব্দ করত। আমারও মনে হচ্ছে ওই কুকুরটার ছোঁয়াচ লেগেছে। I am smelling something like that —একটু চুপ করে থেকে বলেছিলেন—Something will happen. —আমি যেন কারুর footsteps শুনতে পাচ্ছি।

—Oh Ray—তুমি যে মিস্টিক হয়ে পড়ছ—

—Perhaps. বলে হেসেছিলেন যোগেশ্বর।

তারপরও নাগপুর কংগ্রেসে গান্ধীর নন-কোঅপারেশন নিয়ে সম্পাদকীয় লিখেছিলেন। হাওড়া প্ল্যাটফর্মে সি আর দাশের সঙ্গে এ নিয়ে কথা বলে আপিসে ফিরে খুব কড়া ভাষায় লিখেছিলেন সম্পাদকীয়। প্রবন্ধটা কড়া হয়েছিল, কিন্তু তাঁর যেটা বৈশিষ্ট্য—শ্লেষ এবং ব্যঙ্গ সেটা ঠিক ছিল না তাতে। এবং তিনি নিশ্চিত ছিলেন কংগ্রেসের অধিবেশনে এই খর্বকায় কৃশতনু ব্যক্তিটি সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত হবেন। কলকাতা কংগ্রেসে যে প্রস্তাব উপস্থিত হয়েছে তা নাগপুরে নিশ্চয়ই প্রত্যাখ্যাত হবে। সি আর দাশ তো সেজেই গেছেন ডেলিগেট নিয়ে।

কিন্তু আশ্চর্য! সি আর দাশ, পণ্ডিত মতিলাল নেহরু, লালা লজপত রায়, পণ্ডিত মালব্য, মিঃ মহম্মদ আলি জিন্না, সভাপতি বিজয়রাঘব চারিয়া—সকলে এই ব্যক্তিটির প্রভাবে এক বাক্যে কলকাতায় গৃহীত প্রস্তাব কনফার্ম করে গ্রহণ করলে। যোগেশ্বরের বিস্ময়ের অবধি রইল না। যেদিন খবরটা আসে সেদিন তাঁকেই বলা হয়েছিল সম্পাদকীয় লিখবার জন্ত। কিন্তু কিছুক্ষণ বিমূঢ়ের মত বসে থেকে তিনি প্রধান সম্পাদককে স্লিপ পাঠিয়েছিলেন—আমার মাথার মধ্যে যন্ত্রণা হচ্ছে। আজকের লীডার তুমি নিজে লিখো। আমি বাড়ী যাচ্ছি। দীর্ঘক্ষণ তিনি গঙ্গার ধারে বসে থেকে বাড়ী ফিরেছিলেন। এবং সে রাত্রে যে মন্তটুকু নিয়মিত খান তা খেয়ে উঠতে পারেননি—চিন্তার মধ্যে। এত ভুল হল তাঁর?

তারপর একুশ সালে আরম্ভ হল আন্দোলন। তিনি আপিসের রিভলভিং চেয়ারে বসে ঘুরতেন—এটা যেন নেশা হয়ে গেল তাঁর। তিনি মনে মনে ঘুরতেন চারিদিক। সঙ্গে সঙ্গে চেয়ারটাকেও ঘোরাতেন।

একটা নতুন চেহারা। গোটা দেশটার একটা নতুন চেহারা। মন্থপ মদ ছাড়ছে। চাকুরে চাকরী ছাড়ছে। ছাত্ররা পরীক্ষার হলের সিঁড়িতে শুয়েছে, নিজেরা পরীক্ষা দেবে না—অন্তদের দিতে দেবে না। শোভাযাত্রীর উপর লাঠিচার্জ হচ্ছে। তাদের অ্যারেস্ট করে জেলে পাঠানো হচ্ছে; কিন্তু একদল যাচ্ছে আর একদল তার স্থান পূরণ করছে। মেয়েরা জেলে যাচ্ছে। বাসন্তী দেবী জেলে গেলেন দাশ মশায়ের পিছন পিছন। এ হ'ল কি?

ইংরেজরা গাল দিচ্ছে।

সুরেন্দ্রনাথ পিছিয়েছেন। তিনি মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করবেন। তিনি নিজে তাঁরও পিছনে অনেক পিছনে। তিনি ইংলিশম্যানে এডিটোরিয়াল লিখছেন। তাঁর পিতা দেবেশ্বর রায় বিপ্লবীদের সমর্থন করেছেন গোপনে-অর্থ দিয়েছেন। কিন্তু তিনি? এমনিই অবস্থায় ওই ঘোরানো চেয়ারখানা কিসের ধাক্কায় যেন উল্টে যাই-যাই হল। টেলিফোন বেজে উঠল। তিনি রিসিভার তুলে ধরে বলেন—রয়!

ওদিক থেকে কথা ভেসে এল—আমি হেম বলছি!

—কি? কি খবর?

—তুমি বাড়ী এস। গাড়ী গেল।

—এই তো ঘণ্টাখানেক বাড়ী থেকে এসেছি—

—সুরেশ্বর ইস্কুল থেকে ফেরেনি। গাড়ী ফিরে এল—তাকে পায়নি।

—মানে?

—সে টিফিনে বেরিয়ে চলে গেছে। ক্লাসের বন্ধুরা বলেছে—সে বড়বাজার গেছে পিকেটিং করতে!

—পিকেটিং করতে?

—হ্যাঁ।

যোগেশ্বর তৎক্ষণাৎ উঠে বেরিয়ে এসেছিলেন আপিস থেকে। সেই এসেছিলেন আর ঢোকেন নি।

রাত্রি হয়েছিল সুরেশ্বরকে বের ক'রে আনতে। সার্জেণ্টের হাতে সে মার খেয়েছিল। থানার লকআপ থেকে বের করে আনতে হয়েছিল। তাতে সুরেশ্বর অপ্রতিভ হয়নি, লজ্জিত হয়নি, সগৌরবে ঘোষণা করে বলেছিল—আমি ওঁকে ইঁট মারতে পারতুম কিন্তু মারতে মানা। অহিংসার মানে কি হয় বাবা?

যোগেশ্বর আগে হ'লে বলতেন—কাউয়ার্ডিস। ভীরুতা হল এর মানে। কিন্তু সেদিন তা বলতে পারেননি। বেটনের ঘায়ে সুরেশ্বরের পিঠে কয়েকটা দাগ উঠেছিল। তিনি তার দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন—

—মার খেয়ে তুমি বলেছিলে—আর করব না?

—না। সবেগে ঘাড় নেড়ে অস্বীকার করে সে বলেছিল—আমি বন্দে মাতরম বলেছিলাম!

—তুমি এখন শুয়ে পড়। এখুনি ডাক্তার আসবেন।

এরপর একলা ঘরে পায়চারি করেছিলেন। মধ্যে মধ্যে অস্ফুট কণ্ঠে বলেছিলেন—He is the man. Yes, He is the man.

চাকর হুইস্কির বোতল গ্লাস সোডা দিয়ে গিয়েছিল, প্লেটে মাংসের বড়া—হেমলতার নিজের তৈরী, দিয়েছিল, তার সঙ্গে স্যালাড এবং একটা কাটলেট। যা তাঁর নিত্যকারের খাদ্য। কিন্তু ও-সবের আকর্ষণেও তিনি চেয়ারে এসে বসেননি। সেই ঘুরেই বেড়াচ্ছিলেন। ছেলেকে ডাক্তার দেখিয়ে ঘুম পাড়িয়ে হেমলতা তাঁর ঘরে এসে ঢুকে সবিস্ময়ে বলেছিলেন—একি? এখনও ঘুরপাক খাচ্ছ? ভয় নেই, বস, সুরো ঘুমিয়েছে, ডাক্তার দেখে বললে—হ্যাঁ—মার খেলেই দাগ ওঠে। নাথিং—সিরিয়াস। হাসপাতালে একে বলে মাইনর ইনজুরি।

—হুঁ। আর একটা পাক ঘুরে আসতে আসতেই হেমলতার কানে তাঁর ওই He is the man কথাটা গিয়েছিল। বলেছিলেন—কি বলছ?

—ঠিক হয়েছে। আচ্ছা, বল তো এদেশের সব থেকে বড়লোক—আই মীন গ্রেটেস্ট মেনদের নাম। ফাইভ অর সিক্স।

—কেন রামমোহন রায়?

—তাঁর নাম—কীর্তিহাটের লোকে জানে? তাছাড়া উনি তো টাটকা—। পাঁচ হাজার বছর পর যাদের নাম থাকবে—ফাইভ—বল!

—তা হ'লে—। শ্রীরামচন্দ্র—শ্রীকৃষ্ণ—

—ওঁরা অবতার।

—তা হলে—বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্য, রামকৃষ্ণ—

—ঠ্যাটস ইট। করেক্ট। এদেশে রাজা রাজপুত্র বীর—এরা নয়—বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্য, রামকৃষ্ণ দিজ সন্ন্যাসীজ—এরাই বড়। এরাই বেঁচে থাকে। এবং If I am not wrong, একটু ভেবে বলেছিলেন—no—I am not wrong,—this man—this Mr. Gandhi

—he is one of them. লোকটা ঘরে থাকবে না। নিশ্চয় চলে যাবে ঘর ছেড়ে। দেখো।

—তোমার হ'ল কি? বস, খাও। খাবার জুড়িয়ে গেল—

—যাক। বোতল গ্লাস সোডা নিয়ে যেতে বল। এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল দিয়ে যাও!

—না-না—পাগলামী করো না, এতদিনের অভ্যেস! বরং কমাতে পার।

—নো। মরদ কি বাত—হাতী কি দাঁত। আমি বন্য শূকর নই। শূকরেরও দাঁত থাকে —সে দাঁতে কোন কাজ হয় না!

খাননি মদ।

পরদিন সকালে উঠে চলে গিয়েছিলেন বাজারে, চীৎপুর বেন্টিক স্ট্রীট অঞ্চলে। হেমলতা বলেছিলেন—কোথায় যাচ্ছ?

—আসছি। ব্যস্ত হয়ো না।

ঘণ্টা দেড়েক পরেই ফিরে এসেছিলেন এক সেতার এবং এক বেহালা নিয়ে।

হেমলতা সবিস্ময়ে বলেছিলেন—ও মা! এ কি হবে?

—বাজাবো।

—এই বুড়ো বয়সে সারেগামাপাধানিসা? কি খেয়াল তোমার?—হেমলতা তাঁর বিবাহিত জীবনে স্বামীর সঙ্গীতানুরাগের কোন পরিচয় পান নি। যোগেশ্বর হেসে বলেছিলেন—ক্ষণেক অপেক্ষা কর!

ব'লে বেহালাখানা নিয়ে সুর বেঁধে বাজিয়েছিলেন কিছু। এবং অতি নিপুণ সুন্দরভাবে বাজিয়েছিলেন।

অবাক হয়ে গিয়েছিলেন হেমলতা। কথা বলতে পারেন নি। সুরেশ্বরও এসে দাঁড়িয়েছিল। যোগেশ্বর হেসে প্রশ্ন করেছিলেন—কি বাজালাম জান?—

সুরেশ্বর বলেছিল—আমি বলব বাবা?

—পার বলতে? হ্যাঁ তা পারবার কথা। বল—

—একি রূপ হেরি হরি ধরেছ যোগীর বেশ—। বাগেশ্রী!

—রাইট। তারপর হেমলতার মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন—গ্রামোফোনের সামনে ব'সে ওর গান শোনা এবং গলা মেলানো দেখ নি! কিন্তু গলা নেই। তবে সঙ্গীত বোধটা আমাদের রক্তে আছে বংশগত! শুনেছি আমাদের পূর্বপুরুষে একজন ছিলেন মস্ত বড় সাধক আর গানে ছিলেন সিদ্ধহস্ত অর্থাৎ যন্ত্রী!

—কই, আমাকে তো কখনও বলনি?

—কি বলব? ছেলেবেলা কীর্তিহাটে ছিলাম ক' বছর। ঠাকুরদা তখন বেঁচে। তখন শিখেছিলাম। কিন্তু বাবা আমাকে বারণ করেছিলেন। বলেছিলেন, ওটা তুমি শিখো না। তা হলে আর কিছু হবে না। বৃদ্ধ বয়সে ওটা নিয়ে বসো। তখন কল্যাণ হবে।

—সে বয়স এই চল্লিশ বছর বয়সেই হল?

—হ'ল বই কি! আজ থেকে বানপ্রস্থ।

এর অর্থটা ঠিক বুঝতে পারেন নি হেমলতা। মানে চেষ্টাই করেন নি। দুপুরবেলা খেয়ে শোবার সময় বলেছিলেন—দেখ আমাকে আজ আর ডেকে ঘুম ভাঙিয়ো না। মানে নট বিফোর ফোর। কোচম্যানকে বলে দিয়ো গাড়ী চাই না।

—আপিসে যাবে না ?

—না, ওবেলাতেই চুকিয়ে দিয়েছি পাট !

—কি যে হেঁয়ালী কর—

—বলি নি তোমাকে, চাকরী ছেড়ে দিয়েছি।

—ছেড়ে দিয়েছ ? বিস্ময়ের অবধি ছিল না হেমলতার। কারণ জালিয়ানওয়ালাবাগের সময় থেকেই সে বহুবার অনুরোধ করেছে সায়েবদের ইংরিজী কাগজ ছাড়তে। কিন্তু যোগেশ্বর ছাড়েন নি। বলেছিলেন—হেম, সেন্টিমেণ্ট ইমোশন বড় সর্বনাশা। ওর একসেস যখন হয় তখন আত্মহত্যার ঝোঁক চাপে মানুষের। পাথরে মাথা ঠোকে মানুষ—মাথা রক্তাক্ত হয়। পাথর ভাঙে না—মানুষের মাথা ভাঙে। এই পাথরে কাঁচা মাথা ঠুকে মাথা ভেঙে আত্মহত্যার সেন্টিমেণ্টাল ইমোশনালিজ্‌ম থেকে জাতটাকে বাঁচানো আমার মিশন। অন্যে না বুঝুক, তুমি অবুঝ হয়ো না ! বিশ্বাস রাখ আমি বুঝি। অনেক বুঝি। এই ইংরেজ জাত যত বড় তত নিষ্ঠুর ! আজ সেই লোক- চাকরী ছেড়ে দিয়েছে শুনে হেমলতা হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন !

যোগেশ্বর বলেছিলেন—অবাক হয়ে গেছ ?

—তা হয়েছি !

—দুঃখিত হয়েছ ?

—না। খুশী হয়েছি।

—সত্য কথা ?

—তার থেকেও বেশী কিছু ! বোঝাতে পারব না তোমাকে !

—তাহ'লে—

—কি—

—তা হলে—গিভ মি এ—

—পাগল ! উন্মাদ ! এত বড় ছেলে পাশের ঘরে !

—তা বটে। জান ওই ওরই জন্যে—না ওর জন্যে নয়, ও আমার একটা দুরন্ত ভয় ঘুচিয়ে দিয়েছে। আই ওয়াজ এ কাওয়ার্ড ! ভয়ে বলতাম ইংরেজ পাথর। ও মাথা ঠুকে অক্ষত মাথা নিয়ে ফিরে এসে আমাকে দেখিয়ে দিল যে না তা নয়।

—যাক। তুমি ঘুমোও। আমি সুরোকে ঘরে বন্ধ করেছি। তার কাছে যাই ! বিকেলে কিন্তু খদ্দর কিনতে যাব। সুরোকে কথা দিয়েছি।

—শোন—আর একটা কথা।

—কি ?

—আমাকে ঘুম পাড়িয়ে মা-বেটা দুজনেই যেন বেরিয়ে পড়ো না পিকেটিংয়ে।

—ঠাট্টা হচ্ছে ?

—মোটেই না। বুড়ো বয়সে বিয়ে করেছি। সুন্দরী প্রগতিশীলা লেখাপড়া জানা মেয়ে তুমি। তবুও কোনদিন বুড়ো বয়সের ব্যাধি যেটা সেটাকে প্রশ্রয় দিই নি। মানে সন্দেহ-বাতিক। আজ ভয় হচ্ছে—ছেলের কাছে ঘায়েল হয়ে কাত হয়েছি। তুমি তাতে পুলকিত। আনন্দে আটখানা হয়ে খদ্দর কিনতে যাচ্ছ। দেখো, উৎসাহবশে দোকান থেকে বেরিয়েই পিকেটিংয়ে নেমো না মা বেটায় !—জেলে যাও, কষ্টেস্থষ্টে বিরহ সইতে পারব। কিন্তু উদ্বেগের সীমা থাকবে না, মনে মনে কোন পিকেটিংরণ নিপুণপ্রদীপ্ত পুরুষকে জয়মাল্য দিলে !

হেমলতা সেকালের আধুনিকা। কালটা একদিকে যেমন ক্ষোভ আর রোষের যুগ তেমনি রসের যুগ। রবীন্দ্রনাথের কাব্যরসে গৌড়ভূমি ভেসে গেছে। হেমলতা রাগ করেন নি। তিনি হেসে বলেছিলেন—দেখ, তোমার এই রসবোধের জন্যই বয়সের বার তের বছর তফাত সত্ত্বেও আমি স্বেচ্ছায় তোমাকে বিয়ে করেছিলাম। তোমরা জমিদার, তুমি জার্নালিজমে নামী লোক, শৌখীন সাহেব মানুষ, তোমার ফ্রেঞ্চছাঁট দাড়ি আছে, সে জন্যে নয়। আজ এই চাকরী ছাড়লে মদ ছাড়লে এর জন্যে admiration—প্রায় ভক্তিবাদে এসে পৌঁচেছে। ভেবো না। ইন্দ্র হাতছানি দিয়ে শচীত্ব অফার করলেও আমি মরতে চাইব না। তোমাকে ফেলে ! বলে স্বামীর ঠোঁটের উপর ঠোঁট রেখেছিলেন।

যোগেশ্বর পরবর্তীকালে বলতেন—ওই দিনটি তাঁর জীবনে সর্বোত্তম সুখের দিন !

এর পর সেতার বেহালা নিয়ে পড়েছিলেন যোগেশ্বর। ওস্তাদ রেখেছিলেন। এবং শেখার সময় সুরেশ্বরকে কাছে রাখতেন। সুরেশ্বর জন্মাবধি যে সঙ্গীতবোধ নিয়ে জন্মেছিল—তাতে সে না-শিখেই বাঁয়া তবলা বাজাতে পারত। আর ছবি আঁকত যেখানে সেখানে।

সে বছর খানেক। এর মধ্যেই ক্রমে ভাঁটা পড়ে এল আন্দোলনে। জেলখানায় দেশবন্ধু দাশের সঙ্গে ইংরেজ সরকারের কথা হ'তে হ'তে বন্ধ হল। গান্ধী রাজী হলেন না। অসহিষ্ণু হয়ে উঠলেন যোগেশ্বর।

হঠাৎ গানবাজনা বন্ধ ক'রে পড়াশোনায় মাতলেন। সুরেশ্বরকে ইস্কুল তিনি তখনই ছাড়িয়েছিলেন। বাড়ীতে মাস্টার রেখে পড়াচ্ছিলেন। সুরেশ্বর যদৃচ্ছ পড়ত। তার কোন বাধানিষেধ ছিল না। তিনি নিজে পড়তে লাগলেন—গীতা চণ্ডী থেকে শুরু করে রামায়ণ মহাভারত—উপনিষদ পর্যন্ত।

হেমলতা শঙ্কিত হয়েছিলেন। বলেছিলেন—এ কি করছ তুমি ?

—একটা মীমাংসা খুঁজছি। An answer—

—কিসের ?

—বাঘ সাপের সামনে ননভায়োলেন্স—অহিংসার কিছু দাম আছে কিনা ? এবং মানুষের প্রকৃতির মধ্যে বাঘ সাপের প্রকৃতির অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় কিনা ? কথাটা বুঝেছিলেন হেমলতা। উত্তর দিতে পারার তাঁর কথা নয় কিন্তু তিনি বলতে পারতেন, কেন এ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ তুমি ? স্বাভাবিক নিয়মে যা ঘটবার তা ঘটবেই ! বা এই ধরণের কোন কথা তিনি নিশ্চয় বলতে পারতেন কিন্তু তাও তিনি বলতে পারেন নি !

যোগেশ্বর বলেছিলেন—নর্থ পোল সাউথ পোলেও ছ মাস দিন—ছ মাস রাত্রি। ডার্কনেস অ্যাণ্ড লাইট। সমান অধিকার। সূর্যলোকে গেলে পুড়ে ছাই হয়ে যায়! ন্যাট ইজ ডেথ। এ লোকটি ভুল করলে। গান্ধী! ইংরেজ নিজেকে ব্রিটিশ লায়ন বলে, কিন্তু আসলে সে বাঘ! এত বড় এম্পায়ার যে সে গড়েছে তাতে তার ক্যারেক্টারে সিংহের ক্যারেক্টারের স্ট্যাম্প নেই, আছে বাঘের। ব্রিটিশ জাস্টিস ততক্ষণ যতক্ষণ তার এম্পায়ার অনড় আছে। নতুন গড়া নতুন পাওয়া কোম্পানীর দেওয়ানীর মধ্যে প্রজার উপর অত্যাচার হয়েছিল, কটা রাজা রাণী বেগমের ওপর অত্যাচার হয়েছিল ব'লে হেস্টিংসের ইম্পীচমেণ্ট হয়েছিল, বার্ক সেরিডনের কণ্ঠস্বর হেস্টিংসকে তিরস্কার করে পৃথিবীকে চমকে দিয়েছিল; কিন্তু আর তা হবে না, নিশ্চিত থাক। অক্টারলোনী মনুমেণ্টটাকে আমি আওয়াজের ধাক্কায় কাঁপতে দেখি! দিস ম্যান—আশ্চর্য ক্ষমতা কিন্তু এক ভুলে সব মাটি করে দিলে। আমি চোখে দেখছি!

হেমলতা এবার বলেছিলেন—তুমি কাগজ বের কর। লেখ।

—কাগজ?

—হ্যাঁ।

—উঁহুঁ—ও আমার দ্বারা হবে না। লিখতে পারলেই কাগজ বের করা যায় না!

—কেন—তোমার তো টাকার অভাব নেই!

কথাটা মিথ্যে ছিল না। তাঁর বাপ তাঁকে এক লাখ টাকা নগদ দিয়েছিলেন—কাগজ বের করবার জন্যেই। বড়ছেলেকে কলিয়ারী দিয়েছিলেন, তাঁকে দেন নি—তার জন্যে। এ ছাড়া এত বড় বাড়ীটা দিয়েছিলেন—সেও এরই জন্যে। নিচের তলায় প্রেস হবে। উপরতলায় আপিস। একদিকে কিছুটা নিয়ে তিনি থাকবেন; প্রয়োজন হলে তেতলায় ঘর তুলে নেবেন। কিন্তু যোগেশ্বর তা না ক'রে কাগজের আপিসে চাকরীই করেছেন। বাড়ীর নিচের তলাটা ভাড়া দিয়েছেন। ভাড়া দিয়েছেন বড় বড় কোম্পানীকে। তারা গুদোম করেছে। চাল ডাল খাদ্যদ্রব্য যাতে ইঁদুর লাগে—তাদের দেন নি; পাটওয়ালাদের দেন নি আগুনের ভয়ে। দিয়েছেন হগ মার্কেটের, ধর্মতলার যারা স্টেশনারী জিনিস আমদানী করে তাদের। ভাড়ায় নিজের উপার্জনে শেয়ার ডিভিডেণ্ডে কীর্তিহাটের জমিদারীর অংশ বাবদ দেবখরচ বাদে উদ্বৃত্ত আয়ে তাঁর খরচ সংকুলান হয়েও বছর বছর অনেক সঞ্চয় হয়ে ওই এক লাখ টাকাকে স্ফীত করে প্রায় তিন লাখের কোঠায় নিয়ে গেছে। সুতরাং তিনি কাগজ বের করতে চাইলে অবশ্যই বের করতে পারেন।

যোগেশ্বর বললেন—টাকা—লেখা—বাড়ী এ তিনটে কাগজের পক্ষে বাইরে থেকে দেখতে খুব জরুরী। তার চেয়েও জরুরী হল ব্যবসার দিক। ওতে আমার মাথা খারাপ হয়।

—আমি দেখব!

—তুমি? হা-হা করে হেসেছিলেন যোগেশ্বর।

—তুমি হাসছ? আমি পারব না?

—পারবে না বলছি নে। কিন্তু আমার ভুল পলিসিতে কাগজ ডুবতে বসলে আমাকে নোটিস

দিতে পারবে ইওর সার্ভিস ইজ নো লংগার রিকোয়ার্ড বলে ?

শুধু হেমলতাই নয়। বন্ধুবান্ধব সকলেই বলেছিল। তারা সব বিশিষ্ট লোক। এবং সংবাদপত্র জগতের লোক অনেকে। দু-একটা কাগজ থেকে তাঁকে চাকরীও দিতে চেয়েছিল। কিন্তু তিনি নেন নি।

দেশবন্ধু স্বরাজ্য পার্টি করে তাঁকে ডেকেছিলেন। দেশবন্ধু তাঁর থেকে বয়সে কিছু বড় ছিলেন। অসীম শ্রদ্ধাও তিনি করতেন। কিন্তু তিনি বলেছিলেন—আমাকে নিয়ে আপনাদের চলবে না। আমি পারব না বনিয়ে চলতে !

—বেশ—তুমি লেখ।

—তা চেষ্টা ক'রে দেখতে পারি !

চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু পারেন নি। বলেছিলেন—হচ্ছে না !

—হচ্ছে না মানে কি ? এত বড় নামী লেখক তুমি—পারছ না ?

—বল পারছি না।

—পারবে। আমি ব্যবস্থা করছি।

এই কথা বলে হেমলতা মদ আনিয়ে বলেছিলেন—এতকালের অভ্যেস ছেড়ে দিয়ে তুমি দুবল হয়ে গেছ। খেয়ে দেখ তো পার কি না ?

—খাব ?

—খাবে, আমি বলছি।

খেয়েছিলেন এবং মিনিট কয়েক পরে বলেছিলেন—ঠিক বলেছ।

সঙ্গে সঙ্গে আর এক গ্লাস খেয়ে কিছুক্ষণ পর কাগজ কলম টেনে বসেছিলেন লিখতে। গান্ধীজীর অহিংসা মতবাদকে বিদ্রূপাত্মক যুক্তির ধারালো ছুরিতে টুকরো টুকরো ক'রে কেটে নিজের নাম দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন ইংরেজের ইংরিজী কাগজে। খুব মোটা হেডলাইন দিয়ে সমাদর ক'রে তারা ছেপেছিল। এতদিন পরে এই প্রথম লেখাটাই চারিদিকে বেশ সোরগোল তুলেছিল—শুধু বাংলাদেশেই নয়—গোটা ভারতবর্ষে। মাদ্রাজের হিন্দু বম্বের টাইমস অব ইণ্ডিয়া দিল্লীর কাগজ সর্বত্রই এ নিয়ে আলোচনা চলেছিল। লণ্ডনের টাইমস পত্রিকাতেও কিছু মন্তব্য করেছিল তারা।

প্রশ্নটা ওই অহিংসা নিয়ে। বলেছিলেন—হয় গান্ধী বলুন এটা তাঁর নেহাতই বাঘের স্বরূপের উপর নামাবলী, ভবিষ্যতে একদা নামাবলীখানা ফেলে দিয়ে ব্যাঘ্র মূর্তিতে দাঁড়াবেন অথবা তিনি নিতান্তই সেই হিতোপদেশের গল্পের মূষিক ? যে মূষিককে এক ঋষির বরে কয়েকদিনের জন্য লোকচক্ষে বাঘ বলে মনে হত এবং পরে যে আবার মূষিকই হয়ে গিয়েছিল।

প্রায় বছর দেড়েক যে টেলিফোনটা কদাচিৎ বাজত সেটা সেদিন থেকে আবার মুখর হয়ে ওঠে প্রবলভাবে।

হেমলতা খুব খুশী হয়েছিলেন।

সুরেশ্বর তখন বারো বছরের। ইংরেজী সে বাপের কাছে পড়ত। সে বলেছিল—এ তুমি

কেন লিখলে বাবা ?

যোগেশ্বর তাকে স্তোকবাক্যে সান্ত্বনা দেন নি, তিনি তাকে সাধ্যমত বুঝিয়েছিলেন। গল্প বলেছিলেন অ্যামেরিকান ইণ্ডিপেণ্ডেন্সের, ফ্রেঞ্চ রেভল্যুশনের, রাশিয়ান রেভল্যুশনের। সুরেশ্বর বয়সের তুলনায় পড়েছিল অনেক। গোগ্রাসে যাকে পড়া বলে। এবং তার খোরাক যুগিয়েছিলেন—যোগেশ্বর।

সেদিন গল্প বলতে বলতে তিনি সুরেশ্বরকেই বলেছিলেন—গেলাসে মদ ঢেলে দিতে। সুরেশ্বরই দিচ্ছিল। একসময় হেমলতা এসে বলেছিলেন—এ কি! ও কি হচ্ছে? তুমি কেন ঢালছ, সুরো?

—বাবা বললে যে।

—হ্যাঁ আমি বলেছি।

—খুব ভাল! এর থেকে ভাল আর কিছু হ'তে পারে না।

হেসে যোগেশ্বর বলেছিলেন—দেখ, ওর বয়স আঠারো পার হলে আজ আমি ওকে খেতে শেখাতুম। খেতে তো শিখবেই। যার তার কাছে শিখবে কেন? বলে হা-হা ক'রে হেসেছিলেন।

হেমলতা রাত্রে বলেছিলেন—না-না—এত বাড়াবাড়ি করো না। দেখছি আমিই অন্যায় করেছি তোমাকে আবার ধরিয়ে।

—খুব যে অহঙ্কার!

—মানে?

—তুমি না-দিলে, বোধহয় আমিই আনিয়ে শুরু করতাম! তুমি এলে মনের কথা নিয়ে মানসীর মত অথবা ডেস্টিনির মত।

তারপর কিছুদিন তিনি বিপুল উৎসাহে লিখলেন। প্রতিপন্ন করলেন—অন্তত তিনি তাই ভাবলেন, যে অহিংসার কল্পনা একটি রঙীন ফানুস ছাড়া আর কিছুই নয়। এবং এই ফানুস্ যখন ফাটে তখন তার যে গ্যাস বাতাসে ছড়ায় তাতে নিঃশ্বাস নেয় যে মানুষ তাদের একটা নেশা লাগে। বুদ্ধের পরে এই নেশায় গোটা দেশের মানুষ একটা ক্লীবের জাতিতে পরিণত হয়েছিল। দেশের বর্তমান এই যে ইংরিজী শিক্ষার প্রভাবে নতুন চেতনা—সে চেতনা সৎ কিম্বা বোকা। তুমি আর তোমার ধর্মের ধোঁয়া মেশানো অহিংসার নেশায় আবার নতুন করে ক্লীব ক'রে দিও না। ইংরেজের মত এত বড় একটা জাতের শিক্ষাদীক্ষা সব ব্যর্থ হবে। দুনিয়ার চাকা যখন স্টীম পাওয়ারে এবং ইলেকট্রিসিটিতে চলছে প্রচণ্ড ঘর্ঘর শব্দে তখন তুমি সেই পুরানো চরকাকে বের করে ঘ্যানর ঘ্যানর করে বিশ্বজগতে একটি অট্টহাস্যের সম্মুখীন করো না এই হতভাগ্য জাতিকে।

মদের পরিমাণ ক্রমশ বাড়ছিল, বলাই বাহুল্য। হেমলতা আপত্তি করলেন। তিনি বললেন—নো। আর শুনব না।

মান-অভিমান কাঁদাকাটির পর একটা আপোস হল। এরই মধ্যে ঘটল আর এক ঘটনা। এখানেও ঘটালেন হেমলতা। তাঁর মামাতো ভাই তখন ব্যারিস্টার এবং বেশ পসারওয়ালা

ব্যারিস্টার। তার ছেলের জন্মদিনে বাড়ীতে ছিল পার্টি ; সেখানে গিয়েছিলেন সুরেশ্বরকে নিয়ে ; গান-বাজনার আসর ছিল, সেই আসরে বাজিয়ের অভাব হচ্ছিল, বসিয়ে দিলেন ছেলেকে বাঁয়া তবলা বাজাতে। সে চমৎকার বাজাল। চৌদ্দ বছরে সবে পা দিয়েছে—সুন্দর চেহারা ; তারিফ সে পাওনার থেকে বলতে গেলে বেশীই পেলে। প্রশ্ন উঠল—ওমা, শিখলে কখন ?

পার্টিতে ছিলেন মামাতো ভাইয়ের বিশিষ্ট মক্কেলরা। তার মধ্যে ছিলেন ছোট নেটিভ স্টেটের (যে নেটিভ স্টেটের আয় বাংলার বড় জমিদারী থেকেও কম) রাজার এক বান্ধবী। সে আমলেও খাঁটি ইঙ্গ-বঙ্গের চেয়েও কড়া চাল তাঁর। বিলেতও ঘুরে এসেছেন একসময়। পরিচয় তাঁর তিনি রাজার প্রাইভেট সেক্রেটারী। তাঁর সঙ্গে আলাপ হেমলতার পার্টির প্রারম্ভেই হয়েছিল। মিস্টার জে রয় এবং ওমনিপোটেন্টের নাম তিনি জানতেন। তিনি শুনে সবিস্ময়ে বলেছিলেন—সত্যি মিসেস রয় ? না এটা তোমার স্বামী-প্রেমের সুন্দর স্বপ্ন ?

হেমলতা বলেছিলেন—অর্থাৎ তুমি বলছ বাজনা আমি জেগে শুনি নি, স্বপ্নে শুনেছি ! যেমন তোমার মহারাজার শিকারের ঘটনাগুলো ঘরে শুয়ে শুয়ে দেখেছ ?

হেসে উঠেছিলেন মহারাজার বান্ধবী। বলেছিলেন—মহারাজার গুলির চেয়েও তোমার কথার টার্গেট অব্যর্থ এবং মারাত্মক। বেশ তো, আমি মহারাজার গুলির তাগ দেখাতে রাজী আছি, তবে শিকারে যেতে হবে। তুমি মিস্টার রয়ের অপরূপ বাজনা আমাকে শুনিয়ে দাও। আমি গান-বাজনা বুঝি। ভাল লাগে।

হেমলতা বলেছিলেন—কাল আমার ওখানে চায়ের নেমন্তন্ন তোমার।

তিনি আনন্দের সঙ্গে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলেন।

হেমলতা বিশেষ কিছু জানান নি যোগেশ্বরকে, বলেছিলেন—একজন বান্ধবীকে চায়ের নেমন্তন্ন করেছি।

যোগেশ্বর লিখছিলেন। বলেছিলেন—বেশ !

৩

পরের দিন এলেন—মিস চন্দ্রিকা মালহোত্রা। মিশ্রিত রক্তের যে লাবণ্য লাল কালোয় মেশানো পপি ফুলে থাকে সেই লাবণ্যে লাবণ্যময়ী। দীর্ঘাঙ্গী। বড় চোখ। পুরু ঠোঁট। বাপ ছিলেন আর্মিতে ডাক্তার—লেফটেনাণ্ট কর্নেল।

জীবন কেটেছে ভারতবর্ষের বাইরে প্রথম দিকটায়। চন্দ্রিকার মা ছিলেন আসামের খাসিয়া ক্রীশ্চান মেয়ে, ওঁর অধীনে নার্স ছিলেন হংকংয়ে। বিয়ে হয়েছিল সেখানে। তারপর ১৯১৪ সালের যুদ্ধের সময় ইণ্ডিয়ান আর্মির সঙ্গে গিয়েছিলেন ফ্রান্সে। তখন চন্দ্রিকা এবং তার মা ছিল দেরাদুনে। চন্দ্রিকা পড়ত সেখানে। দেরাদুন থেকে পাস করে এসেছিল কলকাতায়। ওদিকে তখন যুদ্ধ শেষ হয়েছে। মালহোত্রার ইচ্ছে হয়েছিল হোমে বাস করবে। নিয়ে গিয়েছিল স্ত্রী কন্যাকে। চন্দ্রিকা বিলেতে গিয়েছিল ১৯১৯এ। বয়স তখন উনিশ কুড়ি।

কলকাতায় থাকতেই সে নিজের গায়ের রং বিচার ক'রে ফ্রক ছেড়ে শাড়ী ধরেছিল। এবং শাড়ী পরেই গিয়েছিল ইংল্যাণ্ড। সে শাড়ী-পরা সেখানে গিয়েও ছাড়ে নি। তার সঙ্গে চুল শ্যাম্পূ করা—মুখ রঙ করার আর্টেও দক্ষ হয়ে মূর্তিমতী পূর্ব-পশ্চিমের মিশ্র সৌন্দর্যের প্রতীক হয়ে উঠেছিল। অন্ততঃ ওর ভক্তগণ বলতো তাই। তার মধ্যে ঔপনিবেশ-স্বপ্নাতুর ইংরেজ-সন্তানও ছিল।

ওদিকে ডাক্তার মালহোত্রা তখন শ্বেতপুষ্পে কালো ভ্রমরের মত মধুলোলুপ হয়ে উঠেছেন। এবং জুয়াতে মদে রেসের ঘোড়ার মত দৌড়াতে আরম্ভ করেছেন। তার ফলে একদা পড়লেন জালে জড়িয়ে। জুয়ার সঙ্গে জালিয়াতির এবং সুরার সঙ্গে নারীর সম্পর্ক আঙ্কিক হিসেবে নিবিড়। ওদেশে ডিম যেমন নিরামিষ—তেমন বিচারে ওদেশে এ দুটোর মধ্যেই এক ধরণের আধানিরিমিষ সততা আছে, সেটা এ-দেশী মালহোত্রার পক্ষে বজায় রাখা সম্ভবপর হয় নি, সুতরাং জালিয়াতির দায়ে এবং অ্যাডাল্‌ট্রির প্যাঁচে প্রায় একসঙ্গে পড়ে গেলেন। নিঃস্ব হয়েও যখন বাঁচবার সম্ভাবনা রইল না—তখন প্রায় পাগল হলেন। এই সময়েই এই ক্ষুদ্র করদরাজ্যের মহারাজটির সঙ্গে মালহোত্রা পরিবারের হল আলাপ। বয়স্ক ব্যক্তি। চন্দ্রিকার বাপ, কন্যাকে সামনে রেখে এই মহারাজাকে ধরেছিলেন পরিত্রাণের আশায়। তার ফল ভাল হয় নি; তার মা দাঁড়িয়েছিল পথরোধ ক'রে। পাগল আর্মি অফিসার, তাঁর পক্ষে এই পথের বাধা অপসারণে দিশেহারা হবার কথা নয়, পিস্তল বের করে স্ত্রীকে হত্যা করেছিলেন। এবং তারপরই মাথা ভাল হয়েছিল, তিনি নিজেও আত্মহত্যা করেছিলেন। চন্দ্রিকা একাকিনী। সে পথ খুঁজতে গিয়ে দেখেছিল, হয় হোটেলে বাসন ধুতে হয়, নয় ওয়েট্রেস হতে হয়, নয়—। কিন্তু সেখানেও প্রতিদ্বন্দ্বিনী অনেক—যুদ্ধের পর ফ্রান্স জার্মানী রাশিয়া থেকে অনেক মেয়ে ইংলণ্ডে এসে আশ্রয় নিয়েছে। বিয়ের বাজার থেকে পথে ঘাটে হোটেলে সর্বত্র দাম পড়ে গেছে মেয়েদের। সুতরাং মহারাজা যখন তাকে স্পেশ্যাল প্রাইভেট সেক্রেটারীর পদ দিলেন তখন সে নিতে দ্বিধা করে নি। সেই পদ নিয়ে সে মহারাজার সঙ্গে দেশে ফেরে। মহারাজা তার প্রতি অনুগ্রহে অকৃপণ। সে বিলিতী নাচ কিছু শিখেছিল—এখানে এসে তিনি তাকে গান বাজনা শিখিয়েছেন। বন্দুক ছুঁড়তেও শিখিয়েছেন। মহারাজার সঙ্গে গল্‌ফ খেলায় সে সঙ্গিনী। টেনিসেও তাকে দক্ষ করে তুলেছেন। মহারাজা এখন টেনিস খেলেন না, আগে ক্রিকেট টেনিসেও দড় না-হলেও তাঁর মহারাজত্বের গুরুত্বের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারত। তবে পোলোতে কখনও কখনও এখনও শখ যায়। গোটা কয়েক দেশী ভাষাতেও চন্দ্রিকাকে তালিম নিতে হয়েছিল—তার মধ্যে হিন্দী বাংলা ওড়িয়া অন্যতম। বাংলা সে কিছু আগে থেকেই বুঝত।

এই হল চন্দ্রিকা।

হেমলতা তাকে অভ্যর্থনা ক'রে এনে ঘরে বসিয়ে স্বামীকে ডেকেছিল।

—এস একবার। আমার বান্ধবী এসেছে।

—বান্ধবী? কালকের সেই মহারাজার নর্মসহচরী—বেগ ইওর পার্ডন, প্রাইভেট সেক্রেটারী, সুন্দরী!

বসে ছিলেন তিনি ঢিলেঢালা একটা আলখাল্লার মত জামা আর কোঁচানো ধুতি পরে। তাই প'রেই যাচ্ছিলেন। হেমলতা বলেছিলেন—ও কি ?

—কেন ?

—পোশাক বদল কর। ও কি ? ওই জামাটা—

—পোশাক ? কি বিপদ ! বলে পোশাক বদলের ঘরে গিয়ে নিজের স্যুটে হাত দিয়ে সরিয়ে নিয়েছিলেন। তারপর আলনা থেকে হেমলতার একখানা বেনারসী শাড়ী টেনে নিয়ে গলায় ঝুলিয়ে নিয়ে বেরিয়ে এসেছিলেন।

হেমলতা বলেছিলেন—ওকি ?

—কেন ? শোনাতে হবে বাজনা—এটা কি তার পক্ষে বেমানান হল ? খারাপ লাগছে ?

তা বলতে পারেন নি হেমলতা। বলতে কি চমৎকার দেখাচ্ছিল যোগেশ্বরকে। রায় বাড়ীর পুরুষদের চেহারার জন্য খ্যাতি আছে। লম্বা চেহারা, মাজা রঙ, টিকালো নাক, বড় চোখ, ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি, সুচলো করে পাকানো গোঁফ, তার সঙ্গে লুটিয়ে পড়া কোঁচানো ধুতির সঙ্গে ওই ঢিলেঢালা ধবধবে শাদা মখমলের আলখেল্লার মত জামায় চমৎকার মানায় যোগেশ্বরকে। শৌখীন মানুষটি এসব করেন খেয়াল বলে নয়, অনেক হিসেব করে মানিয়ে দেখে। এখন তার উপর বেনারসী চাদরটার দুটো প্রান্ত গলায় বেড় দিয়ে দুপাশে পা পর্যন্ত ঝুলে পড়তেই মনে হল—বাঃ—এই যোগেশ্বরই আসল যোগেশ্বর, যার পিতামহ প্রপিতামহ জরি মখমলের পোশাক এবং পাগড়ি পরে আর্টিস্টের সামনে বসে অয়েলপেন্টিংয়ের সিটিং দিয়েছিলেন।

হেমলতাকে নিরুত্তর দেখে যোগেশ্বর বলেছিলেন—কি চুপ করলে যে ?

হেমলতা হেসে বলেছিলেন—তোমাকে প্রণাম !

—কেন ?

—এতও আসে মগজে !

—ভাল লাগছে তো ?

—ওয়াণ্ডারফুল ! কালই বেনারসীর চাদর কিনে আনব !

—রঙীন এনো ! শাদা না ! চল !

শ্যাম্পুকরা চুল—রঙকরা মুখ—পালিশকরা নখ ; জর্জেট-পরা দীর্ঘাঙ্গী চন্দ্রিকা মালহোত্রা—সিগারেট খেতে-খেতে দেওয়ালের ছবি দেখছিল। ১৯২৪ সালের চৈত্র মাস। তখন অবনীন্দ্রনাথের পরে নন্দলাল অসিত হালদার এঁরা এসেছেন ; যামিনী রায় তখনও ঠিক আসেন নি। অবনীন্দ্রনাথ নন্দলালের ছবির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল চন্দ্রিকা, হাতের আঙুলে সিগারেট পুড়ছিল !

—মিস মালহোত্রা—

ফিরে তাকিয়ে মিস মালহোত্রা সবিস্ময়ে চোখ বড় করে তাঁর দিকে তাকিয়েছিলেন। একেবারে কোমর থেকে ভেঙে নুয়ে বাউ করেছিলেন যোগেশ্বর।—গুড আফ্টার-নুন !

হেমলতা বলেছিলেন—আমার স্বামী !

হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল চন্দ্রিকা এবং বলেছিল—ও! হাউ ওয়াণ্ডারফুল ইউ লুক! আমি ভেবেছিলাম—

—এ বাজাওলা উস্তাদ ফ্রম ইউ পি অর পাঞ্জাব—

খিল-খিল করে হেসে উঠেছিল চন্দ্রিকা। বারবার বলেছিল—নো-নো-নো—আমি ভেবেছিলাম মুরশিদাবাদি নবাব-শাহীর কোন তনখা-পানেওলা আমীর—

—এই দাড়ির জন্যে? তা বলতে পার। কিন্তু আমরা হলাম পুরনো জমিদার! এই যে আলখেল্লাটা দেখছ এটা আমাদের বৈরাগীদের পোশাক। কোঁচানো ধুতি আর এই চাদর দিয়ে ভোগ এবং বৈরাগ্যের সমন্বয় হয়েছে।

—কি সুন্দর ব্যাখ্যা করলে তুমি! ওয়াণ্ডারফুল। ওয়াণ্ডারফুল। জান তোমার লেখার ভক্ত আমি। মহারাজাকে কাগজ পড়ে শোনাতে হয় আমাকে। কিন্তু লেখাতে তো তোমার এ পরিচয় নেই? সেখানে তো তুমি তলোয়ার খেল খাঁটি ইংরিজী ঢঙে।

হেমলতা বলেছিলেন—বসে কথা বললে ভাল হয় না?

—নিশ্চয়ই। আমি দুঃখিত—তোমাকে আমি দাঁড় করিয়ে রেখেছি।

বসে কথাবার্তা শুরু হয়েছিল। সুরেশ্বর এসে বসেছিল। হেমলতা শুনছিলেন, কিন্তু সুরেশ্বর চুপ করে শোনে নি, সে মধ্যে মধ্যে কথার মধ্যে কথা বলেছিল। এবং বেমানানভাবে বলে নি, বেশ মানানসই করে বলেছিল।

মিস মালহোত্রা বারবার তারিফ করেছিলেন সুরেশ্বরের কথায়। সে যা বলেছে তা আবোল-তাবোল নয়, হয়তো বলার ভঙ্গিটা ছেলেমানুষের প্রকাশ-চেষ্টায় আবোল-তাবোল মত শুনিয়েছিল। ঈশ্বর নিয়ে তর্ক হচ্ছিল। যে তর্ক জগতে সব থেকে বেশী হয় এবং যে তর্কে নেই বললেও হারে না আছে বললেও হারে না—তারই মাঝখানে হেমলতা এক সময় বলেছিলেন—কেন এ সব তর্ক করছ বল ত? সে থেকেও তোমাকে দিক করে না, না থাকলেও তোমার বৃদ্ধি হয় না, তাকে নিয়ে কেন চায়ের পেয়ালার তুফান তুলছ?

সুরেশ্বর বলে উঠেছিল—God is nothing but botheration.

হো-হো করে হেসে উঠেছিলেন সকলে। মিস মালহোত্রা বলেছিলেন—wonderful.

সুরেশ্বর অপ্রতিভ হয় নি। বলেছিল—তার থেকে তুমি বেহালা বাজাও না বাবা, মা বলছিল তুমি আজ বাজাবে!

—আন, তাই আন! কিন্তু কি বাজাব? আপ ফরমাইয়ে!

—আমি? না-না না—যা খুশি তোমার!

—সন্ধ্যে হয়ে আসছে, পূরবী বাজাও বাবা!

হেমলতা বলেছিলেন—না, তা হলে আর কিছু জমবে না এরপর।

ছড়ি টেনেছিলেন যোগেশ্বর। একটু বাজাতেই সুরেশ্বর বলেছিল—বসন্ত, না বাবা?

ছড়ি টানতে টানতেই ঘাড় নেড়ে সায় দিয়েছিলেন যোগেশ্বর।

* * *

মিস মালহোত্রা চলে গেলে যোগেশ্বর বলেছিলেন—এদের কেন ডাক?

—কেন ?

—নাঃ। এরা হল আলাদা জাত—এদের হল আলাদা ধাত !

একটু ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন হেমলতা। কিন্তু পরের দিনই মহারাজার পুরুষ সেক্রেটারী এসে যোগেশ্বরকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন লাউডন স্ট্রীটের বাড়ীতে। একলা নয়—স্ত্রী-পুত্র সমেত যোগেশ্বরকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন চায়ে। চায়ের নিমন্ত্রণ শেষ করতে প্রায় ডিনারটাইম হয়ে গিয়েছিল। আগের কথায় বংশ-পরিচয় থেকে শুরু করে খেলা-শিকার-সঙ্গীত থেকে পলিটিক্স পর্যন্ত। এরই মধ্যে মহারাজা হঠাৎ বলেছিলেন, মিস্টার রয়, তোমার সঙ্গে আমার কিছু প্রাইভেট কথা ছিল। যদি আপত্তি না-থাকে তবে এস না, আমরা আধঘণ্টার জন্যে ওঘরে কথা বলে নিই। চন্দ্রিকা, তুমি মিসেস রয় এবং মাস্টার রয়কে দেখাও না সব।

ঘরে নিয়ে গিয়ে মহারাজা বলেছিলেন—দেখ রয়, তোমার লেখা আমি পড়ি। তা ছাড়া আমি চন্দ্রিকার কাছে তোমার কথা শুনে দু-চারজনের কাছে পরামর্শ নিয়েছি। তারা তোমার কলম সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছে। আমার স্টেট সম্পর্কে প্রজারা এই সব কংগ্রেসী লীডারদের উস্কানীতে সহায়তায় নানান নিন্দার কথা অশাসন-কুশাসনের কথা ভেন্টিলেট করছে, দরখাস্ত পাঠাচ্ছে। পলিটিক্যাল এজেন্ট এতে আমার উপর সুবিধে নিতে চাচ্ছে। আমি চাই আমি কি করেছি—সেই কথা প্রকাশ করতে। তুমি আমাকে হেল্প্ কর। কাজটার ভার নাও।

গম্ভীর হয়ে গিয়েছিলেন যোগেশ্বর। এ যোগেশ্বর জার্নালিস্ট যোগেশ্বর। যে যোগেশ্বর দেশের সুলভ মতামত উপেক্ষা করে দীর্ঘদিন ইংরেজ রাজত্বকে সমর্থন করে এসেছেন। যে যোগেশ্বর উনিশ শো একুশে চাকরী ছেড়েছেন। যে যোগেশ্বর নন-কোঅপারেশন মুভমেণ্টের ব্যর্থতায় হিন্দু শাস্ত্র সংহিতা পড়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে উচ্চ কণ্ঠে বলেছেন—"অহিংসা একটি মনোরম রোমাণ্টিক স্বপ্ন—প্রায় ঈশ্বরের মত। বাস্তবের সম্পূর্ণ বিরোধী। অবাস্তব বললেও যথেষ্ট বলা হয় না। মানবসমাজ এবং সভ্যতাকে ক্ষীণবল করে এতকালে বহুকষ্টে অর্জিত মনুষ্যত্বের বিকৃতি ঘটায় ক্লীবত্বে অর্থাৎ সভ্যতার বংশধারা বা স্রোতোধারায় ছেদ টেনে দেয়। এমন কি যদি সব দেশের সব মানুষ অহিংস হয়েই বসে, যুদ্ধও আর না হয়, তবে সেদিন দলবদ্ধভাবে বনের বাঘ সিংহ হিংস্র জন্তুরা মানুষকে আক্রমণ করে পরমানন্দে পশু-রাজত্বের সৃষ্টি করবে।"

এ লিখেও নিন্দাকে সমালোচনাকে ভয় করেন নি যে যোগেশ্বর সেই যোগেশ্বর। তিনি বলেছিলেন—মহারাজা, এ ভার নিচ্ছি এ কথা তো বলতে পারব না ! যতক্ষণ সব না জেনেছি !

—বেশ, তোমাকে আমরা সব তথ্য দিচ্ছি। ফুল স্ট্যাটিস্টিক্স্ দিয়ে দেব আমি।

হেসে যোগেশ্বর বলেছিলেন—স্ট্যাটিস্টিক্স্ আর সত্য এক নয় মহারাজ।

—বেশ, তুমি এস আমার স্টেটে। দেখ সব !

—পূর্ণ স্বাধীনতার মধ্যে দেখব সব ?

—নিশ্চয় !

—ভেবে বলব কাল !

—আমি তোমাকে বিলেতের কাগজে যে পেমেণ্ট করে, তাই করব। এবং সব খরচ আমি বহন করব। যদি মাইনে নিয়ে কাজ করতে চাও—

—না। ওদিকে আমি প্রথমটাতে রাজী ! তবে ভেবে দেখব !

—তুমি একবার স্টেটে এসে সব দেখ রয়। প্লিজ। ফার্স্টক্লাস বাংলো—মোটর—এভরিথিং। তুমি মিসেস রয়কে নিয়ে ছেলেকে নিয়ে চল, দেখ।

—কাল বলব মহারাজা !

পথে ভাবতে ভাবতে এসেছিলেন, কথাটা হেমলতাকেও বলেছিলেন। হেমলতা বলেছিলেন—দেখ !

—কি ?

—কাল বলছিলে চন্দ্রিকার জন্যে যে ওকে কেন আনলে ?

—হুঁ। বলেছিলাম।

—এখন ?

—এখন ?

—হ্যাঁ এখন ?

—বলতে পারছি না ! ভেবে দেখি।

* * *

কাজ নিয়েছিলেন যোগেশ্বর। চন্দ্রিকা নিজে এসেছিল মত জানতে। মত তিনি দিয়েছিলেন। হেমলতা বলেছিলেন—এবার বল !

—কি ?

—ডেকে ভাল করেছিলাম কি না ?

—কর্মের একটা চক্র আছে হেম !

হেসে হেমলতা বলেছিলেন—তবু বলবে না যে ভাল করেছিলাম।

—নিশ্চয় বলব। তা বলব। যা ঘটবার তাই যখন ঘটে তখন সেই ভাল। যা ঘটবার নয় তা ঘটাতে গেলে বা ঘটালে পৃথিবীতে যতিভঙ্গ হয়—সুর কাটে। আমার মত জার্নালিস্টের পক্ষে এইটেই ঘটবার। আমি জমিদারের বংশধর। জার্নালিস্ট হয়েছি। ওই কংগ্রেসী সুরে সুর মেলাতে গেলে বেসুর বলতাম। সংসারে যারা বেসুর বলে এ-যুগে তাদের বলে বিদ্রোহী। তারা জিতলে দেবতা হয় হারলে অসুর নাম পায় ইতিহাসে। সে রিস্ক আমি নিতে নারাজ !

এক বছর পর হেমলতাকে বম্বে থেকে যোগেশ্বর যে চিঠি লিখেছিলেন তার গোড়াতেই এই কথাটার উল্লেখ করেছিলেন—তিনি চন্দ্রিকাকে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছেন ইউরোপ।

গোড়াতেই লিখেছিলেন—তোমাকে এই চন্দ্রিকা পর্বের গোড়াতেই বলেছিলাম তুমি ওকে কেন আনলে ? তুমি জিজ্ঞাসা করেছিলে—কেন ? দোষ কি হল ? বলতে সেদিন পারি নি, আজ লিখে জানাচ্ছি—দোষ তোমার নয় দোষ আমার, আমি ওকে দেখে এক মুহূর্তে ক্লোরোফর্ম করা মানুষের মত চেতনা হারিয়ে ফেলেছিলাম। ওর রূপসজ্জা, ওর ভঙ্গি, ওর খাম্পুকরা

চুলের গন্ধ সত্যিই যেন ক্লোরোফর্মের মিষ্টি গন্ধের সঙ্গে একমাত্র তুলনীয়। তবু আমি প্রাণপণে লড়াই করে চেতনাকে জাগিয়ে রেখেছিলাম অনেকদিন। তুমি জান পরদিন চন্দ্রিকা এসেই আমার মত আদায় করে ছেড়েছিল। কি বলেছিল জান—বলেছিল—রয় প্লিজ, প্লিজ তুমি অমত করো না! প্লিজ! আমার চোখে নেশার ঘোর ছিল। সেই ঘোরের মধ্যেই বলেছিলাম, কেন? আমাকে নেবার জন্য এত ব্যস্ত কেন? মহারাজাকে তুমি এত ভালবাস। সে বলেছিল—উল্টো! ঠিক উল্টো রয়। তুমি যদি স্টেটের রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হও তবে আমি পরিত্রাণ পাই। আমার নিশ্চিত ধারণা আমি পরিত্রাণ পাব। জিজ্ঞাসা করেছিলাম—মানে কি বল তো? সে বলেছিল—রয়, আমাকে মহারাজা আসলে কিনেছে। আমার বাবা আমাকে বিক্রী করেছিল। আমি একটা সাংঘাতিক দলিলে সই করেছি। এক লক্ষ টাকা অ্যাডভান্স নিয়েছি—আমার চাকরীর উপর! আমার এ থেকে পরিত্রাণ নেই। তুমি যদি এস রয়—আমি তোমাকে অনেক ফ্যাক্টস দেব প্রমাণ দেব, তার দাবীতে তখন হয়তো মুক্তি পেতে পারব। আমি বলেছিলাম—কিন্তু মহারাজা তো তোমাকে খুব সুখে রেখেছেন চন্দ্রিকা! চন্দ্রিকা বলেছিল—তার থেকে মৃত্যু ভাল। কিন্তু মরতে আমার ভয় করে। আমি নিজে উপরে দরখাস্ত করতে পারি না—আমাকে গুলী করে মেরে দেবে! তুমি এদের জান! তবু আমি বলেছিলাম, কিন্তু আর কি এখান থেকে মুক্তি নিয়ে সাধারণ জীবনে ফিতে যেতে পারবে? সে বলেছিল—রয়, আমি তখন সাধারণ মেয়ের মত সাধারণ মানুষের কাছে নিজেকে বিক্রী করেও বাঁচতে পারব। আমি আর আত্মসম্বরণ করতে পারি নি, বলেছিলাম—আমার ফার্স্ট অফার রইল। চন্দ্রিকা বলেছিল—আমি নিজেকে ইন এ্যাডভান্স তোমাকে দিয়ে রাখলাম। এনগেজ-মেণ্টও করে গিয়েছিল: সেটা একটা বড় হোটেলে। মহারাজার সেদিন ডিনারে নেমন্তন্ন ছিল গভর্ণমেণ্ট হাউসে।

থাক ওসব কথার বিশদ বিবরণে প্রয়োজনও নেই, আমার নিজেরও অপরাধবোধ মরে যায় নি। হেম, এ বোধহয় একটা ব্যাধি। এ বোধহয় নিয়ে জন্মেছিলাম। কারণ তার সংক্রমণের সূত্র আমি দেখতে পাচ্ছি আমার জন্মদাতার জীবন থেকে। তোমাকে বিবাহের পূর্বে এ ব্যাধি আমাকে প্রায় বাঁধা বন্য-জন্তুর মত বা জোতা-ঘোড়ার মত এই মুখে চালাচ্ছিল। চলতে তো আমার বাধা ছিল না। অর্থ ছিল। তার উপর সমাজের যেটা তাড়না বা ভয় তাতেও ছিলাম বেপরোয়া। কিন্তু বাবার একটা মেসেজ ছিল—আমার কাছে। দাদার কাছেও ছিল। সেটা শীলকরা কভারে তিনি দিয়েছিলেন—আমাদের অ্যাটর্নীকে। সেটা তাঁর উইলের সঙ্গে পেয়েছিলাম। লেখা ছিল--'পিতার যদি কোন অধিকার থাকে পুত্রকে উপদেশ দেবার তবে উপদেশ রইল নারী-বিলাস থেকে দূরে থেকো। যদি তা সম্বরণ করতে নাই পার, তবে বিবাহ করে সংসারী হয়ো না!' কারণটা অজানা ছিল না। আমার বাল্য-কালে আমার এক মেম গভর্ণেস ছিল। তিনি তাঁর প্রেয়সী ছিলেন। আমাকে চড় মারার জন্য আমার দাদা তাকে ঘোড়ার চাবুক দিয়ে মেরেছিলেন! তারপর মেমসাহেব গেল চলে, বাবা তাকে অনুসরণ করে এসেছিলেন কলকাতায়। এটা প্রত্যক্ষভাবে জানতাম। তখন আমার পিতামহ বেঁচে। তখন থেকেই আমরা তাঁর থেকে স্বতন্ত্র বাস করেছিলাম। পিতামহের

মৃত্যুর পরও বাবা স্বতন্ত্র থেকেছিলেন কিছুদিন। তারপর তিনি অন্য মানুষ হ'তে চেয়েছিলেন। সে আত্মনির্যাতন আমি দেখেছি। এবং তখন আভাসও পেয়েছি—তাঁর প্রথম জীবনের উদ্দাম গতির বিচিত্র কথার। সেই কারণেই আমি দীর্ঘদিন বিবাহ করি নি—এবং উদ্দাম গতিতে ছুটতে গিয়েও ভয়ে নিজেকে সংযত রেখেছি। তারপর তুমি এলে জীবনে। তুমি দেখেছ প্রমাণ পেয়েছ আমি কি হয়েছিলাম বা হ'তে চেষ্টা করেছিলাম। ইদানীং ভাবতাম আমি সব সংকট পার হয়ে এসেছি। কিন্তু না।

পিতামহ ছিলেন পুণ্যবান পবিত্র চরিত্র মানুষ। অন্ততঃ চরিত্রের দিক থেকে। বিষয়ী হিসেবে তাঁর দোর্দণ্ড প্রতাপের পরিচয় চোখে দেখেছি। জীবনযাপনের ধারা দেখেছি। এ যুগে আমার শিক্ষানুযায়ী তাঁর জীবনকে বলব আত্মনির্যাতন। অর্থহীন আত্মনির্যাতন। তিনি আমাদের শিখিয়েছিলেন—একটা কথা। শিখিয়েছিলেন সংসারে মানুষের জীবনে নারীর সঙ্গে সম্পর্ক দুটি। দুটি সম্পর্কের একটি ভেঙে আবার দুটি হয়েছে। এক পুরুষ আর প্রকৃতি। মানুষের জীবনে এই সম্পর্ক একটি পুরুষের সঙ্গে একটি নারীর। অন্যটি মাতা আর পুত্র। সেটা বয়স-ভেদে হয় কন্যা আর পিতা। এইটেই জগৎজোড়া। এর অন্যথায় তুমি স্বর্গ-নরক মানলে নরকে পড়বে, না-মানলে তোমাকে ফিরতে হবে জন্তুজীবনে। অথবা তাকে হতে হবে সেই পুরুষ যাকে পাপপুণ্য দেশ সমাজ কিছু স্পর্শ করতে পারবে না—তার নাগাল পাবে না।

কথাটা সত্য। চন্দ্রিকার সঙ্গে জীবনের গ্রন্থি লাগল। সেটা যদি মা বা কন্যার মন্ত্রে গ্রন্থি পড়ত! কিন্তু না, তা পড়ল না। আজ একটা বছর আমি নানান অজুহাতে মহারাজার স্টেটে কাটিয়েছি ঘুরেছি—সে কেবল চন্দ্রিকার জন্য। যখন চন্দ্রিকাকে জীবনে জড়িয়েছি তখন চেষ্টা করেছি ওই রকম পুরুষ হ'তে; পাপপুণ্যের দেশসমাজের ঊর্ধ্বের পুরুষ। কিন্তু তা পারি নি। সে সহজ নয়। সহজ সাধারণের মত অবস্থায় পড়লাম। ওদিকে মহারাজা, এদিকে তুমি এবং সুরেশ্বর। একদিকে ভয়, অন্যদিকে নিদারুণ অপরাধবোধ। মহারাজা জানতে পারলে গুলি ক'রে মারত! এদিকে তুমি জানলে কি হ'ত তা কল্পনাও করতে পারি নি। ফলে জন্তুর অধম চোরের মত তার সঙ্গে মিশেছি। আমার সম্পদ, আমার সহায়তা করেছে। বাঘের নখ আর দাঁতের মত মানুষের এই সম্পদ আর প্রতিষ্ঠা। কিন্তু আর গোপন রইল না। মহারাজা জেনেছেন। সুতরাং শিকারীর বনভাঙার শব্দে ভীত জন্তুর মত চন্দ্রিকাকে নিয়ে বিদেশ পালানো ছাড়া আমার গত্যন্তর নেই। আজই জাহাজ ছাড়বে। বম্বে থেকে চলে যাচ্ছি চন্দ্রিকাকে নিয়ে। ব্যাঙ্কের পাস বইয়ে তিন লক্ষ টাকা মজুত আছে। তার দু লক্ষ আমি নিলাম। এক লক্ষ টাকার চেক কেটে বাড়ীঘর সম্পত্তির দলিল তোমাদের নামে করে দিয়ে—বম্বের অ্যাটর্নীকে দিলাম—তারা যথাসময়ে তোমাদের কাছে পৌঁছে দেবে। সম্পত্তি যা পৈতৃক তা সুরেশ্বরের রইল—এ অধিকার ওর জন্মগত। তবে শর্ত রাখলাম যতদিন তুমি বাঁচবে ততদিন সব কাজে তোমার মত নিতে হবে। তোমাকে দিলাম আমার ব্যক্তিগত সম্পত্তি। আর এক লাখ টাকার অর্ধেক পঞ্চাশ হাজার নিব্যাঢ় স্বত্বে।

মার্জনা করতে বলব না। বলব অভিসম্পাতই দিয়ো। অন্য দেশের মত ডাইভোর্স নেই।

থাকলেও আমি বলতে পারতাম না। তোমাকে আমি আজও ভালবাসি। কিন্তু বিশ্বাস কর, আমার কোন শক্তি আজ নেই, আমি ভেসে যাচ্ছি একটা দুর্দান্ত আকর্ষণে। কি মোহ এই মেয়েটার! ওঃ!

সুরেশ্বরকে বাঁচাতে চেষ্টা করো। কিন্তু তাকে বন্ধনেও বেঁধো না। মানুষ কেউ কাউকে বাঁচাতে পারে না হেম। মানুষ বাঁচে নিজে। তার বীজ থাকে তার চরিত্রে। সে চরিত্র আপনি গড়ে। অন্যে যেটা গড়ে দেয় সেটা খড়ের কাঠামোর উপর চাপানো মাটি আর রঙ। কালে ফাটে—জলে গলে।

ইতি—যোগেশ্বর রায়।

৪

সুরেশ্বরের বয়স তখন চৌদ্দ পনের। উনিশ শো চব্বিশের শেষ, পঁচিশের আরম্ভ। ষোল আনা বুঝবার বয়স না হলেও বারো আনা বুঝবার বয়স হয়েছিল। হেমলতা প্রথম কথাটা চাপাই রেখেছিলেন; বলেছিলেন, যোগেশ্বর ইয়োরোপ বেড়াতে গেছেন। সারা ইয়োরোপ বেড়িয়ে তবে ফিরবেন। স্বামীকে দায়ী করেন নি এমন নয়, তবে যতখানি করা উচিত তা করেন নি। করেন নি নিজের দৈহিক অক্ষমতার জন্য। দ্বিতীয় সন্তান মৃতকন্যা প্রসব করার পর থেকে তিনি স্বামীর মনের সঙ্গিনী ছিলেন, গৃহের গৃহিণী ছিলেন, তাঁদের জীবনের ধর্ম যেটা ছিল সে ধর্মানুযায়ী সহধর্মিণীও ছিলেন, কিন্তু নারী হিসাবে তো তাঁর কোন মূল্য ছিল না স্বামীর কাছে। মানুষের জীবনের তৃষ্ণা স্বভাবধর্ম: সেই তৃষ্ণায় যে-জল জমে বরফ নয়—পাথর হয়ে গেল, তার কোন মূল্য থাকে তৃষ্ণার্তের জীবনে? যোগেশ্বর তৃষ্ণাকে যদি জয় করতে পারতেন, তবে তাঁর চেয়ে সৌভাগ্যবতী কেউ হ'ত না। জীবনের অশ্বমেধ যজ্ঞ রাম করেছিলেন স্বর্ণসীতা নিয়ে। তা যদি যোগেশ্বর নাই পেরে থাকেন, তবে তাঁকে কোন দোষে দোষী করবেন? একান্ত নীরবে অটল ধৈর্যের সঙ্গে তিনি গ্রহণ করেছিলেন ঘটনাটিকে। এবং সংসার ও বিষয় এবং সুরেশ্বর এই দুটি তটের মধ্য দিয়ে সাগরসঙ্গমের অদূরবর্তিনী নদীর মত অনুচ্ছ্বসিতভাবে প্রবাহিত রেখেছিলেন নিজেকে।

কোন কিছুর বদল করেন নি। অর্থাৎ জীবনযাত্রার প্রণালীর। আক্ষেপের মালা নিয়ে জপ করতে বসেন নি। ছেলের ধ্যান-ধারণারও পরিবর্তন করতে চান নি। কিন্তু ছেলে বদলেছিল।

কথাটা হেমলতা চেপে ছিলেন, কিন্তু বাইরের লোকেরা চাপে নি। তারা প্রকাশ করেই দিয়েছিল। পনের বছরের সুরেশ্বরের কানে সেটা পৌঁচেছিল। স্বাভাবিকভাবে অনিবার্য আঘাতে সে আহতও হয়েছিল। তার ফলে সে হঠাৎ হতে চেয়েছিল গোঁড়া হিন্দুর ছেলে। অর্থাৎ মনে মনে সে এর কারণ হিসেবে স্থির করেছিল যোগেশ্বরের অহিন্দু অভারতীয় মনই এ অনর্থের মূল। নতুন করে ধরেছিল খদ্দর, চরকাও কিছুদিন কেটেছিল। এবং মাকে তাগিদ দিয়ে উপনয়নের ব্যবস্থা করে উপবীতধারী হয়ে বছরখানেক সন্ধ্যা-আহ্নিক করেছিল,

নিরামিষ খেয়েছিল, খালি পায়ে হেঁটেছিল, বাড়ীতে খালি গায়েও থেকেছিল। সংস্কৃতও পড়েছিল। বছর খানেকের পর অনুভব করেছিল সন্ধ্যা-আহ্নিকে সময় যায় অনেক—সুতরাং সন্ধ্যা-আহ্নিক ছেড়ে—শুধু গায়ত্রীমন্ত্র জপ করত। সেটার আরম্ভ হল ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবার সময় থেকে। পরীক্ষা দিয়েছিল সে ষোল বছর বয়সে। কিন্তু পাস করতে পারে নি। ফেল হয়েছিল অঙ্কে। শুধু একবার নয়—পর পর দুবার ফেল ক'রে পড়া ছেড়েই দিল। এবং ছবি আঁকায় ঝুঁকল। চিত্রকর হবে সে। আদর্শ তার প্রথম নন্দলাল। তারপর যামিনী রায়। ভর্তি হল আর্ট স্কুলে। সেখানে বছর তিনেক পড়ে পরীক্ষা দিলে না—পড়া ছেড়ে দিলে এবং আবার ম্যাট্রিক দেবার জন্য পড়তে লাগল। অর্থের অভাব ছিল না। জমিদারীর আয়, কলকাতার বাড়ীভাড়া, এক লাখ টাকার কোম্পানীর কাগজের সুদ—এ সবের কল্যাণে তার বর্তমান জীবন কেন, আমরণ ভাবী জীবনের দিগন্তও কি করব এ নিয়ে একবিন্দু সমস্যা ও এক ফোঁটা কালো মেঘের ছিটে বা ছায়া বুলোতে বা ফেলতে পারে নি। তার মা হেমলতাও এ বিষয়ে উদ্বিগ্ন হন নি কারণ তিনি এই কয়েক বছরে সম্পত্তি পরিচালনা ক'রে সম্পত্তিকে বাগিয়েই তুলেছিলেন, তার হানি করেন নি। তবে সে কেমন মানুষ হবে এ নিয়ে তাঁর চিন্তা ছিল। কিন্তু তখনও পর্যন্ত এমন কিছু কারণ ঘটেনি যাতে তাঁকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হতে হয়।

এই বছরই খবর এসেছিল—ইউরোপে যোগেশ্বর মারা গেছেন। এতদিনের মধ্যে তিনি একখানা চিঠিও দেন নি। শেষ চিঠি এসেছিল—আমি হাসপাতালে। মরব কয়েকদিনের মধ্যে তাতে সন্দেহ নেই। একলা শুয়ে আছি। চন্দ্রিকা দেড় বছর আগে আমাকে ছেড়ে গেছে। আমি তাকে সহ্য করতে পারছিলাম না। আমি তোমাকে ছেড়ে তাকে পেয়ে সন্তুষ্ট হতে পারি নি। একের পর যখন দুইয়ের দিকে মন ছোটে তখন সে দুয়েই বা থাকবে কেন? সে দশক পার হয়ে শতকের দিকে ছোটে। তারপর ডিজিটের পর ডিজিট বাড়ে। কিন্তু মজা কি জান—এক ডিজিট দু ডিজিটে, দু ডিজিট তিন ডিজিটে পরিণত যখন হয় তখন শূন্য বসিয়ে তা হয়। তার মানে আজ বুঝছি—ওর মূল্যটাই হল শূন্য। পূর্ণ ওই একটি সংখ্যা ওই এক। আর একটা সত্য বুঝলাম। সেটা সবার জীবনের কি না তা জানি নে, আমার জীবনের বটে। সেটা হল এই আমার প্রাক্তন—নারী হতে সর্বনাশ। আমার জন্য শোক করো না। আমি নিজে এর জন্য দুঃখিত নই। আমার অভিযোগ নেই আমার লজ্জা নেই—সংকোচ নেই ভয়ও নেই। এর জন্যে এক বছরের মধ্যে প্রহার খেয়েছি, জরিমানা দিয়েছি, জেলও খেটেছি মাস দুয়েক। তবু মরবার সময় মনে যেটা হচ্ছে সেটা কি তা ঠিক বলতে পারব না—ফ্রাস্ট্রেশন বললে আপত্তি করব না, তবে আমি তা মানি না। মনে হচ্ছে বুক জুড়ে রয়েছে শুধু বিরহ—অনন্ত বিরহ। ভেবে দেখেছি, তুমি যদি পাশে থাকতে তবুও তাই মনে হত। আমার কেউ নেই, আমি কাউকে পাই নি।

অনুরোধ করব আমার শ্রাদ্ধ তোমরা করো। কি জানি কল্পনা করে আনন্দ পাচ্ছি।

হেমলতা এতদিনে ভেঙে পড়েছিলেন। ঝড়ে যে গাছ ভাঙেনি সে গাছ একটি দমকা হাওয়ায় যখন একেবারে শুয়ে পড়ল—তখন দেখা গেল গোড়াটি ভিতরে ভিতরে একেবারে ক্ষয়ে শেষ হয়ে গেছে। মাটি বা মূলের সঙ্গে সংযোগ আর ছিল না।

আগের চিঠি পড়ে হেমলতা কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে পড়ে ছিলেন। তারপর বিছানায় শুয়ে মনে মনে ভেবে নিয়ে উঠে বলেছিলেন—হঠাৎ ইয়োরোপ রওনা হয়েছেন মহারাজার কাজে। জানতে পেরেছিল শুধু অ্যাটর্নীরা—যাদের হাত দিয়ে দলিল এসেছিল। পরে হয়তো সবটাই প্রকাশ পেয়েছিল, কিন্তু হেমলতা অস্বীকার করেছিলেন। সেই হেমলতা ওই চিঠি পড়ে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন। দিন তিনেক পর টেলিগ্রাম এসেছিল হাসপাতাল থেকে—যোগেশ্বর রায় মারা গেছেন·····তারিখ। তখন দশদিনে শ্রাদ্ধ করতে হলে হাতে আছে চারদিন। সেদিন অজ্ঞান হন নি, বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ে ছিলেন মুখ গুঁজে। সুরেশ্বর ছিল বাড়ীতেই। তিনদিন আগে হেমলতা চিঠি পেয়ে যখন অজ্ঞান হয়ে গেলেন তখনও সে বাড়ীতে ছিল। ঘরে বসে পড়ছিল সেকালের অতি-আধুনিক সাহিত্যের মাসিকপত্র ; পরীক্ষা দিয়ে অবধি সে আধুনিক সাহিত্যের পাঠক হয়েছে। সময়টা চৈত্রের শেষ। তখনও পরীক্ষার খবর বের হয়নি।

যুগের হাওয়াটা তাকে কাঁচা সরল তরুণ বয়সের গাছের মত দোলা দিচ্ছে। তার চেহারায় এর ছাপ লেগেছে। তখন বিরোধ চলছিল সাহিত্য-ধর্ম ও সাহিত্যে অশ্লীল সত্যের সীমানা নিয়ে—যার পক্ষে শরৎচন্দ্র নরেশচন্দ্র বিপক্ষে শনিবারের চিঠির দ্বন্দ্ব চলছে। স্বয়ং কবিগুরু এতে মধ্যস্থতা করতে উদ্যত হয়েছেন। সে সময়টা একটা দারুণ উত্তেজনার কাল। সে উত্তেজনা তার রক্তেও সঞ্চারিত হয়েছে। ওই প্রবন্ধই পড়ছিল সে সেদিন। হঠাৎ ঝিয়ের চীৎকার শুনে ঘরে এসে মাকে অজ্ঞান হয়ে যেতে দেখে সে চিঠিখানা তুলে নিয়েছিল। চিঠিখানা পড়ে রেখে সে ডাক্তার ডেকেছিল। এবং সেইদিন থেকেই সে এই টেলিগ্রামের প্রত্যাশা করছিল। সে কাতর খুব হয় নি। বাপের উপর ক্রোধ তার একদিন হয়েছিল—আহ্নিক করেছে, খদ্দর ধরেছে, খালি পায়ে ঘুরেছে, নিরামিষ খেয়েছে—কিন্তু এখন সে খদ্দর ছাড়ে নি বটে, তবে বাকীগুলো ছেড়েছে এবং বলতে গেলে আর একরকম হয়ে গেছে। মনে মনে বাপকে সমর্থন করার পথ খোঁজে।

হয়তো তাতে তার পরিচয়ের গৌরবটা বৃদ্ধি পাবে—প্রগ্রেসিভ বাপের প্রগ্রেসিভ ছেলে বলে এটাও কিছুটা কারণ হতে পারে, কিন্তু সবটা নয়। ওর মধ্যে ঝড় আছে—সেটা এলোমেলোই বয় —কিন্তু যখন যেদিকে বয় তখন সেইদিকেই তার সমান গতি।

সে যাক। হেমলতা বেশীক্ষণ মুখ গুঁজে পড়ে থাকেন নি। অল্পক্ষণের মধ্যেই উঠে বসে সুরেশ্বরকে ডেকেছিলেন—নায়েবকে ডেকেছিলেন।

নায়েব একজন আছেন, সে যোগেশ্বরের আমল থেকেই। একটা ছোট সেরেস্তাও আছে, কয়েকজন কর্মচারীও আছে। তাঁদের কলকাতায় বাড়ী ভাড়া—দেশের জমিদারীর হিসেব-আদায় তার ব্যবস্থা করতে হয় ; মামলা-মকদ্দমাও আছে। সব থেকে জটিল হ'ল জমিদারীর ব্যাপার। ছ'পুরুষ আগে জমিদারীর পত্তন—তা তিন পুরুষ ধরে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধির মুখে চলেছিল এবং ভাগ-বাঁটোয়ারা হয় নি। প্রথম পুরুষ কুড়োরাম ভটচাজের পুত্র সোমেশ্বর ভটচাজ—এফিডেবিট করে রায় খেতাব নিয়েছিলেন—তাঁর এক ছেলে বীরেশ্বর রায় ; বীরেশ্বর ছিলেন নিঃসন্তান—তিনি আপনার ভাগ্নে কমলাকান্তকে পোষ্যপুত্র নিয়ে নাম রেখেছিলেন রত্নেশ্বর রায়। রত্নেশ্বরের তিন ছেলে—দেবেশ্বর, শিবেশ্বর, রামেশ্বর। দেবেশ্বরের দুই ছেলে—যজ্ঞেশ্বর, যোগেশ্বর।

শিবেশ্বরের তিন বিবাহে সন্তান ষোলটি—তার মধ্যে জীবিত দ্বাদশটি। ছয়টি পুত্র ছয়টি কন্যা। রামেশ্বর ব্যারিস্টার, থাকেন এলাহাবাদে। তিনি বংশের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়েছেন ব্রাহ্ম হয়ে। অবশ্য দেবোত্তরের নিজের অংশের সম্পত্তি তিনি অতি সামান্য মুনাফা রেখে পত্তনী দিয়ে হস্তান্তর করেছিলেন অপর দুই ভাইকে এবং নিজের ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিক্রী করেছিলেন মেজভাই শিবেশ্বরকে। ভগবানের অংশ বিক্রী করেছিলেন বড়ভাইকে। এসব করার পর ব্রাহ্ম হয়েছিলেন তিনি।

হেমলতা উঠে বলেছিলেন—এঁদের সকলকে খবর দিতে হবে। টেলিগ্রাম করুন।

নায়েব বলেছিল—তা দিচ্ছি। কিন্তু টেলিগ্রাম কেন? চিঠি দিলেই তো হয়। আজ লিখলে কাল পাবেন সুব।

—না। টেলিগ্রাম করুন। সকলকে অশৌচান্তের কামানোর জন্য আসতেও লিখুন।

—বড়বাবুর (অর্থাৎ যজ্ঞেশ্বরবাবুর) তো আসবার উপায় নেই—ইনসলভেন্সির কেস চলছে! তিনি ওয়ারেণ্টের ভয়ে ডাক্তারের সার্টিফিকেট দিয়ে হার্টের রোগী সেজে পড়ে আছেন। ছেলেরা—কি—

—আমাদের কর্তব্য করুন। মেজ খুড়শ্বশুর গোঁড়া হিন্দু, ধার্মিক লোক—তিনি তো আসবেন।

নায়েব বলেছিল—তার থেকে চলুন না আমরাই কীর্তিহাটে যাই। সেখানেই কামানো হবে। ঠাকুরবাড়ীতে হবে। মানে—তাতে—

চুপ করে গিয়েছিল নায়েব। হেমলতা তার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন কথাটার শেষ শুনবার জন্য। নায়েবকে থামতে দেখে বলেছিলেন—বলুন।

—মানে, মেজকর্তা তো খুবই গোঁড়া। এখানে কামানো হলে না-আসতেও পারেন। পরে বলতে পারেন—অশৌচ আমরা নিই নি। ইউরোপে মরেছে—জাত গেছে—ক্রীশ্চান হয়ে গেছে এসব তো মাঝে মাঝে বলেন সেখানে—শুনতে পাই! উনি তো মামলাবাজ লোক। এর পর অশৌচ জ্ঞাতিরা নেয়নি সুতরাং দেবোত্তরের সেবায়েত স্বত্ব নিয়ে একটা কিছু বাধানো বিচিত্র নয়। ওখানে গেলে যা হয় মুখোমুখিই হয়ে যাবে। আর শ্রাদ্ধটা ঠাকুরবাড়ীতে বলে—উনি যাই করুন—টেঁকবে না!

হেমলতা অ্যাডভোকেট মামার কাছে মানুষ, কুড়ি বছর পর্যন্ত সেখানে মামলা মকদ্দমার কথা শুধু কানে এমনি শুনতেন না—চৌদ্দ বছর বয়স থেকে মামাকে তাঁর বরাত মত আইনের রেফারেন্সের বইও টেনে বের করে দিতেন। তারপর যোগেশ্বরের সঙ্গে বিয়ে হওয়ার পর থেকে যোগেশ্বর তাঁকে জমিদারী আইন এবং বিশেষ করে তাঁদের পৈতৃক সম্পত্তির মূল গ্রন্থির যে দলিল তার সম্পর্কে অনেক কথা বলেছেন। যোগেশ্বরের বিদেশ চলে যাওয়ার পর থেকে তিনি নিজেই সব চালিয়েছেন। সুতরাং কথাটা তাঁর বুঝতে কষ্ট হল না।

সুরেশ্বরও বুঝেছিল। বুঝবার বয়সও তার হয়েছে। আইনমতে সে এখন সাবালক। একুশে পা দিয়েছে। এতদিন নাবালকের গার্জেন ছিলেন মা হেমলতা। কারণ যোগেশ্বর ইউরোপে যাবার সময় সব ছেলেকে দিয়ে গিয়েছিলেন।

ব্যাপারটা হল হিন্দু দেবোত্তরের সেবায়েত অহিন্দু হয়ে গেলে থাকতে পারে না, তখন সে অংশ এসে বর্তায় অন্য অংশীদারদের বয়সে যিনি জ্যেষ্ঠ তাঁর কাছে। সে হিসেবে মেজকর্তা শিবেশ্বর রায়ের ব্যগ্র হয়ে ওঠারই কথা। শিবেশ্বর রায়ের তিন বিয়ে, ষোলটি সন্তান—তার বারোটি বেঁচে এবং তার ছয়টি পুত্র। এবং শিবেশ্বর ইতিমধ্যে আকণ্ঠ ঋণে আবদ্ধ। ঋণের দায়ে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পত্তির সবটুকুই চলে যাবে তা সকলেই বোঝে। দেবোত্তর বিক্রী হয় না তবে পত্তনীবিলি-বন্দোবস্ত হয়—তাও তাঁকে করতে হবে, কিছু করেছেনও। এই অভিনব ফন্দিটি রামেশ্বরের আবিষ্কার। আইনের সূচী-ছিদ্রপথে যে চালাতে পারে সে হাতীও পার করে নিয়ে যায়। রামেশ্বর বিলেত থেকে ব্যারিস্টার হয়ে ফিরে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা নেবার আগে এই ফাঁকটি আবিষ্কার করেছিলেন। দেবোত্তর জমিদারীর আয় ছিল বত্রিশ হাজার টাকা। এই দেবোত্তরে ছ-আনা রকমের মালিক ছিলেন দেবেশ্বর এবং শিবেশ্বর রামেশ্বর পাঁচ আনা হিসেবে অংশীদার ছিলেন। দেবোত্তরে দেবসেবা ইস্কুল টোল দাতব্য চিকিৎসালয় প্রভৃতির খরচ বরাদ্দ ছিল বারো হাজার টাকা। বাকী কুড়ি হাজার টাকা সেবায়েৎ অর্থাৎ এই বংশের ছেলেদের পড়াশুনা খাওয়াপরা এবং চিকিৎসাপত্রের ব্যবস্থা ছিল এবং শর্ত ছিল কোনপ্রকার অহিন্দুজনোচিত কর্মে বা ভোগে-বিলাসে ব্যয় করতে পারবেন না। দলিলকর্তা রত্নেশ্বর রায় ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন—ইচ্ছামত ব্যয়ের অধিকারী হলেও এ থেকে দান-ধ্যান করেন এই তাঁর কাম্য। একটা ফাঁক তিনি রেখেছিলেন—ইচ্ছা করেই শর্ত রেখেছিলেন—ঈশ্বর-না-করুন যদি কোন সেবায়েতের অবস্থাবিপর্যয় ঘটে তবে কন্যার বিবাহ পুত্রদের শিক্ষা পিতৃমাতৃ শ্রাদ্ধের কালে অভাব ঘটিলে দেবসেবা প্রভৃতির বরাদ্দ বারো হাজার টাকা বজায় রাখিয়া উদ্বৃত্ত লাভ—যাহা আমার বংশ-ধরেরা সেবায়েত হিসাবে ভোগ করিবার হকদার রহিলেন—তাহা অর্থাৎ কুড়ি হাজারের মধ্যে আপন লভ্যাংশ—পত্তনী দরপত্তনী দরাদর পত্তনী বিলি করিতে পারিবেন। কোন কারণে বিক্রয় করিতে পারিবেন না।

রামেশ্বর এই ফাঁক দিয়ে ফাঁকি দিয়েছিলেন স্বর্গত পিতা রত্নেশ্বর রায়ের অভিপ্রায়কে। তিনি বিয়ে করে বিলেত গিয়েছিলেন—বিলেতে থাকতেই সে স্ত্রী মারা যান। একটি মাত্র কন্যা ছিল তাঁর। সেই কন্যাটির রাজপুত্র দেখে বিবাহ দেওয়ার অজুহাতে দেবোত্তর সম্পত্তি পত্তনী-বিলি করে মুনাফা বিক্রী করেন। সে সম্পত্তি নিয়েছিলেন তখন দেবেশ্বর এবং শিবেশ্বর। রামেশ্বর দেবেশ্বরকে কথাটা গোপন করেননি,—বলেছিলেন—আমি একটি মেয়েকে বিয়ে করব, অসবর্ণ, তারা অবশ্য ব্রাহ্ম। কিন্তু সে হলে তো মেজদা আমাকে দেবোত্তরের সেবাইত থাকতে দেবে না। সুতরাং আমি যেটা পাব সেটা আমি নিয়ে নিতে চাই।

দেবেশ্বর বিচিত্র চরিত্রের লোক ছিলেন। বলেছিলেন—কর তুমি বিক্রী, আমি বাধা দেব না। কারণ সম্পত্তির অধিকারের জন্য স্বাধীনতা যাবে—তার সমর্থন কখনই করব না। আমার কাছে ধর্মের চেয়ে জীবন বড়—দেবতার চেয়ে মানুষকে বেশী ভালবাসি। তুমি যদি মেয়েটিকে ভাল-বেসেই থাক তবে নিশ্চয় বিয়ে করবে এবং তোমার অংশের মুনাফা সবই তুমি পত্তনী দেওয়ার মধ্যে দিয়ে বিক্রী করে দিতে পার। আমি আপত্তি করব না—প্রকাশও করব না।

কিনেছিলেন দেবেশ্বর অগ্রণী হয়ে। সুতরাং শিবেশ্বর পিছিয়ে থাকেন নি। দেবেশ্বর

অর্ধেক পত্তনী নিয়েছিলেন—শিবেশ্বরও অর্ধেক নিয়েছিলেন।

তারপর এই দীর্ঘকালের মধ্যে শিবেশ্বর অনেক সম্পত্তি ওই পথেই পত্তনী দর-পত্তনী বিলি করে করে এখন শুধু দেবোত্তরের আয়টুকুর উপর নির্ভর করে আছেন।

খরচ অনেক। তিনটি বিয়ে—বারোটি সন্তান বেঁচে—ছয় কন্যার বিয়ে দিয়েছেন—অনেক মামলা করেছেন। অনেক যাগযজ্ঞ করেছেন। প্রথম প্রথম উৎসবে কলকাতার থিয়েটার আনিয়েছেন। কীর্তিহাটে মহাকালী এ্যামেচার থিয়েটার খুলেছিলেন, নিজে নায়কের পার্ট করতেন, ড্যান্সিং ট্রুপ পুষতেন মাইনে দিয়ে—তিনটি গাইয়ে সুদর্শন ছোকরা রেখেছিলেন ফিমেল পার্টের জন্যে।

এখন সে-সব নেই, এখন আছে ছয় ছেলের সংসারে ছেলে-বউয়ে এগারজন, তাদের ছেলে-মেয়ে সতেরোজন। ছোট ছেলে অতুলেশ্বরের তখনও বিয়ে হয় নি। ছেলেরা প্রথম আমলে বাবু ছিলেন; ঘোড়ায় চড়তেন, শিকার করতেন, মদ খেতেন। হাতীও একটা কিনেছিলেন শিবেশ্বরবাবু। এখন হাতী-ঘোড়া নেই। ছেলেরাও লেখাপড়া কেউ ভাল শেখে নি। ছয়জনের মধ্যে দুজন এণ্ট্রান্স পাশ করেছিল গ্রামের ইস্কুল থেকে। বাকীরা কেউ ফোর্থ ক্লাস—কেউ থার্ড ক্লাস—কেউ সেকেণ্ড ক্লাস অবধি, একজন ম্যাট্রিক ফেল।

নাতিরা কয়েকজন সুরেশ্বরের থেকে বড়, কয়েকজন সমবয়সী—বাকীরা ছোট। এরই মধ্যে সাতষট্টি বছর বয়সের শিবেশ্বর তৃতীয় পক্ষের ত্রিশ বছরের স্ত্রীকে নিয়ে ধর্মকর্ম যাগযজ্ঞ করেন। স্বতন্ত্র থাকেন ছেলেদের সংসার থেকে। জমিদারীতে বসেছিলেন, মামলা-মকদ্দমা ভাল বোঝেন, বাকী খাজনার প্যাঁচে গরীব প্রজার অনেক রায়তী জোত ছেলেদের নামে কিনে দিয়ে তাদের আলাদা করেছেন। দেবোত্তরে যে অন্নভোগ হয়—তা তিনি কমান নি, সেই ভোগের অন্ন ছেলেরা নাতিরাই খায়। মা-কালী আছেন—মৎস্যভোগ হয় নিত্য। এ ছাড়া তারা সব কিছুটা ভাজাভুজি করে নিয়ে সেইগুলি নিয়ে চলে যায় নাটমন্দিরে। থাকে থাকে বা আলাদা আলাদা সারিতে বসে। গৃহিণী বধূরা দাঁড়িয়ে থেকে আপন আপন সংসারকে খাওয়ান। নিজের নিজের তরকারি পরিবেশন করে দেন।

রাত্রের আহারটা শুধু বাড়ীতে।

শিবেশ্বর কিন্তু বাড়ীতেই খান। তিনি ছেলেদের থেকে পৃথক। থাকেন পৃথক খান পৃথক। ওই প্রসাদ আসে—পায়সান্নের প্রসাদ। রাত্রে শীতলে লুচির সঙ্গে ক্ষীর মিষ্টের ব্যবস্থা আছে—সেইটে তাঁর জন্যে যায়। আর যায় সকালে বাল্যভোগের ছানা-মিষ্টান্ন।

শিবেশ্বর নিজে বৈষ্ণব। বাড়ীতে কালী আছেন—আর রাজরাজেশ্বর শালগ্রাম শিলা আছেন—খোদ আদিকর্তা সোমেশ্বরের প্রতিষ্ঠিত। তারপর রত্নেশ্বর রায় যুগলবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

বংশ হিসাবে শাক্তের বংশ। কিন্তু শিবেশ্বর বৈষ্ণবমন্ত্র চেয়ে নিয়েছিলেন। তবু বাড়ীতে মা-কালী আছেন বলে মাছ-মাংস খান। মদ খান না। গাঁজা খান।

প্রথম যখন গাঁজা ধরেন তখন গাঁজা তৈরী করবার লোক ছিল। গোলাপজলে ভিজানো গাঁজা অগুরু-চন্দনের তক্তি বা ছোট্ট পাটার উপর রেখে কাটা হত। রূপোর কল্কে ছিল—

সেই কল্কেতে গাঁজা সেজে পরিচারক হাতে ধরত এবং শিবেশ্বর টানতেন মুখ লাগিয়ে। গাঁজা হাতে ধরে খেলে হাতে গন্ধ ওঠে—সেই জন্যে ওই ব্যবস্থা ছিল। তারপর আতর মাখতেন, গায়ের গন্ধ ঢাকতে।

এখন সে সব দিন নেই, এখন নিজে সেজে নিজের হাতে ধরেই খেয়ে থাকেন। নিজে তিলক ফোঁটা কাটেন—গলায় কণ্ঠী আছে। স্ত্রীকেও কাটতে হয় ফোঁটা তিলক। গলায় তুলসীর কণ্ঠীও পরতে হয়।

এই শিবেশ্বর রায়। যোগেশ্বরের খুড়ো। তিনি এখন বেঁচে, বেশ শক্ত হয়েই বেঁচে আছেন। আজও নিত্য সকালে মামলা সেরেস্তা নিয়ে বসেন।

সুতরাং হেমলতা একটু থমকে গিয়েছিলেন। তারপর বলেছিলেন—কিন্তু সে তো তাঁর বলতে গেলে নিজের এলাকা। সেখানে যদি গোলমাল করে সব পণ্ড করে দেন।

নায়েব বলেছিল—তা হোক মা তাঁর নিজের এলাকা। একটা কথা তাঁর এলাকাতেও সত্যি বলে সবাই জানে। সেটা হল তিনি ওখানকার লোকদের জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে খাক করে রেখেছেন। ওখানে উনি ছাড়া আপনার আরও অনেক ক'ঘর দশরাত্রির জ্ঞাতি আছে। তাঁদের আপনাদের সঙ্গে বৈষয়িক শত্রুতা নেই। তাঁরা সব এসে কামান করবেন, খাবেন।

—আসবেন?

—আসবেন। হেসে নায়েব বলেছিল—আমি ওখানকার লোক, ব্রাহ্মণ, আপনাদের জ্ঞাতি নই—তবে আপনাদের জ্ঞাতিরা সবই আত্মীয় বন্ধু। আমি তাদের জানি। তা ছাড়া এতকাল জমিদারি সেরেস্তা চালালাম, কলকাঠি কিসে কোন প্যাঁচে নড়েচড়ে তাও জানি। কোন ভয় নেই চলুন। ক্রিয়া করতে হবে ভাল করে। সমারোহ করে। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের বিদায় করবেন মোটা করে। আর দরকার বুঝলে কোন কিছুতে একটা মোটা দান! বুঝলেন কালটা এখন আলাদা। এখন ঘোড়া হাতী পাল্কী পালঙ্ক দিয়ে দানসাগর থেকে কোন কিছুতে দান করলেই লোক খুশী। কিছুতে, ধরুন ইস্কুল কি ডিসপেন্সারি কি যাতে হোক হাজার পাঁচেক টাকা দান করুন—লোকে খুশী হয়ে যাবে। তাছাড়া ব্রাহ্মণদের মোটা ভোজন-দক্ষিণা। ছাঁদা। আর কাঙ্গালী বিদায়। খুড়োমশায় যত খেলুন সে খেলা চলবে না।

সুরেশ্বর বসে বসে অবাক হয়ে শুনছিল।

এই একুশ বছর বয়েসে তার চোখের উপর অনেক ওলোট-পালোট হল। ছেলেবেলা থেকে ইংরেজীনবীশ বাপের সঙ্গে ইংরেজীনবীশ হয়েই গড়ে উঠছিল। বাপ মদ খেয়েছে সে দেখেছে। মাকে নিয়ে খানা টেবিলে বসে খেয়েছে। বাপ তাকে গান-বাজনায় উৎসাহ দিয়েছেন। মন তার তৈরী হচ্ছিল—দেশী উনোনের উপর চড়ানো চাটুতে দেশী রুটির মত নয়, ইংরেজী অনুকরণে দেশী 'বেকারী'র তন্দুরিতে পাঁউরুটির মত। তারপর হঠাৎ একুশ সালে আধকাঁচা অবস্থায় অসহযোগ আন্দোলনের ওলোট-পালোটে চড়ে বসেছিল দেশী উনোনে চড়ানো চাটুর উপর। কিন্তু সেখানেও সে পুরো তৈরী হবার আগেই ইওরোপের

নতুন নতুন বাদের জোয়ারে দেশী উনোনের আগুন গেল নিভে। তবুও তার বাপের শেষ আচরণের জন্য কিছুকাল ওই গরম চাটুর উপরেই থাকতে চেয়েছিল। কিন্তু চাটু ঠাণ্ডা হয়ে গেল। সে এবার আবার এসে ঢুকল খাস ইওরোপীয় বেকারীতে, যেখানে মানুষের হাতের ছোঁয়াচও নিষিদ্ধ—সবই মেসিনে হয়। যাকে বলে মেসিন মেড ব্রেড।

তবুও বলতে কি, কীর্তিহাটের পিতৃপুরুষের রাজরাজেশ্বর এবং রাধাগোবিন্দের ভোগের জন্য যে পদ্মপাতার মত পাতলা এবং ওই আকারের রুটি তৈরী হয় তার প্রতি একটা গোপন প্রশংসা তার মনে মনে ছিল। ধর্ম ভগবান এ নিয়ে একটা সপ্রশংস কিন্তু উৎসাহহীন আকর্ষণ তাকে টানত। মেজ ঠাকুর্দার ধর্মজীবন সম্পর্কে সে অনেক কথা শুনেছে। ভাল লাগত। কিন্তু মেজ ঠাকুর্দার তিনটি বিয়ে তার ভাল লাগত না। মামলা মকর্দমার কথাও শুনত। সে খানিকটা মন্দ লাগত, খানিকটা আবার ভালও লাগত। বিশেষ করে মামলাবাজ জোতদার প্রজাদের সঙ্গে এবং বর্ধিষ্ণুপত্তনীদের এবং প্রতিবেশী জমিদারদের সঙ্গে কঠিন জেদে মামলা করে জেতার গল্পগুলি খুব ভাল লাগত। কিন্তু সেদিন নায়েবের মুখের কথাগুলি তার কপালে প্রশ্নের কয়েকটি কুঞ্চন-রেখা তুলে দিল। সেগুলি কীর্তিহাটে গিয়ে ত্রিপুণ্ড্রক-রেখার মত দাগ টেনে স্থায়ী হয়ে গেল।

৫

কীর্তিহাটের বাড়ী ছিল রায়দের ব্যক্তিগত সম্পত্তি। এবং তার এগার আনা অংশ ছিল দেবেশ্বর রায়ের ছেলেদের অর্থাৎ সুরেশ্বরের বাপ-জেঠার। ছোট ভাই রামেশ্বর সবই বিক্রী করেছিলেন ভাইদের কাছে। দেবেশ্বর তাঁকে সম্পত্তি পত্তনী-বিলি করতে সহজ অনুমতি দিয়েছিলেন, শিবেশ্বরের অনুমতি ছিল শর্তসাপেক্ষ। তিনি শর্ত দিয়েছিলেন সম্পত্তি পত্তনী বিলি করতে হলে ভাইদের করতে হবে। বাড়ী বিক্রী করতে পারবেন না। কিন্তু দেবেশ্বর রামেশ্বরের জন্য শিবেশ্বরের বিরোধিতা করেই একলাই বাড়ীর অংশ কিনেছিলেন। তাতে শিবেশ্বর আপত্তি করেন নি। তিনি জানতেন—রামেশ্বর বা দেবেশ্বর বা তাঁদের ছেলেরা কেউ এখানে বাস করতে আসবেন না। তাই ভাইদের যাঁরই হোক সবটাই তিনি ইচ্ছে মত ভোগদখল করতে পারবেন। বাড়ীটার নিজের নিজের অংশ এঁরা মেরামত করতেন—তালা বন্ধও করে যেতেন—শিবেশ্বর সে তালা খুলে, প্রয়োজন হ'লে ভেঙে ব্যবহার করতেন, না-করে তাঁর উপায়ও ছিল না। কারণ পুত্র তাঁর ছয়টি, কন্যা ছয়টি—তাদের সন্তানসন্ততি ছেলেদের তরফে সতেরো জন। মেয়েরা শ্বশুরবাড়ীতে থাকে—যখন আসে তখন কোলাহল সম্পর্কে নিজেই শিবেশ্বর বলেন—ওঃ, বিরাট রাজার উত্তর গোগৃহসম উথলিছে সমুদ্রের মত। এবং গালাগাল করতেন ছেলেদের এত সন্তান-সন্ততির জন্য। কথাবার্তায় তাঁর আবেগ রণরণ করত। ওটা যেন তাঁর স্বভাবধর্ম ছিল। এর সঙ্গে যোগ দিয়েছিল তাঁর থিয়েটারি অভ্যাস। প্রথম যৌবন থেকে তাঁর থিয়েটারে ছিল প্রবল আসক্তি। থিয়েটারে পার্ট ভাল করতেন। নায়ক সাজতেন। তাতেও আবেগের পার্ট হলে তিনি প্রায় মদমত্ত হস্তীর মত হয়ে উঠতেন।

সেই পারঙ্গমতা এবং স্বভাবগত আবেগবশে তিনি বলতে গেলে গোটা জীবনটাকেই নাটকের নায়কের ভূমিকা করে নিয়েছিলেন। ওই যে বলতেন—ওঃ বিরাট রাজার উত্তর গোগৃহসম উথলিছে সমুদ্রের মত।—ঠিক নাটকের ঢঙে বলতেন। নাটকীয় ভঙ্গি এবং ঢঙেই তিনি সুরেশ্বর এবং হেমলতাকে অভ্যর্থনা করলেন, যখন তাঁরা যোগেশ্বরের শ্রাদ্ধ উপলক্ষ্যে কীর্তিহাটে পৌছুলেন। নায়েব টেলিগ্রাম করেই নিশ্চিন্ত ছিলেন না—নিজে সঙ্গে সঙ্গে রওনা হয়ে কীর্তিহাটে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। কলকাতা থেকে কীর্তিহাট খুব বেশী দূর নয়; ট্রেনে পাঁচ ঘণ্টা লাগত তখন। শিবেশ্বরকে যোগেশ্বরের মৃত্যু-সংবাদ এবং সুরেশ্বর ও হেমলতা শ্রাদ্ধের জন্য এখানে আসছেন—সংবাদটা দিয়েই নায়েব আর উত্তরের অপেক্ষা করেনি—বেরিয়ে এসে দেবোত্তরের নায়েবের সঙ্গে গুটি কয়েক কথা বলে বেরিয়ে পড়েছিল গ্রামে। রায়বংশের দশরাত্রির জ্ঞাতি সাতপুরুষ উর্ধ্বে—কুড়ারাম ভট্টাচার্যের সহোদরদের বংশধর ভট্টাচার্যদের বাড়ী গিয়ে তাঁদের সঙ্গেও কথা বলে এসেছিল। ফিরে এসে আবার গিয়ে উপস্থিত হয়েছিল শিবেশ্বর রায়ের সামনে।

শিবেশ্বর বসে ছিলেন—একখানা মোটা দলিলের উপর হাত রেখে নিরাসক্ত মুক্ত পুরুষের মত। নায়েব গলার সাড়া দিয়ে ভিতরে এসে তক্তাপোশের একপ্রান্তে বসে বলেছিলেন—তা হ'লে—

—কিছু বলছ? যেন চমক ভেঙে প্রশ্ন করেছিলেন শিবেশ্বর।

—আজ্ঞে হ্যাঁ। আজকেই তো মা আসছেন, সুরেশ্বরবাবুকে নিয়ে—

বাধা দিয়ে শিবেশ্বর বলেছিলেন, টেলিগ্রাম করে দাও আসতে নিষেধ করে।

—নিষেধ করে দেব?

—হ্যাঁ।

—এমন আদেশ কেন করছেন?

—আদেশ আমার নয়, আদেশ এবংশের প্রতিষ্ঠাতা সোমেশ্বর রায়ের। এই তাঁর উইল—তারপর এটা হল স্বর্গীয় পিতা রত্নেশ্বর রায়ের। যারা স্বধর্মচ্যুত—বা ধর্মত্যাগী তাঁদের সঙ্গে সম্পর্ক রায়বাড়ীর নাই। তুমি তো জান!

সুরেশ্বরের নায়েব বলেছিল—তা আমাদের স্বর্গীয় বাবু তো ধর্মত্যাগ করেননি।

—আর ধর্মত্যাগ কাকে বলে?

—কাকে বলে—তা জানি না। তবে তিনি কোনদিন ধর্মত্যাগ করেননি।

—আমার মতে ও বিচারে করেছিলেন। আমি এ অশৌচ নেব না।

—তা নেবেন না।

—নিশ্চয়, ধর্মই সনাতন, তাকে ত্যাগ আমি করতে পারি না।

আলোচনাটা কতদূর অগ্রসর হ'ত কেউ বলতে পারে না, তবে এইখানেই হাত নড়ে গিয়ে বাক্যের মাঝখানেই একটা দাঁড়ি পড়ে যাওয়ার মত রায়বংশের ঊর্ধ্বতন সপ্তম পুরুষের জ্ঞাতি ভট্টাচার্যবংশের দুজন মাতব্বর ভট্টাচার্য এসে উপস্থিত হয়েছিলেন, একটা দাঁড়ি নয় দুটো দাঁড়ির মত। শিবেশ্বরেরই সমবয়সী।

—মধ্যম কত্তা রয়েছেন।

—কে? ও আপনারা! তা বেশ বেশ, এসেছেন ভালই হয়েছে। শুনেছেন তো যোগেশ্বর জার্মানীতে মারা গেছে। হাসপাতালে। জানেন তো সব, স্ত্রী-পুত্র ফেলে একটা ক্রীশ্চান মেয়েকে নিয়ে চলে গিয়েছিল ইয়োরোপ।

বার দুয়েক আক্ষেপের ভাব ও ভঙ্গিতে ঘাড় নেড়ে বলেছিলেন—স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম ভয়াবহ। পরিণাম দেখুন!

সঙ্গে সঙ্গে মুখ-চোখের ভাব পাল্টে গেল, দীপ্ত হয়ে উঠল, বললেন—আমার পুত্র হলেও আমি এমন পুত্রের মৃত্যুতে শোক-প্রকাশ করতাম না, অশৌচ গ্রহণ করতাম না! তাই বলছিলাম—হরচন্দ্রকে। হরচন্দ্র, কি বলে তুমি এলে বলতে যে সেই ধর্মত্যাগী যোগেশ্বরের কামান-শ্রাদ্ধ এখানে হবে? এখনও চন্দ্র, সূর্য উদিত হচ্ছে, হরচন্দ্র। এখনও ধর্মের অন্তত একপাদও অবশিষ্ট।

তারপরই উঠে দাঁড়িয়ে গোটা ঘরটা পায়চারি করে চিন্তিতভাবে ঘাড় হেঁট ক'রে পিছন দিকে কোমরের কাছে হাত দুটি মুঠিতে আবদ্ধ ক'রে মধ্যে মধ্যে ঘাড় নেড়ে নেড়ে বলেছিলেন—হয় না, হয় না। এ হতে পারে না···অসম্ভব!

হঠাৎ নাটকের নাটকীয় গতিকে রূঢ় ভাবে ভেঙে দিয়ে শিবেশ্বরের জ্ঞাতি কাকা মহেন্দ্র ভট্টাচার্য বলেছিলেন—আমরা কিন্তু অশৌচ গ্রহণ করব শিবেশ্বর।

শিবেশ্বর থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন—এবং নির্বাক হয়ে সবিস্ময় দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে ছিলেন। বাক্যস্ফূর্তি হয়নি।

মহেন্দ্রের সঙ্গী জগবন্ধু মহেন্দ্রের ভাইপো, সুতরাং শিবেশ্বরের জ্ঞাতিভাই। তিনি বলেছিলেন—এমন কথা আপনি বলবেন আমরা ভাবিনি।

—ভেবে দেখুন!

—দেখবার কিছু নাই বাপু শিবেশ্বর। ও সব আলোচনা না করাই ভাল। দেখ, কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে যাবে। থাক। আমরা সংবাদটা শুনে এসেছিলাম তোমার কাছে—আসতে হয়—তত্ত্ব-তল্লাস সামাজিক নিয়ম। আর—আর—নিয়মানুযায়ী অশৌচকালের মধ্যে যেমন আমাদের রাজ-রাজেশ্বরের অন্নপ্রসাদ বিধি আছে, তার ব্যবস্থামত এখনও সংবাদ পেলাম না কেন সেইটে জানতে। দেবোত্তরের নায়েবকে বলে এলাম। সে বললে—এখনও তো কত্তার হুকুম পাইনি, তবে আয়োজন আমি করছি—কিছুক্ষণ পরই কেউ গিয়ে ঘর ঘর বলে আসবে!

সোমেশ্বর রায় তাঁর দেবোত্তরের উইলে এই একটি ব্যবস্থা করে গেছেন। সেটা হল—তাঁর রায়বংশে এবং তাঁর পিতৃব্য দুজনের বংশের কারও মৃত্যু ঘটলে অশৌচের দশদিন তাঁরা রাজ-রাজেশ্বরের প্রসাদ পাবেন। অবশ্য যাঁরা ইচ্ছা করবেন। বলা বাহুল্য, এ ইচ্ছা এক যাদের বাড়ী বা পরিবারে মৃত্যু ঘটে তারা ছাড়া সকলেরই হয়। বাকী সকলেই এ প্রসাদ গ্রহণ করে থাকেন। কারণ অ-তৈল অ-সম্বরাব্যঞ্জন বা হবিষ্যান্নের পরিবর্তে দেবতার প্রসাদ বলে ঘৃত-তৈলসিক্ত ব্যঞ্জন কে না খেতে চায়? সুতরাং এটা প্রচলিত আছে। শিবেশ্বর

দেবোত্তরের ট্রাস্টি হিসেবে বেছে বেছে সাত পুরুষের বাইরে যারা তাদের বাদ দিয়েছেন। কিন্তু সাত পুরুষ পর্যন্ত এখনও ব্যবস্থা আছে। সেই নিয়মের কথা উল্লেখ করলেন মহেন্দ্র ভট্টাচার্য।

শিবেশ্বর তাঁকে কোন উত্তর দিলেন না। তিনি এক বিচিত্র স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন যোগেশ্বরের নায়েব বা ম্যানেজার হরচন্দ্রের দিকে।

হঠাৎ নিচে লোকজনের সাড়া উঠতেই হরচন্দ্র উঠে গিয়ে জানালায় দাঁড়িয়ে দেখে বললে—ও।

শিবেশ্বর তখনও তার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। হরচন্দ্র বললে—ঘরদোর পরিষ্কারের জন্য লোক পাঠাতে বলেছিলাম ঘোষালকে। এসে গিয়েছে দেখছি।

ঘোষাল এখানে দেবোত্তরের নায়েব।

শিবেশ্বর বললেন—হুঁ! তারপর বললেন—ঘরদোর পরিষ্কার করাবে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। ওঁরা তো এখানে সন্ধ্যেতেই পৌঁছুচ্ছেন!

আবার শিবেশ্বর বললেন—হুঁ। সঙ্গে সঙ্গে একটি দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল তাঁর। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলবার লোক তিনি নন, তাই পড়ল কথাটাই প্রযোজ্য।

হরচন্দ্র বললে—ওঁরা তো কলকাতার বাসিন্দে, ধরণ-ধারণ একটু পরিষ্কার-মরিষ্কার! ময়লা-টয়লা দেখতে পারেন না। তা ছাড়া রোগটোগকে ভয় করেন। গঙ্গাজলে ফিনাইল দিয়ে ধোবার হুকুম আছে।

কথাগুলি সাধারণ অর্থের অন্তরালে অনেক অর্থ ব্যক্ত করেছিল ইঙ্গিতে। সে ইঙ্গিত হল, যোগেশ্বরের তরফের যে ঘরগুলি শিবেশ্বরের পুত্রেরা দখল ক'রে বাস করছেন সেগুলি খালি ক'রে দিতে হবে। তারই একখানা ঘরেই কথা হচ্ছিল—শিবেশ্বর এই ঘরেই বৈঠকখানা করেন। তাঁর খাস বৈঠকখানা। এবং পাশের ঘর দুখানায় তাঁর কনিষ্ঠা গৃহিণী থাকেন।

যোগেশ্বর থেকে তাঁর বড় ভাই যজ্ঞেশ্বর কলিয়ারীর ব্যবসায়ে বেশী অর্থের মালিক হয়েছিলেন একসময়, তিনি কলকাতায়, কাশীতে, পুরীতে, দার্জিলিং-এ, শিমুলতলায় বাড়ী করেছিলেন, এখানকার বাড়ীও মেরামত তিনি করিয়ে রাখেন। কিন্তু যোগেশ্বর সায়েবী রুচির লোক ছিলেন, তিনি যেখানে গেছেন হোটেলে থেকেছেন, বাড়ী কোথাও করেননি। কিন্তু কলকাতার বাড়ী এবং কীর্তিহাটের বাড়ী মেরামত করিয়েছিলেন নিজের রুচি অনুযায়ী যথেষ্ট খরচ ক'রে। হেমলতাকে বিয়ে করবার ঠিক আগেই প্রথমবার। তখন তাঁর ইচ্ছে ছিল কীর্তিহাটে হানিমুন করবেন এবং তার পরেও মধ্যে মধ্যে আসবেন এখানে বিশ্রাম করবার জন্যে। কিন্তু তা কাজে পরিণত হয়নি। তবে কীর্তিহাটের বাড়ীর নূতন ঢঙ এবং রুচিকে তিনি বজায় রেখে এসেছিলেন নিয়মিত মেরামতে। এই যে-ঘর তিনখানা শিবেশ্বর এখন দখল ক'রে আছেন এ তিনখানা, যোগেশ্বর যতদিন দেশে ছিলেন অর্থাৎ চন্দ্রিকাকে নিয়ে ইয়োরোপ চলে যাবার পূর্ব পর্যন্ত, বন্ধই থাকত, শিবেশ্বরও জবর-দখল করতে সাহস পাননি। তিনি ইয়োরোপ চলে যাবার পর থেকে তিনি দখলে এনেছেন। নায়েব হরচন্দ্র নীচের লোকজনের সাড়ার দিকে তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করে তাঁকে ইঙ্গিতে জানালো, ঘরগুলোকে হিন্দু মতে

গঙ্গাজলের সঙ্গে সায়েবী বা বিজ্ঞানসম্মত মতে ফিনাইল মিশিয়ে শুদ্ধ এবং ডিসইনফেকট ক'রে নিতে হবে।

মুখের দিকে তাকিয়েই ছিলেন শিবেশ্বর। তাঁর মুখখানা একবার রূঢ় কঠোর হচ্ছিল, তারপরেই আবার অসহায়ভাবে করুণ হয়ে উঠছিল। সব থেকে লজ্জা পাচ্ছিলেন জ্ঞাতিখুড়ো মহেন্দ্র ভট্টাচার্য এবং ভাই জগবন্ধু ভট্টাচার্যের উপস্থিতিতে।

হরচন্দ্র জানালার কাছে গিয়ে বললে—দাঁড়া দাঁড়া যাচ্ছি। তারপর শিবেশ্বরের দিকে তাকালে। তার অর্থ অত্যন্ত স্পষ্ট।

শিবেশ্বর মহেন্দ্র ভট্টাচার্যদের দিকে এবার ফিরে তাকিয়ে বললেন—নায়েব ঘোষাল যখন আয়োজন করব, লোক পাঠাব বলেছে তখন লোক যাবে মহেন্দ্রকাকা। আর এ তো জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর কারুর মৃত্যুতে অশৌচ নয়, এ যোগেশ্বর—রায়বংশের তিন শরিকের এক শরিক। তার মৃত্যুতে অশৌচ—এ বলতে হবে কেন?

মহেন্দ্র বললেন—হ্যাঁ। সেই তো কথা। কিন্তু পুকুরে দেখলাম জাল পড়ছে। মাছ ধরছে তোমাদের বাড়ীর জন্যে। তোমার নাতিরা কজন বসে আছে। বলে—

—কি বলে? কেড়ে নিলেন কথাটা শিবেশ্বর। তারপর বিস্ফোরকের মত ফেটে পড়লেন—হ্যাঁ, বড় ছেলে আমার ধুয়ো তুলেছে বটে। দাদা তো একটা ক্রীশ্চান মেয়ে নিয়ে ইউরোপ গিয়ে ক্রীশ্চান হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে অশৌচ কেন নেব আমরা? এ দলিলপত্র সে-ই তো বের করে দেখতে চাইলে! আমি দেখছিলাম। কিন্তু মাছ ধরাচ্ছে খাবে বলে এ তো জানিনে! অপগণ্ড আর কাকে বলে? মদ্য পান ক'রে সিঁদুরের ফোঁটা কপালে এঁকে তান্ত্রিক! তুমি যাও মহেন্দ্রকাকা, ম্যানেজার ঘোষালকে একবার পাঠিয়ে দিয়ে যাও!

মহেন্দ্র ভট্টাচার্য এবং জগবন্ধু ভট্টাচার্য চলে গেলেন।

শিবেশ্বর বললেন—হরচন্দ্র!

—আজ্ঞে বলুন বাবু।

—আমি হেরে গেলাম।

—আজ্ঞে না বাবু! আপনি হারতে পারেন, না, আপনাকে কেউ হারাতে পারে? আপনি জিতলেন। আপনার ভাইপো—।

কথাতে কানই দিলেন না শিবেশ্বর, বললেন—দেখ, কথায় আছে পরভাতি হই সেও ভাল তবু পরঘরি না হই। ওঃ! ভুল হয়ে গিয়েছিল আমার। অর্থাৎ নিজের অংশের বাড়ী মেরামত না করিয়ে ভাইপোদের বাড়ী দখল করে থেকে।

হরচন্দ্র অকারণে ব্যস্ত হয়ে উঠে বললে—আমি যাই বাবু। ওই বিবি-মহলটা বরং সাফ করিয়ে নিই। ওখানেই ওঁরা উঠবেন। বেশ নিরিবিলি থাকবেন। পাঁচজনের গোলমাল থাকবে না। সেই ভাল হবে।

রায়দের বাড়ী প্রকাণ্ড। ইমারত অনেক। প্রথম পুরুষ সোমেশ্বরকে সামনে রেখে তাঁর বাপ কুড়ারাম ভট্টাচার্য প্রথম একখানা চকমিলান দালান তৈরী করিয়েছিলেন। তারপর তার সামনে তৈরী করিয়েছিলেন কালীবাড়ী, নাট-মন্দির, কাছারী। তারপর সোমেশ্বর তৈরী করিয়েছিলেন

পিছন দিকে আর এক মহল, সেটা করেছিলেন তাঁর কন্যা-জামাতার জন্যে। তাঁর পুত্র বীরেশ্বর। তিনি করিয়েছিলেন মূল বাড়ী থেকে পৃথক করে একটু সরে এসে একেবারে কংসাবতীর ধারে, কিনারায় পোস্তা বেঁধে ছোট একটি সুন্দর বাড়ী। কিছুটা দোতলা কিছুটা একতলা। এই বাড়ীতে তিনি বিবাহের পর বাস করতেন স্ত্রীকে নিয়ে। তিনি ছিলেন সাহেবী মেজাজের লোক। তারপর স্ত্রীকে ত্যাগ করে তাকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দিয়ে বাস করতেন এক কলকাতার বাঈকে নিয়ে। লোকে বলত বিবি। সেই নামে বাড়ীটারও নাম হয়ে গিয়েছিল বিবি-মহল। তারপর তার পরবর্তী পুরুষ রত্নেশ্বর—বীরেশ্বর রায়ের ভাগ্নে এবং পোষ্যপুত্র—তিনি করিয়েছিলেন অন্দরের দু'মহলের সঙ্গে যোগ করে আর এক মহল। তাঁর তিন ছেলে, তিন ছেলের জন্য হিসেব করে তিন মহল সম্পূর্ণ করেছিলেন। তাঁর আমলে বিবি-মহল হয়েছিল সাহেব-মহল—তারপর নাম হয়েছিল গেস্ট-হাউস। পরবর্তীকালে দেবেশ্বর কিনেছিলেন এ বাড়ী দুই ভাইয়ের কাছ থেকে।

মহলটার দুর্নাম ছিল। মহলটায় নাকি দুর্ভাগ্যের বোঝা অদৃশ্যভাবে পুঞ্জীভূত হয়ে আছে। সুতরাং ইংরেজী উনিশশো সাল পড়ি-পড়ি সময়টায় শিবেশ্বরের মত লোক সানন্দেই বিক্রী করেছিলেন এবং রামেশ্বর ব্যারিস্টারি পড়তে যাবার সময় ওটার অংশ দাদাকে বেচে-ছিলেন অর্থের জন্য। দেবেশ্বরের বড় ছেলে যজ্ঞেশ্বর কলিয়ারী নিয়েছিলেন এবং দেবতা ধর্ম—এর প্রতি আসক্তি এবং বিশ্বাস যতই যুগধর্মে দুর্বল হোক ব্যবসার লাভ লোকসানের খাতিরে গ্রহ মানতেন—প্রবাল, গোমেদ, নীলাতে যথেষ্ট বিশ্বাস করতেন। তা ছাড়াও কোন সম্পত্তি বা কোন জিনিসের পয়-অপয় মানতেন। ইংরেজীনবীশ যোগেশ্বর সেটা মানতেন না। তাই মূল বাড়ীর অংশ কম নিয়ে তিনি এই বিবি-মহল নিতে আপত্তি করেননি। এই বিবি-মহলেই দেবেশ্বরের মৃত্যুর কারণ ঘটেছিল। কারণটা কি তা কেউ সঠিক জানে না, তবে দেবেশ্বর অজ্ঞান হয়ে পড়েন। তারপর জ্ঞান হয়ে তিনি নিজেই প্রায় উন্মত্ত বিভ্রান্তের মত ওখান থেকে বেরিয়ে এসে পড়েছিলেন ঠাকুরবাড়ীতে। সেইখানেই তাঁর মৃত্যু ঘটে। আরও কিছু অপ্রিয় ঘটনার স্মৃতি এর সঙ্গে জড়িত।

যোগেশ্বর যখন হেমলতাকে নিয়ে এখানে প্রথম আসেন তখন ইচ্ছা ছিল এই বাড়ীতে উঠবেন। কিন্তু স্টেশনে নেমে কেমন পরিবর্তন ঘটেছিল যোগেশ্বরের। তিনি ভিতর-বাড়ীতে এই ঘর কখানাতেই বাস করেছিলেন কয়েক দিন।

তিন মহল রায়বাড়ীতে উপরে-নীচে প্রত্যেক মহলে বারোখানা হিসেবে ছত্রিশখানা ঘর। দেবেশ্বর ছোট ভাই রামেশ্বরের অংশ কিনেছিলেন বলে তাঁর অংশে ছিল চব্বিশখানা ঘর দুটো মহলে মিলিয়ে। প্রায় ষাট-সত্তর বছর আগের তৈরী বাড়ী—তার নীচের তলাগুলি স্যাঁতস্যাঁতে হয়ে উঠেছে। সে মেরামত সত্ত্বেও হয়েছে। এবং আগের আমলে এগুলিতে ছিল লক্ষ্মীর ঘর, ভাঁড়ার। তাছাড়া তরকারীর ঘর, পান সাজার ঘর, কাপড়-চোপড়ের ঘর, সূতিকাগৃহ, খাবার ঘর, চাকর-ঝিদের বাসের ঘর। শুধু লক্ষ্মীর ঘরের সামনে বড় দরদালানটি ছিল দিনের ভাগে অন্দরবাসিনীদের ব্যবহারের স্থান। সুতরাং এখন শিবেশ্বরকে যোগেশ্বরের অন্দর-মহলের শ্রেষ্ঠ ঘর তিনখানি ছেড়ে দিয়ে ওই বিবি-মহল ছাড়া

থাকবার যোগ্য স্থান আর ছিল না। অন্ততঃ এমন আরামদায়ক আর কোন ঘর যোগেশ্বরের অংশে ছিল না।

হরচন্দ্র সেই বিবি-মহলেই সুরেশ্বর এবং হেমলতার বসবাসের ব্যবস্থা করেছিল। সেইখানেই উঠেছিল সুরেশ্বর হেমলতার সঙ্গে।

৬

বিবি-মহলের দুর্নাম যাই থাক সে তার অবস্থান-গুণে গঠন-সৌন্দর্যে, কিন্তু বিবির মতই মনোহারিণী ছিল। এদেশে ইংরেজদের প্রথম আমলের কুঠীবাড়ীর মত সামনে গোল থাম-ওয়ালা বারান্দা ঘেরা দোতলা বাড়ী। তারও সামনে প্রশস্ত গাড়ীবারান্দার উপর ছিল বসবার বা আসর পাতবার জায়গা। চারিদিকে আলসেয় ঘেরা। তার মধ্যে মধ্যে জোড়া গোল থাম। থামের উপর দিকে শৌখীন কাঠের ঝিলিমিলি, তার উপর পাকা ছাদ। গাড়ী-বারান্দার পরই গোল থাম ঘেরা বারান্দা। তারপরই বড় হল। এই হলকে ঘিরে তিন দিকে তিনখানা ঘর। পশ্চিমে, দক্ষিণে, উত্তরে। এর ফলে প্রতি ঘরেই তিন দিক ছিল অবারিত। শুধু কোলে কোলে টানা বারান্দা ছিল লোহার রেলিং ঘেরা। তাতে আলো-বাতাস বা সামনের দিগন্ত অবরোধ করেনি। গোটা বাড়ীখানা ছিল পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা, দক্ষিণ গায়ে কংসাবতী নদী। কংসাবতীর কিনারায় পোস্তা বাঁধিয়ে বাড়ীখানা তৈরী করা হয়েছিল। সদরে ওই গাড়ীবারান্দার দক্ষিণ গায়ে বাঁধানো ঘাট। আগে ওইখানে প্রকাণ্ড একটা দহ ছিল। পশ্চিম দিকে কংসাবতীর কূলে ঘন জঙ্গল একেবারে বাড়ীর প্রান্ত থেকে শুরু হয়েছে। কংসাবতীর ওপারেও জঙ্গল।

সুরেশ্বর মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল এখানে এসে।

সব থেকে ভাল লেগেছিল দক্ষিণ দিক। নিচেই কংসাবতী নদী, তার ওপারে ঘন জঙ্গল। ওই জঙ্গলের মধ্যে ছিল এক সিদ্ধ শক্তিপীঠ। একটা বিশাল শিমূল গাছ সকলের উপরে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে ছিল। আর তারই খানিকটা দূরে ওই কংসাবতীর বন্যার সীমা-রেখার ঠিক প্রান্তেই একখানি বিচিত্র গ্রাম। যেদিন রাত্রে সে এসেছিল সেদিন ছিল শুক্ল পক্ষের নবমী বা দশমী। জ্যোৎস্নার আবছা আলোর মধ্যে সে শিমুল গাছটার পত্রহীন শাখাগুলিকে আকাশের গায়ে ছবির মত দেখতে পেয়েছিল। নীল পটভূমিতে কালো রঙে এঁকে রেখেছে কোন শিল্পী। আর দেখতে পেয়েছিল ওই গ্রামখানায় এখানে-ওখানে জ্বলন্ত আলোকবিন্দু। বাড়ীর নীচেই চৈত্রের কংসাবতীর স্বল্প জলস্রোতে চাঁদের প্রতিবিম্ব, জ্যোৎস্নার ছটা বহুদূর পর্যন্ত একটা গলিত রূপোর স্রোতের মত মনে হচ্ছিল, তারপর সেটা কালো কৃষ্ণাভায় ঢাকা পড়ে গেছে।

এসেছিলেন অনেকে দেখা করতে। জ্ঞাতি ভট্টাচার্যেরা, দেবোত্তরের কর্মচারীরা, ইস্কুলের হেডমাস্টার, গ্রামের লোক অনেকে এসেছিলেন. রায়বাড়ীর জ্ঞাতিদের মধ্যে এখানে সকলেই শিবেশ্বরের বংশাবলী। তাদের মধ্যে শিবেশ্বরের ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম অর্থাৎ

ছোটগুলি—কমলেশ্বর, বিমলেশ্বর, অতুলেশ্বর এসেছিল, তার সঙ্গে ছিল ধনেশ্বরের বড় ছেলে। সে সুরেশ্বরের থেকে বয়সে বড়। বেশ শৌখীন লোক। চেহারাটি ভাল। নাম ব্রজেশ্বর। সুরেশ্বরের সঙ্গে ঠিকাদারী করে। খোঁয়াড় ডাকে। তারা তরুণ। কমল, বিমল সুরেশ্বরের সমবয়সী, অতুলেশ্বর বয়সে ছোট। আরও এসেছিল পরবর্তী পুরুষের প্রায় সকলেই। ছোটদের মধ্যে রায়বংশের কোন ছাপ জ্যোৎস্নার মধ্যে সে দেখতে পায়নি। পোশাক-পরিচ্ছদ শুধু অপর্যাপ্তই নয়, অপরিচ্ছন্নও বটে। কয়েকটা পাঁচ-ছ বছরের ছেলে উলঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে হি-হি করে হাসছিল। ওই হাসি দেখে তার এত কুৎসিত মনে হয়েছিল যে সে কোন মতেই ভাবতে পারেনি যে এরা তারই নিকট জ্ঞাতি খুড়তুতো ভাই। মন তার ছোটই হোক আর বড়ই হোক, মন বিদ্রোহ করে বলেছিল, না, এদের আত্মীয় আপনজন-একরক্ত এ স্বীকার করতে কষ্ট হচ্ছে, ঘৃণা হচ্ছে।

এরই মধ্যে হ্যারিকেন হাতে একটি ব্রাত্যশ্রেণীর মেয়ের পিছনে পরিচ্ছন্ন লালপাড় শাড়ীপরা এক অল্পবয়সী মহিলা এসে দাঁড়িয়েছিলেন ভিড়ের ওপাশে।

ঝিটা বলেছিল—পথ দাও ক্যানে গো! মেজ-মা এয়েছেন। দেখছ না?

সকলে সম্ভ্রমভরে পথ করে দিয়েছিল।

মহিলাটি ভিতরে চলে গিয়েছিলেন তার মা হেমলতার কাছে। কিছুক্ষণ পরই সুরেশ্বরের কলকাতার চাকর রঘুয়া এসে তাকে ডেকেছিল—মা ডাকছেন ভিতরে।

নায়েব সুরেশ্বরের কাছেই ছিল, সে বলেছিল—যাও, মেজ-মা এসেছেন, তিনিই ডাকছেন। কথা তাই বটে; সুরেশ্বর ভিতরে গিয়ে দেখেছিল তার মায়ের পাশেই তাদেরই একখানা রাগ-জাতীয় কম্বলের উপর সেই লালপাড় শাড়ী-পরা মেয়েটি বসে আছেন।

হাজাকের বাতি জ্বলছিল। উজ্জ্বল আলো। মহিলাটির মাথায় চুলের সামান্য অংশ বের করে ঘোমটাটি তোলা, লাল পাড়ের বেড়ের মধ্যে মুখখানি আশ্চর্য শান্ত, প্রসন্ন এবং মিষ্টি। বয়স তাঁর হেমলতার থেকে পাঁচ-সাত বছর কমই হবে। টকটকে রঙ, সুন্দর দুটি চোখ, নাকটি একটু খাটো কিন্তু তাতেই তাঁর রূপ যেন বেড়ে গেছে।

মা বলেছিলেন—মেজ-খুড়ীমা। তোকে দেখতে চাচ্ছিলেন।

সে অবাক হয়ে গিয়েছিল, এই তার মেজ-ঠাকুর্দার স্ত্রী! মেজ-ঠাকুর্দার বয়স তো সত্তরের কাছে!

তিনি বলেছিলেন—বস ভাই নাতি, বস। আমি তোমার ঠাকুমা, তুমি নাতি। সুরেশ্বর তাড়াতাড়ি প্রণাম করতে গিয়েছিল, কিন্তু তিনি তার হাতখানা ধরে ফেলে বলেছিলেন—না ভাই, অশৌচের সময় প্রণাম করতে নেই। বস। বস, এই কাছে বস। তোমাকে দেখি। তুমি বড় সুন্দর হে! বলে তার চিবুকে হাত দিলেন।

লজ্জা সুরেশ্বর পায় না। সে সুন্দর ঐ কথাটা সে নিজেই জানে। তার উপর লোকের মুগ্ধ দৃষ্টি এ কথা তাকে নীরবে বার বার জানায়। কিন্তু এই অল্পবয়সী সুন্দরী মেয়েটি তার চিবুক ধরে এমন করে বলায় সে লজ্জা পেয়েছিল।

তিনি বলেছিলেন—তা হবে না কেন? ভাশুরপো যোগেশ্বর যেমন সুপুরুষ ছিলেন, বউমার

তেমনি রূপ, তাদের গোপালের এমন রূপ হবে না তো হবে কার ?

হেমলতা একটু বিষণ্ণ হেসেছিলেন। হয়তো তাঁর রূপের ব্যর্থতার কথাই তার মনে হয়েছিল।

তিনি বলেছিলেন—দুঃখ পেলে বউমা ? তা এ বাড়ীর বউ হলেই তাকে দুঃখু পেতে হয়। বলে আশ্চর্য হাসি হেসেছিলেন।

হেমলতা বললেন—না খুড়ীমা, দোষ আমি এ বংশকে দেব না। তাকে আমার থেকে ভাল কেউ জানে না। এমন কি এখান থেকে চলে গিয়ে দুখানা চিঠি তিনি লিখেছিলেন, তাতে তিনি একটি কথা গোপন করেননি। যা করেছেন তা তিনি অন্যায় করেছেন তাও আমি বলতে পারব না। দোষ আমার ভাগ্যের। একেবারে আমার ভাগ্যের। সুরোর পর ছেলে হয়ে মরতেই বসেছিলাম, মরাই ভাল ছিল, কিন্তু বাঁচলাম। সে ওই নামেই বাঁচলাম।

—শুনেছি বউমা। থাক ওসব কথা। এখন আমি যার জন্যে এসেছি, তাই কর। সুরেশ্বরকে আমার সঙ্গেই পাঠিয়ে দাও। মেজ কর্তার কাছে ওর এসে-এসে যাওয়াই ভাল, খুঁত যেন ধরতে না পারেন। তোমার নায়েবের খুব বুদ্ধি, প্রথম প্যাঁচেই কর্তাকে বসিয়ে দিয়েছে। কিন্তু তারপরও উনি বড় ছেলের সঙ্গে গজগজ করেছেন। তার উপর শুনলাম মেজ তরফের নিচের তলা থেকে সব কাল ঝাড়াই-মোছাই হবে। মানে দরকার হলে ওই বাড়ীতেই চলে যাবেন তোমাদের অংশ খালি করে দিয়ে। মতলব ভাল নয়। সুরেশ্বরের এখুনি যাওয়াই ভাল।

একটু—মাত্র কয়েকটা মুহূর্ত - চুপ করে থেকে আবার বললেন—দেখ, মানুষটার মধ্যে এখনও একটা ভালমানুষ আছে। আমি তো দেখছি। হয়তো আসলে মানুষটা ভালই। বড় বাপের ছেলে, আমার শ্বশুর শুনেছি দেবতুল্য মানুষ ছিলেন। ধার্মিক চরিত্রবান। লোকে এখনও বলে আগুনে কালি আছে, তাঁর মধ্যে কালি ছিল না। ইনিও লেখাপড়া শিখে-ছিলেন, এফ-এ পাশ। প্রথম জীবন থেকে গোঁড়া ধার্মিক। গীতা ভাগবত কণ্ঠস্থ। আজও পড়েন। কিন্তু মা, বড়লোকের ছেলে জমিদারী জেদে মামলা করা ছাড়তে পারলেন না আর। একটু হেসে বললেন—সুরেশ্বর রয়েছে, বলতে লজ্জা করছে, ওই পরিবার বাতিক। মা, আমার বিয়ে হয়েছে তের বছর। এই তের বছরে একবার আমার বাবার মৃত্যু হলে শ্রাদ্ধে গিয়েছিলাম। বাস, আর যাইনি। শুনেছি আমার বড় সতীন—ওঁর প্রথম পরিবার —পনের বছর বেঁচে ছিলেন, দশটি সন্তান হয়েছিল, সাতটি বেঁচেছে তিনটি মরেছে। তিনি মারা যাওয়ার এক মাসের মধ্যে আবার বিয়ে করেছিলেন। দ্বিতীয় সতীন কুড়ি বছর বেঁচে ছিলেন। তাঁর ছেলে-মেয়েতে ছটি, তার পাঁচটি বেঁচে। তিনি গেলেন, ওঁর তখন চুয়ান্ন বছর বয়স। সেই বয়সে টোপর চেলি পরে আমাকে বেনারসী চাদরে গলায় বেঁধে এনে ঘর বাঁধলেন। আমার একটা ভাগ্য আছে মা, ভগবানকে প্রণাম করি আর বলি, রক্ষে করেছ তুমি আমাকে। বাঁচিয়েছ। আমাকে সন্তান দাওনি। এতেই দুই পরিবারের ছেলেমেয়েতে বারোটি, ছয় মেয়ে ছয় ছেলে। এর উপর আমার গণ্ডাখানেক হলে ষোলকলায় পুন্নিমে হত

মা। নাতি-নাতনীতে সতেরোটা। ওদের পেট ভরাতে বিষয় যেতে যেতে অভাবে স্বভাব মন্দ যাকে বলে তাই হ'ল। মধ্যে মধ্যে আপশোষ করেন। ভালোমানুষটা জাগে। কিন্তু কি করবেন? বড় বড় নাতিগুলো থেকে ছেলেরা একধার থেকে দায়ী করে ওঁকে। বলে—; সে জঘন্য কথা মা। সুরেশ্বরের সামনে বলতে বাধছে।

সুরেশ্বর উঠে গিয়েছিল। যেতে যেতেই শুনতে পেয়েছিল, মেজঠাকুমা বলছেন—বড় ছেলে বলে কি জান? বলে—ছয় পুত্র সন্তান থাকতে বিয়ে করেছিলেন, কেন করেছিলেন? যদি বিয়ে না করে না থাকতেই পেরেছিলেন তবে একটা রক্ষিতা রাখলেই পারতেন। একটা দুটো যটা ইচ্ছে। তবে সত্যি কথা বলব মা, ওই মামলা-মকদ্দমার নেশা, ও ওঁর গাঁজার নেশার চেয়েও বেশী। জ্বরজারি হলে গাঁজা খান না, ভাল লাগে না, কিন্তু মামলা-মকদ্দমার খোঁজ তার মধ্যেও না করে পারেন না। ওটা তো হিংসের কাজ, এ তো অস্বীকার করলে চলবে না! আর নারী ধ্যান-জ্ঞান এই বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত, এই বা অস্বীকার করি কি করে?

হেমলতা বেশ বিস্ময়ের সঙ্গেই শুনছিলেন এই গ্রাম্য মেয়েটির কথা। মেয়েটি রায়বংশের বৃদ্ধের তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী হয়েছে নিতান্তই দুর্ভাগ্যবশে। খুবই দরিদ্রের মেয়ে, সম্ভবতঃ এমন দরিদ্র যে কন্যার বিবাহে সামান্য কিছু খরচ করবারও সঙ্গতি ছিল না, থাকলে এমন রূপসী মেয়ের বিয়ে একটা হয়ে যেতো। হয়তো বা জমিতে-জেরাতে কিছু পরোক্ষ মূল্য নিয়ে বিক্রীই করেছে। সেই মেয়ে এমন কথাবার্তা কইছে, সেটা তাঁকে কিছুখানি বিস্মিত করছে বইকি। সব থেকে আশ্চর্য লাগছে কথাগুলির মধ্যে ক্ষোভ নেই, বেদনা কিছুটা আছে, কিন্তু অপ্রসন্ন নয়। এবং বিচার আছে। এবং একটি ন্যায়বোধও রয়েছে।

মেজগিন্নীর হঠাৎ চোখে পড়ল হেমলতার বিস্মিত দৃষ্টি। তিনি কথা বলছিলেন হেমলতার চোখে চোখ রেখে বা মুখের দিকে তাকিয়েও নয়। তাঁর দৃষ্টি অধিকাংশ সময়েই তিনি নিবদ্ধ রেখেছিলেন তাঁর কোলের উপর পড়ে থাকা নিজের হাত দুখানির উপর। নিটোল দুখানি গৌর-বর্ণ হাতে শুধু দুগাছি শুভ্রবর্ণ শাখা ছাড়া কোন অলঙ্কার ছিল না। দু-একবার চোখ তুলে অনেকটা অন্যমনস্কের মত খোলা জানালাটা দিয়ে বাইরের রাত্রির বায়ুমণ্ডল বা আকাশের দিকে দৃষ্টি তুলে সেই দিকেই তাকিয়ে থেকেছেন। এতক্ষণে হেমলতার চোখে চোখ পড়তেই লজ্জিত হয়ে পড়লেন। বললেন—আমি তো মুখ্যু মেয়ে, গরীবের মেয়ে, যা মনে হয় তাই বললাম। কিন্তু কিছু অন্যায় বললাম মা?

হেমলতা বললেন—না খুড়ীমা। সেই তো আমি অবাক হয়ে শুনছিলাম মা।

মেজগিন্নী বলেছিলেন—গরীব ঘরের মেয়ে, বাপ ছিলেন এঁদের বাড়ীর পুজুরী। চালকলা বাঁধা বামুন। কিন্তু ধর্মভীরু ছিলেন। তিনি বেঁচে থাকলে এ বিয়ে হ'ত না। বাবা মারা গেলেন, নিজের মা ছিল না! দেড় বছরের রেখে মা মরেছিলেন। সৎমা বিধবা হলেন, তখন বয়স আমার চৌদ্দ। গাঁয়ে ঘরে বিয়ের কাল পেরিয়েছে, গলায় কাঁটা লাগার মত লেগেছি। মেজকর্তা লোক পাঠালেন। পাঁচ বিঘে জমি দেবেন ভাইদের। বিয়ে হয়ে গেল। আমিও বাঁচলাম। লোকে বললে শিবের মত স্বামী হল। আমিও তাই ভাবলাম। বাপের কাছে শেখা পাপপুণ্য বোধ

ছিল। মেজকর্তাও তখন এমন ছিলেন না। তখনও থিয়েটার করতেন। ঘরে নাটক পড়তেন। তাঁর থেকে অনেক শিখলাম মা। কিন্তু যাঁর কাছে শিখলাম, অভাবে স্বভাব নষ্ট হয়ে সে-ই সব ভুলে গেল।

হেমলতা বললেন—ভারী ভাল লাগল মা আপনাকে!

খুশী হয়ে মেজগিন্নী বলেন—জান মা, কাল খবর পেয়ে অবধি কতবার মনে মনে বলেছি যোগেশ্বর ভাশুরপো না গিয়ে যদি ইনি যেতেন! আমি যদি বিধবা হতাম! কত দাম তার জীবনের, কত নাম! আর ইনিও দারিদ্র্য-দুঃখ থেকে রেহাই পেতেন!

—ও কথা বলে না খুড়ীমা। উনি বাঁচুন, অনেকদিন বেঁচে থাকুন। ওঁর দুঃখ ঘুচুক? ছেলেরা কাজ-কর্ম করুক—

—ছেলেরা? মা, বড় সতীনের ছেলেরাও তো বুড়ো হয়ে এল বলতে গেলে। বড় ধনেশ্বরের বয়স যোগেশ্বর ভাশুরপোর প্রায় সমান। ছেলেরাই সব উপযুক্ত। বড় ছেলে ব্রজেশ্বর, সুরেশ্বরের থেকে বড়। ধনেশ্বর সিঁদুরের ফোঁটা পরে, কালীমন্দিরে কালী-কালী করে, মদ খায়। লোককে শাসন করে বেড়ায়। ভাবে সেই আমলই বুঝি আছে। ধর্মের ষাঁড়কেও যে আজ-কালকার আইনে খোঁয়াড়ে দেওয়া যায় তা ভুলে যায়। সেজছেলে সুখেশ্বর একটু উপযুক্ত। এখানে ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট। দু-চার টাকা এদিক-ওদিক থেকে রোজগার করে, তা নিজের কুলোয় না বাপ-ভাইকে কি দেবে? কত আর বলব মা, সব ছেলেই অপগণ্ড। দ্বিতীয় পক্ষের বড় ছেলে কমল—কমলেশ্বর বাপকে নেশার পয়সার জন্যে মধ্যে মধ্যে বলে—নেশার পয়সা দিতে পার না বাপ হয়েছিলে কেন? জন্ম দিয়েছিলে কেন? গাঁজা খায়। ছোট ছেলেটা অতুলেশ্বর একটু ভাল। লেখাপড়া করছে। তাও স্বদেশী বাতিক। বন্দেমাতরম করে বেড়ায়। নাতিগুলোও তাই! ওঁর কষ্ট দেখি আর ভাবি আরও কত কষ্ট উনি পাবেন! মধ্যে মধ্যে এমন কাণ্ড ঘটে বড় ছেলের বড়ছেলে আর অতুলের বড় বিমলকে নিয়ে, আর মেজ ছেলে জগদীশ্বরকে নিয়ে যে উনিও বলেন—হে গোবিন্দ, মৃত্যু দাও! পরিত্রাণ কর! অথচ মৃত্যুকে ওঁর বড় ভয়।

—কেন? কি করে? ওঁকে মারেটারে নাকি?

—না-না। সে সাধ্যি নাই। সে ভয় করে। উনি এখনও সব নিজের হাতে রেখেছেন তো! বন্ধ করে দেবেন সব! যা করে সে কেলেঙ্কারী। এখানে ছোটজাতের মেয়েদের নিয়ে—বিশেষ করে ওই নদীর ওপারে গোয়ানপাড়া ব'লে একটা ক্রিশ্চানপাড়া আছে, তাদের মেয়েগুলো খারাপও বটে, তাদের নিয়ে কেলেঙ্কারী করে। ওদের পুরুষ জাতটা আবার আমাদের ছোটজাতের মত নয়—তারা সব চোখোল-মুখোল, বদমাস, গুণ্ডা, তারা আসে মারমুখী হয়ে! ওঁকে তার ঝাপটা সইতে হয়। এক-একদিন বলেন—মেজবউ, আমার অজান্তে আমার ক্ষীর কি সন্দেশে বিষ মিশিয়ে দিতে পার? আর বাঁচতে আমি পারছিনে, চাইনে। কিন্তু জেনে, নিজে উদ্যোগ করে মরবার মত সাহস আমার নেই। মরণকে আমার বড় ভয়। জান, বি-এ পরীক্ষার সময় কলকাতায় প্লেগের হুজুগ হয়েছিল, কলকাতায় প্লেগ এসেছে। আমি পালিয়ে এসেছিলাম পরীক্ষা না দিয়ে। বাড়ীতে কেউ পাঁচবার দাস্ত করলে গাঁজা খাই। ঘর বন্ধ করে বসে থাকি।

কিন্তু এ যন্ত্রণা যে আর সহ্য হচ্ছে না।

আবার কয়েক মুহূর্ত পরে বললেন—আগে শুনেছি দয়া ছিল মায়া ছিল। কেউ মারা গেলে হাউহাউ ক'রে কাঁদতেন—বটঠাকুর মানে তোমার শ্বশুর, ঠাকুরপো মানে ওঁর ছোট ভাই, বন্দুকে পাখী মারতেন, উনি কাঁদতেন। মিথ্যে কথা বলতেন না। সেই মানুষ ওই দুটো দোষে কি হয়ে গিয়েছে!

একটা দীর্ঘনিশ্বাস তিনিও ফেললেন, হেমলতাও ফেললেন। হেমলতা কোন উত্তর দিতে পারলেন না। কি উত্তর দেবেন? একটু নিস্তব্ধ হয়ে রইল ঘরখানা। তারপরই মেজগিন্নী বললেন—তাহ'লে উঠি বউমা। তুমি সুরেশ্বরকে আমার সঙ্গে পাঠিয়ে দাও। ও একবার কাছে বসে মিষ্টি ক'রে বলুক, ঠাকুর্দা, আমার তো অভিভাবক আপনি। আপনার থেকে বড় অভিভাবক তো কেউ নেই। জ্যাঠামশাই তো সেই দূরে। আমি ছেলেমানুষ, আমাকে যেন আপনি দেখবেন। হয়তো···হয়তো কাজ কিছু হবে না। তবু বলা! বিষণ্ণভাবে হাসলেন মেজগিন্নী।

হেমলতা সচেতন হয়ে উঠলেন, তিনি যেন অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন—এই তার চেয়েও কমবয়সী তাঁর শাশুড়ীটির জন্যে। সচেতন হয়ে উঠে বললেন—যাবে বৈকি সুরেশ্বর। যাওয়া উচিত ছিল। সুরো! সুরেশ্বর! রঘু, সুরো বোধহয় বাইরে—

সুরেশ্বর বাইরে যায়নি। পাশের ঘরেই ছিল। বাইরের ওই জঙ্গলের ও কংসাবতীর দিকের জানালাটার সামনে দাঁড়িয়ে জ্যোৎস্নার ফুটফুটে রাত্রির আকাশ পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে ছিল। জঙ্গলে কোথায় দুটো কোকিল পাল্লা দিয়ে ডেকেই চলেছে। 'চোখ গেল' পাখীর ডাকও সে শুনেছে, পাপিয়া ওর নাম, জানবাজারে পাশের একটা বাড়ীতে কেউ পুষেছিল—ডাকত। আর একটা পাখী ডাকছে ভারী চমৎকার সুরেলা ডাক। নাম জানে না। ওই ডাকও শুনেছিল সে, আবার কথাও শুনছিল মেজঠাকুমার। সম্ভবতঃ মনটা মেজঠাকুমার কথার দিকেই আকৃষ্ট ছিল বেশী। পাখীর ডাক এবং গান কানের পাশ দিয়ে বেজে চলেছিল বাতাসের প্রবাহের মত, বৃষ্টির শব্দের মত, দূরান্তের কোলাহলের মত। ধ্বনিতেই তার পরিবেশন শেষ—কোন ব্যঞ্জনার স্বাদ নেই, কোন অর্থবোধের ঔৎসুক্য নেই।

মায়ের ডাকে সুরেশ্বরের যেটুকু মন বাইরে ছড়িয়েছিল, যেটুকু কথার মধ্যে মগ্ন ছিল সব একত্রিত হয়ে সজাগ হয়ে উঠল। সে সাড়া দিয়ে বললে—আমায় ডাকছ?

বলে সে এসে ঘরে ঢুকল।

—পাশের ঘরেই ছিলি বুঝি? বাইরে সব বসে রয়েছেন—

মেজগিন্নী বললেন—ভালই করেছে মা। ওর বাইরে গিয়ে গাঁয়ের লোকের কচ্‌কচি না শোনাই ভাল। এখানে খবর আসা অবধি এদের ছয় ভাইয়ের তো মুখের বিরাম নেই। নানান গল্পগুজব রটিয়ে বেড়াচ্ছে। বড় ছেলে তো সকাল থেকে মদ খেয়ে চীৎকার করছে। মেজকর্তার মন্দস্বভাবে সেটা ভাল লাগছে। তবে মধ্যে মধ্যে বলছেন, না—না। এ বড় বাড়াবাড়ি হচ্ছে। যাক্, আজ উঠি—

—আপনি কিন্তু আসবেন খুড়ীমা। যে যা বলুক করুক আপনি যেন পরিত্যাগ করবেন না।

—আসব। আমার পথ কেউ আটকাতে পারবে না বউমা। তোমার শ্বশুর আমাকে ভয় করে। হাজার হলেও তৃতীয়পক্ষ তো।

বলে হেসে উঠলেন। তারপর বললেন—কিন্তু একটি শর্তে।

—বলুন।

—শর্ত হল, তুমি মা আমাকে আপনি আজ্ঞে করো না। আমি তোমাকে তুমি বলছি, তুমিও আমাকে তুমি বলবে।

—সেকথা কেমন ক'রে বলব খুড়ীমা—তাই।কি পারি?

—মা, এখানে ছেলেরা মাকে তুই বলে। রাগলে বাপকেও বলে। সেকথা থাক্। তোমার সুরেশ্বর তোমাকে তো তুমি বলে। তুমিও আমাকে তুমি বলবে। কেমন লাগে মা। চাকর-বাকর ছাড়া কেউ তো আপনি বলে না। তাছাড়া বয়সে আমি তোমার থেকে ছোটই হব।

হেসে হেমলতা বললেন—বেশ, তাই বলব।

মেজগিন্নী বললেন—এস ভাই নাতি। চল, ঘুরে আসবে। দেখে আসবে ঠাকুরদাকে।

হেমলতা বললেন—ম্যানেজারবাবুকে বলে সঙ্গে লোক আর আলো নিয়ে যা।

নায়েব বা ম্যানেজার হরচন্দ্র একটু খুঁতখুঁত করলেন। কিন্তু যোগেশ্বরের এখানকার পুরানো কর্মচারী গোবিন্দ ঘোষ বললে—মেজমায়ের সঙ্গে যাচ্ছেন, কোন খুঁতখুঁত করবেন না। বলে তিনি ডেকে বলেন—ওরে ডিকু, তুই যা আলো নিয়ে।

একটি অদ্ভুত মূর্তি—অন্তত তাই মনে হল সুরেশ্বরের—আলো এবং লাঠি হাতে সেলাম করে দাঁড়াল। লোকটার গালপাট্টা আছে, পাকানো গোঁফ আছে, পরনে পাজামা আছে, গায়ে একটা ছেঁড়া কোট আছে। বাঙালী তো নয়ই—হিন্দুস্তানী বলেও মনে হয় না, কিন্তু মুসলমানের সঙ্গেও মেলে না।

মেজঠাকুমা বললেন—ডিকু!

—হাঁ মাইজী!

—বহাল হলি বুঝি?

—হাঁ মা। হলদির কাছে আদমী গিয়েছিল তিন আদমীর জন্যে—বুড়ী আমাকে রোজাকে ভেজেছে, কাল আর কোইকে ভেজবে। আচ্ছা আদমী ছাড়া তো দিবে না! হামারা তো নোকরী ঢুঁড়ে ঘুরছি মা, মিলছে না। আর নতুন হুজুর আইলেন, নোকরী মিলল!

সুরেশ্বর বললে—কি নাম তোমার?

—গোবিন্দ ডিকুকুরুজ! হামি লোক গোয়ান আছি হুজুর! হারমাদ ছিলাম হামরা! হুজুরেরা হামাদের এনে এখানে জমিন দিয়ে ঘর দিয়ে বৈঠালেন।

মনে পড়ল সুরেশ্বরের। পূর্বপুরুষ বীরেশ্বর রায়ের আমলে এরা এখানে এসে বাস করেছিল।

বাস করিয়েছিলেন তাঁর স্ত্রীর অনুরোধে। গোয়ানীজ পোর্টুগীজদের বংশধর। মনে পড়ল মেজঠাকুমা মাকে বলছিলেন গোয়ানপাড়ার মেয়েদের কথা। কিন্তু সেকথা নিয়ে কৌতূহল জাগবার মত তার মনের অবস্থা ছিল না। সে একটু শঙ্কিত হয়েই চলেছিল বিচিত্র মেজঠাকুরদার সঙ্গে দেখা করতে। তার বাবাকে সে দেখেছে রায়বংশের প্রাসাদের একটি শ্বেতশুভ্র গম্বুজের মত মহিমায়। তাতে আকাশ থেকে অন্ধকারের কালি ঝরে কালো হয়ে যেতেও দেখেছে। তার চূড়ার কলসে কলঙ্ক ধরতেও দেখেছে। এখন চলেছে দেখতে আরও পুরনো এক গম্বুজ বা মিনারকে—যেটা ভূমিকম্পে ফেটে গেছে; ফাটলে ফাটলে সরীসৃপের বাস; যেটার তলায় দাঁড়ালে যে-কোন মুহূর্তে খানিকটা ভেঙে পড়বার সম্ভাবনা, যেটার রং বিবর্ণ হয়ে কদর্য—হয়তো বা ভয়ঙ্কর—হয়ে দাঁড়িয়েছে।

হঠাৎ সে দাঁড়িয়ে গেল।

মেজঠাকুরমা বললেন—দাঁড়ালে ভাই?

ঠিক পথের ধারেই একটা গাছে যেন মাথার উপরেই সেই অজানা সুরেলা শিস্ দেওয়া পাখীটার ডাক শোনা যাচ্ছে। অত্যন্ত কাছে ঠিক মাথার উপরে বলেই মনটা যেন ছেলে-মানুষের মত ওরই কাছে ছুটে চলে গেছে। সে বললে—ওই পাখীটা! অনেকক্ষণ থেকে ডাক শুনছিলাম নদীর ওপারের জঙ্গলে। এখানে বোধহয় এই গাছটাতেই ডাকছে।

পাখীটা আবার ডেকে উঠল। মেজগিন্নী হেসে উঠলেন—বললেন—ওটা তোমার মেজঠাকুর্দা পাখী ভাই।

—মানে?

—বুঝতে পারলে না? ওকে বলে 'বউ কথা কও' পাখী।

—মেজঠাকুমা পাখীগুলো তাহ'লে কি বলে মেজঠাকুমা?

—হরি হরি হরি! তাও জান না! তারা ডাকেই না। পাখীদের মেয়েগুলো ডাকে না গো! যদি ডাকে—তবে নাতি কথা কও বলে!

তারপরই বললেন—এসে পড়েছি আমরা। দেখো, একটু সহ্য করে যেয়ো ভাই। বয়স সোত্তোরের কাছে, কিন্তু অভাবে অভাবে, আর স্বভাবেও বটে, মেজাজ মন বাহাত্তুরের অধম হয়েছে!

এতক্ষণে বাঁদিকের গাছটা থেকে ডানদিকে চোখ ফেরালে সুরেশ্বর। জ্যোৎস্নার মিষ্টি সাদা আলোয় শেওলাপড়া কালচে রঙের প্রকাণ্ড একটা ফটক। দুপাশে দুটো যেন কি? জানোয়ারের মূর্তি। দুটো সিংহ। ফটক দুটো কাঠের—ভাঙা-ভগ্ন। ওপাশে একরাশ কালো জমাট পাথরের মত বাড়ীখানা স্পষ্ট হয়ে উঠল।

ঢুকে মেজঠাকুমা বললেন—এটা ঠাকুরবাড়ী। প্রণাম করে যাবে ভেতরে।

প্রকাণ্ড নাটমন্দির। মোটা গোল থামের উপর ছাদ—চারপাশে ঢালু চারখানা আলাদা

টিনের চাল। উত্তরদিকে কালীমন্দির। প্রশস্ত চৌকো ঘরই একখানি—সামনে ঠিক মাঝখানে আলসের উপর তিনকোণা বা ত্রিভুজের মত একটি অলঙ্করণ। তার দু'পাশে দুটি হাতীর মাথা, তারা শুঁড় তুলে রয়েছে। মাঝখানে একটি পদ্ম—তার মধ্যে লেখা ওঁ। বারান্দা ঘর সব মার্বেল দেওয়া।

বারান্দায় গিয়ে সুরেশ্বর উঠল মেজঠাকুমার পিছন পিছন। কেউ একজন আসনে বসে নাক টিপে করগণনা করে জপ করছিল। সামনে মদের বোতল, পাশে নারকেলমালার পাত্র, একখানা শালপাতায় কিছু মুড়ি এবং আরও কিছু ভাজাভুজি উপকরণ। পিছন দিক থেকে লোকটিকে দেখে শুধু এইটুকু বুঝলে সুরেশ্বর যে লোকটি প্রৌঢ় এবং দেহখানা যেন ভাঙাভগ্ন, তবে লোকটি দীর্ঘাকৃতি; মাথায় টাক পড়েছে।

ভিতরে শ্বেতপাথরের গড়া বড় একটি সিংহাসন, যার মাথাতেও ছত্রি, সামনে সরু গোল ছোট খাম বা ডাণ্ডা, তার মধ্যে কষ্টিপাথরের কালামূর্তি। মূর্তির রং ঠিক ঝকঝক করছে না, খসখসে মনে হল; এবং বুঝতেও পারলে যে মার্জনা বিশেষ হয় না।

মেজগিন্নী নিজে প্রণাম করলেন। সুরেশ্বর দাঁড়িয়েই রইল। মেজগিন্নী উঠে বললেন—প্রণাম কর।

প্রণাম করতে ঠিক অন্তরের ইচ্ছে ছিল কি না-ছিল তা সুরেশ্বর নিজেই ঠিক জানত না। সে মেজঠাকুমার কথায় প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই প্রণাম করল। বাপের শ্রাদ্ধের জন্য এখানে আসার পিছনে তাদের যে মন রয়েছে সেটাও তাকে বোধহয় নির্দেশ দিলে—প্রণাম কর। তবে যুক্তির দিক থেকে তার বর্তমান মনের যুক্তিতে এতে সায় থাকবার কথা নয়, কিন্তু সংস্কারের প্রভাব একেবারে মুছে যায়নি।

মেজঠাকুমা পূজককে বললেন—চরণোদক দাও ঠাকুর সুরেশ্বরবাবুকে। পূজকঠাকুর তামার চরণোদকের পাত্র নিয়ে বেরিয়ে এল। মেজঠাকুমা বললেন, হাত পাত' ভাই।

ঠিক এই সময়েই উপাসক ব্যক্তিটির ধ্যানভঙ্গ হল—কালী কালী জয় কালী। কালী কলুষ-নাশিনী, কালী আনন্দময়ী—বলতে বলতে ফিরে তাকালে পিছন দিকে। সুরেশ্বরকে দেখে গম্ভীর-কণ্ঠে প্রশ্ন করলে—কে?

মেজগিন্নী বললেন—এই সুরেশ্বর, যোগেশ্বর ভাণ্ডরপোর ছেলে! সুরেশ্বর, ইনি তোমার বড়কাকা—তোমার মেজঠাকুর্দার ছেলে ধনেশ্বর।

—অ—! সুরে-শ্বর। সুরের ঈশ্বর! তা চেহারাখানা তো বেশ! উঁ!

সুরেশ্বর বিব্রতবোধ করলে। কি করবে—কি বলবে ভেবে পেল না। হঠাৎ জুগিয়ে গেল, সে বললে—অশৌচে তো প্রণাম করতে নেই বলছিলেন মেজঠাকুমা।

—না, তা নেই।

মেজঠাকুমা বললেন, বিবিমহলে মনমরা হয়ে বসে ছিল। ওর মা—বউমা বলছিলেন এই বয়সে পিতৃহীন হয়ে বড় ভেঙে পড়েছে বেচারা। অভিভাবক নেই সাহস দেবার, ভয় নেই বলবার কেউ নেই। তা আমি বললাম, সে কি? ওর মেজঠাকুরদা বেঁচে, ওর শূর-বীরের মত কাকারা, ধনেশ্বর, সুখেশ্বর রয়েছে, অভিভাবক নেই সে কি কথা! চল, এখুনি চল। দেখবে

কাকারা বুকে জড়িয়ে ধ'রে বলবে—কি ভয়, কিসের ভয় !

সে প্রায় উদাত্তকণ্ঠ যাকে বলে—সেই উদাত্তকণ্ঠে ধনেশ্বর বলে উঠল—নি-শ্চ-য় ! বলে উঠে দাঁড়িয়ে দু'হাত মেলে বললে—পুত্রের অধিক। যোগেশদার এক পুত্র সে আমার শতপুত্রের অধিক ! ওঃ !

প্রচুর মদ্যপানে তার পা ঠিক থাকছিল না—টলছিল। এবং সর্বাঙ্গ দিয়ে দেশী মদের তীব্র গন্ধ নির্গত হচ্ছিল। টলতে টলতে এসে সুরেশ্বরকে বুকে জড়িয়ে ধরে ধনেশ্বর কেঁদে ফেললে। ওঃ, কি মানুষই ছিল যোগেশদা ! ওঃ ! তুই তার ছেলে !

সুরেশ্বরের অন্তরাত্মা বিদ্রোহ ক'রে উঠল। তার মনে হল যেন পৃথিবীর কুৎসিততম দুর্গন্ধ-যুক্ত একটা জন্তুতে তাকে আঁকড়ে ধরেছে। কি করবে সে তা ভেবে পেলে না ! বহুকষ্টে আত্ম-সম্বরণ করেও একটা হাত দিয়ে ধনেশ্বরের বাহু বেষ্টনীতে একটু ঠেলা দিয়ে বললে—ছাড়ুন ! আমাকে ছাড়ুন !

মেজগিন্নী বুঝেছিলেন, তিনি বললেন, ওকে ছেড়ে দাও বাবা ধনেশ্বর। তাছাড়া তুমি করলে কি ? সন্ধ্যা শেষ না করেই আসন ছেড়ে উঠলে ?

সুরেশ্বরকে ছেড়ে দিল ধনেশ্বর। তারপর বললে—তাই তো, অন্যায় হয়ে গেল ! ফের গোড়া থেকে করতে হবে। তা তুমি ভেবো না বাবা ! কিছু ভেবো না। সব ঠিক হয়ে যাবে। সব ঠিক করে দেব আমি। বিলকুল ঠিক করে দেব। সিধে ঠিক করে দেব !

বলেই আসনে বসে পড়ে গাঢ় প্রমত্ত-কণ্ঠে বলে উঠল—কালী কালী বল মন। কালী কালী কালী। কালী কল্যাণী। কালী করুণাময়ী।

মেজগিন্নী সুরেশ্বরকে নিয়ে এগিয়ে গিয়ে ডানদিকে একটি দরজায় ঢুকে পড়লেন। বললেন—এ চত্বরটি রাজরাজেশ্বরের আর রাধাশ্যামের চত্বর। চত্বরটি স্বতন্ত্র ; পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। বলতে গেলে শাক্ত এবং বৈষ্ণবতন্ত্রের ক্ষেত্র দুটিকে তফাৎ ক'রে আলাদা ক'রে দেওয়া হয়েছে। শক্তি-মন্দিরের মদ্য এবং মাংসের গন্ধ যেন ওদিকে না যায়।

ওদিকে কালীমন্দিরের বারান্দায় বসে উচ্চ জড়িতকণ্ঠে ধনেশ্বর চীৎকার করছিল—কলকাতার বাবু, যোগেশ্বর ব্যাটা, ক্রীশ্চান-সাহেবের গোলাম—এঁটো-চাটার পুত্র। দেশী কুত্তার গায়ে খুসবু সাবান মাখায় সাহেবরা। তাই সাহেবের দেশী-কুকুর গাঁয়ের বাঘা কুকুরকে ঘেন্না করে ! বাঘা কুকুর শ্মশানে ফেরে মশানে ফেরে। তার জাত আছে। জয়কালী জয়কালী। কেরেস্তান-দেবোত্তরের দায়ে শ্রাদ্ধ করতে এসেছে। আমি দেখছি—

স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে গেল সুরেশ্বর।

তখনও বলে চলেছে ধনেশ্বর—হারামজাদা—শূয়ার কি বাচ্চা—তোর বাপ মদ খেত না ? কেরেস্তান—! এ-ই ঠাকুর মন্দিরের বারান্দা গঙ্গাপানিসে নাথাল দেও। কেরেস্তান উঠেছিল। করাচ্ছি, তোমাকে শ্রাদ্ধ করাচ্ছি।

মেজগিন্নী এসে সুরেশ্বরের হাত ধরলেন—এস, ওসব শোনে না। ঠাকুরকে প্রণাম কর। করে চল মেজঠাকুরদাকে বলে চলে যাবে।

চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল সুরেশ্বর।

—নাতি !

—আমি ফিরে যাই ঠাকুমা !

—না। যেতে নেই। দেখ ভাই, তর্পণ যখন করবে তখন দেখবে—অবন্ধু,—শত্রু, বন্ধু, অন্যজন্মের বন্ধু সকলকে জল দিতে হয়। যাদের সন্তান নেই, যারা অপঘাতে মরেছে, তাদের জল দিতে হয়। শ্রাদ্ধে তাদেরও পিণ্ড দিতে হয়। এখন তোমার রাগ করতে নেই।

মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে সুরেশ্বর বললে—আপনি সংস্কৃত পড়েছেন ঠাকুমা ?

—না ভাই। কে শেখাবে ? বাবা পূজারী বামুন ছিলেন, বলতেন, শুনে শিখেছি। তোমার ঠাকুরদা তর্পণ করেন, শুনেছি। বুঝি। হাজার হলেও বামুনের মেয়ে বামুনের বউ তো !

—চলুন। ঠাকুরদাকে দেখে আসি চলুন।

* * *

রায়বংশের পুরুষেরাই দীর্ঘকায়। মেজঠাকুরদার মধ্যে একটু পার্থক্য সে দেখলে। মেজ ঠাকুরদা ঈষৎ স্থূলকায়, বেশ একটি ভুঁড়ি আছে।

দোতলার বারান্দায় আসর পেতে বসে ছিলেন শিবেশ্বর। একদল তিলকধারী খোল নিয়ে বসে ছিল। আরও দুজন বৈষ্ণবও ছিল। শিবেশ্বর সবে গাঁজার কল্কেটি হাতে ধরেছেন। মেজ-গিন্নী সুরেশ্বরকে নিয়ে সিঁড়ি ভেঙে ঠিক বারান্দার প্রান্তদেশে দাঁড়ালেন। এবং একটু থমকে গেলেন। গাঁজা শিবেশ্বর খান এ কথা তিনি হেমলতাকে বলেছেন, না-বলবার কারণও ছিল না, কারণ শিবেশ্বর অতি প্রকাশ্যভাবেই গাঁজা খেয়ে থাকেন। এবং সুরেশ্বর বিবি-মহলে পাশের ঘরে থেকে এ সব শুনেছে তাও তিনি জানেন, তবুও যেন একটু লজ্জিত হলেন।

শিবেশ্বর গ্রাহ্য করলেন না। গাঁজার কল্কে মুখের কাছে ধরে টানতে লাগলেন। মেজগিন্নী বললেন—সুরেশ্বর এসেছে।

গাঁজার ধোঁয়া ছেড়ে একটু দাবা গলায় শিবেশ্বর প্রশ্ন করলেন—কে এসেছে ?

—সুরেশ্বর। তোমার কাছে এসেছে, তোমাকে দেখবে—দেখা করবে !

যোগেশ্বরের ছেলে ?

—হ্যাঁ।

—এস। এস। ভাই এস।

সুরেশ্বর এগিয়ে গেল। শিবেশ্বর কল্কেটা খোল-বাজিয়ের হাতে দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। সুরেশ্বর তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকালে। আলো উজ্জ্বল নয়—হ্যারিকেন জ্বলছে। তবু তার মনে হল, ঠিক সাধারণ নেশাখোর মানুষ তো নন। মুখে এবং দাঁড়ানোর ভঙ্গিতে একটি সুস্পষ্ট ব্যক্তিত্বের ছাপ রয়েছে।

সে বললে—মেজঠাকুমা বলেছিলেন, অশৌচের মধ্যে প্রণাম করতে নেই।

—না। নেই। কিন্তু প্রণামেরই বা দরকার কি ভাই ? যারা বুকে চড়ে মলমূত্র ত্যাগ করলে চন্দন লেপনের আনন্দ পায় মানুষ, তাদের কাছে প্রণাম কি প্রয়োজন ? বস।

অভিভূত হয়ে গেল সুরেশ্বর। নূতন কালের মানুষ সে। সবুজপত্রের যুগ সদ্য শেষ হয়েছে বা সবুজপত্র সদ্য উঠে গেছে ; পেঁচিয়ে কথা বলে বক্তব্যটিকে বক্র ও তীক্ষ্ণ করে বলার রেওয়াজ উঠেছে ; ভারের চেয়ে ধারের দাম বেশী হয়েছে ; তাতে উল্লাস এবং কৌতুক দুইই আছে। এ কথা সে জাতের নয়—সে মেজাজের নয় ; এ কথা সোজা কথা এবং হয়তো কিছুটা ভাবালুতা আছে, তবু সে অনুভব করলে, তার মন আনন্দে এবং আবেগে যেন ভরপুর হয়ে গেল।

শিবেশ্বর তাকে ধনেশ্বরের মত বুকে জড়িয়ে ধরলেন না, হাতে ধরে বললেন, বস। তোমার কম্বলের আসন কই ? আনো নি ? মেজবউ, আসন দাও। গালিচার আসন পেতে দাও !

তারপর হঠাৎ আলোটা তুলে নিয়ে তার মুখের সামনে ধরে তাকে দেখলেন। আবার আলোটা নামিয়ে চশমা বের করে চোখে দিয়ে দেখে বললেন—তাই তো ভাই। তুমি তো দেখি অপরূপ হে ! রায়বংশে শ্রেষ্ঠ সুপুরুষ ছিলেন তোমার পিতামহ। আমার জ্যেষ্ঠ দেবেশ্বর রায়। তাঁর অয়েলপেন্টিং নিশ্চয় দেখেছ। সে অবশ্য পরিণত বয়সের। প্রথম যৌবনের সে ছবি আমার মনে ভাসছে। তুমি হয়তো তাঁর থেকেও সুপুরুষ। প্রেমে পড়বার মত রূপ হে ! আমি যে চিন্তিত হলাম ভাই ! তুমি যে সাক্ষাৎ মদন হে !

লজ্জা পেয়েছিল সুরেশ্বর ; সে লজ্জাকে জয় করে সে একটু পুলকিত কৌতুকেই বললে—কেন ? এ যুগে আর তো শিবের তপোভঙ্গ করতে হবে না ! চিন্তা করছেন কেন ?

—ভাই ! গম্ভীরভাবে বললেন শিবেশ্বর, ভাই, আমার যে তৃতীয় পক্ষের গৃহিণী এবং সুন্দরী গৃহিণী ! বলে হা-হা করে হেসে উঠলেন।

—না ঠাকুরদা, আপনার গৃহিণী রতি নন—উনি সতী—না, সতী বলব না,—উনি গৌরী, উমা।

—বহুৎ আচ্ছা ! সাধু-সাধু-সাধু ! দীর্ঘায়ু হও। তার তুল্য খ্যাতিমান হও ! চমৎকার বলেছ হে ! ঠাকুরদাকে ঠকিয়ে দিয়েছ। এবং—। একটু গম্ভীর হয়ে গেলেন, বললেন—লজ্জিতও করেছ আমাকে। তুমি আমার সঙ্গে নিজে থেকে দেখা করতে এসেছ। যাওয়া তো আমারই উচিত ছিল। তুমি পিতৃহীন হয়েছ ; আমি পিতামহ ; তুমি পৌত্র—ভ্রাতুষ্পৌত্র, আমারই তো গিয়ে বলা উচিত ছিল—এস ভাই, কোন ভয় নেই তোমার, আমি যতক্ষণ আছি। তা আমি করিনি !

—কর নি, এবার কর ! মেজগিন্নী সুযোগ পেয়ে মাঝখানে টুকে দিলেন।

—হুঁ। শুধু একটি হুঁ বলে শিবেশ্বর একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন।

সংসারে বোধহয় অবস্থার আনুকূল্যে প্রসন্নতায় মানুষ মুখর হয়ে ওঠে—আবার প্রতিকূলতায় ক্ষোভে বিষণ্ণতায় কথা হারিয়ে ফেলে—বা কোনক্রমে দমন করে রাখে নিজেকে। সুরেশ্বরের মনে এবং মুখে কথা আপনি এসে গেল, সে বললে—আমাদের উপর কি রাগ করে আছেন আপনি ?

—না। রাগ তো নয় ভাই। রাগ নয়। দেখ, আমি ধর্মে একটু গোঁড়া। সেই

কারণে সেই প্রথম যৌবন থেকে তোমার ঠাকুরদা'র মত কলকাতায় যাই নি, রামেশ্বরের মত বিলেত যাই নি। তিনবার বিবাহ করেছি—তবু পরদার করি নি। আজ বলতে গেলে নিঃস্ব হয়েছি। সেই ধর্ম। মানে তোমার বাবা—। থাক সে সব কথা। আমি ভাবছি। এখনও ভাবছি। ভাবছি বলেই এখনও দূরে দূরেই রয়েছি। তা ছাড়া আমিও তো বলতে গেলে ঠিক স্বাধীন নই। আমার ছেলেরা অপোগণ্ড, মূর্খ, মাতাল—তা ছাড়া অন্য দোষও তাদের আছে। তারা অমত করছে। তারা বিষয়ের জন্যে করছে। সে বলতে হবে। তবে কি জানো, আমার বিচারে তো তোমার বাপের সঙ্গে এদের তফাৎ খুব নেই। দুইই পচেছে। তাই হয়, বড় বড় বংশে তাই ঘটে। তোমার বাপ ইংরিজী মতে পচেছে, এরা দেশী মতে পচেছে। দেখ, আমার কাছে তোমার বাপের পচাটাই বেশী পচা। কারণ ইংরেজী মতে পচা মানেই জাত দিয়ে পচা। আমার ছেলেরা জাতটা রেখেছে। আমি ভাবছি!

সুরেশ্বর বললে—ভেবে দেখুন তা হলে। আমি আজ যাই!

—এস। কাল আমি যাব। বউমার সঙ্গে দেখা করে আসব। ওঁকে সেই বিয়ের সময় আর বিয়ের পরই সাতদিনের জন্য এখানে এসেছিলেন, তখন দেখেছি, আর দেখি নি। দেখে আসব। ইতিমধ্যে ভেবে দেখি। ছেলেদের সঙ্গে পরামর্শও করি।

পরদিন সকালে শিবেশ্বর সঙ্গে সেজছেলে সুখেশ্বরকে নিয়ে নিজে এলেন। সুখেশ্বরের বয়স বছর চল্লিশেক। মেজ জগদীশ্বরের থেকে বেশ কয়েক বছরের ছোট। সুখেশ্বর বেশ ভদ্র। ম্যাট্রিক পাস। এখানকার ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট। কিছু ঠিকাদারি ব্যবসাও আছে। লোকে বলে—ইউনিয়ন বোর্ডের ইন্দারা, রাস্তার সাঁকো এ-সব বেনামীতে সুখেশ্বরই করে থাকে। ইউনিয়ন কোর্টেরও হাকিম। তাতেও নাকি কিছু কিছু আয় হয়। চেহারায় রায়বংশের ছাপ আছে, তবে রঙটা কালো।

শিবেশ্বর হেমলতাকে ডেকে অনেক সান্ত্বনা, অনেক উপদেশ দিলেন। পরিশেষে বললেন—কাল আমি সুরেশ্বরকে সব বলেছি মা। দেখ মা, আমার কাছে ধর্ম সবার উপরে। বুঝেছ! তা আমি আমার গুরুর কাছে লোক পাঠিয়েছিলাম। তিনি বলেছেন, এ অনুমতির কাজ নয়। বিচারের কাজ। যা তোমার বিচারে হবে তাই কর। সে বিচার আমি করছি। হ্যাঁ, করছি। মনে হয় দুপুর নাগাদ একটা সিদ্ধান্ত করতে পারব।

হেমলতা চুপ করে রইলেন।

শিবেশ্বর বললেন—হরচন্দ্র কাল সকালে গিয়েছিল, বলছিল, তোমাদের ইচ্ছে ছিল বসত-বাড়ীতে উঠবে। ইচ্ছেটা স্বাভাবিক বটে। বসত-বাড়ী—পৈতৃক ভদ্রাসন। আর ওগুলি দেবত্রও নয়—সবই ব্যক্তিগত সম্পত্তি। মেরামতও করাও—

হেমলতা বললেন—না-না-না। এই তো আমরা এখানে বেশ রয়েছি।

—হ্যাঁ। এ বাড়ী ওখান থেকে অনেক আরামের। তবে ভদ্রাসন। তা—যদি প্রয়োজন হয় তা হলে আমি আজই খালি করে দেব। আমার বাড়ীটা জীর্ণ হয়েছে। তা হোক, পরিষ্কার এ বেলাতেই হয়ে যাবে। বিকেল চারটে নাগাদ খালি হয়ে যাবে! যদি চাও!

সুখেশ্বর এতক্ষণ পর্যন্ত প্রায় চুপ করেই বসে ছিল, সে এবার বললে—এ সময় কথাটা বলা হয়তো অন্যায় হচ্ছে আমার। একটা ব্যাপার হয়ে আছে—সেটা আমি বলে রাখতে চাই বউদি!

—কি বলুন?

—আমাকে বলুন বলছেন কেন? আমি যোগেশদার চেয়ে দশ বছরের ছোট। হেসে মাথার ঘোমটাটা টেনে দিলেন হেমলতা।

সুখেশ্বর বললে—যোগেশদা তখন কলকাতায় ছিলেন, সে সময় আমি তাঁর কাছে গিয়েছিলাম দেবোত্তরের একশো বিঘে ধানজমির একটা প্লট, আমরা আট ভাই বাবার অংশ রায়তী স্বত্বে বন্দোবস্ত নিয়েছিলাম। যোগেশদাকে বলেছিলাম, দাদা, তোমার তো অনেক আছে, কোন অভাব নেই, এটা বাবা যখন আমাদের খাজনা করে দিলেন তখন তুমিও আমাদের দাও। তা উনি বলেছিলেন—দিলাম! আমি ভুল করে দলিলটা নিয়ে যাই নি—তাই সই হয়নি। এই তারপরই উনি নেটিভ স্টেটে চলে গেলেন। উনি যখন বিলেত চলে গেলেন, তখন হরচন্দ্র সেটা অস্বীকার করলেন, বললেন—তা কি করে হবে? কই, আমরা তো কিছু জানি না! সেই তখন থেকে একটা গাঁট লেগে রয়েছে। সেটা. এদিকটা যখন মিটেই যাবে, তখন মিটে গেলে ভাল হয় না?

শিবেশ্বর বললেন—এ কি সুখেশ্বর! এ সময়ে ওকথা কেন?—এ কি?

হরচন্দ্র নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। সে এবার হেমলতা কিছু বলবার আগেই বললে—না-না কত্তা। উনি ঠিক বলেছেন। সব গাঁট খুলে যাওয়াই ভাল।

তা—নিশ্চয়। স্বর্গীয় বাবু যখন বলে গেছেন, তখন দলিল আনবেন, সই করে দেবো।

৮

এরপরই মিটে গিয়েছিল সব। তবে শ্রাদ্ধে আসে নি বা অশৌচান্তে কামায় নি কেবল ধনেশ্বর।

সে বলেছিল—না।

সে না-কে হাঁ করানো যায় নি। তবে কোন গণ্ডগোলও করে নি। শিবেশ্বর তাকে কঠিন শাসন করেছিলেন। আর একজন কামায়নি—কামায়নি নয়—তাকে পাওয়া যায় নি সে সময়। সে ধনেশ্বরের তৃতীয় ছেলে গোপেশ্বর। সে নাকি একটু অসুস্থমস্তিষ্ক। দৈত্যের মত চেহারা। চৌদ্দ বছরের ছেলেকে মনে হয় আঠারো বছরের জোয়ান। আপন খেয়ালে চলে। মধ্যে মধ্যে চলে যায়, দুদিন-তিনদিন পর ফেরে।

কীর্তিহাটে এক মাসের উপর থেকে প্রথম মাসিক শ্রাদ্ধ সেরে কলকাতায় ফিরেছিল এবং ষষ্ঠ মাসে গিয়ে সপিণ্ডীকরণ শেষ করে সমারোহ করে শ্রাদ্ধ করে এসেছিল। তার সঙ্গে সে বিচিত্র মন নিয়ে এসেছিল।

গ্রামের মানুষদের দেখে দুঃখ হয়েছিল, ঘৃণাও হয়েছিল।

এদের দুঃখ দারিদ্র্য যত, নীচতা হীনতাও তত। অথবা তার থেকেও বেশী। একবিন্দু প্রেম বা এতটুকু শ্রদ্ধা বা ভালবাসার মত এক কণা পরিমিত সম্বলও সে পায় নি। কি লোভ! কি গোগ্রাসে আহার! সব থেকে বেশী খেয়েছিল রায়বংশের ছেলে ওই গোপেশ্বর। এবার সুরেশ্বর তাকে দেখেছিল। কথায় জড়তা। প্রকাণ্ড দেহ, ফর্সা রং। কটা চুল। কটা চোখ। অসুস্থ দৃষ্টি। ছেলেটি খেতে বসে দানবের মত খেয়েছিল। তারপর আর গোপেশ্বরকে দেখেনি। শুনেছিল তার মাথা গরম হয়েছে বলে তাকে ঘরে বন্ধ করে রাখা হয়েছে। গভীর রাত্রে সে বীভৎস চীৎকার করত। সে চীৎকার সে শুনেছিল।

ঐখানকার ব্রাহ্মণেরাও চুরি করে; তার পিতৃশ্রাদ্ধে তারা লুচি মিষ্টি চুরি করলে; সে দেখলে। এবং পরস্পরের মধ্যে কুৎসিত কলহ করলে। সব থেকে খারাপ লাগল তার মেজ-ঠাকুমা পর্যন্ত বালতিতে ভরে মিষ্টি নিয়ে গেলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে চোখে পড়ল তারই। মেজ-ঠাকুমা অপ্রতিভ হলেন না, হেসে বললেন, নিয়ে যাচ্ছি ভাই। কলকাতার কাঁচা সন্দেশ তোমার ঠাকুরদা খেতে ভালবাসেন। চোখে পড়ল কাঙ্গালী বিদায়ে ব্রাত্য দরিদ্রেরা এল দলে দলে, এখানকার রায়বাড়ির ছেলেরা থেকে অন্য ভদ্রবাড়ীর ছেলেরা এমন কি ওদেরই স্তরের যারা পাইক পেয়াদার কাজ করে তারা তাদের যুবতী মেয়েগুলোকে নিয়ে সামান্য স্বাদু খাদ্য-মূল্যে ছিনিমিনি খেললে। নদীর ওপারে গোয়ানপাড়া—ওই ডিকুর্জদের বাড়ী—তারা লুঙ্গি পরে, পাজামা পরে, মেয়েরা সেমিজের মত ঢিলে জামা পরে বেড়ায়—তারা কাঙ্গালী খেতে আসেনি। কিন্তু এই দাঁড়িয়ে দেখলে আর ফিক-ফিক করে হাসলে। মেয়েগুলোকে দেখেই যেন মনে হয়-এরা স্বৈরিণী। এখানকার মুসলমানরাও আসেনি। এদের দুই সম্প্রদায়কে সিধে দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন তার মা।

এখানকার ইস্কুলের হেডমাস্টার এসে তার কাছে হেঁট হয়ে নমস্কার করে ভিক্ষুকের মত কথা বললেন। তার কারণ ইস্কুলে পাঁচ হাজার টাকা দান করা হয়েছিল। তিনি হাতজোড় করে বললেন তার মাকে, স্কুলের ম্যাট্রিক উত্তীর্ণ ছাত্রদের মধ্যে যে প্রথম হবে তাকে এক বৎসরের জন্য মাসিক একটা বৃত্তি বাবার নামে দেবার জন্য।

চ্যারিটেবল ডিসপেনসারির ডাক্তার এলেন ডাক্তারখানা মেরামতের জন্য ভিক্ষা করতে। তিনি আক্ষেপ ক'রে বললেন—এই ডাক্তারখানার যে সর্ব যন্ত্রপাতি ছিল সে সব দেখে মিস্টার লাম্‌বোর্ণ বলে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট উনিশশো আট সালে লিখেছিলেন এসব ইকুইপমেণ্ট সাবডিভি-শনাল হাসপাতালেও নেই। তার আর কিছু নেই। ডাক্তার এখানে থাকে না। কারণ বিনা ফিয়ে গোটা মেজ তরফকে দেখতে হয়। ডাক্তারখানা থেকে তাদের ওষুধ আগে আসে। ভাল ওষুধ অন্য পেশেণ্টদের দিতে নিষেধ আছে সুখেশ্বরবাবুর।

সুরেশ্বর ছিল নীরব শ্রোতা। তার অন্তরলোকে এসবের প্রতিটি বিচিত্র সংবাদ জলন্ত অঙ্গার-স্তূপে দাহ্যবস্তুর মত নিক্ষিপ্ত হচ্ছিল।

ফলে সে ফিরে এল জ্বলতে জ্বলতে।

শুধু রায় বংশ নয়, গোটা গ্রাম—হয়তো গোটা দেশের উপর অবজ্ঞা এবং ঘৃণা নিয়ে।

কলকাতায় তখন সে কলেজে ভর্তি হয়েছে। সেণ্টজেভিয়ার্স কলেজে। ম্যাট্রিক পাস

সে সেবার করেছিল। কীর্তিহাট থেকে ফিরে সে আর কলেজে যায়নি—গিয়ে উঠেছিল প্রভিন্সিয়াল কংগ্রেস আপিসে। এ রাজত্ব এ দেশ এ সমাজে বিপ্লবের আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে ছারখার ক'রে দিতে হবে। তখন ১৯৩০ সাল এসে পড়েছে।

মা বাধা দিয়েছিলেন। সে শোনে নি। একদিন মাকে না বলেই চলে গিয়েছিল মেদিনীপুর লবণ সত্যাগ্রহে। সেখান থেকে খবর এসেছিল—তার এক বছর জেল হয়েছে। কিন্তু এখানেও সে শাস্তি বা স্বস্তি পায় নি। তখন জেলের মধ্যে রাজনৈতিক বন্দীদের ভিতর জটিল দলাদলির ফলে কুৎসিত ষড়যন্ত্র চলছে। তাছাড়া সাধারণ সত্যাগ্রহীদের সে যেন এক অসহনশীল উন্মত্ততা চলছে। এ দল ও-দলের লোককে বলে স্পাই। ও-দল বলে এ-দলের লোককে।

রাত্রে সারারাত্রি জলের ড্রাম আর থালাবাটি পিটে ব্যাণ্ড বাজায়, বিশ-পঁচিশ জনে মিলে চীৎকার ক'রে বেসুরে অসুরের মত গান করার নামে তাণ্ডব করে। তার বিছানার পাশের দেওয়ালটায় চারজন নস্য নিয়ে নাক ঝেড়ে ময়লা করে। সে প্রতিবাদ করায় তার নামে রটে গেল—সে স্পাই। তার সহ্য হল না। সে সেইদিনই জেলারের কাছে এসে জানালে যে সে সুপারের সঙ্গে দেখা করতে চায়। সুপারের সঙ্গে দেখা হল এবং সে তাঁকে বললে—যে সে সত্যাগ্রহ করে এখন অনুতপ্ত। সে আর করবে না এই বণ্ড দিয়ে মুক্তি পেতে চায়। তখন তার এক বছর মেয়াদের মধ্যে ন-মাস গেছে। জেল নিয়মে রেমিশন পেয়ে মেয়াদ প্রায় এক মাস কম হয়ে যাবে। সুতরাং সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বিস্মিত হলেন। বললেন—ভাল ক'রে ভেবে দেখেছেন ?

—দেখেছি।

—আরও দুদিন ভাবুন।

—না। তারপর বলেছিল—আর না হয় দয়া করে আমাকে সেলে থাকবার ব্যবস্থা করে দিন, না-হলে আমাকে আত্মহত্যা করতে হবে।

—বেশ, লিখুন।

দরখাস্ত লিখে সে জেল-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কাছে দিয়ে চলে আসছিল। সুপার ডেকে বলেছিলেন—শুনুন।

—কি বলুন ?

—আপনি বসুন। এখন থেকেই আপনি সেলে থাকবেন। আমি অর্ডার করে দিচ্ছি।

সে যেন বেঁচে গিয়েছিল।

তাইই ছিল। এবং বাকী মেয়াদের কালটা সেলের একটা দেওয়াল কয়লা দিয়ে ছবি এঁকে ভরিয়ে দিয়েছিল। এবং মাস দেড়েক পর খালাস পেয়ে জেল-গেট থেকে বেরিয়ে এসে যেন মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলে বেঁচেছিল। কিন্তু এর জন্যে তার স্পাই অপবাদ এমন সোচ্চার হয়ে উঠেছিল যে সেটা জেলের ভিতরেই আবদ্ধ ছিল না, বাইরেও ছড়িয়েছিল।

ছিল মফস্বলে—মেদিনীপুর সেণ্ট্রাল জেলে। মেদিনীপুর থেকে কলকাতায় বাড়ী পৌঁছে দেখেছিল, মা বিছানায় শুয়েছেন। তাঁর অসুখ হয়েছে মাসখানেক। নায়েব ম্যানেজার খবর দিতে চেয়েছিল, কিন্তু হেমলতা খবর দিতে দেন নি। ডাক্তার বলেছেন—হার্ট উইক হয়েছে।

তার জেলে যাওয়ার অনুশোচনা যেন বেড়ে গিয়েছিল। সেইদিনই সে স্টেটসম্যান আপিসে গিয়ে পিতৃপরিচয় দিয়ে এডিটার ওয়াটসাহেবের সঙ্গে দেখা করে একখানি চিঠি দিয়েছিল ছাপতে। নাম দিয়েছিল—বিদায় সত্যাগ্রহ! তাতে সে লিখেছিল—সে অনুতপ্ত। চিঠিখানা সারা দেশে একটা প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল।

তার মা দুঃখ পেয়েছিলেন সে জেলে যাওয়ায়, কিন্তু এই পত্রের জন্য তার চেয়েও বেশী দুঃখ পেলেন। বললেন—তুই এ কি লিখলি? তোর লজ্জা হল না?

সে বললে—না।

শঙ্কিত হলেন হেমলতা। মনে হল যেন ওর পিছন থেকে যোগেশ্বর ওকে প্রম্পট করেছেন।

সে বললে, পরাধীনতা আমার নিজের পক্ষে অসহ্য বলেই দেশকে স্বাধীন করতে চাই। আমার যে মাথা অন্যের কাছে নিচু হয়ে আছে—সে মাথাকে তাদের সঙ্গে সমান উঁচু করবার জন্যেই আমি লড়াই করি। কিন্তু সেই লড়াই ক'রে যদি আমার থেকে নিচু যারা তাদের কাছে মাথা নিচু করতে হয় তা হ'লে সে লড়াই যে আমার মাথায় পাথর মারার সমান হয় মা। দেশের জন্যে আত্মবলিদান আত্মার মুক্তির জন্য, তার অপমান অসম্মানের জন্য নয়। আমার নামে অপবাদ রটনা করেছিল—আমি স্পাই। আমার সহ্য হ'ল না।

মা কিছু আর বলেন নি। পাশ ফিরে শুয়েছিলেন।

সুরেশ্বর কিছুদিন ছবি আঁকা নিয়ে পড়েছিল। নন্দলালের রেখা—যামিনী রায়ের পটপদ্ধতি সব ছেড়ে সে নিজের খুশিমত ছবি আঁকতে লাগল। তার সঙ্গে এস্রাজ বেহালা। যেগুলো তার বাবা কিনেছিলেন। সেগুলো নিয়ে নিজেই বাজাতে আরম্ভ করলে। এ না-করে তার উপায় ছিল না। সে তখন চিহ্নিত হয়ে গেছে ইংরেজের কাগজের অনুগত সাংবাদিক যোগেশ্বর রায়ের পুত্র হিসেবে। লোকে বলছে—জে রায়ের ছেলে তো সে, ঘরে ঢুকল।

ঘরের মধ্যে ছবি আঁকতে আঁকতেও সে বুঝতে পারলে, সে শুধু সাধারণের কাছেই নয়, নিজের কাছেও অপরাধী হয়ে গেছে। এমনটা হবে সে ঠিক বুঝতে পারে নি। অর্থাৎ জেলে সেলে থাকা এবং বেরিয়ে এসে এই পত্র ছাপার ফল এমন হবে। বার বার সে চেষ্টা করলে শক্ত হবার, মনকে কঠিন করে মাথা উঁচু করে বাইরে বের হবার, কিন্তু সে তা পারলে না।

তখন বাংলাদেশে যেন একটা আগুন নিয়ে খেলার যুগ এসেছে। একটার পর একটা বিস্ফোরণ হচ্ছে। চট্টগ্রামে যে খেলার শুরু হয়েছিল তা যেন শেষ হয়েও শেষ হচ্ছে না। দেশব্যাপী হয়ে জ্বলে উঠবার মত উত্তাপকে নেভাতে ইংরেজের সমস্ত শক্তি যেন হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে পারবে না।

সে ঘরে ব'সে গ্রামোফোন রেকর্ড চাপিয়ে এস্রাজে ছড়ি টেনে সুরে সুর মেলাচ্ছিল। সে হয়ে আসছে। হঠাৎ কাগজের স্পেশাল নিয়ে হকার চেঁচিয়ে যাচ্ছিল। —লাটসাহেবকে গুলি। লাটসাহেবকে গুলি। মেয়েছেলে গুলি করলে—

সে স্পেশালের হাঁক শুনে বারান্দায় বেরিয়েছিল। খবরটা শুনে চমকে উঠল। বুকখানা যেন ধড়াস করে লাফিয়ে উঠে থেমে যেতে চাইল। কিন্তু থামল না—মাথা কুটে চলল।

উনিশশো বত্রিশ সাল—৬ই ফেব্রুয়ারী। সেনেট হলে কনভোকেশনের আসরে—বীণা

দাস গভর্নর জ্যাকসনকে রিভলভার দিয়ে গুলি ছুঁড়েছে। গভর্নর মাথা সরিয়ে নিয়ে বেঁচেছেন। কর্নেল সুরাবর্দী বীণা দাসকে গলা টিপে ধ'রে অ্যারেস্ট করেছেন।

এরপর একের পর এক।

স্টেটসম্যানের সম্পাদক ওয়াটসনের উপর দুবার আক্রমণ হল। চট্টগ্রামে প্রীতিলতা ওয়েদেদার পাহাড়তলীর ইয়োরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ করে মরণ-খেলা খেলে নিজে পটাসিয়াম সাইনাইড খেলেন। ডালহৌসি স্কোয়ার বম কেস হল। টেগার্ট বাঁচল। কিন্তু এদেশে থাকতে সাহস তার আর হল না। সে চলে গেল, পালাল। ওয়াটসন সাহেবও পালাল। ১৯৩৩ সালে ১২ই জানুয়ারী চট্টগ্রাম বিপ্লবী দলের প্রাণপুরুষ সূর্য সেনের ফাঁসি হয়ে গেল।

সুরেশ্বর নিঃসঙ্গ হয়ে দীর্ঘদিন ঘরের মধ্যে স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। ছবিও আঁকলে না। শুধু বাজনাটাই বাজাত। আর ভাবত—সে অপরাধ করেছে? ভুল করেছে?

একে অস্বীকার করে মাথা সে তুলতে পারত না।

হঠাৎ একটা ঘটনা ঘটল।

তাতেই যেন জীবনের সব লজ্জা ভাসিয়ে দিয়ে নির্লজ্জের মত মুখ তুলে বক্রহাস্য করলে। না। নির্লজ্জের মত ঠিক নয়। কঠিন ক্রোধে সে ক্রুদ্ধ হয়ে সমস্তকে উপেক্ষা ক'রে দিলে একমুহূর্তে। অহিংস আন্দোলন সত্যাগ্রহের নামে অট্টহাস্য করতে ইচ্ছে হল তার। আর এই সশস্ত্র বিপ্লবীদের আত্মদান—? এ মহৎ না ব'লে উপায় নেই তার। কিন্তু এর ফলে যারা একদিন এদেশে আধিপত্য বিস্তার করবে—তারা? তারাও কি আজকের এদের মতন থাকবে? সে তাকালে তার পূর্বপুরুষ রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায়ের ছবির দিকে। তারপর তাকালে আয়নার দিকে। যেখানে তার নিজের ছবি ফুটে উঠেছিল। এই হয়। হাসলে সে আবার। মনে যেন জোর পেয়েছে।

হঠাৎ একদিন কীর্তিহাট থেকে সংবাদ এল—একদিনে কীর্তিহাটের মেজতরফে বিপর্যয় ঘটে গেছে। শিবেশ্বর ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেছেন। তার আগে তাঁর সেজছেলে সুখেশ্বর খুন হয়েছে। খুন করেছে ধনেশ্বরের তৃতীয় ছেলে গোপেশ্বর।

মনে পড়ল গোপেশ্বরকে। গভীর রাত্রে কিন্তু তার চিৎকার শুনেছিল সুরেশ্বর, ক্রুদ্ধ জন্তুর মত চিৎকার। তাকে বেঁধে ঘরে বন্ধ করে রেখেছিল তার অভিভাবকেরা। সেই গোপেশ্বর খুন করেছে সুখেশ্বরকে।

হেমলতা ম্যানেজার হরচন্দ্রকে পাঠিয়েছিলেন। সুরেশ্বরকে যেতে বলেছিলেন, সে বলেছিল —না। হরচন্দ্র ফিরে এসে যে বিবরণ দিয়েছিলেন তাতে হেমলতা শিউরে উঠেছিলেন। সুরেশ্বর প্রথমটা স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। অনেকক্ষণ পর তার মুখে ফুটে উঠেছিল একটি বাঁকা রেখায় অতি তিক্ত হাসি। সে হাসি তিক্ততার, সে হাসি ঘৃণার।

বিবরণ শুনে যে কোন লোকের মুখেই এই হাসি ফুটবে সন্দেহ এতে নেই। ওই গোপেশ্বর ছেলেটি তার বাল্যকাল থেকেই দানবের মত অতিকায়। তার চরিত্রের দানবিক প্রকৃতির প্রথম প্রকাশ হয়েছিল আহারে। পরিমাণে তো প্রচুর খেতোই তার উপর ছিল তার কেড়ে খাওয়া স্বভাব। চুরি করে খাওয়া স্বভাব। ক্ষুধায় সে জন্তুর মত ক্রুদ্ধ চিৎকার করত।

অন্যের পাত্র থেকে কেড়ে খেয়ে নিতো। রায়বাড়ীর দেবতার ভোগের উপরেও মধ্যে মধ্যে ডাকাতের মত ঝাঁপ দিয়ে পড়ত।

বাপ ধনেশ্বর কালীসাধক—তার বিশ্বাস ছিল ছেলে সিদ্ধপুরুষ হবে। সিদ্ধপুরুষ সাধকদের বাল্য আচরণ শোনা যায়—তার সঙ্গে নাকি মিল দেখতে পেতো। ক্রমে কৈশোরে আর এক চেহারা দেখা দিল। সে বলির পাঁঠার সদ্যছিন্ন কণ্ঠ থেকে ফিনকি দিয়ে ঝরা রক্ত অঞ্জলি ভরে নিয়ে চুমুক দিত। রায়বাড়ীর আলসের ফাঁকে ফাঁকে বাস ছিল পাঁচ সাতশো পায়রার। এই পায়রা ধরে সে পুড়িয়ে মহানন্দে বিনা লবণেই খেতো। মধ্যে মধ্যে চলে যেতো চাষীদের তরমুজ ফুটির ক্ষেতে। সেখানে তাই গোগ্রাসে খেয়ে গাছতলাতেই পড়ে থাকত। তারপর আজ বছরখানেক থেকে তার নতুন ব্যাধি দেখা দিয়েছিল। কামার্ততার ব্যাধি। প্রথম সে পশুর পিছনে ফিরেছে, তারপর নারীর স্বাদ পেয়ে উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল। এরপর আর ধনেশ্বরেরও পুত্রকে সাধক বলে ধারণা করবার সুযোগের সূচীছিদ্রও রইল না। তারা—বলতে গেলে ধনেশ্বর আর সুখেশ্বর—বংশের মর্যাদা ঘরের মর্যাদা রাখবার জন্য তাকে শাসন শুরু করেছিল। সে শাসন নির্মম এবং নিষ্ঠুর। তাকে বেঁধে ছড়ি বা চাবুক দিয়ে প্রহার করত। সে চিৎকারও করত কিন্তু সে যন্ত্রণায় বা ভয়ে নয়—রাগে গর্জন করত। ঘটনার দিন সে দোতলার ঘরে বদ্ধ ছিল। দাঁড়িয়ে ছিল একটা জানলায়। সেখান থেকেই সে দেখতে পেয়েছিল বাড়ীর পিছন দিকে একটা জোয়ান মেয়ে কাঁধে একটা ঝুড়ি নিয়ে গোবর কাঠ-কুটো কুড়োচ্ছে। বাড়ীর পিছন দিকটা নির্জন। মুহূর্তে সে এই নির্জনতার সুযোগ ও অবকাশের মধ্যে নারীদেহের প্রলোভনে বাঘের মত উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল। পাগল সে, কিন্তু উন্মত্ত পাগল ছিল না। সে বন্ধ দরজায় পদাঘাতে নিজের উন্মত্ত লালসাকে ব্যক্ত করেনি। সে চেষ্টা করেছিল জানালার গরাদেটাকে ভাঙতে। সতেরশো পঁচানব্বুইয়ে জমিদারী কেনার আগে কুড়োরাম ভটচাজ এই অংশটা তৈরী করেছিলেন। ঠাকুরবাড়ীও তার পরের ইমারত। বলতে গেলে এই অংশটাই বড় সব মহলের চেয়ে। এবং মাঝের মহল। জানলা-গুলো স্বাভাবিকভাবেই জীর্ণ হয়েছিল তা বুঝতে গোপেশ্বরের কষ্ট হয়নি। দানবের মত দেহ—দানবের মত শক্তিও ছিল তার। জানালার গরাদে ছাড়িয়ে ফেলতে খুব বেগ তাকে পেতে হয়নি। দু-তিনটে গরাদে ছাড়িয়ে ফেলে সে সেই ফাঁক দিয়ে গলে দোতলা থেকে বাড়ীর বাইরে বাগানে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। আঘাত পায়নি নয়, আঘাত পেয়েছিল হাঁটুতে হাতে—রক্তপাতও হয়েছিল। কিন্তু জীবনের আদিম আকর্ষণে সে তখন জ্ঞানশূন্য। বিশ্বজগৎ তখন তার দৃষ্টির সম্মুখ থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে ঝড়ের বেগে উঠে আসা পুঞ্জ-পুঞ্জ মেঘের আড়ালে ঢেকে যাওয়া আকাশের এবং সূর্যের মত। সে গাছের আড়ালে আড়ালে চতুর বাঘের মত চতুরতার সঙ্গে এগিয়ে এসে মেয়েটাকে আক্রমণ করেছিল। এসব মেয়েগুলি সম্পর্কে নানান অপবাদ আছে। এরা হয়তো নিশাচরী, এরা হয়তো স্বৈরিণী, হয়তো রাক্ষসীও বটে, কিন্তু গোপেশ্বর তার চেয়েও ভয়ঙ্কর—তাছাড়া নারী যাই হোক, যেমন চরিত্রেরই হোক, এ ধরণের আক্রমণে সে আত্মসমর্পণ করে না। সে গোয়ান মেয়ে, সে বাধা দিয়েছিল, সঙ্গে সঙ্গে তারস্বরে চিৎকারও করেছিল। কিন্তু তাতে গোপেশ্বরের বিঘ্ন হয়নি। সে বাঘের

মতই তার বুকের উপর চেপে বসেছিল। মেয়েটা চিৎকার করেই চলেছিল। সেই চিৎকারে সর্বপ্রথম ছুটে এসেছিল কাকা সুখেশ্বর। এসে সে টেনেছিল গোপেশ্বরকে। কিন্তু তাকে টেনে ছাড়ানো ছিল তার সাধ্যের অতীত। প্রহার করেছিল হাত দিয়ে। সে গোপেশ্বর গ্রাহ্য করেনি। তখন সে একটা ভাঙা ডাল দিয়ে তাকে প্রহার করতে শুরু করেছিল।

এই প্রহারই গোপেশ্বরের অসহ্য হয়েছিল এবং মেয়েটাকে ছেড়ে দিয়ে উন্মত্ত ক্রোধে সুখেশ্বরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার বুকে বসে বাঘের মত হাতের থাবায় তার গলা টিপে ধরেছিল। তারপর লোকজন এসে তাকে ধরে টেনে তোলে, কিন্তু তখন শ্বাসরোধে সুখেশ্বরের মৃত্যু ঘটেছে। ডাক্তারখানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, কিন্তু কোন ফল হয়নি। সারা রায়বাড়ী লজ্জায় দুঃখে বোবা হয়ে গিয়েছিল। ছেলেটা পালিয়েছিল। এই স্তব্ধতার মধ্যে অকস্মাৎ শিবেশ্বর দোতলার ছাদে উঠে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন নিচে কতকগুলো ভাঙা ইটের স্তূপের উপর। মাথা নিচু করে পড়েছিলেন, খুলিটা টুকরো টুকরো হয়ে গেছে, ঘাড় ভেঙে গেছে। বিবরণ এই!

এ শুনে কার না ঘৃণা হবে, কার না লজ্জা হবে, কার না ক্রোধ হবে! সুরেশ্বরের কিন্তু ক্রোধ হয়নি। সে বক্র হাসি হেসে মনে মনে বলেছিল—রায়েরা সব পারে। ওই হাসিটুকু হেসেই সে নিজের ঘরে ঢুকেছিল। বসেছিল রঙ তুলি নিয়ে।

আঁকতে চেয়েছিল বীভৎস একটা কিছু। কিন্তু তা পারেনি। যত এবং যেমন বীভৎস সে আঁকতে চায় তা কি করে কোন্ কল্পনায় কোন্ রেখায় কোন্ রঙে ঠিক ফুটবে তা তার ধারণায় আসেনি।

আইভরি ব্ল্যাকের একটা বড় টিউব মোটা তুলি দিয়ে একখানা ক্যানভাসে লেপেছিল। কিন্তু তা মনে হয়েছিল যেন নিদ্রানিথর একটি শান্ত অমাবস্যার রাত্রি। সে তো বীভৎস নয়।

* * * *

ভেবেছিল অনেক! রায়বংশ এমন হল কেন?

অনেক ভেবে সে দায়ী করেছিল ধর্মকে এবং সম্পদকে। রায়বাড়ীর এই পরিণাম এই দুটোর জন্যে। শুধু শিবেশ্বর-ধনেশ্বর এবং গোপেশ্বরকেই তার মনে পড়েনি—তার বাবাকেও মনে পড়েছিল। তার জ্যেঠামশাই, জ্যাঠতুত ভাইদেরও মনে পড়েছে। জ্যাঠামশাই এখন প্রায় সর্বস্বান্ত। মদ্যপান করেন দিনরাত্রি। থাকেন কাশীতে। সম্বলের মধ্যে কাশীর বাড়ী। আর কিছু লুকনো অর্থ। জ্যাঠতুত ভাইরা কলকাতায় এসেছে। তারা দুই ভাই চেষ্টা করছে নূতন কিছু করবার। তাদের ইচ্ছে তারা কাঁতিহাটের দেবোত্তর পত্তনী দেওয়ার নামে বিক্রী করে, কিন্তু জ্যাঠামশায়ের অনিচ্ছায় তা পারে না। দিনের বেলা কয়লার আপিস মহলে ঘোরে, আর রাত্রে দুই ভাই এক সঙ্গে খোলার বস্তিতে রাত কাটায়। মধ্যে মধ্যে গাড়ী কেনে। মাঝে মাঝে খবর পায়--পাওনাদারেরা রাস্তার মধ্যে গাড়ী আটকে তাদের গাড়ী থেকে নামিয়ে দিয়ে গাড়ী দখল করে নিয়ে চলে গিয়েছে।

নায়েবই এদের কথা মনে করিয়ে দিল সুরেশ্বরের। বললে—এই বিপদের মধ্যে বিপদ, বড়বাবুর কাঁতিহাটের বাড়ীর অংশ—যা মানে দেবোত্তর নয়,—তা মাড়োয়ারীরা ক্রোক

করেছে। নিলেমে তুলবে।

হেমলতা বললেন—না। তা তো হতে দিতে পারব না!

সুরেশ্বর উঠে চলে গিয়েছিল।

৯

সুরেশ্বরের জীবনকে কিন্তু এতে আর বিষণ্ণ বা বিমর্ষ করতে পারেনি। পাগলামি কিছুটা তারও আছে। সেটাই যেন বেড়ে গেল। পাগলামি বটে কিনা সেটা পাগল-বিশেষজ্ঞ-বলতে পারেন। সুরেশ্বর তা ভাবে না, কারণ মধ্যে মধ্যে নিজেরই যে মনে হয় সে একটু পাগল। পাগল সে ততক্ষণ হতেই পারে না, যতক্ষণ পাগলামিকে পাগলামি বলে নিজের সন্দেহ হয়। সে সন্দেহ তার হতো। শুধু সন্দেহ নয়—ভয়ও হতো। তাদের রক্তে যে পাগলামির মত, একটা দুরন্ত ব্যাধির মত কিছু আছে তাতে তার সন্দেহ ছিল না। সেগুলো মধ্যে মধ্যে প্রকাশ পেতো নিজের অজ্ঞাতসারেই। এবার তাতে জোর ধরল। সব থেকে বেশী প্রকাশ পেতে লাগল সেটা তার বেশভূষা এবং স্টাইলের মধ্যে। হঠাৎ চুল-দাড়ি দুই রেখে ফেললে সে।

একেবারে প্রথমে সে তখন পাঁচ-ছ'দিন কামায়নি। মা তাকে দেখে বললেন—ও কি, কামাস নি কেন?

দাড়ির খোঁচায় হাত বুলিয়ে বললে—ও একটা ঝঞ্ঝাট।

—ঝঞ্ঝাট? কামানো?

—হ্যাঁ।

—তাই বলে কামাবিনে?

—দাড়ি রাখলে ভাল লাগবে না?

—বাপের মত?

—না। ফ্রেঞ্চকাট-টাট নয়। আদি ও অকৃত্রিম ইণ্ডিয়ান স্টাইল।

—না। দাড়ি রাখতে হবে না।

সুরেশ্বর বলেছিল—আমার সেল্‌ফ-পোর্ট্রেটে আমি দাড়ি-গোঁফ এঁকে দেখেছি আমাকে খুব ভাল মানাবে মা!

মা তবুও বলেছিলেন—না না! কামিয়ে ফেল!

—দোহাই মা। এই তো কিছুদিন হল সাবালক হয়েছি বলে একগাদা কাগজপত্রে সই করলাম। কিন্তু বিষয়কর্ম তোমার হাতে রয়েছে, থাকবে। ওখানে আমি নাবালকই থাকব। এই একটা জায়গায় আমাকে সাবালক হতে দাও।

—এ উদ্ভট খেয়াল তোর হল কেন বল তো?

—ওই যে মা, অশৌচ পালন করতে ক'দিন কামাইনি, দাঁড়ি-গোঁফ বেরিয়েছিল, তা থেকেই বুঝলাম, খুব ভাল মানাবে আমাকে দাড়ি-গোঁফে। তারপর পোর্ট্রেটে এঁকে দেখলাম। আর বিশ্বসুদ্ধ লোক দাড়ি কামাচ্ছে যখন, তখন এটা একটা অসাধারণ কিছু হবে।

মা কিছু আর বলেন নি। ছেলের সম্পর্কে রায়বংশের বংশধর বলে তাঁর মনে একটা আশঙ্কা আছে। ছেলে যা কিছু উদ্ভট-উৎকট করে, তাই দেখে তিনি শঙ্কিত হন। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত সে ভয়ঙ্কর পথে পা না বাড়ায়, ততক্ষণ তিনি বলতে গিয়েও বলতে পারেন না।

তিনি শুধু একটা জায়গায় সতর্ক হয়ে আছেন এবং শেষ দিন পর্যন্ত থাকতে চান। সেটা বিষয় ও অর্থের অধিকার। এটাই সব তা তিনি স্বীকার করেন না। তবে এটা যে অনেকখানি, তা তিনি উকিলের ভাগ্নী এবং জমিদারের বধূ হয়ে স্পষ্ট বোঝেন, তাঁর জীবন তাঁকে মর্মে মর্মে বুঝিয়েছে। একটা কথা যোগেশ্বর বলতেন তাঁকে। হেমলতা যখন তাঁকে কাগজ বের করতে বলেন, তখন বলেছিলেন ; তারপরও বলতেন। বলতেন—দেখ, কাগজ শুধু কাগজ নয়, ব্যবসায়ও বটে। তাই বা কেন, আগে ওটা ব্যবসা, পরে ওটা কাগজ বা কাগজের মতবাদ—দেশের কল্যাণ। ব্যবসা করে টাকা আসে। এবং সেইটেই বড় হয়ে দাঁড়ায় ক্রমে। তখন বাজনার তালে গায়কদের নিয়ে যাওয়া যায় না, গায়করা বেতালা গাইলেও তার সঙ্গেই তাল মানিয়ে চলতে হয়! তা টাকার তো প্রয়োজন নেই আমার। টাকা তো রয়েছে। অর্থ পুঞ্জীভূত হলেই অনর্থ এবং বিষয় বিপুল হলেই বিষ।

তাই বিষয় অর্থ তিনি ধরে রেখেছেন এই রোগশয্যায় শুয়েও। মধ্যে মধ্যে ভাবেন—ওই তিন লক্ষ টাকা সেদিন যদি যোগেশ্বরের নিজের হাতে না থাকত! একখানা চেক কেটে যদি ফরেন এক্সচেঞ্জে পরিণত করতে না পারতেন, তবে কি তিনি তিন-চারদিনের মধ্যে চন্দ্রিকাকে নিয়ে জাহাজে চড়তে পারতেন? তবে পাগলের মত দেশেই পালিয়ে বেড়ানো অসম্ভব ছিল না। কিন্তু তাতে কি চন্দ্রিকাই রাজী হত? হত না বলেই তাঁর ধারণা!

তাই ছেলে ছবি আর গান-বাজনা নিয়ে ঘরের মধ্যে মেতে আছে, তাতে তিনি নিশ্চিন্ত আছেন। এবং ছেলে দাড়ি-গোঁফ রাখছে—তা রাখুক। আপত্তি করেননি।

সুরেশ্বর বাড়ী থেকে বের হত না। ওই আর্ট এক্‌জিবিশন দেখতে যাওয়া, কখনও যামিনী রায়ের বাড়ী, কখনও হঠাৎ শান্তিনিকেতন যাওয়া, যাওয়ার গণ্ডীটা এর মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। শান্তিনিকেতনে গিয়ে রবীন্দ্রনাথকে দূর থেকে দেখেছে। কাছে যায়নি। একান্তভাবে যাত্রীর মতই যেত—চলে আসত। নিজেকে আর্টিস্ট বলেও কোথাও জাহির করত না। মধ্যে মধ্যে পায়ে হেঁটে বেড়াত গঙ্গার ধার থেকে চৌরঙ্গী পর্যন্ত। আর যেতো সে সাহিত্য-সম্মেলনে, যেখানে আধুনিক সাহিত্যিকরা সমবেত হতেন। পরিচয় গ্রুপের সুধীন দত্ত, নীরেন রায় এঁদের দেখেছে। অতুল গুপ্তকে দেখেছে। শরৎচন্দ্রের বাড়ী দেখে এসেছে। কখনও কখনও নব্যপন্থী কাগজের আপিসের সামনে দিয়ে ঘুরেও আসত। আর যেতো ভাদুড়ীমশায়ের থিয়েটারে নাটক দেখতে। আর্ট থিয়েটার তখন উঠে গেছে, রঙমহল হয়েছে, নাট্যনিকেতন হয়েছে, সেখানেও যেত। দক্ষিণ কলকাতায় আশুতোষ কলেজে কিছুদিন আগে প্রগ্রেসিভ রাইটার্স কনফারেন্সে সে সামনের সারিতে আসন সংগ্রহ করে সব বক্তৃতা মন দিয়ে শুনে এসেছে। বিবাহের চেয়ে বড় এবং প্রাচীর ও প্রান্তর বইখানার নাম তার খুব ভাল লেগেছে। এমনি মন তখন তার। হয়তো এর কারণ এই যুগের ছেলে, এই যুগের নিঃশ্বাস নেয়—তাও বটে ; গণবিপ্লবের ভূমিকা উনিশ শো তিরিশে—তার জেলের অভিজ্ঞতা ও তার কৃতকর্মও

বটে। তা ছাড়াও হয়তো গভীর অন্তস্তলে আরও কিছু আছে। নিজের বংশের ধারাকে সমর্থনও বটে আবার তার প্রতি বিদ্বেষও বটে। কারণ যাই হোক, ব্যাপারটা বলতে গেলে এককালের ল্যাংড়া গাছের মিষ্টি আম, স্বাদে টক হয়ে যাওয়ার মত ব্যাপার। কথাটা সুরেশ্বরের নিজের কথা। সে বলেছিল তার মামাতো ভাইবোনেদের। অর্থাৎ হেমলতার মামাতো ভাই ব্যারিস্টার প্রবীর চ্যাটার্জির ছেলে-মেয়েদের। মেলামেশা অর্থাৎ পরিচয়ের ঘনিষ্ঠতাসূচক মেলা-মেশা এদের সঙ্গেই ছিল তার।

বাইরের অনেকে তাকে চিনত, সেও তাদের চিনত—সে শুধু চেনা-জানাই। সকলের দৃষ্টিই তার প্রতি নিবদ্ধ হত তার চেহারার জন্যে। সুপুরুষ দীর্ঘাকৃতি যুবক—চলায়ফেরায়, কথায়-বার্তায়, দৃঢ়তা এবং শালতা, তার উপর বেশভূষার বৈচিত্র্য—এসব দেখে তাকে লোকে চিনতে চাইত এবং চিনে রাখতও। কিন্তু আলাপ সে ঘনিষ্ঠভাবে করতে চাইত না। তার কারণ ছিল—কীর্তিহাটের রায়বংশের নাম, আধুনিকদের কাছে খুব পরিচিত না হলেও, যোগেশ্বরের নাম অনেকে জানত এবং দেশদ্রোহিতার অপবাদে সে-নাম খুব প্রীতিপদ ছিল না। সে যখন জেল থেকে বণ্ড দিয়ে চলে আসতে চেয়েছিল, তখন সকলেই বলেছিল—জে রয়ের ছেলে যে! তাছাড়া তার বাপের চন্দ্রিকাকে নিয়ে ইয়োরোপ চলে যাওয়ার কথাটাও গোপন নেই। সুতরাং ঘনিষ্ঠ হতে সে চাইত না। তাতে সুবিধে এই যে, ভদ্রতার ঢালের আড়াল দিয়ে চলা যায় এবং তাতেও যদি কেউ ভদ্রনীতি উপেক্ষা করে আঘাত করে, তবে সেখানে তীরের বদলে ভল্ল নিক্ষেপে বাধা হয় না। সে-ক্ষমতা সে রাখে।

মেলামেশা তাই অতি নিকট-আত্মীয়তার মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। মামাতো বোন দুটি—একটির বয়স সতেরো, অন্যটি পনেরো, ভাইটি ছোট। সীমা-অসীমা-প্রদীপ। সীমা তাকে বলেছিল —তুমি কি হচ্ছ সুরোদা?

—আমি আমি হচ্ছি! যেমন তুমি তুমি হচ্ছ।

—হেঁয়ালি করছ!

—খেয়ালী মানুষের খেয়াল অনেক সময় হেঁয়ালী বলে সন্দেহ হয়।

—কথায় প্যাঁচ কষো না। দিন দিন কুনো হয়ে যাচ্ছ না?

—বন থেকে কোন নিরাপদ স্থান, আরামদায়কও বটে। আমি বন্য নই তো!

—বাবার কাছে একজন মক্কেল এসেছিল তোমার জাঠতুতো দাদাদের নামে নালিশ করতে। তারা বলছিল—রায়েরা আগাগোড়া হাড়ে হাড়ে টক হয়ে গেছে। তোমার নামও করছিল। আমিও তা সমর্থন করছি—কি বলার আছে তোমার?

সুরেশ্বর বলেছিল ওই কথা—ল্যাংড়া আম কালে স্বাদ বদলে টক হয়ে যায় নজীর আছে। হয়তো হয়েছি। কিন্তু তার উপায় কি? ওই লোকটি এসেছিল, আমার জ্যাঠামশায়ের শ্যালক। জ্যাঠাইমার সহোদর, এক মারোয়াড়ীর সঙ্গে কয়লার ব্যবসা করেন। তিনি দুবার এর আগে ইনসলভেন্সী নিয়েছেন। তাতে বেশ পোস্টাই হয়েছে। এবার জ্যাঠামশাই ইনসলভেন্সী নিয়েছেন। তাঁর টাকা ডুবেছে। তাই তিনি আমাদের কীর্তিহাটের ভদ্রাসন ক্রোক করে-

ছিলেন। কিন্তু আমার মা-র তা সয়নি। তিনি বাড়িটায় জ্যাঠামশাইয়ের অংশ কিনে বাঁচিয়েছেন। আমার কাছেও তিনি এসেছিলেন। সুতরাং আমাদের অম্লত্বের স্বাদ তিনি প্রত্যক্ষভাবে আস্বাদন করেছেন। তবে কি জান সীমা, স্বাদের ব্যাপারটা জিহ্বার উপর নির্ভর করে। কেউ বলে হাড়টক। কেউ বলে অম্লমধুর।

—ওরে, বাপরে! আত্মপ্রশংসায় পঞ্চমুখ! তা ঘরে বসে আমার সামনে করলে কি হবে? বাইরে বেরিয়ে কর! তবে তো বুঝি! ছবি আঁকবে কাউকে দেখাবে না। গান গাইবে, বাজারে কাউকে শোনাবে না! এত অহংকার কেন তোমার?

—সে তো তোমার কাছে নেই। চল নতুন ছবি দেখাই। তারপর গান শোনাব। তবে বাইরের লোকের কাছে অহংকার আমার বেঁচে থাক—তাতে তোমার সঙ্গে কোঁদল করবার পথটা দিন দিন প্রশস্ত হবে।

সীমা আবদার করে তার হাত ধরে বলত—না, তোমার কথা কিছুতেই শুনব না। আমাদের বাড়ীতে, না আমাদের বাড়াতে হলে তোমার ছবি দেখানো হবে না, এই বাড়ীতেই আমার বন্ধুদের একদিন নিমন্ত্রণ করব। তোমাকে ছবি দেখাতে হবে, গান শোনাতে হবে। হবেই হবে। আমার এক নাকউঁচু বান্ধবী আছে, সুলতা ঘোষ, তাকে একবার সব দেখাতে চাই।

—সুবিধে হবে না। আমি বৃক্ষটি ঠিক যাকে সহকার বলে তা নই। বলতে পার শাল্মলী বৃক্ষ। অর্থাৎ শিমুল গাছ।

—ওঃ, সুলতা নাম শুনেই ধরে নিলে আমি তোমাকে তার সহকার করে, তাকে কাঁধে চড়িয়ে দিতে চাই?—সে লতা হলে যাকে বলে কণ্টকলতা তাই। বেতসলতা মশাই, তারও কাঁটা আছে। এবং তা দিয়ে যে আঘাত তাকে বলে বেত্রাঘাত!

—অথবা নিতান্ত মাঠে যে কুমড়ো খেঁড়োর লতা হয় তাই!

—বাবাঃ! হার মানলাম।

—আমি খুশী হলাম। চল আগে বাজনা শোন।

এইভাবেই সে গড়ে উঠেছিল আপনার আবেষ্টনীর মধ্যে—সে লোহার জাফরীঘেরা গাছের মতই হোক আর একান্তে একেবারে উন্মুক্ত প্রান্তরে একক একটি গাছের মতই হোক, মোটামুটি সোজা সিধে হয়েই উঠে চলেছিল।

এরই বছরখানেকের মধ্যে অর্থাৎ উনিশ শো চৌত্রিশ সালে হঠাৎ হেমলতার হাটের অসুখ বেড়ে উঠে শক্ত হয়ে দাঁড়াল।

একটা কারণ ঘটেছিল। সুরেশ্বর বাড়ী ছিল না, সে গিয়েছিল একজন জাপানী আর্টিস্ট এসেছেন তাকে দেখতে। ইতিমধ্যে এসেছিল একটি মহিলা, সে সটান এসে বাড়ীর ভিতর অতি পরিচিতের মত একেবারে হেমলতার কাছে এসে উপস্থিত হয়েছে। হেমলতা তাকে দেখে চমকে উঠেছিলেন ভূত দেখার মত। যে এসেছিল সে চন্দ্রিকা। সে ভারতবর্ষে ফিরেছে। সে ক্ষমা চাইতে এসেছিল হেমলতার কাছে। তার কাছে সে বিশ্বাসঘাতিনী। হেমলতাই সমাদর করে তাকে নিমন্ত্রণ দিয়ে বাড়ীতে এনে যোগেশ্বরের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিল।

*

সে যোগেশ্বরকে প্রলুব্ধ করে তার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছিল। কথা এইটুকু। তার মূল্য চন্দ্রিকার গ্লানি থেকে মুক্তি কিন্তু হেমলতার কাছে তার মূল্য আরও অনেক। তার জন্য তার জীবন দিতেও আক্ষেপ হয়নি। চন্দ্রিকা বলে গেছে—দেখ, তোমাকে সিস্টারই যদি বলি, তবে ঘৃণা করে না বলো না। আমি প্রাণপণে চেষ্টা করেছি তাকে সুখী করতে। বিলিভ মী। কিন্তু সে সুখী হয় নি। একদিনের জন্যও না। সে বলত কি জান? বলত—হেমলতা was my life, and you চন্দ্রিকা তুমি আত্মহত্যার মৃত্যু, তুমি অতি সুন্দরী, তুমি মনোহারিণী, আত্মহত্যার মত মনোহারিণী। মৃত্যুতে মানুষ শান্তি পায়, আত্মহত্যার মৃত্যুতে পায় না। If there is a life after death তবে, আত্মহত্যার মৃত্যুতে শান্তি পায় না—এটা শাস্ত্রের সত্য নয়, লজিকের সত্য। বেশী মদ খেলে কাঁদত। আমাকে মারত। আমি বলতে এসেছি—আমি তাকে তোমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারিনি। ডাকাতি করেও পারিনি। শান্তি আমি পেয়েছি। কিন্তু তুমি আমাকে ক্ষমা কর।

এবং দিয়ে গিয়েছে কিছু কাগজপত্র। যেটা যোগেশ্বরের মৃত্যুর পর তার হাতে পড়েছিল। তাই সে দিয়ে গেছে। হেমলতা শুনেছিলেন আর কেঁদেছিলেন। চন্দ্রিকা চলে যাবার পরও পড়ে পড়ে কাঁদছিলেন, এরই মধ্যে উঠেছিল হার্টের রোগ।

রোগের এই আক্রমণেই হেমলতার মৃত্যু হল। পনের দিন অতি নিষ্ঠুর যন্ত্রণা ভোগ করেছিলেন। দিনের মধ্যে প্রায় অর্ধেকটা সময় কিছুটা সুস্থ থাকতেন, তাও একনাগাড় একটানা অর্ধেক দিন নয়। কিছুক্ষণ একটু ভাল, তারপরই আবার বুকের যন্ত্রণা উঠত।

চিকিৎসার ব্যবস্থার ত্রুটি তো ছিলই না—আতিশয্যই হয়েছিল বলতে হবে। ডাক্তার-নার্স বলতে গেলে মোতায়েন ছিল। বড় কনসাল্টিং ফিজিসিয়ান দিনে একবার নিয়মিত আসতেন। একজন অল্পবয়সী ডাক্তার প্রায় অর্ধেক দিনেরও বেশী থাকতেন। দিনে আসতেন দুবার। এবং রাত্রে ন'টার পর এসে এখানেই শুতেন। নার্স দুবেলা দুজন। রাত্রে একজন, দিনে একজন। সুরেশ্বর মায়ের পাশের ঘরেই শুতো। সে এসে বসে থাকত জানালার ধারে একটা চেয়ারে।

মা মধ্যে মধ্যে কাছে ডেকে বলতেন—যা, শুগে যা। এখন ভাল বোধ করছি।

বললেই সে চলে যেত। কিন্তু আধঘণ্টা বা একঘণ্টা পরই সামান্য শব্দ শুনলেই নিঃশব্দে মাঝের দরজাটি খুলে সেখানে দাঁড়াত। বিশেষ কিছু না হলে ফিরে যেত, না হলে ধীরে ধীরে এসে ওই চেয়ারখানিতে বসত।

এরই মধ্যে পনের দিনের দিন হেমলতা চলে গেলেন। বুঝতে তিনি পেরেছিলেন। ছেলেকে ডেকে কাছে বসিয়ে বলেছিলেন—আমাকে যেতে হবে রে। ভেঙে পড়িসনে যেন!

সুরেশ্বর আত্মসম্বরণ করেও করতে পারেনি। কথা না বলে ঘাড় নেড়ে জানিয়েছিল—না, তা সে ভেঙে পড়বে না। কিন্তু চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়েছিল দুটি ধারায়।

হেমলতা বলেছিলেন—কাঁদছিস?

সে মাটির মূর্তির মত স্থির হয়ে বসেছিল। হেমলতা বলেছিলেন—চোখ মোছ।

একবার সে মুছেছিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই আবার ধারা নেমে এসেছিল; চোখ-মুখ মুছেও

তো আর উৎসমুখ বন্ধ করা যায় না !

হেমলতা বলেছিলেন—কোন কিছু বারণ আমি করে যাব না তোকে। শুধু একটি কথা—তোর নিজের বিচারে যা অন্যায় তা করিসনে !

ঘাড় নেড়েছিল সুরেশ্বর—হ্যাঁ।

হেমলতা আর বলেছিলেন—তোকে না বলে একটা কাজ করেছি, বলে যাই তোকে। আমাকে উনি যা দিয়ে গিয়েছিলেন, সেটা থেকে আমি কীর্তিহাটে তোর জ্যাঠামশাইয়ের সবই কিনেছি। দেবোত্তর পত্তনী নিয়েছি, বাড়ী কিনেছি। ওখানকার খরচ যেন কমাসনে। আর মেজতরফ যেমন খেতে পায় তেমনি যেন পায়। মেজখুড়ীমাকে পঞ্চাশ টাকা করে পাঠানো হয়। বন্ধ করিসনে। আমি জানি দেবতায় তোর বিশ্বাস নেই। কিন্তু ওটা পূর্বপুরুষের কীর্তি।

মৃত্যুর একদিন আগের কথা। পরের দিন সকাল নটায় তিনি আধবসা হয়ে বসে থাকতে থাকতেই প্রায় নিঃশব্দে চলে গেলেন। কেউ বুঝতেও পারলে না।

সুরেশ্বর দুবার শুধু ডাকলে—মা ! মা !

মা স্থির নিথর। সে গায়ে হাত দিলে। নার্স ডাক্তারকে ডাকলে। সে পাশের ঘরেই ছিল—ইনজেকশন তৈরী করছিল। সে এসে দেখে বললে—একস্‌পায়ার্ড !

সুরেশ্বর সেই চুপ করে মায়ের গায়ে হাত দিয়ে মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল।

সেইদিন সন্ধ্যায় যখন সে ফিরল, তখন সে ভাঙা মানুষ। মায়ের শবদেহ যতক্ষণ ছিল তখনও পর্যন্ত সে যেন ব্যাপারটা ঠিক বোঝেনি। মায়ের দেহ চিতায় চাপাতেই সে কল্পনায় কি হবে তা বুঝে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠেছিল। সৎকারে এসেছিল ব্যারিস্টার মামা এবং তার দুই জ্যেঠতুতো ভাই। আর তাদের কাছে সংবাদ পেয়ে এসেছিল ধনেশ্বরের বড় ছেলে ব্রজেশ্বর। সে নাকি এখন এক কোটীপতি শেঠের বাড়ী চাকরি করে।

ব্যারিস্টার মামা প্রবীর চ্যাটার্জি রুমালে চোখ মুছে তাকে ধরে বললেন—এ কি, এ কি, তুমি এমন করে কাঁদবে ! না-না-না ! আমি তো তোমাকে খুব স্ট্রং নার্ভ শক্ত মানুষ বলে জানতাম ! ও-নো। ডোনট ক্রিয়েট এ সিন ! লোকে বলবে কি ? দেখ রবীন্দ্রনাথের ছোট ছেলে শমীন্দ্রনাথ যখন মারা যান। তখন তাঁর কথা তুমি জান। মা কি কারুর চিরকাল থাকে ! ছি ! চল এখন সরে গিয়ে দূরে বসবে চল !

—না। চোখ মুছে সে প্রায় নিষ্পলক দৃষ্টিতে মায়ের দেহ পুড়ে ছাই হতে দেখেছিল শেষ পর্যন্ত !

পাশে এসে বসেছিল খুড়তুতো ভাই ব্রজেশ্বর। ব্রজেশ্বর তার থেকে বয়সে বছর তিনেকের বড়। ধনেশ্বর যোগেশ্বরের থেকে বয়সে বছর দুয়েকের ছোট হলেও বিবাহ করেছিল প্রায় পাঁচ বছর আগে।

ব্রজেশ্বর প্রিয়দর্শন। কিন্তু দেহে দুর্বল। সম্ভবতঃ অভাব তার কারণ। বেশ ছিমছাম ফিট-ফাট। সে এসে সুরেশ্বরের পাশে চুপ করে বসেছিল। প্রগল্‌ভতা করেনি। তাকে বোঝাতে চায়নি। শুধু বসেই ছিল। মধ্যে মধ্যে সিগারেট খাচ্ছিল।

হঠাৎ সে এক সময় গুন গুন ক'রে সুর ভেঁজে ক্রমে ক্রমে কণ্ঠস্বর উচ্চ করে গান গেয়ে উঠেছিল—"ছাড়িয়ে সংসার কোথা চলে যাও দীনহীন বেশ ধরিয়ে—।"

কণ্ঠস্বর তার সত্যকারের সুস্বর। গানটিও এই ক্ষেত্রের উপযোগী। "তখনকার কালে এ গানটির চল ছিল। সংসারের সব পিছনে ফেলে দীনহীনের বেশে কপালে তিলক নিয়ে কোথায় চলেছ তুমি? একবার পিছন ফিরে তাকাও। বলে যাও, কোথায় যাবে আপনার ব'লে যাদের বুকে ধরেছিলে এতদিন তাদের ফেলে!"

শ্মশানে গান সহজবুদ্ধি যাদের তারা হয় তো গায় না কিন্তু কীর্তিহাটের ধনেশ্বর রায়ের ছেলে ব্রজেশ্বর রায়ের পক্ষে সে কথা খাটে না। তাছাড়া গানটি এমন কালোপযোগী এবং এমন বেদনা দিয়ে সে গাইলে যে আবার সুরেশ্বরের স্তব্ধ হয়ে যাওয়া আবেগ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। আবার তার চোখ দিয়ে দরদরধারে জল গড়াতে লাগল।

বাড়ী ফিরতে সন্ধ্যে উত্‌রে গিয়েছিল; নিম মুখে দিয়ে মিষ্টিজল খেয়ে সকলে চলে গেল; জ্যেঠতুতো ভাইরা চলে গেল, ব্রজেশ্বর শুধু বললে—বল তো আমি রাত্রিটা থেকে যাই ভাই সুরেশ্বর। একলা থাকবে?

সে বলেছিল—বেশ তো! থাকুন। বলেই উপরে চলে গিয়ে সে মায়ের ঘরের মেঝেতেই শুয়ে পড়েছিল কম্বল পেড়ে।

নায়েব ম্যানেজার হরচন্দ্র প্রাচীন, বহুদর্শী কর্মক্ষম বিশ্বস্ত লোক, সে যথাবিধি ব্যবস্থার খুঁত থাকতে দেয় নি। সুরেশ্বর বলেছিল—দেখবেন, যেন মায়ের অশৌচে শ্রাদ্ধে কোন খুঁত বা ত্রুটি আমার না হয়।

হরচন্দ্র বলেছিল—সে তুমি ভেবো না। সে কোন খুঁতই হবে না। ভাবছি হবিষ্যির জন্যে। কে রান্না করে দেবে?

—আমি নিজেই করে নেব। না-পারার মত কিছু নেই।

পরদিন সকালে উঠে চাও সে খায় নি। অপেক্ষা করেছিল পুরোহিতের জন্য, যার কাছে সব জেনে নেবে। এই সময় উপরে উঠেছিল ব্রজেশ্বর। বললে—তা হ'লে 'আমি চলি ভাই-রাজা!

সুরেশ্বর সবিস্ময়ে মুখ তুলে তাকালে। ভাইরাজা সম্বোধন শুনে সে বিস্মিত হয়েছে।

ব্রজেশ্বর হেসে বললে—খোসামোদ ক'রে বলি নি ভাই। ওটা রিপ্ত হয় নি। তবে কাল তোমার যা মায়ের উপর টান ভক্তি দেখলাম—মনটির পরিচয় পেলাম—তাতে তুমি রাজা। তা ছাড়া চেহারাতেও তাই। পয়সার কথা বলব না,—জ্ঞাতিতে বললে হিংসে হয়। অন্যে বললে ভিক্ষে চাইবে মনে হয়। রাজা তুমি রূপে-গুণে মনে মেজাজে! তা ছাড়া ছোট তুমি, আশীর্বাদও করছি!

ব্রজেশ্বরের জিহ্বা এবং কণ্ঠস্বরে মধু আছে। ভাল লাগল সুরেশ্বরের। সে বললে—আসবেন আবার!

—নিশ্চয় আসব রাজা! বলতে গেলে কাল সব বুঝে তো বিনা খাজনার প্রজা হয়ে গিয়েছি। সেলাম দিতে নিশ্চয় আসব! এত দিন আছি আসি নি। পরিচয়টা ঠিক হয়

নি, তোমাকে ঠিক বুঝি নি, তাই আসি নি। ভেবেছিলাম কি জানি কাঁটায় ছড়ে যাবে কাছে গেলে। এ যে জুড়িয়ে গেল রাজা। শ্রাদ্ধ এখানেই করবে? না যোগেশ্বর জ্যাঠার শ্রাদ্ধের মত কীর্তিহাটে যাবে?

—না। এখানেই হবে!

—সেই ভাল! অনর্থক রাশি রাশি টাকা খরচ করে কতকগুলো লোভী বামুন খাইয়ে আর—। এইখানেই কর।

১০

মাতৃশ্রাদ্ধ তাকে যেন হঠাৎ একটা নতুন জীবনে নতুন রাজ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে গেল। অতি সাধারণ এবং ভাবসর্বস্ব মানুষ হ'লে সে নিশ্চয়ই ভাবত—তার মা মরজগতের ওপার থেকেই পরম স্নেহে তাকে হাত ধরে এনে এই জীবনে ঢুকিয়ে দিয়ে গেলেন। দুঃখ ভুলিয়ে দিতেই করলেন এটা। কিন্তু সুরেশ্বর তা ভাবলে না। এটা হবেই সে এটা জানত, দুদিন আগে আর দুদিন পরে। এবং এর কারণ তার কাছে স্পষ্ট।

মায়ের শ্রাদ্ধ সে কলকাতাতেই করলে এবং সংক্ষেপে করতে গিয়ে করতে পারলে না শেষ পর্যন্ত। মনটা কেমন খচ খচ করতে লাগল।

নায়েব তাকে প্রথম দিনই তার আর্থিক এবং বৈষয়িক সম্পত্তির একটা পরিষ্কার হিসেব বুঝিয়ে দিয়েছিল। কীর্তিহাটের সাড়ে আট আনা দেবোত্তর এখন তার হাতে এসেছে। তার পিতামহ ছোট ভাইয়ের পাঁচ আনা অংশের মহাল অর্ধেক পত্তনী নিয়েছিলেন এবং তিনি ব্রাহ্ম হয়ে গেলে মূল স্বত্বেরও অর্ধেক তাঁতে বর্তেছিল। তাতে হয়েছিল তাঁর সাড়ে আট আনা! এর অর্ধেক চার আনা পাঁচ গণ্ডা ছিল তার জ্যেঠা মশায়ের। বৎসরখানেক পূর্বে তার মা হেমলতা দেবী ভাসুরের দেবোত্তরের মুনাফা পত্তনীর সামিল করে বন্দোবস্ত নেওয়ায় বলতে গেলে সাড়ে আট আনাই তার হয়েছে। বার্ষিক দেবখরচ বরাদ্দ বারো হাজার বাদে কুড়ি হাজার মুনাফার সাড়ে আট আনা এখন তার। এ ছাড়া কলকাতার বাড়ীভাড়া মাসিক তিন শো টাকা হিসাবে ছত্রিশ শো টাকা এবং কেনা শেয়ারের ডিভিডেণ্ড থেকে বার্ষিক চার পাঁচ হাজার আসে। নগদ টাকা তার অংশের পঞ্চাশ হাজার বেড়ে এখন পঁয়ষট্টি হাজারে পৌঁচেছে। তার মায়ের টাকা সামান্যই মজুদ আছে, হাজার আষ্টেক, বাকী টাকা অর্থাৎ ভাসুরের সম্পত্তি এবং বাড়ী তিনি কিনবার জন্য তাঁকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়েছিলেন।

হরচন্দ্র বলেছিল—বাবা, আয় এখন তোমার বিশ হাজার টাকা। এ যদি তুমি হিসেব করে চলতে পার তবে তোমার পর আর দুপুরুষ পর্যন্ত সুখে চলে যাবে। তোমার বাবা তাঁর নিজের জীবন নিয়ে বেহিসেবি চালে চলেছেন। সম্পত্তিতে বেহিসেব করেন নি। দু লাখ টাকা তিনি নিয়ে গিয়েছিলেন কিন্তু তিনি নিজে জীবনে কোনদিন বসে খান নি। দু হাতে রোজগার করেছেন! তোমার মা ছিলেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। তাঁর টাকা থেকে বড় কর্তার

ওই সম্পত্তি কিনে যে কাজ করে গিয়েছেন, তার তুলনা হয় না।

সুরেশ্বর বলেছিল—মায়ের টাকাটা দিয়ে আমি কীর্তিহাটে মেয়েদের জন্যে একটা ইস্কুল করে দিতে চাই। ম্যাট্রিক ওখানে চলবে না—এম-ই স্কুল এবং ওটা ফ্রি হবে। মায়ের সম্পত্তি থেকে খরচ চলবে।

হরচন্দ্র বলেছিলেন—খুব ভাল কথা। তিনি পুণ্যবতী মহিলা ছিলেন। তোমার মা। তাঁর জন্যে করবে এ তো খুব ভাল কথা। আর শ্রাদ্ধ? সে কি রকম করবে? আজ খবর আমি দিলাম। অবশ্য কীর্তিহাটেই সকলে। এক বড়বাবু আর বড়মা, তাঁরা তো কাল ছেলেদের কাছে শুনলাম এখানে আসছেন। কি একটা গোলমাল করেছে ছেলেরা তাই মেটাতে আসবেন। তা ওখানেও টেলিগ্রাম করে দিলাম। আমাদের কর্তব্য করতে হবে তো! কীর্তিহাটে করতে গেলে অনেক ঝঞ্ঝাট, আমি বলি এখানেই কর। এখানকার মত ক'রে কর। কাল থেকে ভেবেছি। ছোটবাবু সায়েবী মেজাজের লোক ছিলেন। সামাজিক খুব ছিলেন না। এবাড়ীর সঙ্গে আগে কলকাতার বড় বড় বাড়ীর যোগাযোগ ছিল। পাইকপাড়ার রাজারা, ওঁরা বলতে গেলে এ বাড়ীর মূল পত্তন ক'রে দিয়েছিলেন। দেওয়ান গঙ্গাগোবিন সিংজী রায়রাঁয়া, তিনিই লাট কীর্তিহাট কিনিয়ে দিয়েছিলেন। ওঁরা আসতেন। কৃষ্ণনগরের রাজবাড়ী, মহারাজার দেওয়ানবাড়ী এঁরা ছিলেন এক রকম অভিভাবক। বড়ই স্নেহ করতেন। রাণাঘাটের পালচৌধুরীরা আছেন ওঁরা খুব ভক্তি করতেন কর্তাদের। ঠাকুরবাড়ীর সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। পত্রাপত্র ছিল প্রায় সব রাজারাজড়াদের সঙ্গে। শুনেছি তোমার পিতামহ স্বর্গীয় দেবেশ্বর রায় মহাশয়ের বিবাহে দুটো বউভাত হয়েছিল। একটা কলকাতায় একটা কীর্তিহাটে। সব এসেছিলেন, এবং একটা ঘর ভরে গিয়েছিল জিনিসপত্রে। মূল্যবান মূল্যবান জিনিস দিয়েছিলেন। তারপর তোমার পিতামহ তো এখানে মহানামী মহামানী লোক ছিলেন। বড়বাবুর মানে তোমার জ্যাঠামশায়ের বিবাহেও এঁরা এসেছেন, তা ছাড়া বড় বড় সাহেব-সুবো এসেছেন। ছোটবাবু তোমার বাবাই এসব একরকম তুলে দিয়েছিলেন। কাগজে লিখতেন, কারুর খাতির করতেন না, যেতেন না বড় একটা কোথাও, ওই পার্টিটার্টি। তাতে তো সামাজিকতা বজায় থাকে নি। তা তুমি এবার সেটা কর। মায়ের শ্রাদ্ধে পুরনো সম্পর্ক ঝালিয়ে নাও। কত খরচ হবে? শ্রাদ্ধে দশ হাজার টাকা খরচ করলে প্রচুর হবে। একবার কেবল নিজে যাওয়া। সে তো ভাল হবে, পরিচয় হয়ে যাবে!

•

সত্যই সে যেন এক নতুন জগতে এসে পড়ল। বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক তিরিশ সালে পার হয়েছে। আইন অমান্য আন্দোলন পার হয়ে গেছে। আন্দোলন সফল হয় নি এ কথা সত্য কিন্তু বছরের মধ্যে যেমন ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কিছু গাছের ফুল ফোটা শেষ হয়ে ফুলগুলি ঝরে, নতুন গাছে ফুল ধরে, নতুন ফসল ওঠে। মানুষের পরিচ্ছদ পাল্টায়, মন পাল্টায়, তেমনিভাবে আগেকার কাল, যে কালে এই সব বড় বড় বাড়ীর দিকে বিস্ময় এবং শ্রদ্ধার সঙ্গে তাকিয়ে থাকত, সে কাল এখন বিগত ঋতুর মত; এই সব বাড়ী এই সব মানুষ

এখন শুকিয়ে আসা ফুলের মত আকর্ষণহীন। এদের সম্পর্কে সুরেশ্বরের নিজের মনোভাবও সুপ্রসন্ন নয়। তার কারণ সে জন্মাবধি তার সাহেবমনোভাবসম্পন্ন বাপের প্রভাবে প্রভাবান্বিত; তিনি সাংবাদিক হিসাবে ইংরেজকে সমর্থন করলেও এই সব দেশীয় জমিদার ধনীদের সমর্থক ঠিক ছিলেন না। এদের সম্পর্কে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা যা ছিল নিজের বংশাবলী থেকে তার সঙ্গে পরিচয়ও সুরেশ্বরের প্রত্যক্ষভাবে ঘটেছে কীর্তিহাটে গিয়ে। তা ছাড়া এই নতুন কালের বাতাসে নিঃশ্বাস নেওয়া নতুন মানুষ সে। জমিদার বংশধর হয়েও—জমিদারীর সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক না থাকার জন্য তার মন জোর পেয়েছিল—মনে মনে অনুভব করত এর জন্যে কোন কালি কোন গ্লানিই তাকে স্পর্শ করে নি। বাপের জোর ছিল, তিনি খেটে খেতেন। এই মনের জোরে সে এদের থেকে নিজেকে আলাদা ভেবেছে—আলাদা থেকেছে এবং মনে মনে অবজ্ঞা ঘৃণাও করেছে। কিন্তু নিমন্ত্রণ করতে গিয়ে এদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করে সে বিস্মিত এবং মুগ্ধ হল।

মুগ্ধ করলে তাকে তাদের সৌজন্য, তাদের শীলতা। বিস্মিত হল সে এই দেখে যে, তারাও তার চেয়ে কম আধুনিক নয়। ভাল লাগল তাদের রুচি। চমকে গেল সে এই দেখে যে এদের অবস্থার চারিদিকটা পুরনো আমলের ভারী অলঙ্কারের গড়নের মত বেমানান এবং স্থূল হয়ে গেলেও—জহরতের ছটায় ও শোভায় জৌলুসের মত একটা জৌলুস এখনও বুকে ধরে রেখেছে।

কিছু কিছু এ-সব মানুষের ধারা-ধরন চাল-চলনে দম্ভ আছে, বিলাসের উগ্রতাও আছে; অনেকের ব্যভিচার মদ্যপানের প্রকাশ্য অখ্যাতিও আছে, কিন্তু এদের মধ্যে এমন সব লোক রয়েছে যারা ধারালো ছুরির মত বুদ্ধিদীপ্ত। বিদ্যানুরাগী। এটা হল তার প্রথম অভিজ্ঞতা। প্রথম আত্মীয়বাড়ী নিমন্ত্রণ সেরেই সর্বাগ্রে সে গেল পাইকপাড়ার রাজবাড়ী। রাজা বিগত। তাঁর মা আছেন তিনি মানুষ করেছেন তিন পৌত্রকে। কুমার বিমলচন্দ্র সিংহ, কুমার অমরেশচন্দ্র সিংহ, কুমার বৃন্দাবনচন্দ্র সিংহ। কুমার বিমলচন্দ্রের সঙ্গে তার দেখা হল। তার থেকে কম বয়স। সদ্য ম্যাট্রিক পাস করে প্রেসিডেন্সীতে পড়ছেন। কাঁচা সোনার মত দেহবর্ণ। বুদ্ধিবিদ্যা-দীপ্ত মন। এই বয়সেই সুরসিক ব্যক্তি হয়ে উঠেছেন। কিছুদিন আগেই এ বাড়ীতে রবীন্দ্রনাথকে এনেছিলেন—তাঁর সঙ্গে বসে ফটো তুলিয়েছিলেন—সেই ফটোটা সামনেই টাঙানো রয়েছে। যামিনী রায় নন্দলালের ছবি দেওয়ালে ঝুলছে।

মিষ্টভাষী মানুষটির মুখে হাসি লেগেই আছে। অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে গ্রহণ করলেন তিনি। বললেন—নিশ্চয় যাব। আপনাদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক তো অতিনিকট এবং খুব প্রীতির। দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের দুর্নাম দেশের লোক যাই করুক—সেদিন তিনি পার্মানেণ্ট সেটেলমেণ্টের সময় এগার ভাগের দশ ভাগ রেভেন্যু করেছিলেন বলেই আজও গভর্ণমেণ্ট দাঁড়িয়ে আছে। এবং যদি কোন দিন জমিদারী উচ্ছেদ হয় তবে সেদিন কম্‌পেনশেসন দেবার সময় এর উপকারিতা বোঝা যাবে। হেস্টিংস সাহেব যাবার সময় বলেছিলেন—**The regret which I cannot but feel, in relinquishing the service of my honourable employers, would be much embittered, were**

it accompanied by the reflection that I have neglected the merits of a man who deserves no less of them than of myself Gangagobinda Singh.

মস্ত বড় প্যাসেজ একটা। তা দেওয়ানজী রায়রাঁয়া বলতেন—হেস্টিংস সাহেব আমার জন্যে যা বলেছে আমাকে তাই বলতে হবে—কুড়ারাম ভট্টাচার্যের জন্যে।

আরও কয়েকজনের কাছেই সে অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরেছিল। আবার বেশ কয়েকটি বাড়ীতে প্রাচীনত্বের কড়াকড়ি এবং মনের স্থূলতা দেখে তিক্ত হয়েছিল মনে মনে। দু-একজন বলেছিলেন—তাই তো হে—তোমার বাবা তো সাহব বলে আমাদের খাতা থেকে নাম কাটিয়ে নামকাটা সেপাই হয়েছিল। আমাদের গাল দিয়েই তো করে খেয়েছে বলতে গেলে। তা তুমি আমাদের খাতায় আবার নাম লেখাতে যাচ্ছ যে? তা বেশ বেশ!

এ ছাড়া সে তার কয়েকজন বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্রকেও নিমন্ত্রণ ক'রে এসেছিল। শিল্পী যামিনী রায়, অতুল বোস এবং তার বাপের বন্ধু কয়েকজন নামজাদা সাংবাদিক হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, তুষারকান্তি ঘোষ, সত্যেন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিকেও নিমন্ত্রণ করেছিল। শিল্পী যামিনী রায় তাকে স্নেহ করতেন। শিল্পরসিক তরুণ ছেলেটিকে ভাল লাগত তাঁর। অতুলবাবুও ভালবাসতেন।

এই যোগাযোগ বিচিত্রভাবে তাকে যেন অকস্মাৎ ফ্লাশলাইটের আলোর সামনে দাঁড় করিয়ে তাকে সুপরিচিত করে দিলে, খ্যাতিমান করে তুললে। সে ভাবে নি এমন ঘটবে।

ব্যাপারটা ঘটল এইভাবে। সভামণ্ডপে দুখানি অয়েল পেন্টিং কলকাতার আধুনিক রীতি অনুযায়ী মালা দিয়ে সাজিয়ে দুখানি কাঠের চৌকির উপর রাখা হয়েছিল। তার মায়ের এবং তার বাপের।

সুরেশ্বর মাথা কামিয়ে শ্রাদ্ধে বসেছিল—অভ্যর্থনা করছিলেন তার মামা। প্রায় প্রত্যেকেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট হল ওই ছবি দু'খানির দিকে। ছবি দু'খানির বৈশিষ্ট্য হল—যেন জীবন্ত বলে মনে হচ্ছিল। প্রতিজনেই বললেন—বাঃ, ছবি দু'খানি তো সুন্দর হয়েছে! সুন্দর ছবি!

মামা প্রবীর চ্যাটার্জি প্রত্যেককেই বললেন—ও সুরেশ্বরের নিজের আঁকা।

অতুল বোস তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখে বললেন—খুব চমৎকার হয়েছে। মিস্টার রয়কে আমি দেখেছি। ছবি শুধু জীবন্ত নয়—তার সঙ্গে ক্যারেক্টার এসেছে। ওই যে হাসিটুকুতে ঠোঁট দুখানা অল্প একটু বাঁকা করে দিয়েছে একদিকে এবং চোখের তারা দুটোকে একটু করে একপেশে করে দিয়েছে তাতেই বলে দিচ্ছে What was he, ওর মাকে দেখিনি। বলতে পারব না—কিন্তু জীবন্ত হয়েছে। মনে হচ্ছে অসাধারণ ছিলেন তিনি। And তাই ছিলেন তিনি! কিন্তু সুরেশ্বর ছবি আঁকে নাকি? কই একদিনও তো বলে নি!

তারিফ সকলেই করলেন। এবং একটু করে মিষ্টমুখ করাতে উপরের ঘরে নিয়ে গিয়ে প্রবীর-বাবু বললেন—দেওয়ালে ছবিগুলোর অধিকাংশই ওর আঁকা।

যামিনীবাবু আসেন নি, তিনি ধ্যানী মানুষ এবং বেশী লোকসমাগমের মধ্যে তিনি অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। তা ছাড়া সেটা উনিশ শো চৌত্রিশ সালের শেষ—তখনও তাঁর সাধনার খ্যাতি বিস্তৃত হয় নি। জীবনের সঙ্গে তিনি যুদ্ধই করেছেন।

অতুলবাবু বললেন—যামিনীদাকে তো বলতে হবে!

কুমার বিমল সিংহ বললেন—একদিন এসে তো ভাল করে দেখতে হবে সব!

* * *

এরপর বেশীদিন লাগল না। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তার শিল্পী বলে খ্যাতি রটে গেল। যে আড়াল তার ছিল তার মা, তাঁর মৃত্যুর পর যেন শেষ আশীর্বাদে তাকে ঘুচিয়ে দিয়ে গেলেন। সে বিখ্যাত হয়ে গেল তার মায়ের ছবি থেকেই। এতকাল ধরে মায়ের বিষণ্ণ বেদনাময় জীবনের আবেষ্টনীর মধ্যে বাবার শেষজীবনের কৃতকর্মের গ্লানির জন্যে সে যে পলাতকের বা আত্মগোপনকারীর জীবন যাপন করছিল সেটা থেকে তার নিজের খ্যাতির আকর্ষণে বেরিয়ে প্রশংসার প্রসন্নদীপ্ত আলোকে এসে দাঁড়িয়ে উল্লসিত এবং কিছুটা প্রগল্‌ভ হয়ে উঠল।

মাস দুয়েকের মধ্যেই সে নিজের ছবির একজিবিশন করলে। উদ্বোধন করলেন যামিনী রায়। এবারে তিনি এলেন এবং প্রশংসা করে গেলেন। তিনি বক্তা নন তবে অকপটে সাদাসিধে কথায় বললেন—আমার ভাল লেগেছে। বেশ ভাল লেগেছে।

কাগজে প্রশংসা বের হল। কয়েকখানা ছবির ব্লক ছাপা হল। ভিড়ও হল। আলাপ হল নবীন শিল্পীদের সঙ্গে। কয়েকজন সাহিত্যিক এলেন, তাঁদের সঙ্গেও আলাপ হল। প্রবাসীর কেদার চট্টোপাধ্যায় এসেছিলেন, সঙ্গে ছিলেন অমল হোম। কেদারবাবু দুখানা ছবি প্রবাসীতে ছাপতে চাইলেন।

সেইদিনই ; সকলে চলে গেলেন আর সদলে এসে তাকে আমন্ত্রণ করলে সীমা এবং অসীমা। সদল মানে সঙ্গে কয়েকজন বান্ধবী!

—কি মহাশয়?

হেসে একটি সিগারেট ধরিয়ে সুরেশ্বর বললে—এস। সুস্বাগতম। কিন্তু প্রশ্নটা কি?

ভ্রু কুঞ্চিত করে অসীমা বললে—সে প্রশ্ন যাই হোক আপাততঃ থাক। কিন্তু এটা কি? আঙুল দেখিয়ে মুখের সিগারেটটাকে দেখিয়ে দিল!

—ওটা সিগারেট। বেশ মূল্যবান সিগারেট। ফাইভ ফিফটি ফাইভ। গেস্টদের জন্য আনানো ছিল। তাঁরা খেলেন, আমার নাকে ধোঁয়াটা গেল, প্রশংসার মদ্যের নেশায় চিত্ত তৃষিত হল বস্তুটার জন্য। মনে হল নেশা জমবে বেশ! তাই আরম্ভ করলাম।

—ভাল! মাকে বলে দেব। সুরোদা, পিসীমার মৃত্যুর দু মাস না যেতেই সিগারেট ধরেছে!

—আর এক মাস পরে বলো। তখন কামানো দাড়ি আরও ঘন এবং চাপ বেঁধে বেরুবে এবং আমাকে একজন ঋষি বলে মনে হবে। সুতরাং বলবেন—না, এ ছেলে মহাপুরুষ ছেলে, একে কিছু বলা উচিত নয়। এর বদলে ঘুষ চাও তো খুব ভালো জর্দা অথবা বিলিতী দামী

লিপস্টিক যা চাও এনে দিতে প্রস্তুত আছি।

বলাবাহুল্য অসীমার মুখে পান ছিল—খুব সুবাসিত জর্দার গন্ধও উঠছিল এবং একটি বান্ধবীর ঠোঁটে লিপস্টিকের অনুরঞ্জনও ছিল।

লিপস্টিকমাখা মেয়েটি বললে—আপনার ছবি যত দুর্বোধ্য—আপনি কিন্তু তত সহজ এবং অকপট!

—আপনি সত্য বলেছেন। আপনার দৃষ্টি প্রখর।

—মিলিয়ে যাচ্ছি যে। আপনি সত্যই শাল্মলী তরু!

—হ্যাঁ। ভাগীরথীতটে কীর্তিহাট নামক গ্রামে বিশাল শাল্মলী তরু আছে একটি। আমি তারই চারা গাছ। কিন্তু আপনি মনে হচ্ছে বেত্রবতীতটের বেতসলতার সেই লতাটি যাকে সুলতা বলা চলে। যার আঘাতে শুধু কাঁটাই ফোটে না দাগও বসে! কালসিটে পড়ে কেটে রক্তও পড়তে পারে।

সীমা খিলখিল করে হেসে উঠল গরবিনীর মত। তার দাদার ঠিক মনে আছে, ঠিক ধরেছে এবং ওই একটি কথার উত্তরে দশটি কথা শুনিয়েছে! জয়টা তার। সুলতা উত্তর খুঁজছে, পাচ্ছে না।

সুলতা লাল হয়ে উঠেছিল। সে আধুনিকা। বি এ পড়ে। অতি আধুনিক মনের ব্যারিস্টারের মেয়ে। পোশাকে তার ছাপ আছে। পরনে তার খদ্দরের শাড়ী। ঠোঁটে তার লিপস্টিক, পায়ে স্যাণ্ডাল। মাথায় রুখু চুলে বেণী। গোপনে রাজনীতি করে বলে রটনা আছে। ছাত্র-আন্দোলন সবে যেটা তখন শুরু হয়েছে তাতে সে প্রকাশ্যে পাণ্ডা।

সুলতা বললে—ছবিতে আপনার ট্র্যাডিশন ভাঙার চেষ্টা সুস্পষ্ট কিন্তু সোস্যাল কনসাসনেস নেই কেন?

—দুরূহ প্রশ্ন। সম্ভবতঃ আমার নিজের নেই বলে। না হলে ধরুন আর্টিস্ট হিসেবে আমি মনে করি ওটা ছবিতে না আসাই ভাল।

সুলতা তর্কোদ্যত হয়ে উঠেছিল। কেন?

কিন্তু কথায় বাধা পড়েছিল। একজন চাকর এসে বলেছিল—দুটি মেয়েলোক এসেছে, বলছে আপনার সঙ্গে দেখা করবে?

—ইডিয়ট। মেয়েলোক কিরে? মহিলা বলতে হয়। তা ডাক না এখানে।

—তারা বলছে একটু নিরিবিলি কথা বলবে।

—নিরিবিলি?

—হ্যাঁ।

—তা হলে?

সীমা বললে—আমরা বসি। তোমার বাজনা না শুনে যাব না। তুমি শুনে এস কে কি বলছে! কারা—মেয়েছেলে আবার কে?

—কি করে এখান থেকে বলব?

—যাও তা হলে শুনে এস! আমরা ছবি দেখছি, চা খাচ্ছি। যাও।

সুরেশ্বর বাইরে বসবার ঘরে এসে অবাক হয়ে গেল! একটা প্রৌঢ়া, একটা যুবতী! সুন্দরী। পোশাক-পরিচ্ছদে চেহারার মার্জনায় এমনি একটা ছাঁদ তাদের মধ্যে রয়েছে যে ঠিক তার এতকালের জানা-চেনা কারুর সঙ্গে মেলে না, সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। না মেলে সীমাদের সঙ্গে না মেলে কীর্তিহাটের বাড়ীর সঙ্গে, না মেলে সচরাচর কলকাতার পথে-ঘাটে রেলস্টেশনে যে সব বাঙালী মেয়েকে দেখা যায় তাদের সঙ্গে। এদের চেহারায় কোথায় প্রগল্‌ভতা আছে, মালিন্যের মত একটা কিছু আছে। প্রৌঢ়ার বিধবার সাজ কিন্তু হাতে সামান্য গহনা আছে। ফিতেপাড় কাপড় পরনে। গালে পানের একটা পুঁটলি, ঠোঁট দুটো কালো। মাথার চুলে আছে সে আমলের পাতা-কাটা! সুন্দরী যুবতী মেয়েটির পোশাক-পরিচ্ছদ এমন যে যৌবন রূপ সবকিছু একটা অত্যুগ্রতায় আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে আত্মপ্রকাশ করেছে। না চিনলেও একটা আভাস যেন মিলছে, সবকিছু মিলিয়ে বলে দিচ্ছে দেহ এবং রূপ নিয়েই এদের কারবার।

তার ভ্রু কুঞ্চিত হয়ে উঠল। সে বললে—কি বলুন! কি চাই আপনাদের?

তার মুখের দিকে তাকিয়ে তারা একটু বিহ্বল হয়ে গেল। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললে—আমরা বাবুর সঙ্গে মানে সুরেশ্বর রায়ের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। তিনি আমাদের চেনেন।

—আমার নামই সুরেশ্বর রায়।

অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল তারা। প্রৌঢ়া আবার বললে—এ বাড়ীর মালিক।

—আমিই এ বাড়ীর মালিক।

—কিন্তু আপনি তো তিনি নন।

—তাহলে?

প্রৌঢ়া আবার বললে— নং জানবাজার সুরেশ্বর রায়। দেশ হল কীর্তিহাট।

—সে সব আমার পরিচয়!

—তাই তো বাবু! তবে কি জোচ্চুরি করে গেল কেউ?

যুবতীটি বললে—না-না জোচ্চোর সে নয়।

—হ্যাঁ। সুন্দর চেহারা। আপনার মত এমন সুন্দর নয়। তবে সুন্দর। একটু বয়স বেশী। তিরিশ বত্রিশ। গান-বাজনা জানে, সুন্দর কথাবার্তা—

সুরেশ্বর বললে—আপনারা কে?

—আমরা। আমরা বাবু—। একটু ভেবে নিয়ে বললে—বাবু, আমরা গান-বাজনা করে খাই। এ আমার মেয়ে। মিনার্ভা থিয়েটারে নাচত। আমরা থাকতাম বাবু রামবাগানে সেখানে এই বাবু থিয়েটারে একে দেখে বাড়ীতে এসেছিল। তারপর মাসখানেক খুব খরচপত্র করলে; আমোদ-আল্লাদ করলে। নাম বললে সুরেশ্বর রায়। বাড়ী বললে এই ঠিকানা। আমরা অবিশ্বাস করি নি। তারপর হঠাৎ বললে—শেফিকে বাঁধা রাখবে। বাড়ী ভাড়া করবে। এখানে আসতে লজ্জা করে। বড়ঘরের ছেলে। বলে ভদ্রপাড়ায় বাড়ী ভাড়া করে মেয়েকে চাকরী ছাড়িয়ে রাখবে। তারপরে হঠাৎ আজ পনের দিন একেবারে

নি-পাত্তা! খোঁজ নেই খবর নেই। মেয়েটা অধীর হয়েছে। ওদিকে বাড়ীওলা ভাড়ার তাগিদ দিচ্ছে। আমাদের হাতেও পয়সা নেই। অগত্যা এসেছিলাম বাড়ীতে তার খোঁজ করতে। ভাবনাও হচ্ছিল। অসুখ-বিসুখ কিছু হল কিনা? তা আপনি তো—।

স্তম্ভিত হয়ে গেল সুরেশ্বর।

মেয়েটি বললে—তাহলে আমরা যাই বাবু, কিছু মনে করবেন না। আমরা তো জানতাম না।

কি বলবে সুরেশ্বর ভেবে পেলে না। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। ওরা দুজনে উঠে দরজার কাছে গেল। মেয়েটি থমকে দাঁড়িয়ে বললে—মা!

—কি?

দরজার পাশে টাঙানো সুরেশ্বরের মায়ের শ্মশানে চিতায় তুলবার আগের একটা গ্রুপ ফটো টাঙানো ছিল। সেই ফটোর দিকে আঙুল দেখিয়ে সে বললে—এই যে মা! এই দেখ! সে!

প্রৌঢ়া ঝুঁকে দেখে বললে—হ্যাঁ এই তো!

সুরেশ্বর এগিয়ে গেল।

তরুণীটি বললে—এই—এই! এই সে! সে আঙুল দেখালে।

সুরেশ্বর দেখলে। সে ব্রজেশ্বর, ধনেশ্বরের বড় ছেলে। সেই তাকে যে রাজা বলে তার প্রজাত্ব স্বীকার করেছে অত্যন্ত সহজ হাসিমুখে। যাকে তার মিষ্ট মনে হয়েছে। যার স্নেহ-প্রীতির মধ্যে এক বিন্দু কপটতা আছে সন্দেহ করে নি। যাকে সে মধ্যে মধ্যে আসতে বলেছে।

১১

ব্রজেশ্বর এসেছেও। অশৌচের সময় নিত্যই এসেছে। তার মায়ের শ্রাদ্ধে খেটেছে। এতটুকু কীর্তিহাটের প্রকৃতির পরিচয় পায় নি। কীর্তিহাটের বাড়ীর জ্ঞাতিদের ভার তার উপরেই ছিল। মেজঠাকুমা এসেছিলেন। তিন বছরে তিনি ম্লান হয়েছেন। চার বছর আগে দেখেছিল সে। তখন যে অপরূপ লাবণ্যটি ছিল সেটি ঝরে গেছে। একটু বিষণ্ণ হয়েছেন। ছেলেরা তাঁকে খেতে দেয় না। কোন খোঁজই করে না। এখান থেকে পঞ্চাশ টাকা মা পাঠাতেন, তাই তাঁর সম্বল। আর অন্ন, তাও এক বেলা মাত্র প্রয়োজন তাঁর—সে আসে রাজ-রাজেশ্বরেরও গোবিন্দজীর প্রসাদ থেকে। তিনি ব্রজেশ্বরের জন্য বলে গিয়েছিলেন—হ্যাঁ ভাই, ব্রজেশ্বর দেখি তোমাকে খুব রাজা রাজা করে, কি ব্যাপার?

সে বলেছিল—ব্রজেশ্বর-দা মোটের উপর লোক ভাল ঠাকুমা। কথাগুলি ভারী মিষ্টি, অন্তরটিও ভাল। আমাকে রাজা বলেন।

—হ্যাঁ। লোকের মন নিতে জানে। কিন্তু ভাই, মেলামেশা বন্ধুত্ব ওর সঙ্গে না হওয়াই ভাল।

একটু দুঃখিত হয়েছিল সে মনে মনে। মনে হয়েছিল, ঠাকুমা যেন সতীনের ছেলে নাতিদের প্রতি স্বাভাবিক ঈর্ষাবশে কথা বলছেন। তার কাছে বেশী আপন হতে চাচ্ছেন। সে বলেছিল—না। বন্ধুত্ব ঠিক ওঁর সঙ্গে আমার হতে পারে না ঠাকুমা। উনি চাকরী করেন, মারোয়াড়ী ধনীর বাড়ী তৈরী হচ্ছে তার তদ্বির তদারক করেন, সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত কাজ। আলাপ আমার সঙ্গে মায়ের মৃত্যুর পর। আসেন, কিছুক্ষণ বসেন, চলে যান। টাকা কি কোন জিনিস তা চান নি। চাইলেও আমি দেব না। তবে চোর-টোর নন তো?

—না, তা নয়। তা বলতে পারব না।

—বেশ, তা হ'লেই হল। না-হলে নিকট-আত্মীয়, আপনারই নাতি, বারণ করব কি করে?

আর কোন কথা মেজঠাকুমা বলেন নি।

মেজঠাকুমা চলে গেছেন। যাওয়ার সময় তার মনে হয়েছিল, যেন অবিচার অন্যায় হল। তাঁর সঙ্গে কীর্তিহাটের সেই পরম আপনার জনটির মত ব্যবহার করা হল না। কীর্তিহাটের জ্ঞাতিদের সম্পর্কে সে শঙ্কিত ছিল, হয়তো এসে যেতে চাইবে না। কিন্তু ব্রজেশ্বরই তাদের ঠেলা দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছে। নিজে তাদের স্টেশনে নিয়ে গিয়ে টিকিট করে চাপিয়ে দিয়ে এসেছে। সুরেশ্বর মেজঠাকুমাকে যাবার সময় বলেছিল—ঠাকুমা, কাজকর্মের ভিড়ে একবার কাছে বসতে পেলাম না, সুবিধে অসুবিধে অনেক হয়েছে, কিছু যেন মনে করবেন না।

মেজঠাকুমা তার চিবুকে হাত দিয়ে বলেছিলেন—না ভাই, পরম সমাদরে থেকেছি। এখানকার ঐশ্বর্য এ আরাম এ তো কখনও জীবনে পাই নি। তোমাদের এতবড় কীর্তিহাটের বাড়ীতেও তো বোধ হয় কোনকালে ছিল না। আমি কাঙালের মেয়ে, দুদিন বুড়ো স্বামীর দৌলতে রাণী হয়েছিলাম। মান্য খাতির পেতাম। তাও শেষ হয়ে এখন আবার কাঙাল হয়েছি। আমাকে এমন ক'রে বলে না। তোমার মা পঞ্চাশ টাকা ক'রে পাঠাতো, তাতেই আজও স্বামী-শ্বশুর বংশের বউ সেজে বেঁচে আছি!

—টাকা আপনার ঠিক সময়ে যাবে যেমন যেত।

—যাবে বইকি। না গেলে চাইব। লিখব নাতিহুজুর, অধীনার প্রতি কৃপা-কটাক্ষ করতে হুকুম হোক। টাকা পাঠাও।

হেসেছিলেন সঙ্গে সঙ্গে, দুটি জলের ধারাও নেমে এসেছিল চোখ থেকে। তার চোখও সজল হয়ে উঠেছিল। তিনি চলে গেলে মনে হয়েছিল ঠাকুমাকে থাকতে বললে হ'ত। এখানে থাকলে মায়ের অভাব পূর্ণ করতে না পারুন যত্ন করতে পারতেন। কিন্তু পরক্ষণেই শ্রাদ্ধের মধ্যে সত্য খ্যাতি ও গৌরবের স্বাদ-পাওয়া, তরুণ আধুনিক মন বলে উঠেছিল—তুমি আর্টিস্ট, ছবি আর ফ্রেম এ দুটোর নিকটসম্পর্ক ভুলো না। এ ফ্রেমে ও ছবি কি মানায় না খাপ খায়। ডোণ্ট বি সিলি!—

তবু মন খারাপ করেই বসে ছিল। ব্রজেশ্বর স্টেশন থেকে ফিরে এসে বসে বলেছিল—বাপস! রাজা, তোমার ধৈর্য বটে! ওঃ! ঠাকুমার সঙ্গে যে ভাবে কথা কইলে তুমি! এবং এদের যে অত্যাচার এ ক'দিন ধরে সহ্য করলে! আমার তো নিজের গুষ্টি! আমি যে

এই ক'দিনে কতবার ওদের খ্যাঁক খ্যাঁক করেছি। আজ তুমি আমায় লজ্জা দিচ্ছ। ওঃ! তোমাকে সেলাম। এখন প্রজার জন্যে একটু চা হুকুম কর। আর কিছুদিন ওরা থাকলে তোমাকে পাগল করে দিত।

চা খেয়ে সে আর থাকে নি। সন্ধ্যে হয়ে আসছিল, সে তাড়াতাড়ি চলে গিয়েছিল। বলেছিল—আজ শনিবার ভাই, মিনার্ভা থিয়েটারে নেমন্তন্ন আছে—ওদের সঙ্গে খুব খাতির আছে। যাই। দু হপ্তা থিয়েটার দেখি নি।—হ্যাঁ—জগদীশ্বরকাকার ছেলেমেয়েদের গরম কাপড়-জামার জন্যে যে একশো টাকা দিয়েছিলে তুমি—তার ফেরত আছে পাঁচ টাকা ক' আনা। সেটা ভাই রাজা, রাখলাম আমি। আমার হ্যাণ্ড বড্ড টাইট। মাইনের টাকা পাই নি।

হেসেছিল সে।

সুরেশ্বর বলেছিল—টাকার দরকার আছে তোমার?

খুব হেসেছিল ব্রজেশ্বর, বলেছিল—এই না হলে রাজা? প্রজার চব্বিশ ঘণ্টাই টাকা চাই টাকা চাই টাকা চাই। আর রাজার তাতে বিস্ময়! কেন? না, টাকা সে কি করবে ভেবে পায় না।

পরিশ্রমের ঋণ শোধ করবার জন্যই সে তাকে কিছু দিতে চেয়েছিল, বলেছিল—কত চাই তোমার?

—যত দেবে রাজা। প্রজা ইজ অলওয়েজ পুয়োর। তার হাঁড়িটা শতছিদ্র। সে কলঙ্কিনী রাধা। তাকে ওই শতছিদ্র কুম্ভে জল এনে জালা ভরতে হয়! তা দাও না ভাই রাজা, একশোটা টাকা। বেশী দিলেও আপত্তি করব না। জামা কাপড় সব ছিঁড়ে গেছে। তা ছাড়া কীর্তিহাটের রায়দের মেজ তরফের বড় ছেলের বড় ছেলে। সুদিন দেখেছি, সমাদর বলতে গেলে তোমার মতই ছিল। খুব ভাল জামা কাপড় একসময় পরেছি হে! প্রথম ষোল বছর পর্যন্ত ফরাসডাঙ্গার ধুতি, সিল্কের পাঞ্জাবি ছাড়া পরি নি। কিছু করিয়ে নিই।

নায়েবের কাছে টাকা চাইতে সুরেশ্বরের সঙ্কোচ হয়েছিল। নায়েব জানতে চাইবেনই এবং একটু আপত্তিও করবেন। তা ছাড়া রায়বাড়ীর তারই জ্ঞাতির অপমান হবে সেটাও তার মনে লেগেছিল। তার নিজের কাছে দেড়শো টাকা ছিল, তাই বের ক'রে সে তাকে দিয়েছিল।

এরপর কয়েকদিনই ব্রজেশ্বর আসেনি। তারপর এসেছিল সে চমৎকার সাজসজ্জা করে। ফরাসডাঙ্গার ধুতি, সিল্কের পাঞ্জাবি, চকচকে সেলিম স্যু প'রে এসেছিল। গায়ে সেণ্টের গন্ধ। হেসে বলেছিল—জয় হোক রাজা! প্রজা তব হইয়াঁছে সুখী! এই তো রাজার ধর্ম! প্রজানুরঞ্জন! সেদিন গানবাজনা ক'রে, অনেকক্ষণ থেকে, রাত্রি আটটায় সে গিয়েছিল।

তার এগজিবিশনে সাজানোর কাজেও সে যথেষ্ট খেটে গেছে। পরশু পর্যন্ত এসেছিল। তারপর কাল আজ সে আসে নি। তার অভাব সে অনুভব করেছে। সেই ব্রজেশ্বর, এই করেছে। করেছে, মেয়েটির সঙ্গে সম্পর্ক পাতিয়েছে—যায় আসে, তার বিরুদ্ধে বলার তার কিছু নেই। কিন্তু তার নামে নিজের পরিচয় দিয়েছে। একসঙ্গে সুরেশ্বরের মুখে অতি সূক্ষ্ম

একটি বক্র তিক্ত হাস্য দেখা দিল, সঙ্গে সঙ্গে ভুরু কপাল কুঁচকে উঠল !

মেয়ে দুটি তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে।

সে বললে—ওর নাম সুরেশ্বর নয়, ওর নাম ব্রজেশ্বর। আমার জ্ঞাতি বটে। চিনি তাকে।

—কোথায় থাকে সে বাবু ?

—তা আমি জানি না। কোন দিন জিজ্ঞাসা করি নি।

—বাবু !

—বল !

—সে তো আপনার নিজের লোক—। আমাদের যে বড় বিপদ বাবু ! ধারে মদ খেয়ে গেছে। আমরা আনিয়ে দিয়েছি। ভাড়া বাকী। আজ না দিলে কাল সকালে জিনিসপত্র কেড়ে নিয়ে বাড়ী থেকে বের করে দেবে। তা আপনি দিয়ে—যদি তার কাছে—

—না। অত্যন্ত রূঢ়স্বরে সুরেশ্বর বললে।

সে কণ্ঠস্বরে তারা চমকে উঠল ভয়ে।

—চল মা চল !

—দাঁড়াও। তোমাদের ঠিকানা দিয়ে যাও। সে যদি এখানে আসে তবে লোক দিয়ে তাকে তোমাদের কাছে পাঠিয়ে দেব।

—মেয়ের নাম শেফালি বাবু। ঠিকানা—নতুন রাস্তা, সেণ্ট্রাল এ্যাভেন্যু আর বিডন স্ট্রীটের ধারে। ৫-নম্বর রাম ঘোষের গলি। ওই মনোমোহন থিয়েটারের পেছনে। তখনও সেণ্ট্রাল এ্যাভেন্যু শ্যামবাজার পর্যন্ত আসে নি—ওই বিডন স্ট্রীটে মনোমোহন থিয়েটারের সামনে পর্যন্ত এসে শেষ হয়েছিল। বুঝতে দেরী হল না তার। ব্রজেশ্বরও কাছাকাছি কোথাও থাকে। বিডন স্ট্রীটেই কোথায় যেন মারোয়াড়ীটির বাড়ী তৈরী হচ্ছে। সে এবার ডাকলে—রঘু !

রঘু দরজার পাশেই ছিল। সে ভিতরে এল, সুরেশ্বর বললে—এদের নিচে রাস্তা পযন্ত এগিয়ে দে।

তারা চলে গেলেও সে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। তারপর হঠাৎ মনে পড়ল সীমা অসীমা সুলতা ঘরে বসে আছে।

ফিরে আসতেই সীমা বললে—বাবাঃ ! ওরা কে ?

—প্রশ্ন করো না। উত্তর দিতে আবার কষ্ট হবে। সম্ভবতঃ দিতে পারব না !

—ওরা ভদ্রঘরের মেয়ে ?

—উঁকি মেরে দেখেছ ?

—দেখেছি।

—কথা শোন নি ?

—শুনে বুঝতে পারি নি।

—তা হ'লে থাক।

—বাঃ—অভদ্র মেয়েরা তোমার বাড়ী আসবে। জিজ্ঞাসা করব না ?

—না করাই উচিত। জিজ্ঞাসা করলে বলব, আমিও ওদের চিনি না—ওরাও আমাকে চেনে না।

—তবে এল কেন ?

—এল, আমার না হলেও আমার বংশের কারুর দায় আছে।

এতক্ষণে সুলতা বললে—ওদের কিছু সাহায্য করলে পারতেন আপনি। মুখ দেখে বড় বিব্রত মনে হল !

অবাক হয়ে তার মুখের দিকে সুরেশ্বর তাকিয়ে রইল। মুগ্ধ হয়ে গেল সে। মুখের দিকে অসঙ্কোচে বিস্ময়ের সঙ্গে চেয়ে থেকেই বললে—ঠিক বলেছেন। কিন্তু— !

—কিন্তু কি ?

—আপনি অদ্ভুত !

লাল হয়ে উঠল সুলতা।

সুরেশ্বর বললে—আমি শাল্মলী বৃক্ষের চারা কিন্তু আপনি বেত নন। অত্যন্ত নরম লতা। মালতী বললে রাগ করবেন।

—এখন আপনার বাজনা শোনান !

বাজনা সে শুনিয়েছিল। এবং সারাটা দিন সুলতার কথাই ভেবেছিল। ওর কথার টানে ওই মেয়ে দুটির কথাও এসে পড়েছিল বারবার ঘুরে ঘুরে।

ওদের কিছু দেওয়া উচিত ছিল। সুলতা বললে—ওদের মুখ দেখে মনে হল ওরা খুব বিব্রত।

মুখের দিকে বার দুই তাকিয়েছিল সে। মেয়েটির রূপ আছে। কিন্তু বেশভূষাতে সে রূপে বেশী চড়া রঙের শেড দিয়ে ফেলেছে। ভালগার হয়েছে তাতে। তাই জন্যে তাকাতে পারেনি। সুলতার মুখেও রঙ ছিল। ঠোঁটে লিপস্টিক ছিল। চুল রুখু ছিল। দুটোতে আশ্চর্য সমন্বয় হয়েছে।

ব্রজেশ্বরের উপর রাগ হয়েছিল। রাস্কেলের কি শয়তানি বুদ্ধি ! তার নাম ব্যবহার করেছে। কেন ? মনে হয়েছিল, তাকে বিপন্ন করবার জন্যে ? কিন্তু তাই বা কি ক'রে করবে ? তবে ? তা হলে একটু বড়লোকী আত্মপ্রসাদ অনুভব করবার জন্য ? তা হয়তো হবে। ব্রজেশ্বরের কথাবার্তা মনে পড়েছিল। মিষ্টিমুখ, চতুর। ধনেশ্বর রায়ের ছেলে। ওর পক্ষে এ আর বিচিত্র কি ? একটু হাসিও পেয়েছিল।

সারাটা দিন কথাগুলো ঘুরছিল মনের মধ্যে। তারই মধ্যে সন্ধ্যার পর মনে হয়েছিল, কাল সকালেই ওদের জিনিসপত্র কেড়ে নিয়ে মেয়ে দুটিকে পথে বের ক'রে দেবে। ভাড়া বাকী আছে, ধার পড়ে আছে। অস্বস্তি অনুভব করতে করতে হঠাৎ সে একসময় উঠে পড়েছিল ইজিচেয়ার থেকে। কিন্তু—।

টাকা ? নায়েব ম্যানেজারকে সুরেশ্বর শুধু সঙ্কোচই করে না—অভিভাবকের মত ভয়ও করে। হঠাৎ মনে পড়েছিল আজ চারখানা ছবি দেড়শো টাকায় বিক্রী হয়েছে—সেটা তার আলমারিতে আছে এবং তার হাতখরচের টাকাও আছে। সে দুশো টাকা বের ক'রে নিয়ে

একটা জামা টেনে মাথায় গলিয়ে প'রে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। ডাকলে—রঘু!

—বাবু!

—আমি একটু বেরুচ্ছি। হঠাৎ কৈফিয়তের প্রয়োজন অনুভব করলে, বললে—একজনের সঙ্গে একটু দেখা করা দরকার, ভুলে গিছলাম। বুঝলি!

—গাড়ী বলব?

বাড়ীতে একখানা ব্রুহাম গাড়ী আছে। সে সেই তার বাবার আমল থেকে। সেটা হেমলতা ঘোচান নি। আবার মোটরের যুগ উঠেছে, মোটরও কেনে নি। সুরেশ্বর বললে—গাড়ী? তারপর বললে—না। বলে বেরিয়ে চলে গেল। জানবাজার থেকে হেঁটে চৌরঙ্গীর মোড় পর্যন্ত এসে দাঁড়াল। একটা ভুল হয়ে গেছে। মনে ছিল না এটা জানুয়ারীর প্রথম সপ্তাহ। শীতটা ক'দিন গাঢ় হয়ে পড়েছে। শুধু আলখাল্লার মত একটা খদ্দরের পাঞ্জাবি গায়ে চড়িয়ে বেরিয়ে পড়েছে। গায়ের আলোয়ানটার প্রয়োজন অনুভব করলে। হ'লে অন্তত ভাল হত। থাক। সে চৌরিঙ্গী পার হয়ে এসে আবার একটু দাঁড়িয়ে ট্যাক্সি নিলে একখানা। ট্রামে সে বড় একটা চড়ে না। হয় হেঁটে, নয় বাড়ীর ব্রুহামে, নয় ট্যাক্সিতে চড়ে। দিনের ভাগে প্রায়ই চরণবাবুর জুড়ি। মানে হেঁটে।

ট্যাক্সিতে চড়ে বললে—চলিয়ে বিডন স্ট্রীট আর সেণ্ট্রাল এ্যাভেন্যু জংশন।

১৯৩৪।৩৫ সালের কলকাতা; কলকাতায় লোকসংখ্যা হয়তো দশ পনের লক্ষ। গাড়ীই বেশী, মোটর কম—বাস হয়নি। ট্রামে ভিড় নেই। বেলা বারোটা থেকে ট্রাম ফাঁকা ছোটে। রাত্রি আটটার পরও তাই। ট্যাক্সিখানা প্রচণ্ডবেগে ছুটে চলেছিল। বাইরে কনকনে হাওয়া গাড়ীর ভিতর ঢুকে তাকে শীত ধরিয়ে দিল। সে কাচ বন্ধ করে দিয়ে বসল। হঠাৎ বললে—রোখিয়ে তো সর্দারজী! বাঁয়া তরফ।

গাড়ী রুখলে সে। গাড়ী থেকে নেমে এক বাক্স গোল্ডফ্লেক সিগারেট দেশলাই কিনে নিলো, যেন একটা উত্তেজক কিছুর দরকার ছিল। ঠাণ্ডায় যে শীত তার থেকে আলাদা একটা কিছুর তাড়না তার বুকের স্পন্দনকে দ্রুততর করে যেন একটু কাঁপুনির সৃষ্টি করেছিল। গাড়ীর ভিতর বসে সিগারেট ধরিয়ে সে একটু আরাম পেলে।

বিডন স্ট্রীটে এসে নেমে তার ভাবনা হল—এই বাড়ী কোথায় পাবে? কি ভাবে বের করবে, কি বলে ঢুকবে? ব্যাপারটা এবার তার কাছে স্পষ্টতর হয়ে উঠল। অভিজ্ঞতা নেই। বলতে গেলে এ অঞ্চলে কয়েকবার থিয়েটার দেখতে আসা ছাড়া এমনি কখনও আসে নি! কিন্তু পড়ে-শুনে একটা ধারণা আছে—তবে সেটা বেশ সহজ সরল নয়।

সে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ভাবলে ফিরে যাই। পিছনে একটা পানের দোকান। সেখানে হিন্দুস্থানী পানওয়ালা পান বেচছে। সামনে দাঁড়িয়ে কয়েকজন বেশ পাঞ্জাবি পরা, পাকানো গোঁফ, তেল-চকচকে চুলে বাহারে টেরী হিন্দুস্থানী হাসছে গল্প করছে। মধ্যে মধ্যে রিক্সা করে বাবু চলছে মালা গলায়। রজনীগন্ধার মালা। গোড়ের মালা এখন নেই। একজন একটা খড়-জড়ানো কাঠে-গোঁজা গোলাপ ফুলের কুঁড়ি এবং ফুল বিক্রী করছে। হাঁকছে—চাই ফুল!

হঠাৎ একজন হিন্দুস্থানী এসে পাশে দাঁড়িয়ে বললে—বহুৎ আচ্ছা বিবি, বাবু সাহেব!

দেখিয়ে গা ?

সুরেশ্বর নার্ভাস হল। এতক্ষণ সে দাঁড়িয়ে নার্ভাসনেসের সঙ্গেই যুদ্ধ করছিল। এ-প্রশ্নে সে বেশ একটু দমে গেল। উত্তর দিল না।

—বাবুসাহেব !

—না !

—তব ইখেনে দাঁড়িয়ে কেনো ?

এবার সে সাহস সঞ্চয় করে বললে—একটা বাড়ী খুঁজছি, বাতলে দিতে পার ?

—হ্যাঁ। বাতাইয়ে।

ঠিকানাটা বললে সে। এবং বললে—ওখানে শেফালি বলে একটি মেয়ে থাকে, তার বাড়ী।

—হাঁ-হাঁ। জরুর জানি। উ তো মিনার্বার সখী ছিলো। আব এক বাবু উসকে রাখিয়েসে। আসেন। লেকিন বকশিস লিবো হামি !

—চল !

সে একটা সংকীর্ণ গলিপথ। দুধারের বাড়ীর দরজায় আলো জেলে বসে দাঁড়িয়ে নানান সাজে সাজা মেয়ের দল। নানান বাড়া থেকে গান ভেসে আসছে। শিউরে উঠল সে। শীত তার বেশী ধরে গেল। প্রায় প্রতি ঘরের দরজা থেকেই ইঙ্গিতে আহ্বান করছিল তারা। সরব আহ্বানেও ডাকছিল—আসুন না ! অ বাবু !

হিন্দুস্থানীটা বললে—বাবু শেফালির কামরামে যাবেন। মিনার্বার শেফালি।

—আমি শেফালির চেয়ে ভাল। তাকিয়ে দেখুন। বলে হেসে উঠল মেয়েটা।

সে মাটির দিকে চেয়েই পথ চলছিল। আর সিগারেট টানছিল।

মনে হচ্ছিল পা থেকে মাথার দিকে সন্-সন্ করে একটা কিছুর স্রোত বইছে। কান দুটো গরম হয়ে উঠেছে। হাত ঘামছে। মনে অনুতাপ হচ্ছিল। নিজের উপর রাগ, তার চেয়েও বেশী রাগ হচ্ছিল ব্রজেশ্বরের উপর। তাকে পেলে সে তার পায়ের জুতো খুলে মারতে পারত।

—এহি বাড়ী বাবুজী !

বাড়ীর দরজায় দু-তিনটে মেয়ে দাঁড়িয়ে। এখানটায় এত ভিড় নেই। যে-মেয়েরা দাঁড়িয়েছিল, তার মধ্যে শেফালি নেই। সুরেশ্বর বললে—জিজ্ঞেস কর তো শেফালি আছে কিনা ! হয়তো লাঞ্ছনার ভয়ে আগেই বাড়ী ছেড়ে চলে গিয়ে থাকতে পারে।

একটি মেয়ে বললে—কাকে খুঁজছেন ? শেফালিকে ?

—হ্যাঁ।

—তার ঘরে হুজ্জুত চলছে। ভাড়া বাকি, বাড়ীওলী পা লাগিয়ে বসেছে। টাকা দেওয়ার কথা ছিল, দিতে পারে নি। তার বাবু ভেগেছে। সেখানে সুবিধে হবে না। হেসে উঠল সে—তা আমার ঘরে আসতে পারেন।

—আমাকে ভিতরে যেতে পথ দিন।

—হামার বকশিশ বাবু !

—কত ?

—সেলাম, খুসীসে দো-চার রূপেয়া দেদিজিয়ে !

চারটে টাকাই তার হাতে দিয়ে দিলে সে। বললে—চল ভিতরে গিয়ে ঘরটা দেখিয়ে দেবে।

—জরুর ! বলেই সে সিঁড়িতে উঠে দাঁড়াল। মেয়ে দুটি তাকে পথ দিল সরে গিয়ে। তাকে ডাকলে—আইয়ে হুজুর !

ঘুপচি কুয়োর মত একটা উঠোন। তার চারিপাশে ঘর। সব ঘরেই দরজা প্রায় ভেজানো। ভিতরে আলো জ্বলছে। কোন ঘরে হাসি-উল্লাস, কোন ঘরে গান, কোন ঘর প্রায় স্তব্ধ। মধ্যে মধ্যে দু-চারটে কথা ভেসে আসছে। তারই মধ্যে একটা সংকীর্ণ সিঁড়ি। সেই সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় উঠে লোকটা ডাকলে—শেফালি বিবি !

সামনেই ওপাশে একখানা ঘরের দরজা খোলা। দরজায় বসে আছে একটি স্থূলাঙ্গী মেয়ে। নীচ হাত থালি—উপর হাতে তাগা আলোর ছটায় ঝক-ঝক করছে। তার ওদিকে ঘরের মধ্যে শেফালিকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। মাথা হেঁট করে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসে আছে। বেশ নেই, ভূষা নেই, হেঁট-করা মাথা থেকে খোলা চুল কিছু সামনে এসে পড়েছে। ডাক শুনে সে মাথা তুললে। আলোর ছটা মুখে পড়ল। সুরেশ্বর দেখতে পেলে, মেয়েটি কাঁদছিল। এবার সুরেশ্বর সহজ হয়ে উঠল মুহূর্তে। সে হিন্দুস্থানীটিকে পাশ কাটিয়ে দরজার সামনে এসে দাঁড়াল।

অবাক হয়ে গেল শেফালি।

সুরেশ্বর বললে—তোমার মা কই ?

—সেই বাবু মা। বিহ্বলকণ্ঠে বললে শেফালি। ঘরের কোণ থেকে এবার উঠে এল তার মা। শেফালিও উঠে দাঁড়াল। তার মায়ের বিস্ময়ের অবধি রইল না। সে সুরেশ্বরের ঐশ্বর্য দেখে এসেছে। এবং আরও দেখে এসেছে আজ তার বাড়ীতে বড় বড় লোকের ভিড়। তারা যখন গিয়েছিল, তখন ওই ভিড় দেখে বাড়ীতে ঢুকতে সাহস করেনি। অন্য লোককেও কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারেনি। জিজ্ঞাসা করছিল একটু দূরের এক ভুজাওলাকে—ও-বাড়ীতে কি হচ্ছে ? তারা বলেছিল—এগজিবিশন ! তসবীরের এগজিবিশন ! ছবির গো ছবির। ওহি বাড়ীর মালিক বহুত লায়েক আদমী। বহুত নাম। উনি তসবীর আঁকিয়েছেন, ওহি দেখনে লিয়ে বড়াবড়া আমীর, বড়াবড়া ভারী-ভারী আদমী আসিয়েছেন !

ওরা অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থেকেছিল। শেফালির গৌরব-গর্বের অন্ত ছিল না, তার বাবুর এত ঐশ্বর্য, এত গৌরব। তারপর সকলে চলে গেলে ভিতরে ঢুকে ঐশ্বর্য দেখে বিস্মিত হয়েছিল। তারপর যখন সুরেশ্বর এসে দাঁড়িয়েছিল, তখন বিভ্রান্ত হয়ে গিয়েছিল। সুরেশ্বরের ব্যক্তিত্ব, তার আকার অবয়ব দেখে নিতান্ত ছোট হয়ে পড়েছিল। কথায়বার্তায় ভয় পেয়েছিল। সুরেশ্বর একবার রূঢ়কণ্ঠে 'না' বলেছিল, তাতে চমকে উঠেছিল দুজনেই। সেই মানুষ তাদের এই কদর্য পঙ্কপঙ্কিল নিজের পা-দুখানাকে হাঁটু পর্যন্ত কর্দমাক্ত করে এখানে এসেছেন। বুঝতে পারছিল না তারা। কিন্তু ওরা দেহব্যবসায়িনী, ওরা

দুনিয়ায় দেহের চাহিদার বিচিত্র তত্ত্ব নিপুণভাবে বোঝে। মা মেয়ে দুজনের মুখ-চোখই পরমুহূর্তে দীপ্ত হয়ে উঠল। মা বললে—আসুন, বাবা আসুন।

তারপরই দরজায় বসে-থাকা স্থূলাঙ্গীকে বললে—এখন যাও দিদি। পাবে বইকি। দেব বইকি। উনি দাঁড়িয়ে আছেন। মস্ত-বড়লোক, রাজার ছেলে, তার চেয়েও বড়। এখন যাও—

সুরেশ্বর বললে—উনি ভাড়া পাবেন?

স্থূলাঙ্গী বললে—হ্যাঁ বাবু, আমি দু'মাসের ভাড়া পাব। এক মাসের ভাড়া আগাম দিয়ে ঘর ভাড়া করে তারপর—

—কত পাবেন?

—দু'মাসের ভাড়া ষাট টাকা। বাড়ীর সব থেকে ভাল ঘর বাবু। আলাদা কল, আলাদা সব।

একখানি একশো টাকার নোট তার হাতে দিয়ে বললে সুরেশ্বর—তিন মাসের ভাড়া মানে আগামী মাসের ভাড়াও নিয়ে রাখুন। বাকি টাকাটা—। কি যেন মদের ধার আছে বলেছিলে তুমি? কার কাছে?

—সেও আমার কাছে। সেও কুড়ি টাকা।

আর একখানা একশো টাকার নোট সে শেফালির মায়ের হাতে দিয়ে বললে—ওকে দশ টাকা দিয়ে বাকি টাকাটা তোমরা রাখো। এক মাসের মধ্যে তোমরা যা হয় কাজ দেখে নিয়ো। বুঝলে! আমি চললাম।

—চললেন?

—হ্যাঁ। সে ফিরল।

—বাবু! বাবু! আপনার পায়ে ধরছি! বাবু!

এক্ষেত্রে বোধহয় নাটক করার লোভ সম্বরণ কেউ করতে পারে না। সুরেশ্বরও সম্বরণ করতে পারলে না। সে ফিরল না—সে নেমে এল সিঁড়ি দিয়ে। যে-নাটকটি হয়ে গেল উপরে, সে নাটকটির বেগ এবং গতি এত প্রবল এবং তীক্ষ্ণ যে, তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সে নামতে নামতেই নিচে এসে গিয়েছিল। ফলে দরজা ফাঁক করে তাকে সকলে বিস্ময়বিমুগ্ধ হয়ে দেখলে। দরজায় যে-দুটো মেয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, তারা দরজা থেকে সরে এসে তখন উঠোনে দাঁড়িয়েছে। সে আবার থমকে দাঁড়াল। তার এখন সাহস হয়েছে। অন্তর শুধু তৃপ্তি নয়, তার সঙ্গে অহঙ্কারেও পূর্ণ হয়ে উঠেছে। সে বললে—একটা কথা জিজ্ঞেস করব?

তারা প্রগল্‌ভতা করলে না। একজন বললে—কি?

—কত উপার্জন কর তোমরা?

অবাক হয়ে গেল তারা। উত্তর কি দেবে বুঝতে পারলে না।

সুরেশ্বর হেসে বললে—এই শীতে বাইরে দাঁড়িয়ে থাক। এই তো ফিনফিনে পোশাক। শীত করে না? কষ্ট হয় না?

করুণভাবে একটি মেয়ে বললে—খাব কি বাবু?

পকেট থেকে দুখানা দশ টাকার নোট বের করে তাদের দুজনের হাতে দিয়ে বললে—আজকের দিনটে আর কষ্ট করো না। রাত্রি বোধহয় দশটা বাজে!

বলে সে বাড়ী থেকে বেরিয়ে চলে এল। তার পিছন পিছন আসছিল সেই হিন্দুস্থানীটি। সে-ও বিস্ময়ে স্তম্ভিত হতবাক হয়ে গেছে। এইসন শরীফ-আমীর সে তার জিন্দগীতে দেখেনি। কানেও শোনে নি। হ্যাঁ শুনেছে বটে—বাদশাহী জমানাতে। এ-জমানাতে নয়!

সে তাকে কিছু বলতেও সাহস করলে না। সুরেশ্বর এসে আবার দাঁড়াল। সেণ্ট্রাল এ্যাভেন্যুর মোড়ে। একটা ট্যাক্সি চাই।

লোকটা এসে শুধু বললে—হুজুর!

—একটা ট্যাক্সি ডেকে দিতে পার?

—ট্যাক্সি মিলবে না হুজুর, ঘোড়ারগাড়ী ডেকে দিই।

—আচ্ছা। ওই তো আড্ডা। আমি নিয়ে নিচ্ছি। দীর্ঘ পদক্ষেপে এসে সে একখানা গাড়ীতে চেপে বসে বললে—জানবাজার।

মনে মনে একটা নেশা লেগেছিল। আশ্চর্য একটা নেশার ঘোরের মত। ঘন ঘন সিগারেট খাচ্ছিল। মধ্যে মধ্যে এই সদ্য সমাপ্ত দৃশ্যটার টুকরো টুকরো ছবি মনে ভেসে উঠছিল এবং গভীর তৃপ্তি অনুভব করছিল। গাড়ীর পিছনের সিটটায় বসে সামনের সিটের কোণের দিকে চেয়ে যেন ছবিগুলো দেখছিল। ঘুরে ঘুরে শেফালির একটা ছবি মনের সামনে আসছিল। প্রথম তাকে যেমন দেখেছিল—সেই ছবি। সেই দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসেছিল মেয়েটি, মুখ আধখানা দেখা যাচ্ছিল উপরের দিকটা। ভুরুর নিচে চোখ পর্যন্ত। কতকগুলো রুখু চুল কপালে এসে পড়েছিল। অত্যন্ত সকরুণ। গাড়ীর ভিতরে অন্ধকারের মধ্যে সেই স্মৃতির ছবিটা যেন সে স্পষ্ট দেখছিল। সিগারেট টানাও সে ভুলে গিয়েছিল এবং সিগারেটটা পুড়েই যাচ্ছিল ধোঁয়ার একটি আঁকাবাঁকা রেখা তুলে। অনুভব করছিল নিঃশ্বাস দিয়ে। তার শিল্পী-মন আপসোস করছিল। একখানি সুন্দর ছবি হত। অতি সুন্দর ছবি হতে পারত। হঠাৎ হাতের আঙুলে গরম লাগায় আঙুল সরিয়ে নিয়ে আগুনের ছেঁকা খেলে। সচেতন হয়ে সিগারেটটা বাইরে ফেলে দিয়ে সে একটু চঞ্চল হয়ে উঠল। ফিরে গেলে হয় না?

খানিকটা নড়েচড়ে বসে একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেললে। আঁকবার কোন সরঞ্জাম নেই, গিয়ে কি হবে? তাছাড়া সে-মুহূর্ত তো আর ফিরবে না!

গাড়ীটা ততক্ষণে ধর্মতলায় পৌঁচেছে। বাইরে ব্রিস্টল হোটেল—একটু দূরে মেট্রোতে এবং অন্য দোকানগুলোতে আলো ঝলমল করছিল। সায়েব-মেমের ভিড় চলেছে। ফিরিঙ্গী এবং দেশী ক্রীশ্চান মেম-সায়েবগুলো এদিকে-ওদিকে ঘুরঘুর করছে।

সব ভেসে যাওয়া ছবি যেন। গাড়ীটা কর্পোরেশন স্ট্রীটে ঘুরল। কর্পোরেশন স্ট্রীটের নতুন নাম হয়েছে—সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি রোড।

গাড়ী এসে বাড়ীর দরজায় লাগল। নামল সে। ভাড়া দিয়ে সে উপরে উঠে গেল। বসল কিছুক্ষণ। তারপর ঘরে গিয়ে ক্যানভাসের উপর কয়লার স্টিক দিয়ে ওই ছবিটা আঁকতে

চেষ্টা করলে। কিন্তু হল না।

শুধু একটা উত্তেজিত অস্থিরতায় পায়চারি করলে ঘরের ভিতর। হঠাৎ একবার মনে হল ছবির সরঞ্জাম নিয়ে ফিরে যাবে সে ?

নাঃ। তবে কি করবে সে ? একটা কিছু করার যেন প্রয়োজন। ওই মেয়েটার সেই মুখচ্ছবি ভাসছে। রাস্তার ধারে দরজায় দাঁড়ানো মেয়েগুলোর সেই শীতে কষ্ট পাওয়ার ছবি মনে পড়ছে।

অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থেকে সে চিঠির কাগজ নিয়ে চিঠি লিখতে বসল সুলতাকে। হঠাৎ সুলতাকে মনে পড়েছে। সেই তাকে বলেছিল—মুখ দেখে মনে হল বড় বিব্রত। কিছু দিলে পারতেন।

১১

ধন্যবাদ দিয়ে পত্র লিখলে সুলতাকে। লিখলে—আপনাকে ধন্যবাদ, শত-সহস্র ধন্যবাদ না জানিয়ে মন তৃপ্তি পাচ্ছে না। আমার দৃষ্টিতে আপনি অস্ত্রোপচার করেছেন আজ। আমি দেখতে পাই নি—আপনি দেখতে পেয়েছিলেন, সকালের ওই মেয়ে দুটির মুখের মধ্যে বিব্রত বিপন্ন হওয়ার লক্ষণ। গাছের মাথায় ঝড়ের আগে ছায়া নামা আমি দেখেছি। ঝড় ওঠবার লক্ষণ দেখা দিলে আমি ছাদে উঠে দেখেছি পশ্চিমদিকে ময়দানের গাছগুলোর মাথায় ছায়া পড়ে। ছায়াই শুধু পড়ে না। গাছগুলোও নিঝুম হয়ে নেতিয়ে পড়ে। কিন্তু মানুষের মুখে ওটা দেখতে পাই নি। আপনি পেয়েছিলেন, আমাকে বলেছিলেন, কিছু দিলে পারতেন। সারাটা দিন কথাটা আমার মনে ঘুরেছিল। সন্ধ্যার পর মনে হয়েছিল—ওরা বলেছিল, কাল সকালেই ওদের বিপদ ঘটবে। সব কেড়ে নিয়ে বের করে দেবে পথে। তাই শেষ পর্যন্ত বেরিয়ে পড়েছিলাম। এবং সব সংকোচ জয় করে যখন ওদের আস্তানায় উপস্থিত হয়েছিলাম, তখন দেখেছিলাম, ঝড়ের ঝাপটা নেমেছে। সেই ঝাপটায় মেয়েটিকে দেখলাম, দেওয়ালে ঠেস দিয়ে মাথা নিচু করে কাঁদছে, মাথার চুল কপালে নেমে ছড়িয়ে পড়েছে, ঠিক ঝড়ে বিধ্বস্ত লতার পল্লবের মত। আমি টাকা দিয়ে ওদের বাঁচিয়ে এসেছি। এবং যে কৃতজ্ঞ-দৃষ্টির অভিষেক নিয়ে এসেছি, তা আমার জীবনের সব অপবাদের পঙ্কলেপনের মাঝখানে একটি চন্দনতিলক পরিয়ে দিয়েছে। আমি এই মুহূর্তেও অনুভব করছি—আমি দেবকুমার হয়ে গেছি।

•

•

মানুষের পাপপুণ্য, নিন্দা-প্রশংসার সব খোলস খসে পড়েছে। আপনার মন আশ্চর্য মন। পরশ-পাথরের মত। সে-মনের স্পর্শ পেয়ে আমার মন সোনা হয়ে গিয়েছে মনে হচ্ছে। ফিরে এসেই পত্র লিখছি আপনাকে। ইতি—সুরেশ্বর রায়।

এই খুশী-মনের জের তার আর ঘোচে নি বা মোছে নি। পরদিন সকালে উঠেও সে অনুভব করেছিল যে গ্লানি তার জীবনটাকে ভার করে রেখেছিল—তা যেন সব ঘুচে গেছে। সকালে

উঠেই সে ছাদের উপর উঠেছিল অকারণেই। তখন জানুয়ারী মাসের শীত। তারই মধ্যেই সে ছাদে উঠে কুয়াশার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। নিচে নেমে এসে বাজনা নিয়ে বসে ছিল।

রঘু চা-টোস্ট-ডিম নামিয়ে দিয়ে বলেছিল—আজও আবার সব লোকজন আসবে তো?

—নিশ্চয়ই! রঘুপতি রাঘব রাজারাম—তুমি ভাব কি? একজিবিশন এখন সাতদিন খোলা থাকবে। দশটা থেকে বারোটা। আবার চারটে থেকে সন্ধ্যে সাতটা।

—খাবার-দাবারও আনতে হবে তো?

—তাও আনতে হবে। তবে কালকের মত নয়। অল্প পরিমাণে। সিগারেট আনবে। আর একখানা চিঠি ফেলতে হবে। না—থাক। আমি নিজে ডাকে দিয়ে আসব। এক্ষুনি বেরুব।

চিঠিখানা আজই পৌছুনো চাই সুলতার কাছে। সকালে জি-পি-ও-তে ফেললে বিকেলে পাবেই। চিঠি পেয়ে সুলতা বিস্মিত হয়ে আসতেও পারে! বেরিয়ে গেল সে চা খেয়েই। হেঁটেই গেল। জানবাজার থেকে জি-পি-ও কাছেই।

বিকেলে কিন্তু সুলতা আসেনি। তবে সে-কথা নিয়ে ব্যস্ত হবার বা ভাববার সময় পায় নি। কারণ, একদল তরুণ শিল্পী এসেছিলেন · কেউ কিউবিস্ট,, কেউ ফিউচারিস্ট।—কেউ বা অন্য কিছু। তাঁরা খুশী হলেন। এবং ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই বেশ হৃদ্যপরিচয়ে পরিচিত হয়ে গেলেন। তাঁদের দল আছে। বললেন—আমাদের দলে আসুন।

সে চৌবাচ্চায় বন্দী মাছের ওপরে জলস্রোতের শব্দ এবং ইসারায় আহ্বান পেয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। পরিচয় এমনই গাঢ় হল যে, সেইদিনই সে তাদের বাজনাও শুনিয়ে দিলে—এস্রাজ-বেহালা।

এর মধ্যে সময় যে কেমন করে উড়ে গেল তা দলের কারুরই খেয়াল ছিল না। হঠাৎ একজন বললে—ওরে সর্বনাশ! আটটা যে বাজে বাজে! আমি উঠলাম। তখন নতুন করে কফি এবং খাবারের কথা বলেছে সুরেশ্বর। সে বললে—সে কি?

ভদ্রলোক বললেন—না! আটটার পর কফি—না স্যার! আবার আসব। নিয়ে যাব আপনাকে। আজ ছুটি!

অন্য একজন বললেন—উনি ড্রিংক করেন।

সুরেশ্বর বলে উঠল—বেশ তো। তাই আনাচ্ছি। বসুন।

—খুব ভাল হবে। আপনার স্বাস্থ্যপান ক'রে উন্নতি কামনা করে ফাংশন হবে আমাদের।

তারপর উৎসাহ এবং উল্লাসের মধ্যে সে তাদের গেলাসের সঙ্গে গেলাস ঠেকিয়ে মদও খেলে।

আসর যখন ভাঙল, তখন ন'টা বেজে গেছে!

সকলে চলে গেলে সে আবার গিয়ে ছাদে উঠল। চৌরিঙ্গীর দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। মাথার মধ্যে মদের প্রভাব চঞ্চল উত্তেজনা জাগিয়েছে—মনের মধ্যে প্রশংসা প্রতিষ্ঠার এবং শিল্পীদের প্রীতির স্মৃতি চৌরিঙ্গীর আলোর মতই ঝলমল করছে। পৃথিবী যেন তাকে ডাকছে

মনে হচ্ছে।

হঠাৎ মনে হল কালকের রাত্রের কথা। বের হবে আজকে আবার? এই শীতের রাত্রে যারা সুতি জামা আর রঙীন কাপড়ে ও রঙে-পাউডারে সেজে সামান্য টাকার জন্যে হাসির মুখোশ পরে বসে আছে পথের দিকে তাকিয়ে, তাদের সকলের হাতে পাঁচটা করে টাকা দিয়ে বলে আসবে—যাও ঘরে যাও। এই তো কিছু পেলে—এ থেকেই চালিয়ে নিয়ো। দাঁড়িয়ে শীতে কষ্ট ক'রো না, যাও।

আবার আজ একবার সে দেবতা হয়ে পূজো প্রণাম কুড়িয়ে ফিরে আসবে। ইচ্ছেটা প্রবল হয়ে উঠল তার। কিন্তু—। একটা নয় অনেক, কিন্তু! সব থেকে বড় হয়ে উঠল একটা কিন্তু। সে মদ খেয়েছে। কি ভাববে সেই রামদীন—তাকে তো সঙ্গে নিতেই হবে। কি ভাববে যাদের হাতে টাকা দেবে তারা? ভাববে না এটা মাতালের খেয়াল?

নিজেকে সম্বরণ করলে সে। বাবার কথা মনে হল।

না! সে যাবে না! চন্দ্রিকাতে বাবা সহজ অবস্থায় মুগ্ধ হন নি। তার প্রথম দিনের কথা বেশ মনে আছে। বাবা বেহালা বাজিয়েছিলেন—সে তবলা বাজিয়েছিল। সে গন্ধ পেয়েছিল বাবার কাছ থেকে।

না—সে যাবে না।

পরদিন সকালটা এর তৃপ্তিতে ভরপুর হয়ে ছিল। সে তৃপ্তি উপচে পড়েছিল একখানা চিঠি পেয়ে। সুলতার চিঠি; ছোট্ট চিঠি।

ভারী ভাল লাগল চিঠিখানি। তবে একটা কথার প্রতিবাদ করছি। মনে হয় অতি বিনয়ে লিখেছেন বা আবেগের আতিশয্যে লিখেছেন। সংসারে পরশপাথর অলীক বস্তু। কিন্তু সোনা বাস্তব। আপনার মনই সোনা দিয়ে গড়া। কিছুর ছোঁয়াতে সোনা সে হয় নি। আমার কাছ থেকে হয়তো খানিকটা উত্তাপ পেয়েছিলেন যাতে সোনার কাঠিন্য কিছু নরম হয়েছিল।

আপনি খাঁটি শিল্পী, বিচিত্র মানুষ—যাদের বিধাতা ছাঁচে তৈরী করেন না। নিজের হাতে তৈরী করেন পরমানন্দের মধ্যে।

ইতি—সুলতা ঘোষ।

সেদিন সন্ধ্যায় সে মদ খায় নি। সময় থাকতে ম্যানেজারের কাছে টাকা চেয়ে নিয়ে রেখেছিল। এবং সন্ধ্যার পর বেরিয়ে ট্যাক্সি নিয়ে বিডন স্ট্রীট এবং সেণ্ট্রাল এ্যাভেন্যু জংশনে নেমে রামদীনকে ডেকেছিল। রামদীন দাঁড়িয়েই ছিল। সে সসম্ভ্রমে সেলাম করে বলেছিল —হুজুর!

—আসবে একবার আমার সঙ্গে?

—শেফালি বিবিকে ছুঁয়া?

—নেহি! এদের মধ্যে সব থেকে গরীব যারা, তাদের কিছু করে দিতে চাই।

রামদীন অবাক হয়ে গিয়েছিল।

হঠাৎ তার মন আর একটা সূত্র খুঁজে পেয়েছিল। বলেছিল—না। আমি ঘুরে আসছি। এগারটা নাগাদ আসব। বুঝেছ। তুমি থেকো।

ট্যাক্সিটা তখনও যায় নি। মোড় নেবার উপক্রম করছিল মাত্র। সে ট্যাক্সিতে চড়ে বলেছিল—চল। এখন নটা বাজে। দু ঘণ্টা ঘোরাও। তারপর ফের আসবে এখানে। এগারটায় এসে রামদীনকে সঙ্গে নিয়ে সেই গলিটা থেকেই শুরু করেছিল। যারা তখনও সেই শীতের মধ্যে ক্লিষ্ট মুখে, উৎকণ্ঠিত চোখে পথের দিকে তাকিয়ে প্রতীক্ষা করে ছিল তাদের হাতে সে এক একখানা পাঁচ টাকার নোট দিয়ে বলেছিল—ঘরে যাও। রাত্রি অনেক হয়েছে। সে দাঁড়ায়নি কোথাও এক মুহূর্ত। এ-মোড়ে ঢুকে ও মোড়ে বেরিয়ে এসে ট্যাক্সিতে চেঁপে বলেছিল —চল।

ট্যাক্সিটা সে দাঁড় করিয়েই রেখেছিল।

রাত্রে গিয়ে সুলতাকে পত্র লিখেছিল। পরদিন সকালে জি-পি-ও-তে ফেলে এসেছিল নিজেই। সেদিন সন্ধ্যার সময় সুলতা নিজেই এসেছিল।

বলেছিল—আপনি কি পাগল নাকি?

—কেন?

—এসব কি আরম্ভ করেছেন?

—এদের দুঃখ জানেন?

—জানা সম্ভব নয়। তবে অনুমান করতে পারি। কিন্তু দুঃখ যতই থাক তার প্রতিকার কেউ কি এইভাবে করতে পারে?

—যতটুকু পারি!

—আপনি পৃথিবীর বুর্জোয়াদের একজন খাঁটি বুর্জোয়া।

হেসে উঠেছিল সে, বলেছিল—না—আমি আর্টিস্ট!

—না বুর্জোয়া। ন্যাশনাল মুভমেণ্ট নিয়ে সে চিঠি এই কারণেই আপনার পক্ষে লেখা সম্ভব-পর হয়েছিল।

চুপ করে গিয়েছিল সুরেশ্বর। মনে আঘাত পেয়েছিল।

সুলতা বলেছিল—এ সব ছাড়ুন। মানি আর্টিস্টদের খেয়াল থাকে। তারা কিছুটা অদ্ভুত হয়ে থাকে। যে কাজ করেছেন তাতে তাদের এককণা উপকারও হয়েছে—একটা দিনের খোরাক হয়েও কিছু বেঁচেছে হয়তো! সব মেনেও বলব এটা পথ নয়! শুধু যারা বড়লোক তাদেরই এমন দয়ার অহঙ্কার থাকে। এটা ভাল নয়, ছাড়ুন!

বলে সে চলে গিয়েছিল।

* * * *

বিচিত্র মানুষের মন। সেই বৈচিত্র্য বশেই বোধ করি এই মতের পার্থক্য সত্ত্বেও কিছু দিনের মধ্যেই সুলতা এবং সুরেশ্বর খুবই কাছাকাছি এসে পড়েছিল। দেখার চেয়ে বেশী চিঠি লেখার মধ্যেই হয়েছিল এটা। মাস কয়েকের মধ্যেই তারা চিঠি লিখতে শুরু করত "সু" বলে এবং

শেষে সই করত "সু" ব'লে। সুলতাও তাই লিখত। আরম্ভে "সু"—শেষেও "সু"। ওরই মধ্যে বোধহয় জ্যামিতিক নিয়মে দুটি ত্রিভুজের মিলে যাওয়ার মত দুজনের চিঠিতেই সু শব্দের মিলের মধ্যে মনের মিল হওয়া বা মিলে যাওয়ার ইঙ্গিত ছিল। দুজনের মধ্যে যে পার্থক্য—তা সামান্য ছিল না—ছিল অনেক। সেটা মতের এবং পথের। মতে ও পথে সুলতা ছিল ছাত্র আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। সুরেশ্বর সেদিক থেকে দাগী। কিন্তু ইদানীং তার ওই বিচিত্র ছবির অঙ্কনপদ্ধতির জন্য বিপ্লবী দলের প্রশংসা পেয়েছিল। তাঁরা হয়তো তাকে এই জন্যেই মার্জনা করেছেন যে, যারা সংসারে শিল্পী হয় তারা এ ধরনের ভ্রম এবং ভুল ক'রে ফেলে আবেগ বশে। তাহলেও মতের কথায় তাদের মিলত না। তবুও কিছু-দিনের মধ্যেই সুরেশ্বর লিখলে—দেখ পুরুষে নারীতে মিলন হয় বাহুবন্ধনের মধ্যে। এবং মনে মনে। যে মন মতের তোয়াক্কা করে না, তার রাজত্বের বাইরে তার বাস। সেখানে তোমার আমার মন—"সু" শব্দের মতই মিলে গেছে। এরপর রেশ্বর এবং লতায় যদি নাই হয় মিল—সেক্ষেত্রে কি যায় আসে। আমার মত হল—মিলনটা বিবাহের চেয়েও বড়। সেটা আমি জানি তোমারও। কিন্তু বিবাহের চেয়ে বড় যে মিলন—তার দিন আসে নি। এবং অন্যদিকে মিলনটাই যখন হয়ে গেছে মনে মনে তখন ছোট ব্যাপার বিবাহটাই বা হবে না কেন?

সুলতা লিখেছিল—তুমি পাগল। এক কথায় বিয়ে।

সুরেশ্বর লিখেছিল—একশো বার। সুস্থ মানুষকে ঠেকানো যায়। পাগলকে ঠেকানো যায় না।

সুলতা লিখেছিল—যায়। রাঁচী পাঠালে।

সুরেশ্বর লিখলে—তার থেকে তুমি শেকল দিয়ে বাঁধো না!

সুলতা লিখলে—অবুঝের সঙ্গে সংকেতে আলাপ চলে না। আগেরকালে যাঁরা বলেছেন—অরসিকের কাছে রসের নিবেদন করতে নেই তাঁদের কথাটা পাল্টে বলতে চাই বোকা বা পাগলকে বুদ্ধিমানের মত কথা বলো না এবং একেবারে রূঢ় যুক্তি ছাড়া বোঝাতে চেয়ো না। তোমার সঙ্গে এ মিলন হয় না। বাবা ব্যারিস্টার। তাঁর মেয়ে আমি কিন্তু আমি পাগল নই, আর্টিস্টও নই। তুমি জমিদারের ছেলে হয়ে খেয়াল নেই যে আমাকে বিয়ে করলে তোমার সমূহ ক্ষতি হবে। দেবোত্তরের সেবায়েৎ স্বত্ব চলে যাবে। ওসব ভুলে যাও। আমি তোমার সু হয়েই থাকব, কুয়ের কারণ হতে পারব না।

সুরেশ্বর এবার টেলিফোন ধরলে। কারণ চিঠি যাবে আসবে এ বিলম্ব তার সহ্য হল না। সে বললে—সু। আমি সু বলছি। তুমি যদি আমার কুয়ের কারণই হও, দেবোত্তরের সেবায়েত পদ যদি যায়ই তবে আমি তোমাকে পেয়ে ধন্য হব—মুক্তি পেয়ে যাব। আমি এ যুগের মানুষ। রায়বংশের গৌরবে কোন শ্রদ্ধা নেই আমার। যেটুকু শ্রদ্ধা আজ আমার জুটেছে সে আমার তুলির জোরে, আমার মনের জোরে। দেবতাতেও আমার বিশ্বাস নেই। তবে এইটুকু বলছি—রায়বংশের সেবায়েতরা দেবতাকে ফাঁকি দিয়ে সম্পত্তি পত্তনী দরপত্তনী দিয়েছেন, তার মোটা অংশ আমার ঠাকুরদা—তারপর আমার মা কিনে গেছেন। সুতরাং আর্থিক কষ্টে

পড়ারও আশঙ্কা নেই। যদি তাও থাকত তবে আমি তাতেও পিছপাও হতাম না। এখন কি বলছ বল ?

সুলতা চুপ করে ছিল।

সুরেশ্বর প্রশ্ন করেছিল—উত্তর দাও।

—উত্তর ?

—হ্যাঁ।

এবারও নীরব থেকেছিল সুলতা।

সুরেশ্বর বলেছিল—মৌন থাকলে সম্মতি আছে ধরে নিতে হয়। তা হলে কাল আমি তোমার বাবার কাছে যাব।

এবার সুলতা বলেছিল—এখনও ভাবছি।

—এর মধ্যে ভাবনার কি আছে ?

—আছে।

—না—নেই। আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, মত নিয়ে কখনও কোনও ঝগড়া আমি করব না। তারপর হেসে বলেছিল—আমি ছবির একজিবিশন করব, তুমি বলো কিছু হয় নি, আমি রাগব না। তুমি ইলেকশনে দাঁড়িয়ো। আমি কথা দিচ্ছি তোমার পোস্টার তৈরী করে দেব। আমার জমিদারীতে বলে দেব।

—কিন্তু তবুও যদি না বনে ?

—তখন ডাইভোর্স করে নেব।

—হুঁ।

—তার মানে ?

—তার মানে তা হলে আমাকে পরীক্ষাটা আগে পাস করতে হবে। তারপর বিয়ে। তখন তুমি বাবাকে এসে বলবে।

—তা হ'লে আবার তখন কেন ?

—তখন এই জন্যে যে, রেজেস্ট্রী করে বিয়ে করে যদি ডাইভোর্স করতে হয় তখন আমি কি করব ? জীবিকা উপার্জনের ক্ষমতা না-থাকলে নতুন স্বামী খুঁজে বেড়াতে হবে। নয়তো কোন সাবান গন্ধতেল স্নোওয়ালাদের মাল নিয়ে বাড়ী-বাড়ী বেচে বেড়াতে হবে কমিশনের জন্য। নেহাত ভাগ্য হলে টেলিফোনে চাকরী পেতে পারি। তা হবে না।

—তুমি ঠাট্টা করছ ?

—বুঝলে এতক্ষণে ? ধন্যবাদ তোমাকে। কিন্তু তোমায় হাতজোড় করে মিনতি করছি, আমাকে পাসটা করতে দাও। বিয়ে হলে আর হবে না পাস করা। তুমি যা মানুষ !

ওই পরীক্ষার জন্যেই বিয়েটা ঠেকে ছিল। এবং সেটা দুজনের প্রতিশ্রুতিক্রমে খুব গোপনেও ছিল। তার কারণ সুরেশ্বরেরই দেবোত্তর। এদিকে তার মামা এবং ম্যানেজার ওদিকে সুলতার বাবা দুপক্ষেই হয়তো আপত্তি তুলবেন।

সুলতার পরীক্ষা ছিল মাস দেড়েক পর। ছাত্রী হিসাবে ভালই ছিল। এবং রেজাল্ট ভাল করবার নেশাও ছিল। তবু মধ্যে মধ্যে আসত সে সুরেশ্বরের দাবী মত। দুপুরে ঘণ্টা দুয়েক ঘুরে যেত—ইডেন গার্ডেন বা গঙ্গার ধার দিয়ে। সপ্তাহে একদিন হয়তো।

এরই মধ্যে হঠাৎ একটা ঘটনা ঘটল।

হঠাৎ কীর্তিহাটের দেবোত্তরের নায়েব সেটেলমেণ্ট ক্যাম্প-আদালতের এক সমন হাতে এসে হাজির হন। তার সঙ্গে মেজঠাকুমাও এসে হাজির হলেন কীর্তিহাট থেকে। সমনখানা তাঁরাই হাতে ক'রে এনেছেন। দেশে গভর্ণমেণ্ট সেটেলমেণ্ট হচ্ছে। তার ব্যাপার অর্থাৎ আইন কানুন প্রায় সামরিক আইনের ধাঁচে তৈরী। মাঠের মধ্যে তাবু খাটিয়ে তাঁরা তেতে পুড়ে থাকেন—তাঁদের তাঁবুর দরজায় বিত্তবান মালিকদের হাতজোড় ক'রে না দাঁড়ালে অঙ্গ শীতল হয় না—মেজাজ ঠাণ্ডা হয় না। কীর্তিহাটের কর্মচারীরা যা কাগজপত্র দেখিয়েছে তাতে তাদের সমস্যা মেটে নি। উল্টে মেজতরফ অর্থাৎ শিবেশ্বরের ছেলেরা নানান রকমে গোল বাধিয়েছে। যা কাগজ দেখিয়েছে তাতেই তারা আপত্তি দিয়েছে, বলেছে দেবোত্তর। আবার বহু দেবোত্তর সম্পত্তিও তারা নিজেদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে রেকর্ড করিয়েছে। জাল-জালিয়াতি করতে তাদের দ্বিধা হয় নি। বরং তারা গৌরববোধ করেছে তাদের নিজেদের বিষয়বোধের জন্য। এতে মুখপাত্র হয়েছে সুখেশ্বরের ছেলে দুজন। দুজনেই চতুর এবং কিছু লেখাপড়াও শিখেছে। তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে ধনেশ্বর এবং জগদীশ্বর। জগদীশ্বর গাঁজা খায়, মদ খায়, ধনেশ্বর থেকেও উগ্র। সে বাঘ মেরে একটা বন্দুক পেয়েছে। সেই বন্দুক ঘাড়ে বেড়ায়। এবং কথায় কথায় মারপিট করে। সাধারণ গরীব প্রজারাও ভয় করে তার প্রহারকে এবং মধ্যবিত্ত গৃহস্থেরা ভয় করে তাকে কুকথার জন্য। সরকারী কর্মচারী বিশেষ ক'রে হাকিমের কাছে তারা অত্যন্ত বিনীত এবং অনুগত। সুতরাং দেবোত্তরের কর্মচারীরা হয়ে পড়েছে অসহায়। হাকিম তাদের ঠিক বিশ্বাস করেন না। এবং তাদের ভরসায় সাধারণ প্রজা গরীব ও মধ্যবিত্ত কেউই সাক্ষী দিতে অগ্রসর হয় না। সুতরাং দেবোত্তরের নায়েবরাই হয়ে দাঁড়াচ্ছে মিথ্যাবাদী জালিয়াত কুচক্রী। তাছাড়াও সেটেলমেণ্ট হাকিম হয়েছেন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ। কারণ আজও পর্যন্ত এই সম্পত্তির মোটা অংশের মালিক শ্রীসুরেশ্বর রায় তাঁদের ক্যাম্পে হাজিরা দেয়নি। সুতরাং তাঁরা হুকুম জারী করেছেন সুরেশ্বর রায়কে সশরীরে ক্যাম্প-আদালতে হাজির হতে হবে প্রয়োজনীয় দলিলপত্রসহ। অন্যথায় বডি ওয়ারেণ্ট জারী করে তাকে গ্রেপ্তার করে হাজির করা হবে।

সমন নিয়ে ছুটে এসেছে দেবোত্তরের নায়েব। সঙ্গে এসেছেন মেজঠাকুমা। মেজঠাকুমা বললেন—ভাই, বলতে গেলে ওরা আমারই বংশ। কিন্তু কি ক'রে দেখব যে তারাই ভগবানের সব সম্পত্তি আত্মসাৎ করছে। আর তোমাকে ঠকাচ্ছে। মেজকর্তা গিয়ে অবধি ওরা তো আমার দিকে ফিরে তাকায় না। ভগবানের প্রসাদের বরাদ্দ করে গেছেন শ্বশুর। আজকাল প্রসাদ বলতে করকরে আতপের ভাত আর সামান্য ব্যঞ্জন, তা মুখে দেওয়া যায় না। তাই খেয়ে পেটটা ভরে। আর তোমার মা বরাদ্দ ক'রে গেছেন পঞ্চাশ টাকা

মাসিক। তাতেই বস্ত্র তাতেই তেল তাতেই ধর্ম ব্রত-পার্বণ সব। ভাই, ভগবানের বাল্যভোগ শুধু মণ্ডায় ঠেকিয়েছে। আমি একটু করে ছানা কিনে দি ওই টাকা থেকে। তোমাদের বলব কোন্ মুখে? কিন্তু আজ যখন তারা ঠাকুরকে তোমাকে সবাইকে ঠকাবে তখন আমিও ঠকব। লজ্জার দায়ে ছুটে এসেছি—পেটের দায়ে ছুটে এসেছি। শ্বশুর বংশের মান সম্ভ্রম কীর্তি সব ডুববে বলে ভয়ে ছুটে এসেছি। তুমি চল ভাই। একবার গিয়ে দাঁড়াও!

এখানকার নায়েব ম্যানেজার হরচন্দ্র তখন কদিন থেকে অসুস্থ। তিনি ঘরে বিছানায় শুয়ে আছেন। না-হলে তাঁর নামে আম-মোক্তারনামা পাওয়ার অব এ্যাটর্ণী দেওয়া আছে, তাঁকে পাঠালে চলত। দিন পরশু।

পরের দিন সুলতার সঙ্গে সে একটা এনগেজমেণ্ট করেছিল। ওই টেলিফোনে কথাবার্তার পর তারা দু-তিন দিন দেখা করেছে, বেড়িয়েছে একসঙ্গে। কথা ছিল ইডেন গার্ডেনে দুপুরবেলা গিয়ে সে তার ছবি আঁকবে।

সে ফোন করলে সুলতাকে।—বিপদ ঘটেছে সু।

—কি বিপদ?

সে বললে বিপদের কথা। বললে—এ রাজত্ব ইংরেজের রাজত্ব, অভিসম্পাত করছি, এই পাপেই ধ্বংস হোক। এবং হবেও তুমি দেখো। আমি নায়েবকে বললাম—আমি যদি সম্পত্তি না চাই। হেসে ম্যানেজার বললেন—তাও গিয়ে হাজির হয়ে বলে আসতে হবে। এবং হাজির না-হলে এরা কোমরে বেঁধে নিয়ে যাবে। এর আর জামীন নেই। আপীল নেই। কি করি বল তো!

হেসে সুলতা বলেছিল, আমার সামনে পরীক্ষা না থাকলে তুমি অ্যাব্স্কণ্ড করতে, আমি তোমাকে শেল্টার দিতাম। তাতে আমার যা হবার হ'ত। কিন্তু যাও না ঘুরেই এস না।

—যেতে বলছ?

—বলছি।

ছেড়ে দিয়েছিল ফোন সুরেশ্বর। কিছুক্ষণ পরে আবার সুলতা ফোন ক'রে বলেছিল—দেখ, বাবাকে জিজ্ঞাসা করলাম। বাবা বললেন—যেতেই হবে সুরেশ্বরকে। হি মাস্ট গো।

—মাস্ট গো!

—হ্যাঁ। বলছেন না-গেলে প্রচণ্ড ক্ষতি হয়ে যাবে তিনি বুঝতে পারছেন।

বৃদ্ধ হরচন্দ্র বিকেলে সেই অসুস্থ শরীর নিয়েই এসেছিলেন—যাওয়ার কি ব্যবস্থা হ'ল দেখতে। সঙ্গে এখানকার পুরনো আমলাকে দিলেন, যে দীর্ঘকাল—প্রায় তিরিশ বছর—যোগেশ্বরের জমিদারী সেরেস্তায় আছে।

রওনা হতে হ'ল সেই রাত্রেই। না হলে সকালে পৌঁছুনো যাবে না। সেটেলমেণ্ট ক্যাম্পে সময় দেওয়া আছে—বেলা দশটা!

সেই গেল সুরেশ্বর। ১৯৩৪ সাল শেষ হয়েছে, ১৯৩৫ সালের মার্চের ৩১শে রাত্রে। দিন ছিল ১লা এপ্রিল!

সেই গেল। তারপর বিচিত্রচরিত্র এই খেয়ালী বা অর্ধপাগল সুরেশ্বর কীর্তিহাটেই থেকে গিয়েছিল। কলকাতায় মধ্যে মাঝে দুচার দিনের জন্য বা এক দুদিনের জন্য এসেছে, আবার ফিরে গিয়েছে কিন্তু সুলতার সঙ্গে আর দেখা করে নি। চিঠির মধ্য দিয়ে যে ঘনিষ্ঠতার শুরু হয়েছিল, চিঠির মধ্য দিয়েই তাতে ছেদ টেনে শেষ ক'রে দিয়েছে। শুধু সুলতার সঙ্গেই নয়, কলকাতার জীবনের সঙ্গে, শিল্পী-জীবন না-হলেও শিল্পী-সমাজের সঙ্গে, সভ্য সমাজের সঙ্গে, সব কিছুর সঙ্গে। একবার নাকি বিলেত ঘুরে এসেছে—সেটা প্রথম দিকেই। তারপর সব শেষ। লোকে নানান কথা বলেছে। ক্রমে সে কথা চাপা পড়েছে। সুরেশ্বর সকলের মন থেকে মুছে গেছে।

সুলতা নীরবেই সব সহ্য করেছে। তার অন্তরের কথা সেই জানে। তবে সে বিয়ে করে নি। বি-এ পাশ করে সে দ্বিগুণ উৎসাহে রাজনীতিতে যোগ দিয়েছিল। এম-এ পাস করে কলেজে অধ্যাপিকার কাজ নিয়ে সেই রাজনীতি নিয়েই একরকম মেতে আছে। বামপন্থী রাজনীতি। কিন্তু কম্যুনিস্ট পার্টি নয়! সোস্যালিস্ট সে। আজ ১৯৫৩ সালের ২৫শে নভেম্বর। এই আঠারো বছর পরে সেই সুরেশ্বর এবং সেই সুলতা জানবাজারের বাড়ীতে আকস্মিক ভাবে মিলিত হয়ে সামনাসামনি বসেছে। সামনের দেওয়ালে সুরেশ্বরের আঁকা সারি সারি ছবি। বিভিন্ন ভঙ্গী বিচিত্র বর্ণবিন্যাস। উজ্জ্বল আলোতে ঝলমল্ করছে। তার প্রথম ছবিখানার উপর ছড়ি ঠেকিয়ে সুরেশ্বর বললে—এই আমার প্রথম ছবি। পুণ্যবারিবিধৌত তট-বটচ্ছায়া-শীতল কীর্তিহাট গ্রাম। ১৮০১ সাল।

সুলতা ছবিখানার দিকে তাকিয়ে দেখছিল। ভারা ভাল হয়েছে ছবিখানা। রেখায় বর্ণে সুন্দর লাগছে।

না। শিল্পে সুরেশ্বর বেঁচে আছে!

সুরেশ্বর বললে—লেডীজ এ্যাণ্ড জেণ্টেলমেন।

চকিত হয়ে উঠল সুলতা—লেডীজ এ্যাণ্ড জেণ্টেলমেন!

সুরেশ্বর সংশোধন করে নিলে—না। এখানে তো তুমি একা সুলতা। হাসলে। তারপর বললে—দেখ, কিছুক্ষণ আগে বলছিলাম, তুমি নিজেও জান—একটা পাগলামি আমাদের বংশে আছে। খেয়াল ততক্ষণই খেয়াল, যতক্ষণ মাত্রা না ছাড়ায়। আমার মাত্রা অনেকদিন ছাড়িয়েছে। তারপর কীর্তিহাটে গিয়ে সেটা আমার মন আমার বুদ্ধি আমার বাসনা কামনাকে এমনভাবে অভিভূত করেছে সুলতা যে আমার ঠিক থাকে না। অবশ্য মদ্যপান আমি প্রচুর করতাম। ওটা তাকে বাড়িয়ে তুলতে। আমি কল্পনায় নানান ছবি দেখি অন্ধকার রাত্রে। দেওয়ালের গায়ে, ছাদে চটে যাওয়া পলেস্তারার মধ্যে দেখতে পাই নানান ছবি। কখনও কখনও জীবন্ত হয়ে ওঠে তারা, কথা বলে। আজও আমার মনে হচ্ছিল, এই যে ছবিগুলোর মানুষ, হয় তারাই জীবন্ত হয়ে উঠেছে, নয়তো অনেক অশরীরী আত্মা এখানে বসেছে। তারা দেখতে এসেছে ছবিতে কীর্তিহাটের কড়চা। শুনতে এসেছে সুরেশ্বরের জবানবন্দী।

চোখ দেখে সুলতার মনে হল, সুরেশ্বর কত দূরে—অনেক দূরের দিকে চেয়ে রয়েছে।

দ্বিতীয় পর্ব

সুরেশ্বর বললে সুলতাকে—আমার যে কি আনন্দ হচ্ছে সুলতা, তোমাকে এই আজকের দিনটিতে পেয়ে সে কি বলব! আজ ১৯৪৩ সালের ২৫শে নভেম্বর হয়তো বা বিধাতাই ধার্য করে রেখে-ছিলেন যে দীর্ঘ পনের বছর পর তোমার সঙ্গে আমার দেখা হতেই হবে!

সুলতা হাসলে। বললে—কেন, বিধাতার কি দায় পড়েছিল। দেখা তো তুমি এর আগে করলেই পারতে। তোমার কোন লজ্জার বালাই আছে বলে তো বিশ্বাস করি নে। তুমি কলকাতায় এসেছ। আমি জানি মাসে একবার তো এসেছই—কোন মাসে দুবারও এসেছ। আমি খোঁজ পেয়ে ফোন করেছি—তুমি ফোন ধরতে না, চাকরে ধরত, তুমি বলতে—বল বাড়ী নেই বাবু। কথাটা ক্ষীণভাবে হলেও ফোনের মারফত শুনেছি। চাকর তোমার রিসিভারের সাউণ্ডপিসে হাত চাপা দিতে জানত না, তুমিও শেখাও নি। তাছাড়া দুবার তুমি আমাকে দেখেও সরে গেছ—মানে গা ঢাকা দিয়েছ। একবার মিউনিসিপ্যাল মার্কেটে, একবার ধর্মতলায় —জি সি লাহার রঙের দোকানের সামনে। বোধহয় রঙ তুলি কিনে বেরুচ্ছিলে। আমি ওপারে মসজিদটার কাছে ট্রামের জন্য দাঁড়িয়ে। তুমি হনহন করে চলে গেলে। কি—মিথ্যে বলছি আমি?

সুরেশ্বর বললে—না। মিথ্যে বল নি। সত্য কথা। অস্বীকারই বা আমি করব কেন? আমি আর যাই হই মিথ্যেবাদী নই। মানে যাকে কাপুরুষ মিথ্যেবাদী বলে। নইলে কৌতুক করে অনেক মিথ্যে বলি। রায়বংশের ছেলেরা বেশীর ভাগই সাহসী মিথ্যেবাদী। যেমন ধর, চাকরকে বললাম—বল বাড়ী নেই বাবু অথচ রিসিভারের মুখটা চাপা দিতে বললাম না। ও তথ্যটা আমি জানি না তা তো নয়। জানি। ওটা যাতে তুমি শুনতে পাও—তাই জন্যেই বলেছি এবং বেশ উঁচুগলায় বলেছি, যাতে কথাটা তুমি শুনতে পাও।

—সামনাসামনি বলতে পারতে তো!

—পারতাম না, চক্ষুলজ্জা হত!

—সেটা আজ ঘুচল কেন? আর চোখের লজ্জা তোমার আছে বলেও তো জানতাম না।

হেসে সুরেশ্বর বললে—আমিও জানতাম না। কিন্তু তোমার ক্ষেত্রে ওটা যে কেমন করে গজাতো তা আমি নিজেও জানি না।

—সেই তো। আজ সেটা গেল কি করে তাই তো জিজ্ঞেস করছি।

একটু ভেবে সুরেশ্বর সিগারেট ধরালে। তারপর বললে—দেখ—আজকের দিনটা এমন একটা দিন, যে দিনটা পঞ্জিকার অর্ধোদয়যোগে গঙ্গাস্নান বা মেয়েদের অনন্ত ব্রত, সাবিত্রী ব্রত প্রতিষ্ঠা এবং উদ্‌যাপন করবার দিনের মত। ধর, আমি সংকল্প করেই ব্রত করেছিলাম যে, আজকের দিনটি যতদিন না আসবে, ততদিন আমি জগতে সমাজে নিতান্তভাবে নগণ্য এবং জঘন্যের মত থাকব। আজ সেই দিনটি এল। পঞ্জিকার নয়—ইতিহাসের। ১৯৫৩ সাল ২৫শে নভেম্বর; লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলীতে ব্রতকথা শুনে এলাম। বেরিয়ে আসছি, তোমার

সঙ্গে দেখা হল। বুঝলাম, আমার ব্রত ঠিক পালন করা হয়েছে। তোমাকে এবার বললেই আমার ব্রতের সমাপ্তি।

—হুঁ। সুলতা বুঝলে এবার ; জমিদারী প্রথা রদ করে বিল পাশ হয়েছে এবং সুরেশ্বর তাতে আজ ক্ষুব্ধ এবং মর্মাহত হয়ে নির্লজ্জ উদ্ভ্রান্তের মত কথা বলতে শুরু করেছে। ক্ষোভে হৃদয়াবেগের বাঁধ ভেঙেছে।

ছবিগুলোর দিকে তাকালে সে। সারি-সারি বর্ণাঢ্য ছবি। বিচিত্র বিভিন্ন পদ্ধতিতে আঁকা। প্রথম ছবিখানা যেন সেই কোম্পানীর আমলে কোন ইংরেজ চিত্রকরের আঁকা স্কেচের ঢঙে আঁকা ছবি। তবে কালো সাদা রেখাতে নয়—রঙ—তেলরঙে আঁকা। তার-পরের ছবিখানা একটি মন্দিরের মধ্যে কালীমূর্তি। মনে হচ্ছে পুরনো আমলের দেশী চিত্রকরের আঁকা ছবি।

লম্বা একটা বারান্দা-ঘেরা ঘর—দৈর্ঘ্যে বোধ হয় একশো পঁচিশ ফুটের কম নয়। ছবিও কম নয়। দু' সারিতে একটু উঁচু-নিচু করে অনেক ছবির সঙ্কুলান হয়েছে। অন্তত একশোর কম নয়। তা ছাড়াও বারান্দার দুটো প্রান্তের দুটো দেওয়াল আছে। তাতেও কুড়ি পঁচিশখানা ক'রে চল্লিশ পঞ্চাশখানা।

সুরেশ্বর বলেছে—এটা সে ছবি দিয়ে 'কীর্তিহাটের কড়চা' তৈরী করেছে। অর্থাৎ তাদের কীর্তিহাটের রায়বংশের ইতিহাস!

খুব গৌরবোজ্জ্বল ঘটনাগুলিকে এঁকেছে।

একটু হাসি ফুটে উঠল সুলতার মুখে।

১৯৪৩ সালের ২৫শে নভেম্বর, আজ বাংলার বিধানসভায় জমিদারী প্রথা রহিত করে বিল পাশ হল। সুলতা অ্যাসেম্বলীর নিচের তলায় দেওয়ালের ধারে যে সরু একটা ফালিতে কিছু দর্শকদের বসবার জায়গা আছে—সেখানেই বসে ছিল। উপর-নিচে সমস্ত গ্যালারী দর্শকে পূর্ণ ছিল। উপরে গভর্ণরের গ্যালারীতে ক'জন রাজা-জমিদার বসে ছিলেন, যাঁদের সুলতা চিনত। বর্ধমানের মহারাজার টুপিটা সে খুঁজেছিল কিন্তু নজরে পড়েনি। ওই টুপিটা চেনার কথা তার মনে অক্ষয় হয়ে আছে। এই অ্যাসেম্বলী হাউসের বাগানেই একটা বড় টি-পার্টি হয়েছিল। তাতে এসেছিলেন ইয়োরোপের এক বড় রাজনীতিবিদ্। তাঁকে সম্বর্ধনা দেওয়া হচ্ছিল। সম্বর্ধনা শেষে যখন সে বেরিয়ে আসছিল তখন ঘটনাচক্রে সামনেই আসছিলেন প্রাক্তন রাজনৈতিক কর্মী এবং ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত মন্ত্রী ভূপতি মজুমদার মশায়। তিনি তাকে দেখে বলেছিলেন—আরে সুলতা!

সে বলেছিল—ভাল আছেন? প্রণাম করতে গিয়েছিল। কিন্তু ভূপতিদা বলেছিলেন—না-না-না। অ্যাসেম্বলী হাউসের সীমানা গণতন্ত্রের কাশীক্ষেত্র, এখানে প্রণাম নিষিদ্ধ। সে বাবাকেও প্রণাম করতে নেই ছেলের। অ্যাডাল্ট ফ্র্যাঞ্চাইজের বিধানে ভোটাধিকার এখানে আঠারো বছর হলেই আপনি পায়। ইনহেরিটেন্স নেই এবং বাপের বিরুদ্ধে ছেলের ইলেকশনে দাঁড়াতে নিষেধ নেই। প্রণাম এখানে অচল। অধম এখানে কেউ নেই।

বলতে বলতেই থমকে দাঁড়িয়েছিলেন। পার্টির আসরের একেবারে একপ্রান্তে একান্তে একখানি লম্বা আসনে একটি দম্পতি বসে ছিলেন। স্বামীর মাথায় ছিল একটি টুপি, গড়নটা বিচিত্রও বটে চেনাও বটে। যেন ছবিতে সে দেখেছে। অনেকবার দেখেছে। পরনে শেরওয়ানী চুস্ত পাজামা। কিন্তু কে ঠিক ঠাওর করতে পারেনি। ভূপতিদা থমকে দাঁড়িয়ে হেসে বলেছিলেন—হ্যালো বার্ডওয়ান!

তখন তার মনে হয়েছিল, হ্যাঁ, বর্ধমানের মহারাজার টুপিই তো বটে!

এ মহারাজাকে সে দেখেনি কিন্তু মহারাজ বিজয়চাঁদকে সে দেখেছে। ইউনিভারসিটির কনভোকেশনে দেখেছে। এবং সে কালে তাঁর এই টুপি মাথায় ছবি অনেকবার কাগজে ছাপা হয়েছে মনে পড়ছে তার।

ভূপতিদা বলেছিলেন—আপনি এখানে একপাশে?

মহারাজ বর্ধমান হেসেছিলেন। সে হাসির অর্থ স্পষ্ট।

থাক সে কথা। আজও সেই টুপি সে খুঁজেছিল ওইখানে জমিদারদের মধ্যে। পায়নি। পেয়েছিল পাইকপাড়ার বা কান্দীর কুমার বিমলচন্দ্র সিংহকে। তিনি সেবার ইলেকশনে হেরেছিলেন। আগের বারে তিনিও মন্ত্রী ছিলেন ভূপতিবাবুর সঙ্গে। তিনি বসে ছিলেন স্পীকার'স গ্যালারীতে, একেবারে প্রথমেই। তিনি অতি সুপরিচিত ব্যক্তি—কি রাজনৈতিক মহলে কি পণ্ডিত সাহিত্যিক রসিক মহলে। চেহারাতেও এমন বৈশিষ্ট্য আছে যে একবার দেখলেই চেনা হয়ে যায়।

আরও একজনকে সে খুঁজেছিল। খুঁজেছিল কাশিমবাজারের মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর উত্তরাধিকারীকে। হ্যাঁ, ওই একজন সন্ন্যাসী জমিদার। প্রাতঃস্মরণীয়। তাঁকে যেন দেখেছিল। মহারাজ শ্রীশচন্দ্র নন্দী। তিনি ছিলেন উপরে। জমিদার কজনের মধ্যে।

সুরেশ্বরকে ঠিক তার মনেই পড়েনি। তাকে খোঁজেওনি। সে এখানে উপস্থিত থাকবার সম্ভাবনার কথা তার মনের মধ্যে উঁকিই মারেনি। সুরেশ্বরকে সে মনের দিক থেকেও মুছেই ফেলেছে। হ্যাঁ, মুছেই ফেলেছে। যখন সুরেশ্বর ওখানে গেল, তখন প্রথম প্রথম বেশ সকৌতুকে ওখানকার সব কিছুকে ব্যঙ্গ করে চিঠি লিখত। লিখেছিল, মনে আছে, এখানকার সেটেলমেণ্ট হাকিম হরেন্দ্রনাথ ঘোষ আমারই বয়সী। একেবারে নতুন হাকিম। সুপুরুষ চেহারা। চোখে চশমা আছে, চশমার পাওয়ার শুধু দুর্বল দৃষ্টিকে সবল করেনি, দিব্য-দৃষ্টি দিয়েছে। সাপের পাঁচটা করে পা আছে তা তিনি দেখতে পান। সারাদিন দাঁড় করিয়ে রেখেছিলেন ক্যাম্পের আদালতের মাঠে। সেটা ইচ্ছাপূর্বক তা গোপন করেননি ভদ্রলোক। আমার কেস নম্বরটা উঠলেও সেটাকে ঠেলে সরিয়ে রেখেছিলেন। তখনও পর্যন্ত মনে হচ্ছিল তিনি সাপের তিনটে পা দেখেছেন। বেলা বারোটার সময় (আমি গিয়েছিলাম বেলা দশটায়) দেখলা এক প্রবীণ প্রৌঢ় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে সত্যিই কোমরে দড়ি বেঁধে নিয়ে এল থানার কনেস্টবলসহ ওঁর লোকেরা। তখন বুঝলাম পাঁচ পা-ই দেখতে পাচ্ছেন। তাঁকেও বসিয়ে রাখলেন। সব শেষে আমাদের কেস হল। কাগজপত্র দেখালে কর্মচারীরা, আমি শুধু দাড়িয়ে রইলাম। তাতেই হয়ে গেল। আমাদের বক্তব্য লিখে নিলেন। ফাইনাল

* * *

বিচার হবে এখন নয় ; এরপরে ; সে হবে মাস দুয়েক পর। তখন দোসরা হাকিম আসবেন। এঁর উপরের লোক। আমাকে বললেন—নোটিশ করলে আপনি আসেন না কেন ? বললাম—আমি তো এখানে থাকি নে, কলকাতায় থাকি। সংক্ষেপে বললেন—তা হলে কিছুদিন থাকুন এখানে। জমিদারী ভোগ করবেন কলকাতায় বসে বার মাস, তা অন্ততঃ সেটেলমেণ্ট যতদিন চলছে হবে না। পেশকারকে বললেন—ওঁর সমনগুলো দাও। পেশকার বললে—দাঁড়ান। তারপরই সেই প্রৌঢ় ভদ্রলোকের ডাক হল। হরিদাস মুখার্জি হাজির হো ! কনেস্টবল দড়ি ধরে এনে হাজির করলে। হাকিম বললেন—কি ? উনি (অর্থাৎ আমি) কলকাতায় থাকেন, আপনি তো থাকেন না। এখানেই থাকেন শুনেছি, কাজের মধ্যে নেশা-ভাঙ। তা নোটিশ সমন পেয়েও আসেন না কেন ? সাপের পাঁচটা পা গজায়, আপনার কটা গজিয়েছে—দশটা না বিশটা ? এবার আমার প্রচণ্ড ক্রোধ হয়েছিল। আমি সমনগুলো হাতে-হাতে না নিয়ে চলে এসেছি। পেশকার হাঁকলে, সমন নিয়ে যান। বললাম—যথারীতি বাড়ীতে দিয়ে আসবার নিয়ম অনুযায়ী পাঠিয়ে দেবেন। দেখছি কিছুদিন থাকতে হবে। দেখি ! কলকাতায় রঙ-তুলি আনবার জন্য লোক পাঠাচ্ছি। ইতি—

তার কদিন পরেই চিঠি পেয়েছিল—সু, তুমি চিঠির উত্তর দাওনি। খুব পড়ছ বোধহয়। তা পড়। আমি ছবি আঁকছি। এখানে ল্যাণ্ডস্কেপ খুব ভাল। এবং ছবির দৌলতে অকস্মাৎ সেটেলমেণ্ট ক্যাম্প কোর্ট পর্যন্ত রঙ ধরে গেছে। মজা হয়ে গেছে। সেদিন কাঁসাইয়ের ধারে বসে ছবি আঁকছি একমনে। হঠাৎ পিছন থেকে কে বললে—বাঃ ! অ্যাপনি তো চমৎকার ছবি আঁকেন। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলাম সেই হাকিম হরেন ঘোষ। তখন সাহেব নয়। শৌখীন বাঙালীর ছেলে—পাঞ্জাবি, ফিনফিনে মিলের ধুতি, পায়ে সবুজ রঙের জরিদার নাগরা ! মনের রাগ দমন করার অভ্যেস আছে। উঠে হেসে নমস্কার করে বললাম—আপনি ! বললেন—হ্যাঁ, বেড়াতে বেরিয়েছিলাম। দূর থেকে দেখলাম আপনি বসে কি করছেন। কৌতূহল হল। এলাম। আপনি তো চমৎকার আঁকেন ! বিনয় করলাম না। বললাম—খুশী হলাম। উনি সিগারেট দিলেন, নিজে ধরালেন। তারপর বললেন—শুনেছিলাম আপনাদের ধনেশ্বরবাবুর কাছে, কল্যাণেশ্বর বলে ইয়ংম্যানটির কাছে যে আপনি কলকাতায় থাকেন, টাকা আছে বাপের তাই ওড়ান আর থিয়েটার দেখেন, ফুর্তি করেন। আপনি আর্টিস্ট তা তো বলেননি। হঠাৎ খুব হৃদ্য হয়ে বললেন—তাই শুনেই তো রাগ হয়ে গেল মশাই ! বললাম—বটে ! তাই সমন জারী করেছিলাম ! বললাম—তাতে কি হয়েছে ? আপনার সমনের টানে এসে কতকগুলো ভালো ল্যাণ্ডস্কেপ হয়ে যাবে আমার। বললেন—না মশাই, মনটা খচখচ করছে। আপনি গুণীলোক ! তবে মনে এটাও হচ্ছে যে ভালোই করেছি। আপনাকে তো পেলাম। এখানে মাঠের মধ্যে যা কষ্ট, সারাটা দিন শুধু প্লট নম্বর, বাটা দাগ, রায়তী স্থিতিবান, মোকররী আর এমন এখানকার লোক যে সব তাতেই সকলের আপত্তি। কর রেকর্ড। দেখ কাগজ। এতে আর মাথার ঠিক থাকে ! আপনার সমস্ত খতিয়ানে আপত্তি দিয়েছে আপনার জ্ঞাতিরা। সে হিসেবে আপনার উপকার করেছি আমি। আমার উপকার করার লাভও হয়েছে

দেখছি। এখানে মিশবার লোক পাইনে। আপনাদের ইস্কুল-লাইব্রেরী থেকে বই আনিয়ে পড়ি। যত পুরনো বই। দিন কাটে না।

মানুষের মন সু, ভারী আশ্চর্য। বুঝলে এখুনি যে লোকটা মন্দ বললে মনে হয় এত বড় পাষণ্ড এবং এত বড় শত্রু আর নেই জগতে, সেই লোকটাই যদি কিছুক্ষণ পর বা তক্ষুনি কথাটা ঘুরিয়ে মিষ্টি কথা বলে প্রশংসা করে তা হলে সব ভুলে মনে হবে লোকটা ভারী ভাল। জান, সত্যটা উপলব্ধি করে খুব আশ্বাস পেলাম। কারণ তোমার আমার মধ্যে তো এরপর মধ্যে মধ্যে ঝগড়া হবেই। আমার তখন নিশ্চয় মনে হবে আজই পালাব, ফকিরী নেব; আর তুমি ভাববে—কি ভাববে? ডাইভোর্স করবে ভাবতে ভাল লাগে না, ভাল লাগে তুমি ভাবছ বিষটিষ খাবে। তখন আমি হয়তো তোমার মুখের দিকে তাকাব, তুমি জলভরা চোখ ফিরিয়ে নেবে। অমনি আমি গিয়ে বলব—আমারই অন্যায়, আমাকে মাফ কর সু! তুমি ফিক করে হেসে ফেলবে। ইতি—

এরপরও খান তিনেক চিঠি লিখেছিল। শেষখানা মনে আছে, তাতে খুব সরস রসিকতা বা বাক্যের ছটা বিস্তার করেনি। লিখেছিল—একেবারে সময় নেই সু। বড় জালের মধ্যে জড়িয়েছি। ধনেশ্বর কাকা আর সুখেশ্বর কাকার ছেলে কল্যাণেশ্বর যে ব্যাপারটা করেছিল তা খুব কঠিন ছিল না, কিন্তু হঠাৎ আমার বড় জ্যাঠামশায়ের দুই ছেলে এখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন এবং এমনই কুটিল ব্যাপার করে তুলেছেন যে আমাকে বিপদগ্রস্ত করেছেন। আমাকে পত্তনী বিলি করা সব সম্পত্তিই কেড়ে নেবার ব্যবস্থা করেছেন। আমি প্রাচীন কাগজপত্র হাতড়াচ্ছি। কাগজের ধুলো পেটে গিয়ে গিয়ে পাকা জমিদারী সেরেস্তানবীশ হয়ে উঠছি। রঙ খুব কালো হয়েছে বলছিল গোয়ানপাড়ার হলদী বুড়ী। ইতি—

পুঃ দিয়ে লিখেছিল—সেটেলমেণ্ট হাকিমের সঙ্গে প্রেম আবার বিগড়েছে। তার কারণ আমার চেয়ে আমার জ্যাঠতুতো ভাইদের সঙ্গে ওর জমেছে বেশী। —ইতি সু।

তারপর নীরব হয়ে গিয়েছিল সুরেশ্বর। একেবারে নীরব। পুরো একমাস কোন চিঠি পায়নি।

অসীমার কাছে খবর নিয়ে জেনেছিল, সুরেশ্বরের এখানকার নায়েব ম্যানেজার হরচন্দ্রের পক্ষাঘাত হয়েছে। ওখানে যে কর্মচারীকে সঙ্গে নিয়ে সুরেশ্বর গিয়েছিল তাকে এখানে পাঠিয়ে সুরেশ্বর ওখানকার কর্মচারীদের নিয়ে মামলা-মকদ্দমায় প্রায় ডুবে গেছে।

আরও মাসখানেক পর হঠাৎ চিঠি পেয়েছিল সুরেশ্বরের—সেই সাংঘাতিক চিঠি।

সুলতা, বিদায়। বিদায় নিচ্ছি চিরজীবনের মত। সব ভুলে যাও—ভগবানকে ধন্যবাদ, তোমাকে ধন্যবাদ যে বিয়েটা ঘটেনি, তুমিই পরীক্ষার আপত্তি তুলে বিয়েতে রাজী হওনি। হলে আজ আর আক্ষেপের শেষ থাকত না। তুমি আত্মহত্যা করতে। আমার—আমি যা হয়েছি তাই হতাম। অর্ধ পাগল ছিলাম। পুরো পাগল হতে চলেছি। প্রচুর মদ খাচ্ছি। খাঁটি দেশীমতে গোয়ানীজদের তৈরী মদ! আমাকে ভুলে যাও। আমাকে ফেরাবার চেষ্টা করো না, তা হলে আমাকে হয়তো আত্মহত্যা করতে হবে। ইতি—

সুরেশ্বর।

কষ্ট সুলতার নিশ্চয় হয়েছিল। তার মা-বাপ কেউই তার এবং সুরেশ্বরের মধ্যে এতটা ঘনিষ্ঠতার কথা জানতেন না। সে রাত্রে ঘরে খিল দিয়ে সারারাত্রি কেঁদেছিল। একবার ভেবেছিল সে নিজে কীর্তিহাট যাবে, দেখা করে মুখোমুখি প্রশ্ন করবে—বল কি ব্যাপার! কেন এ চিঠি লিখেছ? কেন? কিন্তু ভাবলেও তা কাজে করতে পারেনি। মনে হয়েছিল, তার থেকে বোধহয় মেয়ের পক্ষে মৃত্যু ভাল। নিজে যাবে সে উপযাচিকা হয়ে তাকে সাধতে! ছি-ছি-ছি! ওদিকে ভাগ্যক্রমে ওদের স্টুডেণ্টস মহলে ছাত্র-আন্দোলন উঠেছিল জমে। তারই মধ্যে পড়েছিল সে ঝাঁপ দিয়ে। তারপর বের হল পরীক্ষার খবর। এই খবরটাই তাকে শুধু বাঁচিয়ে দিলে না, উৎসাহে তার মাথাটা উঁচু করে দিয়ে বললে—বেঁচে গেছ। চল, সামনে চল। বি-এ পরীক্ষায় ইকনমিক্সের অনার্সে ফার্স্ট ক্লাস সেকেণ্ড হয়েছে। প্রবল উৎসাহে সে এম-এ পড়তে শুরু করলে। যেদিন এম-এ ক্লাসে ভর্তি হয় সেইদিনই সে দাঁড়িয়ে ছিল ধর্মতলার মসজিদটার কাছে, ধর্মতলা স্ট্রীটের ফুটপাথের উপর, অপেক্ষা করছিল ট্রামের জন্য। হঠাৎ তার সঙ্গে চোখা চোখি হয়ে গেল সুরেশ্বরের সঙ্গে।

সুরেশ্বরের গৌরবর্ণ রঙের উপর একটা পোড়া দাগের মত ছোপ ধরেছে। পরনে তার সেই বিচিত্র অদ্ভুত সাজ আরও অদ্ভুত হয়েছে। গেরুয়া রঙের সিল্কের একটা আলখাল্লা গোছের জামা। পরনে কোঁচানো ধুতি। মুখে একমুখ দাড়ি-গোঁফ, বাবরী চুল, চোখে—স্বপ্নাতুরই হোক আর উদ্ভ্রান্তই হোক—একটা বিচিত্র দৃষ্টি, সে বেরুচ্ছে লাহাদের দোকান থেকে। তার পিছনে একটা লোকের মাথায় একগাদা জিনিস—সম্ভবত ছবির জন্য তৈরী ক্যানভাস। লোকটার হাতেও একটা কাঠের বাক্স, তাতে বোধহয় তার্পিন—বার্নিশ রঙের টিন ছিল। সুরেশ্বরের নিজের হাতে একটা প্যাকেট। সম্ভবতঃ রঙ-তুলি। ভাগ্যক্রমে বেরুবামাত্র দুজনেই দুজনকে দেখতে পেয়েছিল, চোখোচোখি হয়েছিল। সুলতার চোখ বিস্ফারিত দীপ্ত হয়ে উঠেছিল। সেও মুহূর্ত দুয়ের জন্য থমকে দাঁড়িয়েছিল, সুলতার চোখের সঙ্গে মিলিত হওয়া তার চোখের দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে পারেনি। কিন্তু ওই দুই মুহূর্ত পরেই সে মুখ ফিরিয়ে হনহন করে চলতে শুরু করেছিল পশ্চিম মুখে এগিয়ে। ইতিমধ্যে এসে গিয়েছিল একখানা ট্রাম। দাঁড়িয়েছিল দু ফুটপাথের মাঝখানে আড়াল করে। সে ট্রামে সুলতা চড়েনি। ট্রামখানা চলে গেলে সে তাকিয়ে তাকে খুঁজেছিল। তখন সুরেশ্বর আর নেই। পরের ট্রামে সে ইউনিভার্সিটি এসেছিল। কিন্তু সন্ধ্যায় তাকে ফোন করেছিল। ধরেছিল চাকর। সে নাম বলেছিল, বলেছিল—বল বাবুকে সুলতা ঘোষ ডাকছেন। সে শুনতে পেয়েছিল সুরেশ্বর বলছে—বল বাবু বাড়ী নেই। উত্তরটা সে আর চাকরের মুখে শোনার জন্য প্রতীক্ষা করেনি। রিসিভারটা রেখে দিয়েছিল। ঘৃণা হয়েছিল তার।

কারণটা জানতে তার দেরী হয়নি।

অসীমা তাকে বলেছিল—সুরোদার খবর শুনেছিস?

—কি?

—সেখানে প্রবল প্রতাপে জমিদার হয়ে বসেছে। মদ খাচ্ছে। দেশী মদ। বাবা বলছিলেন—ভাল উপমা দিয়ে বললেন—বুনো মোষ যেমন পাঁকজলে গলা ডুবিয়ে বসে, তেমনি

ভাবে ডুবেছে শুনছি।

সুলতা বলেছিল—ওর চেয়েও ভাল উপমা আছে অসীমা। বন্য শূকরের উপমা। তারা শুধু গা ডোবায় না। দাঁতশুদ্ধ মুখ ডুবিয়ে পাঁক আর গেঁড়ো তুলে খায়।

উত্তরে কিছু বলতে যাচ্ছিল অসীমা। কিন্তু সুলতা চলে গিয়েছিল। বলেছিল—কি করব শুনে অসীমা। আজ আমার ক্লাসের পর ক্লাস। তারপর ইউনিয়নের মিটিং।

এম-এ পরীক্ষার সময় সে শুনেছিল সেবার ফাইন আর্ট এগজিবিশনে সুরেশ্বর রায় একখানা ছবির জন্য ফার্স্ট প্রাইজ পেয়েছে। ছবিখানার নাম মা-যশোদা। একটি শ্যামাঙ্গী তরুণী মায়ের কোলে ছেলে আর আকাশের চাঁদ। ছবিতে এক সময় আগ্রহ ছিল। কিন্তু সে আগ্রহ তার বোধ করি বিদ্বেষে পরিণত হয়েছিল সেবার।

অসীমা গিয়েছিল সুরেশ্বরের সঙ্গে দেখা করতে। অসীমার সেবার ফিফথ ইয়ার। ফিরে এসে সুলতাকে ফোন করেছিল—সুরোদা বিলেত যাচ্ছে সুলতা।

—বিলেত? তা ভাল। ওই কীর্তিহাটের জমিদারী থেকে ভাল। কিন্তু খবরটা আমাকে কেন?

—এমনি। তোকে একটা জিনিস দিয়েছে দিতে।

—আমাকে?

—হ্যাঁ। একখানা ছবি। খুব সুন্দর একটা ল্যাণ্ডস্কেপ!

—ধন্যবাদ জানাস। কিন্তু আমার ঘরে ছবি টাঙাবার জায়গা নেই। ফিরিয়ে দিস।

—ফিরিয়ে দেব?

—হ্যাঁ। বলে সে রিসিভার নামিয়ে রেখেছিল। তারপর পড়ায় মন দিয়েছিল। যেন এই ছোট্ট ঘটনাটা তার পড়ার ঝোঁকে বেশ খানিকটা জোর জুগিয়েছিল দু-চার দিনের জন্য।

সেবার এম-এ পরীক্ষায় সুলতা হয়েছিল ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট। বাবা-মা বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন, মেয়েকে সংসারী দেখতে চেয়েছিলেন তাঁরা, কোন বাবা-মা তা না চায়, কিন্তু তার ছাত্রী-জীবনের এই সাফল্য এখানেও তাকে তার স্বাধীন মতে চলবার পাশপোর্ট দিয়েছিল। সে চাকরী পেয়েছিল, ভাল চাকরী, গভর্ণমেণ্ট ডেকে তাকে শিক্ষা বিভাগে বেথুন কলেজে ইকনমিক্সের লেকচারার করে নিয়েছিল। এবং কিছুদিনের মধ্যেই পদোন্নতি হবে এ আশ্বাসও ছিল। নিজেকে কাজে ডুবিয়ে দিয়েছিল পরমোৎসাহে। নিজেকে বিচার করে সুলতা দেখেছে। তাতে বুঝেছে সুরেশ্বরের প্রতি অনুরাগ এর হেতু নয়। আজকালকার নারী-স্বাধীনতার যুগেও মনের অ্যাডোলেসেন্সের একটা কাল আছে; সে কালের মধ্যে স্বাভাবিক-ভাবে কিছু তরুণ বন্ধু কিছু কিছু স্বপ্নসঞ্চার করে, কিন্তু সে স্বপ্নই। স্বপ্ন দুভাবে মিলোয়—এক, কিছুক্ষণ বেশ গল্পের মত বাস্তবের ধারাবাহিকতা রেখে চলে কেমন এলোমেলো হয়ে যায়, তুলির হিজিবিজি দাগ টেনে আঁকা ছবি মিটিয়ে দুর্বোধ্য করে দেওয়ার মত। অথবা কোন রচনার অংশবিশেষের উপর কলমের দাগ টেনে কেটে দেওয়ার মত। আর একভাবে শেষ হয়, ঘুম ভেঙে গিয়ে স্বপ্ন-স্বপ্ন অর্থাৎ মিথ্যে বলে ব্যঙ্গ করে মিলিয়ে যায়। সে স্বপ্ন শেষ পর্যন্ত

হিজিবিজি হয়ে বা অবান্তর অবাস্তব হয়ে স্বপ্নের মধ্যেই অর্থহীন হয়, তাতে বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রশ্ন থাকে না, শুধু হাসি পায়। কিন্তু যে স্বপ্ন ধারাবাহিকতায় বাস্তবের পথে চলতে চলতে ঘুম ভেঙে থেমে যায় ভেঙে যায় সেই স্বপ্নই স্বপ্নকে মুখ ভেঙচায়, এবং স্বপ্ন যে দেখে তাকেও ভেঙচায় এই বলে যে কেমন ঠকেছ! তাতেই হয় খেদ, তাতেই স্বপ্নকে ব্যঙ্গের বিষয় করে তোলে। সুরেশ্বরের সঙ্গে তার জীবনের এই ঘটনাটুকু পরিসরে ক্ষুদ্র হলেও ধারাবাহিকতায় এবং ঘটনা-বিন্যাসে অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং বাস্তব ছিল, সেটা এইভাবে হঠাৎ ভেঙে গেল, ঘুম ভেঙে স্বপ্ন অসমাপ্ত হয়ে শেষ হওয়ার মত। যার ফলে যে কোন অন্য পুরুষের প্রতি এবং প্রেমের প্রতিও তাকে বিমুখ করে তুললে। সঙ্গে সঙ্গে প্রেমের বদলে সে চাকরী এবং ঘরকন্নার বদলে চাকরীর সঙ্গে রাজনীতির বৃহত্তর জীবন ও জগতের রঙ্গমঞ্চে বেশ বড় পার্ট পেয়ে গেল। তাতেই মেতে উঠল। তখন ১৯৩৯ সাল। পৃথিবী এবং তার সঙ্গে ভারতবর্ষের রাজনীতিতে বলতে গেলে পুরনো অঙ্ক শেষ হয়ে নতুন অঙ্ক শুরু হচ্ছে। যার গতি যার আবেগ—নাটকের ভাষায় টেম্পো—একেবারে গোমুখীতে গঙ্গাবতরণের মত। স্বর্গের মন্দাকিনী পৃথিবীর মাটিতে ঝরে পড়ে তার জলে ধুলো, মাটি, খড়-কুটো সবকিছু স্বীকার করে কলস্বরে ঘোষণা করছেন—গঙ্গা হলেও আমি জল, গতি আমার নিম্নগামিনী, বিষ্ণু-পাদোদ্ভূতা হয়েও আমি মাটিকে ভালবাসি, আবিলতাকে স্বীকার করি! এই সত্য এই বাস্তব।

ইয়োরোপে তখন যুদ্ধ বাধে-বাধে অবস্থা। চীন জাপান যুদ্ধে নেমে গেছে। ভারতবর্ষের রাজনীতিতে বামপন্থা প্রবল হয়ে উঠেছে। সশস্ত্র বিপ্লববাদীরা সোস্যালিজম কম্যুনিজম নিয়ে প্ল্যান করছে। নেতাজী সুভাষচন্দ্র তখন শুদ্ধ সুভাষচন্দ্র—ভারতের বিদ্রোহী আত্মার নব-যৌবনের প্রতীক; তিনি কংগ্রেসের সভাপতি হয়েছেন। কিন্তু দক্ষিণপন্থীদের দৃষ্টি এবং পদক্ষেপের মন্থরতার সঙ্গে তাঁর দৃষ্টি এবং পদক্ষেপ মিলছে না। সেই কালে পৃষ্ঠপোষকতায় এবং প্রেরণায় সুলতা কিছুদিনের মধ্যেই প্রায় নেত্রীস্থানীয় হয়ে উঠল। বাংলার নবীনা নেত্রী যাঁরা—কমলা দাশগুপ্তা, বীণা দাশ, মায়া ঘোষ প্রভৃতি মন্দিরা কাগজকে কেন্দ্র ক'রে সমবেত হন—সে দলে সে ঠাঁই ক'রে নিলো। এরই মধ্যে একদিন দেখা হয়ে গেল সুরেশ্বরের সঙ্গে। দেখা হল না—সেও তাকে দেখলে—সুলতাও তাকে দেখলে। হাওড়া স্টেশনে বম্বে মেল ছাড়ছিল—সন্ধ্যেবেলা—সুলতা গিয়েছিল হাওড়া স্টেশনে, তার বান্ধবীকে তুলে দিতে অন্য একটা গাড়ীতে। হঠাৎ সে দেখলে কুলীর মাথায় মোটঘাট চাপিয়ে নিঁখুত সাহেবী পোশাক-পরা সুরেশ্বর চলেছে। মুখোমুখি প্রায়; দুজনেই থমকে দাঁড়িয়ে গেল। দুটি কথা হয়েছিল। সুরেশ্বর বলেছিল—বিলেতে যাচ্ছি। সুলতা বলেছিল—গুড লাক! বলে সে-ই আগে পাশ কাটিয়ে অন্য প্ল্যাটফর্ম-মুখে চলে গিয়েছিল। সুরেশ্বর কি করেছিল ফিরে তাকিয়েও দেখেনি, তবে সে যে বিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেনি এটা সে অনুমান করেছিল। সে হয়তো মুহূর্তখানেক দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরিয়ে মেলের রিজার্ভকরা ফার্স্ট ক্লাস বার্থে গিয়ে চেপে বসেছিল।

কাগজে দেখেছিল—হঠাৎ নজরে পড়েছিল—বিলেতে তার একখানা ছবির খুব প্রশংসা হয়েছে। 'ইণ্ডিয়ান ম্যাডোনা'। কাগজে লিখেছিল—এই ছবিখানাই কলকাতার প্রদর্শনীতে বিশেষ সম্মান এবং প্রশংসা পেয়েছিল।

তাতেও তার অর্থাৎ সুলতার জীবনযাত্রার স্বচ্ছন্দগতি কোন বেদনাদায়ক স্বপ্নের দ্বারা বিঘ্নিত হয় নি। সহজভাবে স্বচ্ছন্দ গতিতে সেও কাগজখানা পুরনো খবরের কাগজের সঙ্গে বিক্রী ক'রে দিয়ে এগিয়ে চলেছিল আপন পথে—কলেজে, কাগজের আপিসে। পার্টি আপিসে অবশ্য সে যেত না; সেটা সরকারী চাকরির বাধা-নিষেধের জন্য।

* * *

তারপর, গঙ্গায় অনেক জল বয়ে গেছে—এ কথাটাও 'যৎকিঞ্চিৎ' হয়ে গেছে ব্যঞ্জনা হিসেবে। ভাগীরথীর মুখেই চড়া পড়েছে, এতদিনে সত্য ক'রে গঙ্গার ধারা দুটো হয়ে গেছে দুটো দেশে। ভাগ করে দিয়ে ইংরেজ যখন দেশ ত্যাগ করল, তখন ভাগীরথীর বুকে জাহাজ ভাসিয়ে ডায়মণ্ড-হারবার হয়ে যেভাবে বাংলা দেশে এসে কলকাতার পত্তন করেছিল—কুঠী গেড়েছিল, সেভাবে এদেশ ত্যাগ করেনি। ভাগীরথীর মুখেও চড়া পড়েছে। তারা দলে দলে ১৯৪৭-৪৮ সালে দমদম এরোড্রোম থেকে প্লেনে উড়ে চলে গেছে; ইংরেজ পল্টনেরা গেছে বম্বেতে ইণ্ডিয়া গেটের ভিতর দিয়ে বম্বে ডকে জাহাজে চেপে।

বাংলাদেশে প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ মুখ্যমন্ত্রী হলেন। তখন রাজনৈতিক ক্যারমবোর্ডে দলাদলির স্ট্রাইকারের ধাক্কায় কর্মীরা বিভিন্ন দলের পকেটে ঘাঁটি গাড়ছে।

কম্যুনিস্টদের সঙ্গে সুলতার মিল ১৯৪২ সাল থেকেই নেই। অর্থাৎ জনযুদ্ধের আমল এবং অ্যান্টিফ্যাসিস্ট লেখক-শিল্পীদের আন্দোলনের আমল থেকে। সে অর্থনীতির সঙ্গে রাজনীতি-বিজ্ঞানের দৃষ্টি পেয়েছে। সে এসবের তত্ত্ব এবং মর্ম বুঝত। গোড়া থেকে সে সোস্যালিস্ট। তখনও পর্যন্ত, সোস্যালিস্টরা কংগ্রেসের মধ্যেই ছিল—সেও ছিল—তবে একই বোর্ডের চারটে পকেট হওয়ায় একটা পকেটেই স্থান করে নিয়েছিল। তারপর প্রফুল্ল ঘোষ মন্ত্রিত্ব ছাড়লেন। ডাঃ বিধান রায় মুখ্যমন্ত্রী হলেন। প্রদেশ কংগ্রেসেও ওলোটপালোট হল। অতুল্য ঘোষ প্রেসিডেণ্ট হলেন। মহাত্মাকে হত্যা করলে গডসে দিল্লীর বিড়লা ভবনে। তারপর ঐক্যের বন্ধন দেখতে দেখতে ছিন্ন হয়ে গেল। সোস্যালিস্টরা পৃথক হল। তার সঙ্গে সঙ্গে সুলতাও তারপর একান্ন সালে ইলেকশনের আগে কৃষক-প্রজা-পার্টি হল। প্রফুল্ল ঘোষ তার বাংলাদেশের নেতা—সর্বভারতীয় প্রধান হলেন আচার্য কৃপালনী। ইলেকশন হয়ে গেল। সোস্যালিস্ট-কৃষক-প্রজা এক হয়ে পি-এস-পি হল।

দেশকে দেশের মানুষকে তীব্র আক্রমণ না করে পারলে না সুলতা। মানুষগুলো অদ্ভুত বোকা। এরা ধরতেও পারলে না কংগ্রেসের পরিবর্তন। তার ধাপ্পাবাজি! তারা ভোট দিলে কংগ্রেসকেই। কংগ্রেসকে এই সাবাস দেয় সুলতা যে, কংগ্রেস এই বোকা মানুষগুলোকে ঠিক চিনেছে। তারা যেখানে যেমন সেখানে তেমন খেলা খেললে। যেখানে জমিদারকে দাঁড় করালে ভোট পাবে, সেখানে জমিদারকে দাঁড় করালে। যেখানে শেঠকে দাঁড় করালে টাকার জোরে জিতে যাবে, সেখানে তাই করল। যেখানে কর্মী দিতে হবে, সেখানে কর্মীই দিল। এবং এই কৌশলে অধিকাংশ পল্লী অঞ্চলেই জিতে গেল। দু-চার জায়গায় হার হল না তা নয়—তবুও তারা সংখ্যায় এমন মেজরিটি হল যে, সব দলগুলি তাদের মতবাদ এবং নিজেদের সততা ও বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কে যথেষ্ট গৌরব এবং বিশ্বাস পোষণ করেও মানুষের কাছে গৃহীত হ'ল

না। তবে এটা ঠিক কথা যে—অন্ততঃ সুলতাদের তাই বিশ্বাস—এই যাত্রাদলের রাজার সাজ —যা প'রে কংগ্রেসওয়ালারা আসর জমাচ্ছে—সে আসর ভাঙবেই। জীবনের আসর চিরদিনের, সত্যের কদর চিরদিনের, কিন্তু জীবনের নামে অভিনয়ের আসর যতই অভিনয়গুণে জীবন্ত হোক, অভিনয় শেষ করতেই হয়। তখন পালাটা আর সত্য থাকে না এবং পালার বীরগুলো তখন একান্তভাবে নট বলে ধরা পড়ে। তখন সত্য এবং সত্যকারের মানুষের কাল আসে; তাদের তখন চেনে মানুষ—তাদের ডেকে এনে বসায় জীবনের আসরে। কথাটা আরও জোর দিয়ে বললে সে—পঞ্চাশ সালটা গোটা বিলেত এবং ইউরোপ ঘুরে এসে। স্টেট থেকেই স্কলারশিপ পেয়েছিল সে।

১৯৫৩ সালের নভেম্বর সেসনে কংগ্রেস দল নাটকে ভাঁওতা দিলে দেশের মানুষকে জমিদারী উচ্ছেদ বিল এনে। জমিদারী উচ্ছেদ বিল নয়, এস্টেট্‌স্ এ্যাকুইজিশন বিল। শুধু দেশের মন্ত্রিত্ব নিয়ে তৃপ্তি হচ্ছে না এদের—জমিদারদের জমিদারী কিনে প্রকারান্তরে তারা জমিদারই সেজে বসবে। প্রজার খাজনায় এক পয়সা মকুব হবে না, ষোল আনা লাভ সমেত আয়বৃদ্ধি হবে। পতিত জমি—যা জমিদারদের খাস—তা আসবে তাদের হাতে—তারা বিলি করবে ইচ্ছামত। বিনিময়ে ভোগের সুবিধে হবে বটে।

বিল যেদিন থেকে বিধানসভায় এসেছে সেদিন থেকেই সে প্রায় নিয়মিত আসছে—শুনছে বক্তৃতা। অভিনয় দেখছে। কিন্তু একদিনও সে সুরেশ্বরকে দেখে নি। এবং এমনই ভাবে সে তার মন থেকে স'রে বা মুছে গেছে যে, তার দেখা এখানে পেতে পারে এমন কথা তার মনে হয় নি। এর অবশ্য আরও একটা কারণ আছে। সেটা এই যে, সুরেশ্বর দেশে ফিরে—সে সেই ৪১ সালে—আবার সেই কীর্তিহাটেই ফিরে গেছে। সে তার খোঁজও করে নি কোনদিন এবং কোন সংবাদও সে পায় নি—যাতে তাকে মনে করবার হেতু হতে পারে। না শিল্পী হিসাবে না মানুষ হিসাবে। অসীমা-সীমার বিয়ে হয়ে গেছে। তারা ঘরণী গৃহিণী —অবশ্য ভাল ঘরেরই। তারাও তাকে ভুলেছে—সেও তাদের ভুলেছে। দেখাও হয় না। চিঠি লেখালিখিও নেই। তা ছাড়া আর একটা পার্থক্য হয়েছে সেটা সীমা-অসীমার ভাইকে নিয়ে। প্রদীপ যৌবনে পা দিয়েই বিয়াল্লিশ সাল নাগাদ গিয়ে পড়েছিল অ্যান্টিফ্যাসিস্ট রাইটার্স্-আর্টিস্টস্ এ্যাসোসিয়েশনে। সেখান থেকে একেবারে কম্যুনিস্ট পার্টিতে। দীর্ঘদিন স্টুডেন্টস ফ্রন্টে স্টুডেন্ট লীডার হয়ে ছাত্রজীবনের জের টেনে অবশেষে এ্যাডভোকেট হয়েছে হাইকোর্টে। পার্টির মেম্বারও সে বটে। কম্যুনিস্ট পার্টি ১৯৪৯।৫০ সালে বে-আইনী ঘোষিত হলে অনেকদিন জেলেও ছিল। জেল থেকে বেরিয়ে সে হাইকোর্ট যাচ্ছে আসছে। এর মধ্যে রাশিয়া-চীন দুটো দেশেই ঘুরে এসেছে। তার সঙ্গে চীনে গিয়েছিল অসীমা আর তার স্বামী—রাশিয়া গিয়েছিল সীমা এবং তার বর। তারা দুই বোনেই বিলাসিনী ধনী গৃহিণী হয়েও এবং পার্টি মেম্বার না হয়েও খুব কড়া রকমের কম্যুনিস্ট মতবাদ পোষণ করে। সুতরাং তাদের সঙ্গে টেলিফোনে কথা হওয়া দূরের কথা—পথে দেখা হলেও এদিকে ওদিকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং গগলসটা অকারণে দুহাত দিয়ে নাকের উপর টিপে বসায়। অর্থাৎ সুরেশ্বরের সংবাদ কোন একটি সুচীছিদ্র সরু পথেও কোন সূত্রে আসে নি, আসতে পায় নি। সুতরাং

এস্টেট্‌স্ এ্যাকুইজিশন বিলের শেষদিনে সে যখন পরম কৌতূহলভরে উপর নিচে জমিদারদের মধ্যে কুমার বিমলচন্দ্র সিংহকে দেখে, তারপর বর্ধমানের মহারাজার টুপি খুঁজে দেখতে গিয়ে পেল না, তখন আর কাউকে খোঁজে নি—সুরেশ্বরকে মনেও পড়ে নি। শুধু একটা কৌতুককর কথা মনে হয়েছিল। মনে হয়েছিল, আজ যদি ভূমিরাজস্বমন্ত্রী সত্যেন্দ্রনাথ বসুর জায়গায় দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের বংশধর কুমার বিমলচন্দ্র সিংহ থাকতেন তো বড় ভাল হত। তাহলে অপোজিশনের কেউ না কেউ তাঁর কৌতুক-কথাটা নিশ্চয় বলত। অন্ততঃ সে শ্রীসুধীর রায়-চৌধুরীকে, দাশরথি তা'কে বলে দিয়ে আসত বলতে। বলত—দেড় শো বছর পরে আবার হেস্টিংস আর তাঁর দেওয়ান বার রাঁইয়া নতুন খেলা খেলতে এসেছেন।

গালাগাল, তীব্র সমালোচনা, কঠিন উক্তি, গোলমাল করে বিপক্ষ দলের বক্তৃতায় বাধা দেওয়া, বক্তৃতা ঢেকে দেওয়া হয়ে গেছে। আজ শেষদিনে এই হলে ঢুকে ওই কথাটা মনে করেও সে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ভুলে গেল। মনের মধ্যে একটা গম্ভীর ভারী থমথমে কিছু জুড়ে বসল। এ দেশের ইতিহাস স্মরণ ক'রে মনে হ'ল—যাই গলদ থাক নতুন আইনে, আজ এর গুরুত্ব এর মহত্ত্ব এর বিপ্লবাত্মক সম্ভাবনাকে কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না। মনের মধ্যে তার হঠাৎ মনে হল—একটা দেড়শো বছরের পাকা ইমারতের তলায় ডিনামাইট চার্জ করা হয়েছে—যে মুহূর্তে স্পীকার বলবেন—It is now agreed to and passed— ; সেই মুহূর্তে বিপুল বিস্ফোরণ শব্দের সঙ্গে বিরাট ইমারত টলতে টলতে চারিপাশে ফেটে চৌচির হয়ে বিপুলতর শব্দ করে মাটিতে আছড়ে পড়বে। বিরাট একটা ধূলির পুঞ্জ উঠবে আকাশে, ঢেকে দেবে চারিদিক। হয়তো চাপা পড়ে মানুষ কাতরাবে ধ্বংসস্তূপের ভিতর থেকে। শুনতে হবে দাঁড়িয়ে। চোখে জল এলেও মুছে ফেলতে হবে। যারা ওই ঘর আঁকড়ে পড়ে ছিল মৃত্যুই তাদের নিয়তি। মরতে দাও তাদের। তারা মরুক! খেদ কিসের? তাকাও, দৃষ্টি আরও প্রসারিত করে তাকাও; স্মরণ কর; এই তো কিছুদিন আগেই গোটা করদ রাজ্যগুলি অসহায়ভাবে এমন করেই ভেঙে পড়েছে! মনে পড়ছে না হায়দ্রাবাদে নিজামের নিজামত্বের সব থেকে উঁচু মিনারটা ভেঙে পড়ে যাওয়ার ছবি? কেঁদো না।

ভাবছিল সে। এরই মধ্যে কারুর মোটা ভারী গলার শব্দে সে চমকে উঠল। ডাঃ রায়ের গলা। তিনি তাঁর শেষ বক্তৃতা দিতে উঠেছেন। সম্ভ্রম ভরেই সে তাঁর দিকে তাকালে। অস্পষ্ট গোটা হাউসে কোথাও অসম্ভ্রম ছিল না। সকলে ডাঃ রায়ের গুরুত্ব পূর্ণ স্বীকার করে গম্ভীর-ভাবে তাঁর দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। ডাঃ রায় আরম্ভ করলেন—

"Sir, the curtain is about to be rung down on the scene with which —we in Bengal have been familiar for the last 150 years."

হ্যাঁ, তাই মনে হচ্ছে। বেশ বলেছেন। যবনিকা নেমে আসছে। জমিদারদের নাটমন্দিরে, জলসাঘরে, উৎসব-সমারোহের আলোকোজ্জ্বল দৃশ্যের শেষে যবনিকাপাত হচ্ছে! জমিদারেরা এবার মুখের রঙ তুলে জরির পোশাক ছেড়ে পথে এসে দাঁড়াবেন। এতক্ষণে হঠাৎ মনে পড়েছিল সুরেশ্বরকে। কীর্তিহাটের বাড়ী চাপা পড়বে সে? না—বেরিয়ে এসে পথে দাঁড়াবে?—

সে চিন্তা বেশিক্ষণ থাকেনি। ডাঃ রায়ের গম্ভীর কণ্ঠের বক্তব্য স্তব্ধ বিধানসভার গম্বুজের

গোল ছাদে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল, একটানা তিনি বলে চলেছিলেন—একটিবারের জন্য কোন কথা কেউ বলেনি—অন্য কোন শব্দও হয় নি।

"I am glad to say that my Party has been able to put before the country to-day a scheme which, I hope, will lead to better understanding between the raiyats and the landlords, between different classes of society in this country and I hope that this will lead to the establishment of what we earnestly desire namely a welfare state in Bengal."

শেষ করলেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেস তরফ থেকে শুরু হয়ে সারা সভায় সঞ্চারিত হয়ে ধ্বনিত হয়ে উঠল টেবিল চাপড়ানোর শব্দ—যা করতালি ধ্বনি বলে গণ্য। বেশ লাগল। হাসি মুখেই উঠে দাঁড়াল সুলতা। শুধু দুটি শব্দে তার আপত্তি আছে। My Party. —কেন? শুধু My Party. কেন? জমিদারী প্রথা উঠবে এতে কার আপত্তি ছিল—কে না চেয়েছিল? এ যে বাংলাদেশের মাটির ভেতর থেকে বাংলাদেশ চেয়েছিল।

হাসতে হাসতে বেরিয়ে এসে সে লবীতে দাঁড়াল। দলে দলে এম-এল-এরা এখনও বিতর্ক করছেন। কিছু কিছু প্রবীন সভ্যেরা বেরিয়ে যাচ্ছেন। নিচে গাড়ী এসে দাঁড়াচ্ছে। নিজের নিজের গাড়ীতে উঠে চলে যাচ্ছেন। ওদিকে ওপর থেকে সিঁড়ি ভেঙে দর্শকেরা নামছেন। চিনি-চিনি করেও যেন কয়েকজনকে চেনা গেল না। মহারাজ শ্রীশচন্দ্র নন্দী নামলেন। বামপন্থীরা তাঁর দিকে তাকিয়ে কণ্ঠস্বর একটু মৃদু করলেন। কয়েকজন নমস্কার করলেন—শ্রীশ নন্দীও মৃদু হেসে নমস্কার করলেন।

একজন খবরের কাগজের রিপোর্টার তাঁর কাছে দাঁড়িয়ে বললে—একটা কথা জিজ্ঞাসা করছিলাম স্যার।

—বলুন।

—এই বিল সম্বন্ধে আপনার মত!

—নিশ্চয়ই খুব ভাল! ডিটেলস নিয়ে হয়তো একটু-আধটু পার্থক্য থাকতে পারে।

—একটু বেশী করে—

—ওই খুব বেশী যথেষ্ট। খুব ভাল। দেশের লোক যখন চেয়েছে। এবং জমিদারেরাও বাঁচল। ওদ্রিকে পিছন থেকে সরস কণ্ঠে কেউ বললে—অন্ততঃ গালাগালের হাত থেকে। তিনি আর কেউ নন—তিনি কুমার বিমলচন্দ্র সিংহ। তাঁর কণ্ঠস্বর সুপরিচিত।

শ্রীশচন্দ্র নন্দী নেমে গেলেন—তাঁর গাড়ী এসে লেগেছে। বাইরে কম্পাউণ্ডে গাড়ীর হর্নে রাত্রি চকিত হয়ে উঠেছে—হেডলাইটের আলোগুলো বাগানের গাছের মাথায় মাথায় ঘুরছে বাঁক নেবার সময়।

কুমার বিমলচন্দ্র সিংহ একজন বামপন্থী নেতাকে বললেন—আপনার স্পীচ যাকে বলে টাইগারি স্পীচ হয়েছে। ওয়াণ্ডারফুল। সন্দেহ হচ্ছিল নিজের চরিত্রে। খুব বলেছেন লাম্পট্য টাম্পট্য লাগিয়ে—! হেসে উঠলেন। বেড়ে বলেছেন। তা চলুন না, চা খেয়ে গল্প ক'রে যাবেন বাড়ী।

—আজ না !

—বেশ, তা হলে কবিয়াল গোমানী আর লম্বোদরকে ডেকে আসর পাতাই একদিন। একজন জমিদার একজন লেফটিস্ট লীডার—আপনার স্পীচের জবাব সেখানে পেয়ে যাবেন। কি বলেন।

—মোস্ট গ্ল্যাডলি ! তবে কান্দীর মিষ্টি খাব। মনোহরা।

—তার সঙ্গে লবণাক্ত কিছু ? আপত্তি হবে না তো ?

ভদ্রলোক বললেন—নিশ্চয় না। জমিদারদের গাল দিয়েও আপনার গুণ গাইব।

ঠিক এই সময়টিতেই এসে সামনে দাঁড়াল দীর্ঘকায় একটি লোক। প্রথমে চিনতে পারেনি সুলতা। চোখে নীল চশমাটার জন্যে আর ওকে এখানে দেখতে পাবার সম্পর্কে সচেতনতা না-থাকার জন্যই চিনতে পারেনি। তবে রোগাও হয়ে গেছে সে। শীর্ণ দেখাচ্ছে। দাড়ি গোঁফ না থাকাটাও একটা কারণ বটে। গায়ে টিলেঢালা আলখাল্লা গেরুয়া সিল্কের। পরনে পাজামা। সুরেশ্বর তার সামনে থমকে দাঁড়াল। সুলতা তখনও তাকিয়ে ছিল তার নীল চশমাটার দিকে কারণ চশমাটা যেন তার মুখেই নিবদ্ধ। কে ? ভাবছিল সুলতা।

চোখের চশমাটা খুলে সুরেশ্বর বললে—চিনতে পারছ না ?

সুলতা সবিস্ময়ে বলে উঠল—তুমি ? তার বিস্ময় তাকে উষ্ণ হয়ে উঠবারও অবকাশ দিলে না।

হেসে সুরেশ্বর বললে—হ্যাঁ।

সকৌতুকে এবার সুলতা বললে—জমিদারীর উপর যবনিকাপাত দেখতে এসেছিলে ?

সুরেশ্বর হাসলে, বললে—হ্যাঁ।

সুলতা বললে—তা যবনিকাপাতের সঙ্গে পাল চাপা পড়নি। কংগ্রেস সুবিধে দিয়েছে, গ্রীনরুমে গিয়ে কম্পেনসেশনের টাকায় মেক-আপ বদলে এবার নতুন সাজে রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হতে পারবে। এবার কি হবে ? কংগ্রেসী, না বিজনেস ম্যাগনেট ? তা ছাড়া তোমাদের তো আরও সুবিধে, দেবোত্তর। এবার আর নায়েব গোমস্তা পাইক রেখে প্রজা ঠেঙিয়ে খাজনা আদায় করতে হবে না। খোদ সরকার এবার অ্যানুয়িটি পৌঁছে দেবেন !

সুরেশ্বরের হাসি এতেও মিলিয়ে গেল না। সে কিছু বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু ওদিক থেকে কুমার বিমলচন্দ্র সিং সুরেশ্বরকে দেখে বললেন—কি মশাই, আপনি কীর্তিহাটের সুরেশ্বর রায় নয় ? শিল্পী সুরেশ্বর রায় ?

সুরেশ্বর নমস্কার ক'রে বললে—হ্যাঁ। আপনি ভাল আছেন ?

—হ্যাঁ, তা আছি। উপায় কি ভালো না থেকে ? তারপর আপনার খবর কি ? বিলেতে গিয়ে নাম কিনে দেশে এলেন। তারপর সব নীরব। তবে শুনি না কি দেশে বসে দেদার ছবি আঁকেন। তা আমাদের দেখান !

—দেখাব !

—হ্যাঁ। এগজিবিশন করুন।

—এগজিবিশন নয়। কয়েকজন রসিক এবং আপনজনকে দেখাব।

—বেশ। আমাকে বাদ দেবেন না।

—নিশ্চয়ই না!

—আচ্ছা চলি।

তাঁর গাড়ী এসে লেগেছে। তিনি চলে গেলেন।

সুলতা যেতে যেতে থমকে দাঁড়িয়েছিল। বললে—আমাকে দেখাবে না?

—ছবি?

—হ্যাঁ!

—যদি বলি আজই চল। তোমাকেই সর্বাগ্রে দেখাবার বাসনা আমার ছিল। এখানে না-পেলে আমি তোমার বাড়ী যেতাম! কারণ ছবি ঠিক এগজিবিশন নয়। ছবির মধ্যে দিয়ে আমার জবানবন্দী।

বিস্মিত হয়ে সুলতা তার মুখের দিকে তাকালে। এদিকে লবী জনবিরল হয়ে এসেছে। যাঁরাও আছেন তাঁরা নেমে গিয়ে বাগানে গিয়ে কে কার গাড়ীতে যেতে পারেন দেখছেন। কিছু কিছু দল বেঁধে হেঁটে বেরিয়ে পড়ছেন। এসপ্ল্যানেডে বা হাইকোর্টের ওদিকে গিয়ে ট্রাম ধরবেন। সুলতা এবং সুরেশ্বর ছাড়া মাত্র জন পাঁচ ছয় লোক ছিল। তার মধ্যে তিনজন হাউসের কর্মচারী।

তার মুখের দিকে তাকিয়ে সুলতার মনে হচ্ছিল—এ যেন আর একজন—সে নয়। সে ছিল উল্লসিত উদ্ভাসিত বেপরোয়া একজন। এ যেন ক্লান্ত প্রশান্ত মানুষ একজন। সুরেশ্বর বললে—চল!

—আজ? তুমি পাগল?

—সে তো চিরকালের। পাগলামি আমার আছে সেটা জানি বলেই উন্মাদ নই। তবে যে-কোন মুহূর্তে পাগল হতে পারি। উঠতে পারে পাগলামি। বলেই সে খপ করে তার হাত ধ'রে বললে—চল!

চমকে উঠল সুলতা। কিন্তু রুষ্ট হতে পারলে না। কারণ এ হাতধরা জোর করে হাতধরা নয়, এ হাতধরার মধ্যে মিনতি অত্যন্ত স্পষ্ট।

সে বললে—ছাড়।

ছেড়ে দিলে হাত সুরেশ্বর। বললে—জোর নেই তোমার ওপর। কিন্তু গেলে আমি খুশী হতাম। ছবি দেখে কে কি বুঝবে জানিনে। বোঝাবার গরজও নেই আমার। ছবির ভেতর জবানবন্দী—ছবির রঙে হারিয়ে যাবার ভয় আছে। তাতে শিল্পী সুরেশ্বর জিতবে। কিন্তু মানুষ সুরেশ্বর বোবা আসামীই থেকে যাবে। তোমাকে পেলে তোমার কাছে সে বাঙ্ময় হতে পারত। বাচালও হয়তো হতো। এখানে যে নাটকের যবনিকাপাতের জন্য উল্লাস করছ সেখানে গেলে নাটকটার ম্যানাস্ক্রপ্টটা দেখতে পেতে। আচ্ছা—

বলে সে দীর্ঘ পদক্ষেপে এগিয়ে গেল ফটকের দিকে।

সুলতার ভুরু দুটি কুঁচকে উঠল। মনের মধ্যে যেন দ্বিধা জেগেছে একটা। ওই

লোকটার সম্পর্কে ধারণা তার যত খারাপ হোক তবু কি জানি কেন যেন একটা করুণা জাগছে। হাতের ঘড়িটার দিকে একবার সে চেয়ে দেখলে। নটা বেজে চার মিনিট। জানবাজার কাছেই। একবার ওর ওখান হয়ে গেলে কি হয়? বড়জোর দশটা, সওয়া দশটাই বাজবে। তাতে খুব দেরী হবে না। সে ডাকলে—দাঁড়াও। শুনছ!

সুরেশ্বর তখন ফটকে। সে ফিরে দাঁড়াল। —কিছু বলছ?

—হ্যাঁ। কাছে এসে বললে—চল, কিন্তু আধঘণ্টার বেশী না।

—তা হলে একটা ট্যাক্সি নিই।

—সেই ভাল।

একটু এগিয়ে এসে রাজভবনের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণটায় কয়েক মিনিট দাঁড়াতেই ট্যাক্সি একটা মিলল, তাতে চড়ে বসে এসে সেই জানবাজারের বাড়ীর সামনে দাঁড়াল। বাড়ীটা চেনা যায় না। দীর্ঘদিন এ পথে সুলতা হাঁটেনি। সর্বাগ্রে চোখে পড়ে তার একটা আধুনিক বহির্সজ্জা। রেলিংদেওয়া জোড়া জোড়া গোল থামওয়ালা সেই এক-শো সওয়াশো ফুট লম্বা বারান্দাটা বন্ধ করে আধুনিক প্যাটার্নের একটা চেহারা দেওয়া হয়েছে।

সুলতা দাঁড়িয়ে দেখলে বাড়ীটাকে। তারপর বললে—এটা কি করেছ বল তো?

—বারান্দাটাকে ঘেরার কথা বলছ?

—হ্যাঁ। হঠাৎ হেসে বললে—তবে তোমার মনটা ফুটে উঠেছে। বা তুমি ফুটে উঠেছ এর মধ্যে।

হাসলে সুরেশ্বর, বললে—বলতে পার। তবে কি জান, এসব কথা আমার গা-সওয়া হয়ে গেছে। প্রথম যখন দাড়ি গোঁফ চুল রেখে আলখাল্লা পরতাম তখনও শুনেছি। এখনও শুনি। আর অল্পবিস্তর সকলের চেহারাই তো এই। সে রাজার ছেলে গৌতম সিদ্ধার্থের চাঁচর চুল কেটে চীরবস্ত্র পরে বনে যখন তপস্যায় গেলেন তখন দেবদত্তরা এই ধরণের কথা বললে তো মিথ্যে বলে নি। অন্ততঃ প্রথম প্রথম যে দেখেছে সেই বলেছে—মানায় নি। ব্যারিস্টার গান্ধী যখন প্রথম গান্ধীর সাজ পরেছিলেন তখনও কি এমন ভাবে নি লোকে? তারপর ধর তোমার কথা। তোমাকে যেদিন প্রথম দেখি সেদিন ঠোঁটে তোমার লিপস্টিক ছিল, মনে পড়েছে আমি একটু বাঁকা কথা বলেছিলাম। আজ তুমি এমনই সেজেছ বা হয়েছ যে সেই লিপস্টিকের কথা তুললে এই ধরণেরই কথা হবে।

সুলতা তার মুখের দিকে তাকালে। ভুরু তার কুঁচকে উঠেছিল। কিন্তু সুরেশ্বরের মুখ সেই তেমনি বিষণ্ণ প্রশান্ত হয়ে আছে। যুদ্ধ করার বা ঝগড়া করার মনের কোন প্রকাশ ফুটে ওঠেনি সেখানে। কণ্ঠস্বরেও উত্তাপ নেই।

সুরেশ্বর বুঝেছিল, সে হেসে বললে—না, ঝগড়া আমি করিনি। বলছি কি জান, বলছি পরিবর্তন কালের নিয়ম। সেটা যেমন মানুষের হয় তেমনি মানুষের বিচরণক্ষেত্রে সর্বত্রই হয়। পুরনো বাড়ীতে নোনা ধরে। ফাট ধরে। তখন ভেঙে-চুরে মেরামত করতে হয়। আবার বংশও বাড়ে। তখন পাঁচিল ওঠে। জানালা ফুটিয়ে দরজা করতে হয়। বারান্দা

ঘিরে ঘর বাড়াতে হয়।

সবিস্ময়ে তার দিকে তাকিয়ে সুলতা বললে—বিয়ে করেছ? ছেলেপিলে বুঝি অনেকগুলো হয়েছে এর মধ্যে। মুখে হাসি এবং দৃষ্টিতে কৌতুক ফুটিয়ে সুলতা তার দিকে তাকালে।

সুরেশ্বর বললে—দেখ, প্রথমটা স্থির করেছিলাম বাড়ীটায় দুর্ভাগিনী মেয়েদের জন্যে একটা হোম-টোম বা আশ্রম-টাশ্রম করব। তখনই এই বারান্দা ঘেরার ব্যবস্থা হয়।

—সেই শেফালি কেমন আছে? যাকে করুণা করতে আমিই বলেছিলাম। তারপর তা থেকেই বুঝি তোমার করুণার স্রোত একেবারে ঝরঝর করে ঝরল—যার তোড়ে ঐরাবত ভেসে গেল!

—জানিনে ঠিক। তার খবর আর রাখিনি। ছেড়ে দাও ওকথা। তারপর মত বদলে ভেবেছিলাম অনাথ আশ্রম করব। বারান্দাটায় ক্লাস বসবে। কিন্তু তাও হয়নি। বারান্দা ঘেরার ইতিহাসটা এই, তবে ওর মধ্যে যেটা আধুনিক মেট্রো প্যাটার্ন চাপানো হয়েছে সেটা নেহাতই ইঞ্জিনীয়ার আর রাজমিস্ত্রীর কেরামতি। এখন ভিতরে এস। বাইরে ঝলমলে আলো পড়েছে, তার মধ্যে আমরা দুজনে পথে দাঁড়িয়ে বাগবিস্তার করছি, এতে জনসাধারণ কৌতূহলী হয়ে উঠেছে।

কথাটা ঠিক। রাস্তার সামনের দোকানে বেশ জটলা জমেছে। রাণী রাসমণির বাড়ীর নিচে বাইরের দিকটায় অসংখ্য দোকান। মশলাপাতি বিশেষ করে সুপুরীর পাইকারী দোকান অজস্র। তারই মধ্যে ছোট্ট তেলেভাজার দোকান থেকে নানান দোকান রয়েছে। দোকান-আইন মেনেও তারা ঝাঁপ আধখানা বন্ধ করে হিসেব-নিকেশ মেলাচ্ছে, মধ্যে মধ্যে কৌতূহলী হয়ে তাদের দিকেই তাকাচ্ছে। ফ্রি স্কুল স্ট্রীট থেকে মোড় ফিরে ফিরিঙ্গী মেয়েরা যাচ্ছে, কেউ হেঁটে কেউ রিক্সায়, পিছনে তাকাচ্ছে শিকার অদৃশ্য সুতোয় গাঁথা মাছের মত পিছনে আসছে কিনা? অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান এবং হাওয়াই শার্ট প্যাণ্ট পরা দেশী বাবুসাহেবরাও যাচ্ছে। সকলেই ওই আলোঝলমল স্থানটায় এসে সবিস্ময়ে তাকাচ্ছে। বাড়ীটা প্রায় বারো মাস অন্ধকার থাকে—হঠাৎ সেটার হল কি যে এমন আলোর জৌলুস ফুটিয়ে রঙ্গমঞ্চে পাদপ্রদীপের সামনে প্রধানা অভিনেত্রীর মত কোন এক বিশেষ রজনী উপলক্ষে রাজরাণীর পোশাকে মুখে পেণ্ট মেখে দাঁড়াল? তারপরই চোখে পড়েছে ওদের দুজনের দিকে।

সুলতা বললে—চল।

* * * *

ভিতরে এসে ওই বারান্দাঘেরা হলটায় নিয়ে এল তাকে সুরেশ্বর। এবং যে আলোগুলো নিভোনো ছিল তাও জেলে দিলে। ঘরখানা ঝলমল করে উঠল শুধু আলোয় নয় ছবির রঙের উপর পড়া আলোর প্রতিচ্ছটাতেও বটে। রঙের আভাও ফুটে উঠল আলোর সঙ্গে।

সবিস্ময় দৃষ্টিতে সে তাকালে ছবিগুলোর দিকে। মুগ্ধবিস্ময়ে দেখছিল। এতো ছবি!

এতো ছবি এঁকেছে সে এই এতদিন অজ্ঞাতবাসে আত্মগোপন করে ? ফিরে সে তাকালে সুরেশ্বরের দিকে। তারপর বললে—এতো ছবি এঁকেছ ?

—এর তিন-চার গুণ ছবি এঁকেছি ! কিন্তু এখানে সব ধরবার কথা নয়। আর সেগুলো যা আমি বলতে চেয়েছি ছবির মধ্যে তার সঙ্গে হয়তো সম্পর্ক ক্ষীণ বা মাত্রা ছাড়িয়ে বলা হয় বলে টাঙাই নি।

ছবিগুলোর দিকে আবার তাকালে সুলতা। দেখতে দেখতেই বললে—ছবির মধ্যে কিছু বলতে চেয়েছ নাকি ?

—তাই জন্যেই তোমায় আমার আজ সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন ছিল দেখাবার। এবং সর্বাগ্রে দেখবার এ তো ছবির প্রদর্শনী নয়, কীর্তিহাটের কড়চা—সুরেশ্বরের জবানবন্দী। ছবি থেকে যাঁরা বুঝতে পারবেন তাঁদের নমস্কার। তাঁরা রসিক এবং রসিকের চেয়েও বেশী কিছু। কিন্তু কি বলতে চেয়েছি তা যাদের কাছে বলতে পারি তার মধ্যে তুমি প্রথম এবং প্রধান।

হাসলে সুলতা। মনে মনে বলতে গিয়ে মুখে বেরিয়ে এল কথাটা। বললে—বড্ড দেরী হয়ে গেছে সুরেশ্বর। আমি অনেক দূরে বাস করি। নিউ আলিপুরে।

—তা জানি। তবে একটা কথা বলি। আজ নানান জমিদারের বাড়ীতে আসর পড়েছে। আমার মনে হচ্ছে বর্ধমানের মহারাজা সম্ভবতঃ গোলাপবাগের প্রাসাদ থেকে প্যালেস পর্যন্ত ঘুরছেন ছবি দেখে দেখে। মন চলে গেছে ১৭৯৯ পার হয়ে ১৭৫৭-তে। তা পার হয়ে আরও পিছনে, শোভা সিং যখন কৃষ্ণকুমারীর ছুরিতে মরেছিলেন সে আমলে। ওঁকে দেখছি, ইমোশনাল লোক। হয়তো ভাবছেন ডিনামাইট দিয়ে এই রাত্রেই সব চুরমার করে দেবেন। তারপর হয়তো ভাবছেন, না সব তিনি গভর্ণমেণ্টকে দান করে দেবেন। কুমার বিমলচন্দ্র সিংহ হয়তো দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের ছবির তলায় দাঁড়িয়ে মুচকে মুচকে হাসছেন। বলছেন—তোমার প্রবর্তন-করা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত যারা আজ নাকচ করলে তাদের মধ্যে আমিও একজন। কোন জমিদার হয়তো একা বসে কাগজের উপর হিসেব করে দেখছেন কম্পেনসেশন কত পাবেন। কেউ কেউ গাল দিচ্ছেন যারা এটা করলে তাদের। এমন লোকও হয়তো এক-আধজন আছেন যাঁরা প্রচুর পরিমাণে মদ্য পান করছেন। কেউ যদি বাঈজী-বাড়ী গিয়ে শেষ উৎসব করেন তবে তাঁকে আমার সেলাম রইল। আমি এই ছবির আসর পেতেছি। ভেবেছিলাম সারা রাত একলাই এপাশ থেকে ওপাশে ঘুরব ! ভাগ্যক্রমে এমন জনকে পেলাম যাকে আমি চেয়েছি মনে মনে ছবিগুলো আঁকবার সময় থেকে টাঙাবার সময় পর্যন্ত।

হঠাৎ একটা লম্বা ছবি, যেটা টেবিলের উপর রাখা ছিল সেটা তুলে নিয়ে প্রথম ছবিটার ফ্রেমে ঠেকিয়ে বললে—এই আমার প্রথম ছবি সুলতা। কংসাবতীবারি-বিধৌত তট—বনচ্ছায়া-শীতল কীর্তিহাট নামক গ্রাম। ১৮০১ সাল।

প্রকাণ্ড বড় বড় ছবি। অয়েলে আঁকা। চার ফুট তিন ফুট বা তার চেয়েও বড়। সুন্দর ছবি। যেমন বর্ণাঢ্য তেমনি বিচিত্র টেকনিকে আঁকা। যেমন আমাদের দেশের

মন্দিরের ভিতর দিকে পোড়ামাটির কাজের মধ্যে কৃষ্ণলীলা রামলীলা ফোটানো হয় তেমনি ঢঙে আঁকা। গ্রাম নদী বন সব আছে পটভূমিতে। গ্রামের খড়ের চাল ঘরের চালগুলিতে সোনালী হলুদ রঙ চমৎকার লাগছিল, তারই মধ্যে সাদা একখানা পাকা বাড়ী। এও পটভূমির কোলে দ্বিতীয় পটভূমি। ছবিটার কেন্দ্র-বিন্দু পথ—পথের উপর পাল্কি চলছে। তার মধ্যে টোপর মাথায় মুকুট মাথায় বালক-বালিকা বর-কনে। বরের হাতে একখানা কাগজ।

তার পিছনে নরনারী। বাদ্যভাণ্ড। আসাসোঁটা হাতে বরকন্দাজ পাইক।

দেখছিল সুলতা।

সুরেশ্বর বললে—রায়বংশের প্রথম জমিদার সোমেশ্বর রায় ১৮০১ সালে দশ বৎসর বয়সে জমিদার হয়েছিলেন। বিয়ে করে তিনি গ্রামে প্রবেশ করছেন।

হঠাৎ সে উঠে দাঁড়াল, বললে—ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ!

চকিত হয়ে উঠল সুলতা। ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ?

সুরেশ্বর সেই মুহূর্তেই বললে—না, আমার ভুল হয়েছে। এখানে তো তুমি একা রয়েছ সুলতা! আর তো কেউ নেই!

তারপর হেসে বললে—আমার হঠাৎ মনে হয় ঘরখানা নরনারীতে ভরে গেছে! এমন ভুল আমার হয় মধ্যে মধ্যে। একটু আগে বলছিলাম, তুমিও জান, একটা পাগলামি আমাদের বংশে আছে। প্রথমে খেয়াল বলে চলে যায়, কিন্তু খেয়াল ততক্ষণই খেয়াল যতক্ষণ মাত্রা না ছাড়ায়। মাত্রা ছাড়ালেই হয় পাগলামি। আমার মাত্রা অনেক দিন ছাড়িয়েছে। তারপর কীর্তিহাটে গিয়ে সেটা আমার মন বুদ্ধি আমার বাসনা কামনাকে এমনভাবে অভিভূত করলে যে আমার সব বেঠিক হয়ে গেল। তার উপর প্রচুর মদ্যপান করতাম। সেটা তাকে বাড়িয়ে তুলত। আমি কল্পনায় নানান ছবি, নানা মানুষ দেখি অন্ধকার রাত্রে। দিনে দেওয়ালের গায়ে ছাদে চটে-যাওয়া পলেস্তারার মধ্যে দেখতে পাই নানান ছবি, নানান মানুষ। কখনও কখনও জীবন্ত হয়ে তারা কথা বলে। আজও আমার হঠাৎ মনে হল ছবির মানুষগুলো ছবি থেকে নেমে এসে ঘর ভরে বসেছে! এরা যে ঐতিহাসিক সুলতা, কাল্পনিক তো নয়। এদের অশরীরী আত্মা এসে বসেছে মনে হল। তারাও দেখতে এসেছে ছবিতে 'কীর্তিহাটের কড়চা'। শুনতে এসেছে সুরেশ্বরের জবানবন্দী!

সুলতার মনে হল সুরেশ্বর যেন কত দূরে—অনেক দূরের দিকে চেয়ে রয়েছে।

২

একজন চাকর এসে ঢুকল হাতে ট্রে নিয়ে। নামিয়ে দিল সামনের টেবিলে। বুড়ো চাকর। সে সুলতাকে দেখে নমস্কার করে বললে—ভালো আসেন দিদিমণি?

সুলতা তাকে এবার চিনলে। এ তো সেই রঘু। রঘু বুড়ো হয়ে গেছে, চুল গোঁফ একেবারে সাদা হয়ে গেছে। সে বললে—তুমি তো রঘু!

—হ্যাঁ। হমি রঘু। রঘুর বাংলায় এখনও হিন্দী টান যায়নি !

—এখনও আছো বাবুর কাছে ? ভাল আছ ?

—হ্যাঁ। ই বাবুকে ছোটা উমরসে মানুষ করলাম। কাঁহা যাই আর কেমন করে যাই ছোড়কে ?

সুরেশ্বর কোন সাড়াই দিলে না। সে দূরের দিকে তাকিয়ে আছে। রঘু ট্রেতে চা এবং কিছু কেক মিষ্টি এনে নামিয়ে দিয়েছে। সে চায়ের কাপটা তুলে নিলে। চায়ের তৃষ্ণা এবং ক্ষিদেও তার পেয়েছিল। সুরেশ্বরকে জানে, সে হয়তো নাও বলবেই না। সেই বরং সুরেশ্বরকে বললে—চা নাও।

তেমনি ভাবে অনেক দূরের দিকে তাকিয়ে সুরেশ্বর বললে—না। তারপর বলেই গেল—সুলতা, ভেবেছিলাম—১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধ থেকে শুরু করব। সে ছবিও আমার আঁকা আছে। কিন্তু দেখলাম তাহলে ১৯৪৭ সালে কড়চা শেষ করতে হয়। এবং তাতে রায়বংশের ভূমিকা ছোট হয়ে যায়। যাকে বলে সাইড ক্যারেক্টার তাই দাঁড়ায়। তারপর ভেবেছিলাম—ইম্পীচমেণ্ট অব হেস্টিংস ছবি দিয়ে শুরু করব। সে ছবিও আঁকা আছে। হাউস অব লর্ডসে ইম্পীচমেণ্টের পালা শেষে হেস্টিংস বেকসুর খালাস পেয়ে বেরিয়ে আসছে। কিন্তু মনে হল, তা হলে শেষ করতে হবে অন্ততঃ আরও একখানা বা দুখানা ছবি এঁকে। হেস্টিংস জবান-বন্দী করেনি নিজে। সুরেশ্বর জবানবন্দী করছে, যাদের সামনে করছে, তাদের মধ্যে তুমি আছ, সে ছবি না-হলে শেষ হয় না। সে ছবি মনে কল্পনায় ছিল কিন্তু আঁকা হয়নি। তাই শুরু করেছি একেবারে বর-বেশী দশ বছরের সোমেশ্বর রায় জমিদার হয়ে কীর্তিহাটে ঢুকছেন সেখান থেকে। ১৮০১ সাল সেটা।

সতরো শো সাতান্নতে পলাশীর যুদ্ধে সিরাজুদ্দৌলা হেরে গিয়ে নিমকহারামের দেউড়িতে মীরনের হুকুমে মহম্মদী বেগের হাতে প্রাণ দিয়েছেন। তারপর মীরজাফর, তারপর মীরকাশেম নবাব কাশেম আলি খাঁ। উধুয়ানালা-ঘিরিয়া থেকে বকসারে শেষ। আবার মীরজাফর। এবার কোম্পানী দেওয়ানী পেলে। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দ। বাংলা ১১৭১-৭২ সাল। কোম্পানীর হাতে সব এল। মায় দেশরক্ষা পর্যন্ত।

পটভূমিটা তোমায় বোঝাচ্ছি সুলতা। ইতিহাসে তুমি পড়েছ। কিন্তু ইতিহাস ঘটনা বলে যায়, অবস্থার ভিতরটা বোঝায় না। এ বোঝানো বড় শক্ত !

আমি একখানা পুরনো পাঁচালীর পুঁথি পেয়েছি। সেখানা সোমেশ্বর রায়ের বাবা কুড়ারাম ভট্টাচার্যের লেখা।

ওগো মা শিবজায়া গো,
অধম সন্তানে কর দয়া গো
অন্তিমেতে অভয়া গো—
কুড়ারামে দিয়ো পদছায়া গো
হরজায়া গো !

মস্ত পাচালী। তার মধ্যে আছে সুলতা, সেদিন লোকে ইংরেজকে পরিত্রাতা ভেবেছিল।

* * *

মুসলমান আমলে বর্গী হাঙ্গামায় যে অত্যাচার করেছিল বর্গীরা তা তো জান। তবু সেকালে এক কবি মহারাষ্ট্র পুরাণ লিখেছিল, তাতে আছে, পাপে সব পূর্ণ হয়ে গেছে দেখে স্বর্গ থেকে দেবতারা এসে বর্গী পেশোয়া থেকে নানান সেনাপতির মধ্যে তাঁদের শক্তি সঞ্চারিত করেছিল, দেশময় পাপীদের শাস্তি দিতে। এতেও তাই আছে—নবাবের সঙ্গে নবাবী আমল শেষ হতে অন্তত হিন্দু সমাজের সাধারণ লোক ইংরেজের উপর কৃতজ্ঞ হয়েছিল।

অত্যাচার তো কম হয় নি।

ওই পাঁচালীর গোড়াটা আমার মুখস্থ আছে। বলে সুরেশ্বর আবৃত্তি করে গেল—

কালে কালে পাপের ভারা পূর্ণ হইলে কাঁপে ধরা
ব্রহ্মা বিষ্ণু দিশেহারা যাচে তোমার দয়া গো।
হরজায়া গো।
তখন তোমার তা থৈ নাচে পাপী মরে পুণ্যাত্মা বাঁচে
পতি তোমার পদ যাচে শবরূপী হয়্যা গো
হরজায়া গো!
পলাশী ঘিরিয়া উধুয়ানালা হইল এমেতে নৃত্যশালা
ফুরালো নবাবী পালা সাহেবানে কৈলে দয়া গো।
হরজায়া গো!
রাঙা চুল লাল মুখ দেখিলে মা কাঁপে বুক
তবু মনে ভাবি সুখ সুবিচার প্যায়া গো।
হরজায়া গো!
সে পাঁচালী রচিতে সাধ হয়েছে দীনের চিতে
শিবরাম মম পিতে কুড়ারাম বাছা
কীর্তিহাটে আদি বাস বর্গী আইল মহাত্রাস
নবাবের সৈন্য নাশ, পালায় খুলে কাছা।
তারা পালাবার কালে গ্রামে গ্রামে অগ্নি জ্বালে
লুঠ করে মেরে ফ্যালে দরিদ্র প্রজারে
পিতা শিবরাম মরে অগ্নি জ্বলে বাস্তুঘরে
জননীর হাত ধরে বনে ও বাদাড়ে
পলাইয়া প্রাণ রক্ষা দ্বারে দ্বারে, অন্ন ভিক্ষা
তুমি কালী সর্বরক্ষা দিলে স্নেহছায়া গো
হরজায়া গো!
সে দয়াতে কুড়ারাম ফিরিল আপন গ্রাম
ভট্ট নয় রায় নাম কোম্পানীর কাছে পায়া গো
হরজায়া গো!
বর্ণিব সে সব কথা কোথায় জল মরে কোথা

ভিক্ষুকের রুখু মাথায় দিলে পাগ পরায়া গো।
হরজায়া গো!
তোমার মন্দির ক'রে তোমারে বসাই ঘরে
মাগি মাগো জোড় করে থাক অচলা হয়া গো।
হরজায়া গো!

অবাক হয়ে সুলতা শুনছিল। সুরেশ্বর চুপ করলে সে বললে—ওয়াণ্ডারফুল! সেটা আছে তোমার কাছে?

—আছে। জাল নয়। কীর্তিহাটের রায়বাড়ীর সেরেস্তাখানা খুঁজতে খুঁজতে পেলাম এটা। সেটেলমেণ্টের জন্য কাগজ দেখতে গিয়ে রায়বংশের স্বরূপের কিছু ছবি• তখন পেয়েছি। তার মধ্যে এমন কিছু পেয়েছি যাতে আমি আমার বংশকে আমার রক্তকে চিনে যেমন শিউরে উঠেছি, তেমনি নেশাগ্রস্ত হয়েছি। তখনই পেলাম এটা।

এতে অনেক কিছু আছে সুলতা। সেদিনের বাংলাকে চেনা যায় জানা যায়। বোঝা যায়। সে বাংলা দেশ এ দেশ নয়! প্রথম ছবিখানিকে ভাল করে দেখ। বুঝতে পারবে। নতুন খড়েছাওয়া ছোট-ছোট ঘর, কোঠাবাড়ীও তখন সারা গ্রামে দুখানা বা একখানা। কীর্তিহাটে ১৮০১ সালের দশ বছর আগে প্রথম কুড়ারাম যে বাড়ী করেন সেখানাই গ্রামের প্রথম কোঠাঘর। পাঁচালীতেই আছে। তখন কুড়ারাম ভটচাজ দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দের দেওয়ান। ১৭৯১ সাল। ১৬৬০ পরগণার রাজস্ব স্থির করছেন, দশশালা বন্দোবস্ত হব। মেদিনীপুরের ময়নার পুরনো রাজবংশের তখন সম্পত্তি গেছে, সে সম্পত্তি গোয়ালপাড়া সরকারের ভুক্তান হয়ে কাশিজোড়ার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কাশিজোড়াও তখন যাই-যাই করছে। ইতিমধ্যে কিছু লাট বের করে নিয়ে কোম্পানী বিলি করেছে, ছোট ছোট তালুকদারেরা নিয়েছে। কুড়ারাম তখন কলকাতার বাসিন্দে দেওয়ানজীর সঙ্গে। ঘর ছেড়েছিলেন বাপের মৃত্যুর পর আর ফেরেন নি! পাঁচালীতে আছে—

পরগণা ষোলশো ষাট কত মৌজা কত লাট
কত জল কত মাঠ কষি দিন রাত
তারই মাঝে চোখে পড়ে ময়না মেদনীপুরে
কাঁসাই নদীর পাড়ে তারই সাথে সাথ
কীর্তিহাট বাস্তুভিটা কি মাটি আঠালো চিটা
লাল চাল কত মিঠা—কাঁসাইয়ের পাড়ে ঘন বন
বামুন কায়েথ বদ্যি সদ্গোপ মাহিষ্য ছত্রি
চুয়াড় চামার মধ্যি আপনার জন।
রাত্রিকালে স্বপ্ন পাই, কীর্তিহাটে ফিরে যাই
খুঁজে ফিরি ভিটি তাই পাই বহু দুঃখে
হয়েছে জঙ্গল ঘোর শিয়াল চেঁচায় রাত্রিভোর
বহু হল কষ্ট মোর স্বপ্ন মাঝে বুকে।

সে হেতু বানালাম কোঠা মাটির দেওয়াল মোটা
শাল কাঠ দিয়ে গোটা মজবুদ চাল
শত তঙ্কা পুরাপুরি খোলা হাতে খরচ করি
হইলাম খুশী ভারী বাদে এতকাল !

সুলতা বললে—তুমি নিজে তৈরী কর নি তো ?

সুরেশ্বর বললে—অবিশ্বাস কর—কি বলব ? বাদপ্রতিবাদ করব না। প্রমাণ-প্রয়োগ হাজির করে ইতিহাস নিয়ে লড়াই করব না। শুধু বিশ্বাস করতেই বলব। পাণ্ডুলিপিতে বানান অনেক ভুল আছে। শব্দ দু-চারটে দুর্বোধ্য আছে। সে আমি পূরণ করেছি, হয়তো ভাষা কিছু আমার একালের জিহ্বায় একালের হয়ে গেছে। তবে তার কাহিনীটা শুনে যাও। ওই ছবিতে যে-পাকাঘরটা দেখা যাচ্ছে সেখানা সতেরো শো নিরানব্বইয়ে আরম্ভ হয়ে আঠারো শো সালে শেষ হয়েছে। মানুষেরা তখন আটহাতি ধুতি, কাঁধে গামছা ফেলে বেড়াত। খালি পা। ওই দেখ কজন ভট্টাচার্য রয়েছেন। তাঁদের পরনে দশ হাত ধুতি, তাও চল্লিশ ইঞ্চি, কাঁধে উড়ুনি। পায়ে তালতলার চটি। তাও শোভাযাত্রায় বেরিয়েছেন বলে। শুধু কুড়োরাম যাচ্ছেন ওই দেখ—পরনে লম্বা ধুতি গায়ে চাপকান তার উপর চাদর। মাথায় একজন ছাতা ধরে রয়েছে। তিনি জমিদার রায়বংশের প্রতিষ্ঠাতা। দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দের ডান হাত। পাল্কিতে সোমেশ্বরের হাতে যে কাগজখানা সেখানা জমিদারী নীলামে কিনেছেন তারই কাগজ !

কিছু কৌশল—বলতে গেলে চুরি, তাই বা কেন, ডাকাতি করে কিনেছেন লাট কীর্তিহাট। টাকা তিনি অনেক উপার্জন করেছিলেন। ঘুষ বল ঘুষ, উপরি বল উপরি। যা বলবে তাই মানব আমি।

তাইতো বলছিলাম—নিজের বংশের স্বরূপ দেখে আমার আমাকে যেন আমারই ভয় হয়েছিল সেদিন। শিউরে উঠেছিলাম। কিন্তু কুড়ারামকে দোষ দিই নি। কৃতী পুরুষ হিসেবে অভিনন্দন জানিয়েছিলাম। হয়তো তোমার মতের সঙ্গে মিলবে না। তা না মিলুক। তা নিয়ে এ কৈফিয়তও দেব না যে, যারাই সংসারে বড় হয়, অন্তত বিষয়ের সংসারে, তারা কর আবওয়াব আদায় করে থাকেন। জোর করে যারা বাহুবলে রাজ্যজয় করে, অন্য দেশ লুঠ করে, তাদের কথা বাদ দিলাম সুলতা। কারণ তারা কারুর মতামতের ধার ধারে না। গ্রাহ্য করে না। কিন্তু যাঁরা তা না করেন, মানুষের প্রচলিত পথে বড় হন, তাঁরাও কিছুটা কর আদায় করেন। প্রভুত্ব অর্জন করলেই মানুষের আনুগত্যটা জমিদারী সেরেস্তার খাজনার উপর চাঁদার মত লোককে দিতেই হয়। না দিলে যাঁর যেমন প্রভুত্ব তেমনি পেনালটি আদায় না করে ছাড়েন না। মন্ত্রীদের কথা ভাবো না। মানে—স্বাধীনতার পরের মন্ত্রীদের কথা। এই তো স্বাধীনতার পর থেকে এ পর্যন্ত গুলি তো কয়েকবার চলল। লাঠিচার্জ তো বাদই দিচ্ছি। এবং এই পদ অর্জনের জন্য ভোট-ভোট করে পরস্পরের সমালোচনার নামে যে তত্ত্ব—সত্য মিথ্যা প্রকাশ পেলে তাই থেকে বিচার কর না। দেখ না, কত স্থানে কত প্রতিশ্রুতি। কতরকম প্রতিশ্রুতি। কোন দল বললে—সব জমিগুলো ওদের কাছ থেকে

কেড়ে নিয়ে তাদের দেব। কেউ বললে—তোমাদের জীবন সুখ-সমৃদ্ধিতে ভরে দেব। তার উপর তোমরা সত্যিকারের স্বাধীন থাকবে। তারপর এগাঁয়ে কুয়ো, ওগাঁয়ে ইস্কুল, ওগাঁয়ের রাস্তা—এসব খুচরো প্রতিশ্রুতি বা ঘুষ যাই বল না কেন—দেওয়ার তো হিসেব নেই। এর ছেলের চাকরী, ওর এটা, তার সেটা এ-সবের ফিরিস্তি নাই তুললাম। সুতরাং এ-ধরণের ব্যাপার চিরকাল আছে। ব্যাপারের ঢং পাল্টেছে। কিন্তু যাঁরা লোকনায়ক হলেন, তাঁদের অস্বীকার করব কি করে? কুড়ারাম ভট্টাচার্যকে তাই আমি অভিনন্দন জানিয়েছিলাম সেদিন।

কুড়ারাম ভট্টাচার্যের পাঁচালী আমাকে খুব বেশী আকর্ষণ করত না বা এত মূল্য তাকে দিতাম না সুলতা যদি আমি আর একটা বিচিত্র এবং নিষ্ঠুর তথ্য আবিষ্কার না করতাম। তাতে তুমি জড়ানো সুলতা। অন্ততঃ তোমার সঙ্গে আমার যে অন্তরঙ্গ বন্ধন হবার কথা—প্রতিশ্রুতি দিয়েছি একরকম—তার মাঝখানে এই তথ্যটা এসে দাঁড়িয়ে আমাকে শিউরে দিয়েছিল। আমি সেই তথ্যটার অন্তরালে সত্য কি তাই আবিষ্কার করতে পুরনো কাগজ হাঁটকে দেখেছি সারাদিন—সেই ধূলা সর্বাঙ্গে মেখে ভূত হয়ে সন্ধ্যায় স্নান করে বিবি-মহলের ছত্রি-দেওয়া রেলিংঘেরা বারান্দায় বসে ভেবেছি।

সুলতা ভুরু কুঁচকে বিরক্তিভরেই বললে—কি বলছ পাগলের মত? আমার সঙ্গে কোথায় সম্পর্ক আবিষ্কার করলে?

—তোমার চারপুরুষের নাম জান সুলতা?

—কেন?

—বল! চারপুরুষ আগে তোমার পূর্ব-পুরুষের কারুর নাম ছিল ঠাকুরদাস পাল।

—ঠাকুরদাস! হ্যাঁ, ঠাকুরদাস ঘোষ।

—হ্যাঁ। তখন তিনি পাল ছিলেন। তাঁর ছেলে ছিল জগন্নাথ পাল! তিনি ঘোষ হয়েছিলেন। তাঁর ছেলে নরেশ ঘোষ কলকাতায় অ্যাডভোকেট হয়েছিলেন। তিনিই ব্রাহ্ম হন। তাঁর ছেলে তোমার বাবা আর সি ঘোষ, রমেশচন্দ্র ঘোষ ব্যারিস্টার।

অবাক হয়ে সুলতা তাকিয়ে রইল সুরেশ্বরের মুখের দিকে।

সুরেশ্বর বললে—ঠাকুরদাস ছিলেন আমার প্রপিতামহের বড়ভাইয়ের মত, ভক্তের মত। তাঁর বাড়ী ছিল কীর্তিহাট থেকে পনের-বিশ ক্রোশ দূরে, হুগলী জেলায়, গঙ্গার ধারে শ্যামনগরে। আমার প্রপিতামহের বিবাদ হয়েছিল তাঁর মামা বীরেশ্বর রায়ের সঙ্গে। বীরেশ্বর রায় দুর্দান্ত পুরুষ। সেই বিবাদে, আমার প্রপিতামহকে ঠাকুরদাস পাল জীবন বিপন্ন করে রক্ষা করেছিলেন, কিন্তু তার জন্যে তাঁর প্রথম পক্ষের সংসার স্ত্রী-পুত্র সব পুড়ে মারা গিয়েছিল। আমার প্রপিতামহই আবার তাঁর বিবাহ দেন। সেই ঠাকুরদাস পাল, সুলতা, খুন হয়েছিলেন। কাগজ দেখতে দেখতে সন্দেহ হল—সে খুন করিয়ে ছিলেন আমার প্রপিতামহ। রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায়। শরীরের রক্ত যেন বিষ হয়ে গেল সুলতা। মাথার খেয়াল যাদের থাকে, মস্তিষ্কের উগ্রতা তাদের স্বাভাবিক। সেই উগ্রতা চিন্তায় চিন্তায় এমন উত্তপ্ত হল যে, আমি পাগলই হয়ে গেলাম। আমার এই উদ্ভট মন যাকে লোকে খেয়ালী

বলে পাগল বলে, তার পাগলামি জাগল—আমি সুলতার পাশে দাঁড়াব কি বলে ?

সুলতা স্থিরদৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে রইল।

ক্লক-ঘড়িতে ঢং-ঢং করে দশটা বেজে গেল। সুলতা বললে—বল। থামলে কেন ?

* * * *

সুরেশ্বর বললে—খুন তিনিই করিয়েছিলেন। আমার প্রপিতামহ, তোমার পূর্ব-পুরুষকে।

—কেন ? জমিদারীর ব্যাপারে ?

—সে সুদীর্ঘ কথা সুলতা। সেই তো কীর্তিহাটের কড়চা। সেই তো আমার জবানবন্দী। গোটা রায়বংশ তার সঙ্গে জড়ানো। জমিদারীর দায়ে তিনি খুন করাননি। জমিদার ছিলেন বলেই খুন করিয়েছিলেন। করাতে পেরেছিলেন। সংসারে বংশ-গৌরব, জন্ম-গৌরবের মূল্য সব মানুষেরই আছে। অনেক বিদগ্ধ মানুষের কাছে শুনবে—পাঁচপুরুষ সাতপুরুষ আগে হয় পূর্বপুরুষ রাজা ছিল—নয় সিদ্ধপুরুষ ছিল, নয় কোন অবিস্মরণীয় মানুষ ছিল। কিন্তু এই বংশগৌরব যখন সম্পদের আর বিষয়ের সঙ্গে একসঙ্গে হয়, তখন সে হয় যত দীপ্ত তত উত্তপ্ত! দীপ্তি যখন কেউ ম্লান করে দিতে চায়, তখন তাকে উত্তাপ দিয়ে পুড়িয়ে মারে। সম্পদ যার না থাকে, তাদেরও এতে উন্মত্ত হবারই কথা। কিন্তু এখানে সম্পদবিষয়ও ছিল জড়ানো। বিষয়—মাতৃকুল-পিতৃকুল, মাতামহ-পিতামহ, পিতা-মাতা রত্নেশ্বর নিজে সকলে এতে জড়িয়েছিলেন। কিন্তু কলঙ্কই বল আর অগৌরবই বল, সবটাই ভ্রান্তিবশে একটি অকিঞ্চিৎকর সত্যকে গোপন করতে গিয়ে সৃষ্টি করেছিলেন নিজেরাই! তাঁরা সত্যকে প্রকাশ করতে পারেন নি, সেই সত্যকে প্রকাশ করে জবানবন্দী দিয়ে আমি মুক্ত হতে চাই।

হাসলে সুরেশ্বর। তারপর সে ঠাণ্ডা চায়ের কাপটা তুলে নিলে।

সুলতা বললে—ওটা জল হয়ে গেছে।

রেখে দিলে সুরেশ্বর।

সুলতা ডাকলে—রঘু!

রঘু ঘরের দরজার ওপাশেই বোধহয় বসে বসে ঢুলছিল। এ অভ্যাস তার আছে। সুরেশ্বরের প্রতি তার মমতা আসক্তি—উদরান্নের দায়ে নয়—এর মধ্যে একটা নেশা আছে। খেয়ালী সুরেশ্বরকে মানুষ করে তার রূপ-গুণ-দোষ-ত্রুটি সবের নেশায় পড়েছে; সব থেকে বেশী সুরেশ্বরের খেয়ালীপনার অত্যাচারের নেশা। সে তাকে ছাড়তে পারে না। সুরেশ্বর ছবি আঁকে, সে দাঁড়িয়ে তুলি-রঙ এগিয়ে দেয়—ধরে। সুরেশ্বর বাজনা বাজায়, সে দরজার পাশে বসে শোনে। সুরেশ্বর মদ্য পান করে, সে উপকরণ তৈরী করে সন্ধ্যা থেকে। সুরেশ্বর রাত্রি জেগে বসে ভাবে, নক্ষত্রক্ষচিত আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে, সে বসে বসে ঘুমোয়, কিন্তু সামান্য শব্দে জেগে ওঠে!

রঘু এসে সামনে দাঁড়াল।

সুলতা বললে—একবার চা কর রঘু। তোমার লালবাবু চা খান নি, জুড়িয়ে গেছে।

রঘু বললে—চা খাবে এতো রাতে ? উটা খাবে না ?

—না।

সুলতা বললে—কি ? ব্র্যাণ্ডি-হুইস্কি ? আমি তো জানি তুমি খাও। তা খাও না !

—না সুলতা। আজ আমি এমন একটা কথাও বলতে চাইনে, যার উপর কোন মাদকের একবিন্দু প্রভাব পড়ে। চা নিয়ে আয় রঘু।

—তাই আন তাহলে। এক কাজ কর। বেশী করে তৈরী করে ফ্লাস্কে পুরে দাও। দরকার মত আমরা ঢেলে নেব। আর চল. আমি একটা ফোন করব।

সুলতা, রঘু চলে গেল। সুরেশ্বর এসে কাচের জানালায় দাঁড়াল রাস্তার দিকে চেয়ে। সামনে ফ্রি স্কুল স্ট্রীট।

রাস্তাটা নির্জন হয়ে এসেছে। মধ্যে মধ্যে রিক্সা যাচ্ছে—আর পায়ে হেঁটে যাচ্ছে দু-চার জন ফিরিঙ্গী এবং লুঙ্গীপরা মুসলমান। এ রাস্তাটায় এদের বাসই বেশী। রাণী রাসমণির শ্বশুর প্রীতিরাম মাঢ়ের কাছে জমি সংগ্রহ করেছিলেন কুড়ারাম ভট্টাচার্য। এক বিঘা জমি ব্রাহ্মণকে দিয়েছিলেন তাঁরা।

কুড়ারাম অর্থ উপার্জন করে জমিদারী কিনেও তাঁর বাল্যকালের অভ্যাস ছাড়তে পারেন নি। প্রথম জীবনটা গেছে নিদারুণ কষ্টের মধ্যে। বাপের মৃত্যুর পর মায়ের হাত ধরে পথে পথে বেড়িয়েছেন ভিক্ষা করে। মা বেশী দিন বাঁচেননি। ঘর থেকে বেরিয়ে ছ'মাসের মধ্যেই আত্ম-হত্যা করেছিলেন। কাল হয়েছিল তাঁর রূপ। ভট্টাচার্য-বংশে রূপ আছে অনেকদিন থেকে। গৌরবর্ণ রঙ, ব্রাহ্মণপণ্ডিতি চেহারা। এটার অবশেষ কীর্তিহাটের বিশ-ত্রিশ ঘর ভট্টাচার্যের বাড়ীতে আজও আছে। কুড়ারামের মা রূপের সে প্রদীপশিখাকে আরও উস্কেই শুধু দেন নি, সে প্রদীপে কিছু ঘৃতসিঞ্চনও করেছিলেন। তাঁর রূপ ছিল প্রতিমার মত।

হেরে পালালো—হিজলীর নবাবের সৈন্যরা ঘর জ্বালিয়ে লুঠে শিবরামকে হত্যা করে যেদিন রাত্রে, সে রাত্রে প্রথমেই ছেলের হাত ধরিয়ে স্ত্রীকে শিবরাম জঙ্গলে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। নিজে ছিলেন কিছু ঘুষ দিয়ে ঘরটাকে বাঁচানোর জন্য। কিন্তু তারা সব লুঠে ঘর জ্বালিয়ে তাঁকে হত্যা করে চলে গিয়েছিল। কুড়ারামের মা গ্রামে পরদিন ফিরে স্বামীর সৎকার করে আশ্রয়ের জন্য গ্রামের লোকের সঙ্গেই পথে বেরিয়েছিলেন—গোধা গ্রাম পুড়ে গেছে। সবাই নিরাশ্রয়। তার উপর বর্গীর ভয়। কিন্তু বর্গীরা এদিকে আসে নি, তারা চন্দ্রকোণা মেদিনীপুর দিগনগর খিরপাই হয়ে চলে গিয়েছিল বর্ধমানের দিকে। পাঁচালীতে আছে—

"তবে কোন কোন গ্রাম বর্গী
দিল পুড়াইয়া।
সে সব গ্রামের নাম শুন
মন দিয়া।

চন্দ্রকোণা মেদিনীপুর আর দিগনগর খিরপাই পোড়ায়ে যায় বর্ধমান শহর।

লোকে ভাগীরথী পার হয়ে আশ্রয় নিয়েছিল নানান স্থানে। হুগলী জেলায় গিয়ে

উঠেছিলেন কুড়ারামের মা ছেলের হাত ধরে। কটা ছেলে মরে হয়েছিল কুড়ারাম—কয়েকটি সন্তানের জননী কুড়ারামের মা, কিন্তু রূপ তাঁর যথেষ্ট ছিল। ছেলেও রূপবান। তাঁদের দেখে মমতা করে আশ্রয় দিয়েছিলেন একটি বর্ধিষ্ণু ঘরের প্রবীণা মহিলা। রান্নার কাজ দিয়েছিলেন। কুড়ারামকে দিয়েছিলেন পূজার ফুল তোলার কাজ।

মাস ছয়েক পর মা তার একদিন রাত্রে গলায় দড়ি দিয়েছিলেন।

কুড়ারাম জানত—তার মাকে উত্যক্ত করে তুলেছিল ওই বংশের একটি ছেলে। সে বুঝতে পারত। প্রথমটা নিরাপদেই ছিল—ওই বৃদ্ধা গৃহিণীর কৃপায়। তিনি তার মাকে আপনার ঘরে নিয়ে শুতেন। তিনি মারা গেলেন। তাঁর শ্রাদ্ধ শান্তি চুকতেই একদিন রাত্রে মা চীৎকার করে উঠলেন। সে ঘুমিয়ে ছিল। ঘরের একটা দরজা খোলাই শুধু দেখেছিল—আর কিছু সে দেখে নি—মা উদ্‌ভ্রান্তের মত হাঁপাতে হাঁপাতে দরজাটায় পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। দরজাটার খিল ছিল না। তারপর সে আবার ঘুমিয়ে পড়েছিল। সকালে দেখেছিল তার মা ঘরে নেই। বাইরে অনেক গোলমাল। ওই বাড়ীরই খিড়কীর পাড়ের একটা গাছের ডালে গলায় দড়ি দিয়ে মা ঝুলছেন। কুড়ারাম মায়ের সৎকারও করে নি। ভয়ে সে পালিয়ে গিয়েছিল।

তারপর ভিক্ষা করত। রাত্রে কোন গ্রামে কারুর দাওয়ায় কিম্বা গাছতলায় খুঁজে নিত আশ্রয়। একান্ত অনাহূতের মত। এরই মধ্যে আবার একটা আশ্রয় তার মিলল। সেও তার রূপের জন্য। সে এসে পড়েছিল হুগলী শহরে।

তখন মস্ত শহর হুগলী। হুগলীতে নবাবের ফৌজদার থাকেন। রাজা তখনও হন নি—বাবু নন্দকুমার তখন হুগলীর ফৌজদার। হুগলীতে তখন ইংরেজদের কুঠী। তখন সুতানটিতে তারা নতুন শহর পত্তন করে কুঠী তৈরী করে কলকাতা নাম দিয়েছে বটে, কিন্তু হুগলীর তখনও খুব জম-জমাট। পাশেই চুঁচড়োতে ওলন্দাজদের কুঠী ও আড্ডা। চন্দননগরে ফরাসীরা রয়েছে। দিনেমাররা শ্রীরামপুরে। এর সঙ্গে আরমানী মুসলমান ব্যবসাদাররা আছে। এ এক নতুন রাজ্যে এসে পড়েছিলেন কুড়ারাম। ব্রাহ্মণের ছেলে, ছেলেমানুষ, একটা ভয় তাঁর ছিল। এই ম্লেচ্ছের শহরে এসে কোথায় জাত চলে যাবে। সেই ভয়ে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন দেবস্থলে। চুঁচড়োর ষাঁড়েশ্বরতলায়। এই রূপবান খুদে বামুনের ছেলেটিকে যাত্রীরা সমাদর করত। মেয়েরা বামুন করে খাওয়াতো, কিছু দক্ষিণে দিত। ওখানেই কিছু মন্ত্রতন্ত্র শিখেছিলেন। সেই শেখার দায়ে লেখাপড়াও, কিছুটা বাংলা, কিছু মুখস্থ করে সংস্কৃত পড়ে এই জীবনের গোড়া-পত্তন করে নিয়েছিলেন।

সময়টা তখন কিন্তু মানুষের সুখে-শান্তিতে বাঁচার পক্ষে নিরাপদ ছিল না। বর্গী গিয়েছে। কিন্তু তারপর থেকেই এই সব সাহেবান লোক, এই শান্ত নিরীহ দেশের বুকে নিদারুণ দাপাদাপি শুরু করলে। নিজেদের মধ্যে ঝগড়া। নবাবের সঙ্গে ঝগড়া এসব লাগিয়েই রাখলে। আজ ফরাসীর সঙ্গে ইংরেজের ঝগড়া হয়, ইংরেজরা চন্দননগরে গিয়ে কামান দাগে, কাল ফরাসীরা হামলা করে।

এরই মধ্যে খবর রটল—নবাব আলীবর্দী খাঁর ইন্তেকাল হয়েছে, তাঁর নাতি সিরাজুদ্দৌলা

নবাব হয়েছেন। নবাব সিরাজুদ্দৌলা ইংরেজদের ওপর চটা। ফরাসীদের সঙ্গে আঁতাত বেশী। সুতরাং হুগলী অঞ্চলের অনেক লোক মনে মনে শঙ্কিত হয়ে উঠল। তখন কুড়ারাম ভট্টাচার্যের বয়স পনের-ষোল। তিনি ঠাকুরের স্থান ছাড়েননি বটে কিন্তু এ এলাকা ছাড়িয়ে অন্য এলাকাতে আসা-যাওয়া শুরু করেছেন। এদেশে তখন অনেক ছোটখাটো বিদেশী ব্যবসাদার ব্যবসা করে যারা লিখতে পড়তে জানে না। এদের মধ্যে মুসলমান বেশী। আফগানিস্থান, পারস্য, আরব দেশ থেকে এদেশে এসে কাঁধে করে মাল বয়ে ব্যবসা শুরু করে; খাতা একটা রাখে, তাতে ধারে মাল যাদের দেয়, তাদের নাম লিখিয়ে নেয় অন্যকে দিয়ে। এবং এ থেকেই তারা কেউ কেউ হয়েছে ইতিহাস-বিখ্যাত মীরহাবিবের মত রাজনীতি ক্ষেত্রের ধুরন্ধর। ব্যবসার ক্ষেত্রে বড় গদী ফেঁদে বসে ধনী হয়েছে এমন লোকও অনেক আছে। বাংলাদেশে কাবুলীরা এখনও আছে। সুরেশ্বর যখন কীর্তিহাটে প্রথম যায় পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষ্যে, তখন কাবুলীওয়ালাদের টাকা আদায়ের সময়। সে তাদের লাঠি এবং খাতা হাতে ঘুরতে দেখেছে। সে-খাতা বাংলায় লেখা!

সে আমলে এ ধরণের ব্যবসাদার ছিল প্রচুর। এই কুড়ারাম ভট্টাচার্য তাদের খাতা লিখে দিতেন। এই কর্মযোগেই তিনি চেষ্টা করে পারসী লিখতে-পড়তে শিখেছিলেন।

কুড়ারামের রূপ শুধু দেহেই ছিল না তাঁর হাতের লেখাতেও রূপ ছিল। লেখা ছিল গোটা গোটা ছাপার হরপের মত। ফলে দেবমন্দিরের যৎকিঞ্চিৎ কাঞ্চনমূল্যের দান ও দক্ষিণার এলাকা ছেড়ে সামনে এই শহরগঞ্জের মুনাফার প্রশস্ত ক্ষেত্র তাঁকে হাতছানি দিয়ে ডেকে অনায়াস প্রবেশাধিকার দিয়েছিল। তিনি ধনী মুসলমান ব্যবসায়ীর গদীতে মুন্সী নিযুক্ত হয়েছিলেন মাসিক পাঁচ সিকা তঙ্কা বেতনে। এখানে তিনি পাকা হিসাবনবীশ হয়ে ওঠেন। তখনও বয়স বিশ হয় নি। সেই সময়ে খবর রটল নবাব সিরাজুদ্দৌলা কলকাতা দখল করে কেল্লা উড়িয়ে দিয়েছেন। ইংরেজরা পালিয়েছে ফলতার ওদিকে। হুগলীতেও কি-হয় কি-হয় অবস্থা। বহুজন কারবার বন্ধ করে পালাচ্ছে। হাঙ্গামা মিটলে আসবে, খুলবে।

কুড়ারামও সরে এসেছিলেন হুগলী থেকে। গঙ্গার স্রোত এবং বাদশাহী শড়ক এই দুটো পথ থেকে যে যতদূর যেতে পারে, সে তত নিরাপদ। লোকে তাই পালাচ্ছিল। কুড়ারামও হুগলী থেকে সরে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন তারকেশ্বরে। আবার ধরেছিলেন দেবতাকে। এখানে থাকতেই খবর পেয়েছিলেন, পলাশীতে নবাবের সঙ্গে ইংরেজ কোম্পানীর লড়াই হয়ে একটা হেস্তনেস্ত হয়ে গেছে। নবাব সিরাজুদ্দৌলা হেরেছেন। শুধু তাই নয়, হেরে তিনি পালিয়ে যাচ্ছিলেন তাঁর বেগমকে নিয়ে কিন্তু ভগবানগোলা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে এনে, নতুন নবাব সিজাজুদ্দৌলার সিপাহসালার মীরজাফর আলী খাঁয়ের ছেলে মীরন তাঁকে খুন করিয়েছে। সুতরাং এখন মোটামুটি আর লড়াইটড়াই হবে না। এবং ইংরেজ কোম্পানীরই এখন পাশার দানের পোওয়া বারো। যে যেখানকার সে সেখানে ফিরল। হুগলীতে বরং বেশী লোক ফিরল। কিন্তু কুড়ারাম ফিরলেন না। তখন তাঁর জীবনে যৌবনের নেশা লেগেছে। তিনি তারকেশ্বর মন্দিরে পূজক-পুরোহিতদের আশ্রয়েই ছিলেন। পূজোয় সাহায্য করতেন। লোকরঞ্জনে ক্ষমতা ছিল। উপার্জন বলতে গেলে সামান্য। কিন্তু ওই তারকেশ্বরে আসত এক

সম্পন্ন ঘরের কিশোরী কন্যা। তার মানত ছিল। আসত সে সপ্তাহে দু'দিন করে। রূপবতী কিশোরী। কোষ্ঠীতে আছে চৌদ্দ বছরে বৈধব্যযোগ। এইজন্যই তারকেশ্বরে নিয়মিত অর্চনার সংকল্প ব্রতের মত পালন করে। প্রাচীন জমিদার বংশ। কিন্তু সম্পদ এখন যাবার পালা। তাতেও অবশ্য কম কিছু নেই। বাড়ীতে হাতী আছে। পাল্কি আছে। চাকরানভোগী বেহারা আছে। ঘোড়া তো আছেই। ও অঞ্চলে নামডাক যথেষ্ট। লোকে রাজাই বলত। তাঁর ওই একটি কন্যা। কুড়ারাম এই কন্যার রূপে মুগ্ধ হলেন এবং নিজের রূপ এবং ব্রাহ্মণবংশের বৈশিষ্ট্য-গৌরবে মনেও করলেন না যে, ব্রাহ্মণ-পুত্র হলেও তিনি রাখাল এবং সে রাজকন্যা।

মেয়েটিও মুগ্ধ হয়েছিল।

পাঁচালীতে তাই বলেছেন কুড়ারাম।

দুরু দুরু কম্পে বুক হস্ত কম্পে শুষ্ক মুখ
বাক্যবদ্ধ হইনু মুক আশীর্বাদী দিতে
মিটি মিটি কন্যা হাসে কপট রোষের ভাসে
বোবা ঠাকুরের পাশে পুষ্প নারি নিতে।
চোখের পলক ঠারি জানাইয়া দেয় কুমারী
মন সমর্পণ করি দিয়াছি তোমাকে।
আমি পাগল হইলাম তারকেশ্বরে ধেয়াইলাম
পূর্ণ কর মনস্কাম পাওয়াও কন্যাকে।

কিন্তু তারকেশ্বর সে মনস্কামনা পূর্ণ করেন নি। বরং কপালে লিখেছিলেন লাঞ্ছনা। গ্রাস-চারেক মধ্যে কথাটা প্রকাশ হয়ে গিয়েছিল। সঙ্গে আসতেন বৃদ্ধা ঠাকুমা, দাসী, পাইক, গোমস্তা। ঠাকুমাই নাতনীকে নিয়ে পূজার্চনা করাতেন, দাসীও থাকত অবশ্য একটু দূরে। ক্রমে ক্রমে ইসারা-ইঙ্গিত থেকে কথাবার্তাও হয়েছিল। বুড়ী ঠাকুমা এই রূপবান যুবককে দেখে ভুলেওছিলেন। তাঁর ক্রমে ক্রমে ধারণা হচ্ছিল—বাবা তারকনাথই এই কুড়ারামের ছদ্মবেশে বা কুড়ারাম হয়ে জন্মে তাঁর নাতনীর বর হতে এসেছেন। পাঁচালীতে তার বর্ণনা আছে।

ইসারা-ইঙ্গিত হইতে হাতে হাতে ছুঁতে ছুঁতে
দোঁহে যায় মজি দুঁহুতে ঠাকুমাও বোঝে।

এই ঠাকুমাই বলেছিলেন ছেলেকে—দেখ, এই ছেলেই বুঝি বর। এরই সঙ্গে বিয়ে দে। একে-বারে সাক্ষাৎ শিব রে, সাক্ষাৎ শিব!

কিন্তু ছেলে তাতে তুষ্ট তো হন-ই নি—রুষ্ট হয়েছিলেন প্রচণ্ডভাবে। একটা পুজুরী বামুন—ওই পাণ্ডাশ্রেণীরও চাকর, সে হবে তাঁর জামাতা! তিনি মুখে কিছু বলেন নি মাকে। কিন্তু কন্যা ও মায়ের পরের আসবার নির্দিষ্ট দিনের আগেই হাতী চড়ে এসেছিলেন এবং মোহন্তের সঙ্গে কথা বলে গিয়েছিলেন। মহান্ত তারকেশ্বরের মহান্ত, তিনি কুড়ারামকে ডেকে খুঁটির সঙ্গে বেঁধে অপমান ও লাঞ্ছনার শেষ রাখেন নি। দেবতার পূজা সেবা করতে গিয়ে যাত্রী কুমারী কন্যার উপর পাপদৃষ্টি দাও তুমি পাষণ্ড! তুম বদমাস শয়তান, পাপী হো। তারপর

হুকুম দিয়েছিলেন—সেইদিনই সূর্যাস্তের পূর্বে সে যেন তারকেশ্বর ছেলে চড়ে যায়। না গেলে দুনিয়াতে সে আর থাকবে না। তাতেই ক্ষান্ত হন নি ; পাইক সঙ্গে দিয়ে হুগলী পর্যন্ত তাকে তাড়িয়ে রেখে আসবার ব্যবস্থা করেছিলেন।

হুগলী এসে তিনি কয়েকদিন মুহ্যমান হয়ে পড়ে আবার মহোদ্যম নিয়ে অর্থোপার্জনের জন্য ব্যস্ত হয়েছিলেন। টাকা রোজগার করে বড়লোক হয়ে ওই কন্যাকে তিনি বিবাহ করবেন। ব্যবসা তিনি পারবেন না তা জানতেন। তিনি চেয়েছিলেন চাকরী। এমন চাকরী যাতে মাইনেটা কিছু নয়, তার থেকে অনেক বেশী পাওয়া যায় ঘুষ। ঘুষকে তখন ঘুষ বলত না। স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নাম ছিল। পাইকের উপরি—তলবানা। গোমস্তার উপরি—তহুরী ! নায়েবের—নায়েব সেলামী। আমলাদের—পার্বণী। দালালের-দালালীর উপরেও দস্তুরী। সাহেবের—ভেট। ডালি। কুড়ারাম বেছে বেছে জমিদারী সেরেস্তা পছন্দ করেছিলেন এবার এবং এসে উঠেছিলেন প্রাচীন উত্তররাঢ়ী কায়স্থ জমিদারী বাড়ী বাঁশবেড়ের কাছে। দাতার বংশ —নিত্য প্রভাতে উঠে ব্রাহ্মণকে নিষ্কর দিতেন কিছু। বাঁশবেড়ে জমিদারদের রাজা খেতাব আজও লোকসমাজে বহাল আছে। সকলে রাজার কাছে দর্শনপ্রার্থী হলে রাজা বলেছিলেন—তাই তো ঠাকুর, সাক্ষাৎ দেবতার মত তোমার রূপ, তা বিলম্বে এলে ! এক্ষুনি যে নিয়মমত দান একজন নিয়ে গেল বাবা। তুমি কাল এস।

কুড়ারাম বলেছিলেন—হুজুরের কাছে নিষ্কর দানপ্রার্থী হয়ে আসি নি আমি। আমি একটি কর্মপ্রার্থী হয়ে এসেছি।

—কর্ম ? তা দেবকর্ম লোকজন তো যথাযথ রয়েছে এখন। তা—

হাতজোড় করে কুড়ারাম বলেছিল—দেবকর্ম আমি জানি হুজুর। কিন্তু তার প্রার্থনায় আসি নি ঠিক। এসেছি হুজুরের সেরেস্তাখানায় কোন কর্মের জন্য। আমি পার্সী জানি, বাংলা জানি, হিসাবনিকাশ রাখতে পারি।

—বল কি ! কই তোমার হস্তাক্ষর দেখি !

হাতের লেখা দেখে খুব খুশী হয়ে কাজ দিয়েছিলেন তিনি। এখানে বছরখানেক কাজ করে পাকা জমিদারী সেরেস্তার পাটোয়ার হয়ে উঠেছিলেন। আমীনের কাজ তাও শিখেছিলেন। কিন্তু এরই মধ্যে খবর তিনি পেয়েছিলেন যে, সেই কন্যার বিবাহ ইতিমধ্যে হয়ে গেছে। শুনে প্রথম ভেবেছিলেন, কাজকর্ম ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়ে যাবেন। কিন্তু কয়েকদিন পর মদ্যপানে দীক্ষা নিয়ে এই বিরহ ভুলেছিলেন। পাঁচালীতে লিখেছেন—

ভুলিতে বিরহ জ্বালা লইনু জপের মালা
ভরিয়া নারিকেল মালা খাইনু কারণ
পাইনু সান্ত্বনা তাতে জননী চরণ প্রসাদে
কর্ম করি সাথে সাথে হয় উপার্জন।

সুরেশ্বর হাসলে। এই ধরণের শক্ত বস্তুনিষ্ঠ মানুষ না হলে কুড়ারাম ভটচায বাংলার জমিদারী বন্দোবস্তের ক্ষেত্রে অজ্ঞাতনামা কীর্তিমান ব্যক্তি হতে পারতেন না। রায়বংশ

প্রতিষ্ঠা করতে পারতেন না। তবে তাঁর এই পথে কঠিন পরিশ্রমে দৃঢ়পদে অগ্রসর হওয়ার কারণটা বোধ হয় ছিল এই কন্যাটির পিতৃবংশের সর্বনাশ। সেটা তিনি সচেতন মনে জানতেন না বোধ হয় তবে অচেতন মনের গভীরে ছিল এই বাসনা। না হলে তিন বছর পর যখন খবর রটল নবাব জাফর আলিকে নবাবী গদী থেকে নামিয়ে কোম্পানী তাঁর জামাই মীর্ মহম্মদ কাসেম খাঁকে তক্তে বসাচ্ছেন এবং কাসেম খাঁ খুব কাজের লোক তখন বাঁশবেড়ের চাকরী ছেড়ে তিনি মুরশিদাবাদ রওনা দিতেন না। বাঁশবেড়ের কর্তাই তাঁকে সুপারিশপত্র লিখে দিয়েছিলেন। দিয়েছিলেন কান্দীর উত্তররাঢ়ী কায়স্থবংশের সন্তান নবাব সরকারের কানুনগো (তখন নাম ছিল বঙ্গাধিপ) প্রাণগোবিন্দ সিংহের কাছে। কুড়ারামের হাতে তখন পাঁচ হাজার টাকা জমেছে। তখনকার দিন, পথ নিরাপদ ছিল না। তারপর নবাব বদলের কাল। কুড়ারাম হুগলীতে গিয়ে কোম্পানীর কুঠীতে টাকাটা জমা দিয়ে বরাত নিয়েছিলেন কাসিমবাজারের কুঠীর উপর।

মুরশিদাবাদে এসে পড়েছিলেন মরসুমের সময়। নবাব কাসেম আলি খাঁ তখন শ্বশুর মীরজাফরের আমলের যত বিশ্বস্ত কর্মচারী তাদের প্রত্যেককে হিসাবনিকাশের দায়ে ফেলে তাদের কাছ থেকে টাকা আদায় করছেন। জাফর আলীর রাজস্ব বিভাগের কর্তা ছিলেন কিনুরাম এবং মণিলাল। তাদের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে ক্ষান্ত হলেন না, তাদের প্রাণ-দণ্ড দিলেন। ছ বহন হরকরা জাফর আলীর পেয়ারের হরকরা ছিল। তারও দশা হল তাই। এমন কি হারেমের দাসীবাদীরাও দায়ে পড়ল। রাত্রে কান্না শোনা যেত। তামাম অবস্থাপন্ন কর্মচারীর তখন হিসাব হচ্ছে, সুমার হচ্ছে পরগনাওয়ারি। নতুন বিচক্ষণ পাটোয়ারের প্রয়োজন হয়েছে নবাব সরকারে। প্রাণগোবিন্দ সিংহের নির্দেশমত নবাবের প্রিয়পাত্র মুৎসুদ্দিদের প্রধান আলি ইব্রাহিম খাঁর বিশ্বাসভাজন মুন্সীর হাতে এক হাজার টাকা নজরানা দিয়ে কানুনগোদের অধীনে কর্ম পেলেন কুড়ারাম। পেলেন প্রাণগোবিন্দ সিংহের অধীনে নয় তাঁর ভাই কানুনগো গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের অধীনে।

শুধু কর্মই পান নি। জীবনে প্রথম সঙ্গিনীও জুটে গিয়েছিল। সেদিন সন্ধ্যার পর কানুনগো গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ যাচ্ছিলেন কান্দী মোকাম। খাগড়া ঘাটে গঙ্গা পার হয়ে ওপারে গিয়ে উঠবেন পাল্কিতে। পাল্কিবেহারা সিপাহী পাইক সেখানে হাজির থাকবে। গঙ্গার ঘাট পযন্ত তিনি সিংহজীকে নৌকায় তুলে দিতে গিয়েছিলেন। ফিরবার পথে তখন রাত্রি প্রায় এক প্রহর। লালবাগ মুরশিদাবাদের পর বাকী সবই তখন পল্লীগ্রাম্। অন্ধকার পথ। গঙ্গার ধারে সিদ্ধির জঙ্গল। বড় বড় আমবাগান। পথের দুধারেও জঙ্গল। তিনি সন্তর্পণে আসছিলেন একলাই। জীবনের প্রথম থেকে পথে পথে ঘুরে গাছতলায় রাত্রি কাটিয়েছেন তিনি, দুঃসাহস তাঁকে যেন আশ্রয় করেছিল ভাগ্যফল হিসাবে। হাতে ছিল এক গাছি গুপ্তি লাঠি। লাঠি হিসাবেও মজবুদ। একেবারে ডগায় পরানো ছিল লোহার বোলো। হঠাৎ এক সময় কে যেন ছায়া-মূর্তির মত উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে এসে একেবারে তাঁর উপরেই আছড়ে পড়েছিল। ধাক্কাটা আচম্বিতে অতর্কিতে। পাশের একটা বাগান থেকে বেরিয়ে দৌড়ে রাস্তা পার হয়ে ওপরের জঙ্গলে ঢুকবার মতলব ছিল তার। কিন্তু কুড়ারামের উপর আছড়ে পড়ল। কুড়ারাম পড়ে

গেলেন, সেও পড়ে গেল। কিন্তু আশ্চর্য হলেন কুড়ারাম, যার ধাক্কা খেয়েছেন সে অত্যন্ত হাল্কা মানুষ, হাল্কাও বটে কোমলও বটে, হয় বালক না হয় স্ত্রীলোক। আঘাত তিনি পান নি, পড়েই গিয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে উঠে বসে তিনি তাঁর গুপ্তিটা কুড়িয়ে নিয়ে ডান হাতের মুঠোয় ধরে বললেন—কৌন হো তুম ?

উত্তর পান নি। দেহটা প্রায় নিশ্চল হয়ে পড়ে আছে। তখন হেঁট হয়ে তার গায়ে মুখে হাত বুলিয়ে বুঝেছিলেন সে স্ত্রীলোক। গন্ধেও বুঝেছিলেন। চুলের গন্ধ পেয়েছিলেন। আবার নেড়ে দেখেছিলেন তার মুখ, নাকের কাছে হাত দিয়েছিলেন শ্বাস-প্রশ্বাস পড়ছে কিনা দেখবার জন্য। শ্বাস-প্রশ্বাস পড়ছিল। তার সঙ্গে হাতে ঠেকেছিল বেসর। নাকের বেসর। মুসলমানী ?

এবার পোশাক নেড়ে দেখছিলেন। হ্যাঁ, গায়ে কাঁচুলি ওড়না রয়েছে। কি করবেন ভেবে পান নি। ফেলে চলে যাবেন ? যাওয়াই উচিত ছিল কিন্তু দুঃসাহসী নব-যুবক কুড়ারাম এই রাত্রে নির্জনে এমন একটি বিচিত্র রোমান্স ত্যাগ করে যেতে পারেন নি। তাকে ধরে তুলতে গিয়েছিলেন। ততক্ষণে সে কাতরে বলে উঠেছিল—ছোড় দো মুঝে ছোড় দো। খোদা কসম কুছ্ নেহি মেরি পাস।

কুড়ারাম বলেছিলেন—লেঃ বাবাঃ! যা ভেবেছি। প্যাঁজ রসুনের গন্ধ বাবা! উঃ!

সঙ্গে সঙ্গে সে বলেছিল খাঁটি বাংলায়—তোমার পায়ে পড়ি। তোমার পায়ে পড়ি।

কুড়ারামের বিস্ময়ের সীমা ছিল না। বলেছিলেন—কে তুমি ?

—তুমি কে ?

—একজন রাহী!

—নবাবের লোক নও ? সিপাহী নও ?

—চাকরী করি নবাব সেরেস্তায়, সিপাহী নই। তুমি কে ?

—নবাবমহলের বাঁদী। বুড়ো নবাবের ছেলে মীরন আলীর বাঁদী। হিন্দু বামুনের মেয়ে ছিলাম, আমাকে ধরে এনেছিল। নবাবজাদা মরে গেল, বাঁদীদের কতক দিয়ে দিয়েছিল একে-ওকে, আমি মণিবেগমের কাছে ছিলাম। নতুন নবাব সব বাঁদীদের খোজা দিয়ে মারপিট করাচ্ছে ছেঁকা দিচ্ছে, বলছে—নবাবী টাকা জহরত কার কাছে কি আছে নিকাল। যা ছিল দিয়েছি। তবু রেহাই নেই। একটা হীরের আংটি ছিল সেটা ঘুষ দিয়ে আমি পালিয়েছি। পালাব আমি। আমাকে ছেড়ে দাও। কিছু নেই আমার।

সুরেশ্বরের চিন্তাসূত্র ছিন্ন হয়ে গেল। একটা মানুষের ব্যস্তত্রস্ত উচ্চ পদক্ষেপের শব্দে। জুতো পায়ে দেওয়া বিংশ শতাব্দীর মানুষ। ছুটে চলেছে।

কর্পোরেশন স্ট্রীট থেকে মোড় ফিরে একটা লোক ছুটে পালাচ্ছে। তার পিছনে তিনজন যেন তাকে ধরবার জন্যই ছুটছে। হয়তো একটু পরই শোনা যাবে কোলাহল। কেউ কাউকে ছুরি মেরেছে অথবা দুজনেই দুজনকে মেরেছে। ফ্রী স্কুল স্ট্রীট এখান থেকে খানিকটা দক্ষিণে গিয়েই। এখনও সেই উনবিংশ শতাব্দীর শেষ—যখন ইংরেজের জীবন উদ্দাম হয়ে উঠে ফিরিঙ্গী সভ্যতার সৃষ্টি করেছিল—সেই সভ্যতার রাজ্য বা সাম্রাজ্য। তার সঙ্গে আছে

মুসলমান আমলের ওই কালের জের যে-কালে কুড়ারাম ভটচাজ ওই মেয়েটিকে কুড়িয়ে পেয়েছিলেন।

মেয়েটিকে কুড়ারাম ছেড়ে দেন নি। ঘরে এনেছিলেন, আশ্রয় দিয়েছিলেন। মীরজাফরের ছেলে মীরন বজ্রাঘাতে মারা গেছে তখন—বছর খানেক আগে। লোকে বলছে ঢাকার পথে নৌকোতে নির্বাসনে যাচ্ছিলেন সিরাজজননী আমিনা বেগম আর সিরাজের প্রধান শত্রু তাঁর মাসী ঘেসেটী বেগম। ঘেসেটী বেগম বলতে গেলে সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে জাফর আলি খাঁয়ের চেয়েও বড় ছিলেন। এঁর চরিত্র নিয়ে কুৎসিত কথা এবং গল্পের আর অন্ত নেই। তবুও তো নারী। আলিবর্দীর কন্যা। ঢাকায় পাঠানো হচ্ছিল যেন আর কোন গণ্ডগোল না হয়। মীরন ছিল প্রধান উদ্যোগী। কিন্তু তার আসল মতলব ছিল অন্য। সিরাজের বেগম যারা ছিল তাদের এক লুৎফুন্নিসা বেগম আর উমদৎউন্নিসা বেগম ছাড়া বাকীদের সব ভাগ-বাঁটোয়ারা করে দিয়েছিল মীরন আমীর-ওমরাহদের মধ্যে। ক্লাইভ সাহেবের সাঙ্গোপাঙ্গরাও নাকি সব থেকে খুবসুরতি যারা তাদের বেছে নিয়েছে। কিন্তু এই কয় বেগমকে নিয়ে ছিল সমস্যা। লোকের ভয়ে লুৎফুন্নিসা আর উমদৎকে বিলি করতে পারে নি বা নিজেও নিতে পারে নি মীরন। লুৎফুন্নিসাকে নাকি বলা হয়েছিল কাকে পছন্দ কর তুমি বল!

লুৎফুন্নিসা বলেছিল—হায় মেরী নসীব। হায় সরম কি বাত্!—

—কেন?

—কেন? হাতীর উপর যার চড়া অভ্যেস বা হাতীতে যে চড়েছে তাকে কতকগুলো গিধ্ধড় দেখিয়ে বলছে—বল কোন গিধ্ধড় তোমার পসন্দ্!

উমদৎউন্নিসা ছিল সিরাজের বিয়ে-করা বেগম। তাকে কিছু বলতে সাহসই করে নি। কিন্তু যতদিন আমিনা ঘেসেটী বেঁচে আছে ততদিন বিপদ কাটবে না। নবাব আলিবর্দী খাঁর বেটী যদি কোন রকমে বেরিয়ে একটা আশ্রয় পায় এবং সিপাহীদের সামনে দাঁড়ায় তো কি হবে কেউ বলতে পারে না। মীরন তাঁদের ঢাকা পাঠাবার নাম করে নৌকোয় চড়িয়ে নিয়ে গিয়ে পদ্মার বুকে নৌকোটা ডুবিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেছিল। কেউ জানবে না কেউ দেখবে না, পদ্মার বুকের উপর কোন সাক্ষী থাকবে না। তাই ডুবিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু আমিনা ঘেসেটী নৌকো যখন ডুবছে তখন তার উপর দাঁড়িয়ে উপরের দিকে মুখ তুলে চিৎকার করে বলেছিল—আরে বেইমান, বিজলী গিরে রে তেরা শিরপর, বিজলী গিরে রে মীরন, তেরা শিরপর বিজলী গিরে। তারপর ডেকেছিল আল্লাহতায়লাকে। ডাকতে ডাকতেই ডুবেছিল নৌকো। এবং এই চিৎকার-অভিশাপ গঙ্গার ধারের অনেক লোক শুনেছিল, তাই আর গোপন থাকে নি। মিথ্যে হয় নি বেগমদের অভিশাপ। সুরেশ্বর জানে এটা কাকতালীয়। অভিশাপ ফলে না। কিন্তু মীরন মরেছিল বজ্রাঘাতে। কুড়ারাম ভট্টাচার্য সে কালের লোক, তিনি অভিশাপ মানতেন। তিনি বিশ্বাস করেছিলেন এতে।

"বেগমদের অভিশাপে মীরন মরে বজ্রাঘাতে সাতটি ছিদ্র ছিল মাথে দেখেছে সকলে।"

পূর্ণিয়ায় বিদ্রোহ দমন করতে যাচ্ছিলেন মীরন শাহজাদা। সঙ্গে কোম্পানীর পল্টন-কাপ্তেন। মীরনের সঙ্গে বাঈ ছিল, হাত-পা টেপার খানসামা, কাহিনী বলার লোক—এরাও

ছিল সেদিন তাঁবুতে। আকাশে মেঘ উঠতেই মীরন ভয় পেয়ে আসর মজলিস সব ফেলে বড় তাঁবু ছেড়ে ছোট্ট একটা তাঁবুর মধ্যে এসে ঢুকেছিল, যেমনভাবে লোকে চোরকুঠীতে লুকোয়। কিন্তু হঠাৎ আকাশ ঝলসে উঠল বিদ্যুতে—কড় কড় কড়াৎ শব্দে চারিদিকটা থরথর করে কাঁপিয়ে ডেকে উঠল মেঘ। বাজ পড়ল মীরনের সেই ছোট তাঁবুতেই। তার মাথায় সাতটা ছিদ্র হয়ে গিয়েছিল, মুখখানা ঝলসে গিয়েছিল। সেই সঙ্গেই ছিল এই মেয়ে। অন্য তাঁবুতে। নাম ছিল ফয়জান। ফয়জান তখন মাসছয়েক এসেছে। গঙ্গার ঘাটে স্নানে এসেছিল, মীরন নৌকো থেকে হুকুম দিয়েছিল—লে আও উয়ো ছোকরী কে। সিপাহীরা তুলে এনেছিল। ব্রাহ্মণের ঘরের বালবিধবা মেয়ে, সুন্দরী মেয়ে। সত্যকার সুন্দরী মেয়ে। মীরনের সঙ্গে বাঈজী বেগম চাকর নফর এরা ফিরল মুরশিদাবাদ। মীরন শাহজাদা হেরে গিয়ে মরে নি, তাহলে তার তাঁবুর হীরা-জহরৎ টাকা লুটের সঙ্গে এরাও লুট হত। কিন্তু মীরন তখন শাহজাদা মীরন। বাপ জাফর আলি মুর্শিদাবাদের তক্তে বসে আছেন। সুতরাং খুব ইজ্জত সম্ভ্রমের সঙ্গেই মীরনের তাবুর সব এসে ঢুকেছিল মুরশিদাবাদ হারেমে।

মণিবেগম এককালে সিরাজের বিয়ের সময় বাঈজী হিসেবে নাচতে এসেছিল। সে আর বব্বু। দুই বাঈজীকেই নিকা করে ঘরে ঢুকিয়েছিলেন জাফর আলি খাঁ। মণিবেগম হয়ে উঠেছিল প্রধান বেগম। মণিবেগম রূপসী মেয়েটাকে দেখে নিজে নিয়েছিলেন বাঁদী করে। হয় জাফর আলি খাঁর হাত বাড়ানো বন্ধ করতে কিম্বা হয়তো জাফর আলির নজর তার দিক থেকে সরে অন্যদিকে ফিরতে চেষ্টা করলে এই মেয়েটাকে দিয়ে সেই নজর বন্ধ করতে। কোনটা ঠিক জানতেন এক মণিবেগম।

মেয়েটাকে ঘরে এনে তুলেছিলেন কুড়ারাম। রূপ সম্বন্ধে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন। বেশ একটু বিশদ বর্ণনা। এ যুগেও রীতিমত অশ্লীল। কাজী নজরুলের বসন্ত কবিতাটি নিয়ে এ যুগের একজন বিশিষ্ট মহিলা সাহিত্যিক নিষ্ঠুর কথা বলেছিলেন। সে কবিতা এর কাছে কিছুই নয় সেদিক দিয়ে।

ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর জাতের। ভারতচন্দ্রের কাব্যগুণ এতে নেই। তারপর কুড়ারাম মেয়েটাকে বলেছিলেন—দেখ, মুসলমান থাকতে তোকে ঘরে ঠাঁই দিতে পারব না। বাজারে বাঈজী হলে সেখানে তুই আমার কথা ভুলবি। আর নবাবের নজর ফের পড়বে। তখন আবার পাকড়াও হবি। তা হলে কি করি বল তো।

মেয়েটা কি বলবে? সে বলেছিল—তুমি যা বলবে।

সেও মুগ্ধ হয়েছিল কুড়ারামকে দেখে তাতে সন্দেহ নেই। কুড়ারাম একটু ভেবে নিয়ে বলেছিল—পথ আছে। হয়েছে।

—কোন পথ?

—তার আগে বল—পিয়াজ রসুন গোস্ত ছাড়া ভাত রুচবে তো তোর?

মেয়েটা বলেছিল—আমি তো হিন্দু ঘরের বিধবা। তাই তো খেতাম।

কুড়ারাম বলেছিল—সেইজন্যেই তো বলছি। হিন্দু বিধবা একবার ও সব খেতে ধরলে

ছাড়তে পারে না। সলমানীর চেয়ে বেশী খায়।

মেয়েটা বলেছিল, পারব। তুমি দেখ।

কুড়ারাম বলেছিল—তাহলে তোকে বোষ্টমী হতে হবে। মহাপ্রভুর ধর্ম, ওতে বাধা নেই। চল তোকে জিয়াগঞ্জের হরিদাস বাবাজীর কাছে নিয়ে গিয়ে ভেক দিয়ে নিয়ে আসি। ভাল হবে। ফোঁটা তিলক কাটলে চুড়ো করে চুল বাঁধলে কার সাধ্যি ধরবে তুই নবাব হারেমে বেগম সাহেবের বাঁদী ছিলি। তোর নাম ছিল ফয়জান।

কথা হচ্ছিল কুড়ারামের বাড়ীতে বসে। কুড়ারাম হিসাবের দিক থেকে অত্যন্ত পাকা এবং সে দিকে বুদ্ধিবিচার তীক্ষ্ণ ছিল। নিজে লিখেছেন—

যাহা করি রোজগার তিন ভাগ করি তার
এক ভাগে ব্যয়ভার নিজের পেটের
এক ভাগ পুঁতে রাখি পিত্তলের ঘটি ঢাকি
অন্য ভাগ লগ্নী রাখি বিশ্বাসী শেঠের।

হিসাবী লোকটি মুরশিদাবাদে পাঁচ হাজার টাকার বরাত হুণ্ডী নিয়ে এসে টাকা ভাঙিয়ে হাজার টাকা নজরানা দিয়েছিলেন চাকরীর জন্য। বাকী চার হাজারের কিছু টাকা হাতে রেখে একটা সামান্য বাড়ী কিনেছিলেন খাগড়ার প্রান্তে। নবাবী শহরের ধার ঘেঁষে। সামান্য দু কুঠুরী দালান। নবাবের কাছে যারা সাজা পেয়েছিল পূর্বতন নবাব-প্রীতির জন্য তাদেরই একজনের বাড়ী। বাকী টাকাটা ওই বাড়ীর মেঝেতেই পুঁতে রেখেছিলেন। কথা হচ্ছিল সে বাড়ীতে। বেশ খিল কপাট বন্ধ করে।

মেয়েটা আবারও বলেছিল—যা বলবে তুমি, তাই করব। তুমি আমাকে বাঁচিয়েছ। প্রাণের ভয়ে যা ছিল সব দিয়ে কোন রকমে বেরিয়ে জঙ্গল ভেঙে বাগানের পাশ দিয়ে পড়ো বাগানের তলা দিয়ে কোথা পালাচ্ছিলাম জানি না। হয়তো সাপে খেতো নয়তো কোথাও খানাখন্দে পড়ে জান যেতো—

—উঁহু উঁহু। জান নয় জীবন বল! জানে পেঁয়াজের গন্ধ ছাড়ে।

মেয়েটা হেসেছিল, বলেছিল—অভ্যেস হয়ে গিয়েছে এমন—

—ছাড়তে হবে।

—ছাড়ব।

হঠাৎ কুড়ারাম বলেছিল—এক কাজ কর।

—কি?

—দাঁড়া। বলে একটা ধারালো দা দিয়ে বলেছিলেন—ওই লম্বা বেণীটা আগে কাট। ওই চুল বাধা। চুল একেবারে কামাতে হবে। নইলে ওই বাহারে চুল আর সিঁথির ঢং যাবে না। কাট!

মেয়েটা তাই কেটেছিল। অনেক কষ্টে অবশ্য। চোখ দিয়ে জল পড়েছিল একদিকে, অন্যদিকে হাসছিল; এ যেন এক কৌতুক। নিজে কাটতে পারে নি, বলেছিল—তুমি কেটে দাও।

—চেঁচাস নে।

—না।

জোরে খড় কাটার মত পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে কেটেছিলেন কুড়ারাম। তারপর বলেছিলেন—আর এক কাজ কর।

—বল।

বাইরে বেরিয়ে খানিকটা গোবর এনে তাকে দিয়ে বলেছিলেন—খা। খেয়ে শুদ্ধ হ। বামুনের মেয়ে তো, বুঝিস না? নে।

বেশ খানিকটা গোবর নিয়ে সে কোঁত করে গিলেছিল অম্লান মুখে।

কুড়ারাম বলেছিলেন—হ্যাঁ, তুই বামুনের মেয়ে বটিস।

তারপর কলসীতে গঙ্গাজল ছিল, এনে খানিকটা খেতে দিয়েছিলেন, বাকীটা হড় হড় করে তার মাথায় ঢেলেছিলেন, তারপর বলেছিলেন—যা শুদ্ধ। বল দশবার—কি বলবি বল দেখি?

মেয়েটা বলেছিল, শ্রীহরি শ্রীহরি, শ্রীহরি শ্রীহরি, শ্রীহরি শ্রীহরি, শ্রীহরি শ্রীহরি, শ্রীহরি শ্রীহরি।

—বাস শুদ্ধ। এবার ওই ঘাঘরা-মাগরা ছেড়ে আমার কাপড় পর একখানা। কাল শাড়া কিনে এনে দেব!

কুড়ারাম জীবনে বহুবার শাস্ত্রকে নিজে নিজের মনোমত করে ব্যাখ্যা করে নিয়েছেন। অন্যের ব্যাখ্যার ধার ধারেন নি, কিন্তু কখনও শাস্ত্র মানি না বলে ফেলে দেন নি। বলতেন—শাস্তর হলো বৈতরণী পারের নৌকো, বাইব আমি নিজে। ওপারে পৌছুলেই হল।

বৈতরণী পার হতে হইলে শাস্ত্র তরা ভূমণ্ডলে
আমি নিজ বাহুবলে বাহিব ওপার।

মোট কথা এই ভাবেই ব্রাহ্মণ বালবিধবা শ্যামা দাসীকে মীরন ধরে এনে ঘাঘরা কাঁচুলি ওড়না পরিয়ে নাম দিয়েছিল ফয়জান, কুড়ারাম তাকে ঘরে এনে মাথা নেড়িয়ে গোবর খাইয়ে গঙ্গাজলে স্নান করিয়ে তিলক ফোঁটা রসকলি কাটিয়ে নাম দিয়েছিল ললিতা বৈষ্ণবী। চুল যখন আবার নতুন করে গজিয়ে এক পিঠ হয়েছিল তখন তাকে বৈষ্ণবীর চেহারায় ফয়জান থেকেও ভাল লেগেছিল। প্রথম প্রথম ঘরে বন্ধ করে যেতেন সেরেস্তাখানায়। এসে ঘর খুলবার আগেই গলার সাড়া দিতেন, অমনি জানালাটা খুলে ললিতা মুখ বাড়িয়ে হাসত।

ললিতার পয় ছিল। এবং ললিতা নতুন জীবনে সত্যই কুড়ারামগতপ্রাণ ছিল। ঘর করেছিলেন পনের বছর। এর মধ্যে যত উন্নতি হয়েছিল কুড়ারামের তত তিনি সুখী হয়েছিলেন ললিতাকে পেয়ে। এবং বিশ্বাস এমনি গাঢ় হয়েছিল যে, তাঁর টাকা কোথায় মাটিতে পোতা আছে তাও কুড়ারাম ললিতাকে দেখিয়েছিলেন। সৌভাগ্য কুড়ারামের যে, তাঁদের সন্তান হয় নি।

গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ জানতেন কুড়ারাম বিবাহিত। ললিতাই তাঁর স্ত্রী। তিনিই তাঁকে ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দের বর্ষার সময় সাবধান করে দিয়েছিলেন—ভটচাজ, তুমি একা নও, শুনেছি

পরিবার নিয়ে বাস কর, লোকে বলে স্ত্রী সুন্দরী। সেইজন্যে সাবধান করছি হে, সময় থেকে অন্তত পরিবারকে ঘরে রেখে এস। কোম্পানীর সঙ্গে কাশেম আলীর বনছে না!

কুড়ারাম সঙ্গে সঙ্গেই সাবধান হয়েছিলেন। নবাব কাশেম আলী রাজধানী সরিয়েছেন মুঙ্গেরে; কোম্পানীর কেল্লা কলকাতা থেকে দূরত্ব বাড়িয়েছেন। সুতরাং কুড়ারাম ভুল করলেন না, তিনি কলকাতার দিকেই এগিয়ে এলেন। মারামারি রক্তারক্তি যা হবার মুরশিদাবাদ থেকে মুঙ্গের পর্যন্ত হবে। বলতে গেলে মুরশিদাবাদকে একরকম খালিই করছেন নবাব। তিনি কৃষ্ণনগরে এসে এক আস্তানা গেড়ে রাখলেন। দরকার হলেই ওখানে এসে উঠবেন। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র তখন মীরকাশেমের কোপ থেকে রেহাই পেয়ে কৃষ্ণনগরে ফিরেছেন। মহারাজ তাঁকে জানতেন। জানবার কারণ, নবাব তখন আয় বাড়াচ্ছেন; পরগণায় পরগণায় রাজস্ব বৃদ্ধি করছেন, আবওয়াব চাপাচ্ছেন। সে সব যাদের কলমে হচ্ছে তাদের মধ্যে কুড়ারাম ভট্টাচার্য অন্যতম। কুড়ারামের হিসাব অনুযায়ী দিনাজপুরের রাজার রাজস্ব আগের থেকে ৫ লক্ষ ৭৬ হাজার বেড়েছে। নাটোরের বেড়েছে আট লক্ষ। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সে অনুপাতে কমই বেড়েছে, ১ লক্ষ ২৮ হাজার টাকা। সুতরাং আশ্রয় পেয়েছিলেন। সহজেই। সেখানে ছোটখাটো আস্তানা তৈরী করে রেখেছিলেন। দরকার হলেই সরবেন। নগদ টাকাটা জিম্মা দিয়েছিলেন তাঁর মালিকের মত উপরওয়ালা গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের হাতে। তার পরিমাণ তখন প্রায় দশ হাজার।

গঙ্গাগোবিন্দ প্রশ্নও করেন নি—এত টাকা কোথা পেলে?

টাকা আরও বেশী হলেও জিজ্ঞাসা করতেন না। করবেন কেন? ব্যাপারটা তো বলতে গেলে প্রকাশ্য। নবাব কোম্পানী জমিদার সকলেই আয় করছেন। নবাব কাশেম আলী নবাবী নেবার সময় পনেরো লক্ষ টাকা দিয়েছেন কোম্পানীর সাহেবদের। ভান্সিটার্ট সাহেবই নিয়েছে পাঁচ লাখ, হলওয়েল দু লাখ সতেরো হাজার। তা ছাড়া কোম্পানীর আলাদা। মীরজাফর আলি দিয়েছিলেন ষাট লাখ টাকা। একা ক্লাইভকেই দিতে হয়েছিল কুড়ি লাখ।

নবাবেরা দিয়ে সেটা প্রজার ঘাড়ে না তুললে পাবে কোথায়? সে দিক থেকে নবাব কাশেম আলী জবরদস্ত। রাজস্ব বাড়িয়ে পূর্বের আয় থেকে এক কোটি দশ লক্ষ টাকা বাড়িয়ে পাকা আয় করেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বড় বড় জমিদারদের কাছে খেলাতই হোক আর জরিমানাই হোক আদায় করেছিলেন কোটি দরুণে। তার সঙ্গে সেরেস্তার কর্মচারীরা পাবে না এ কি কথা! অন্ততঃ সে আমলে কুড়ারামেরও মনে হয় নি, ঘুষের টাকা উপরওয়ালাকে দেখালে তিনি তাকে ধরবেন এবং গঙ্গাগোবিন্দ সিংহও তা ধরেন নি, বেশ সহজভাবেই নিয়ে রেখে স্মরণার্থ একটা রসিদ দিয়েছিলেন। মানুষের শরীর, তিনি যদি নাই থাকেন তবে পুত্র পৌত্র যে থাকুক তিনিই দেবেন।

কয়েক মাসের মধ্যেই লড়াই বাধল। এক কাটোয়াতেই যা মুরশিদাবাদের আগে যুদ্ধ হল, নইলে কুড়ারামের কথাই হল সত্য। যুদ্ধ হল ঘিরিয়ার উধুয়ানালায়—মুরশিদাবাদের উত্তর-পশ্চিমে। কুড়ারাম আগেই সরে গেলেন গঙ্গা পার হয়ে পশ্চিম তীর ধরে নবদ্বীপ পর্যন্ত,

তারপর গঙ্গা থেকে জলঙ্গী ধরে কৃষ্ণনগর।

কাশেম আলী গেলেন, আবার বুড়ো নবাব এলেন। এবার আর কুড়ারাম ফিরলেন না। ওই কৃষ্ণনগরে রাজার সেরেস্তাতেই কাজ নিয়েছিলেন। ঠিক ভাল লাগে নি ঝঞ্ঝাট। সে সময় ললিতাকে নিয়ে সুখে থাকবার একটা মোহ তাঁকে পেয়েছিল। কিন্তু বছর খানেক পর বুড়ো নবাব মারা গেলেন। ছেলে নজুমউদ্দৌলা নবাব হল। মণিবেগম তার অভিভাবিকা। তখন ললিতা বললে—ফিরে চল মুরশিদাবাদ। বেগম আমাকে খুব ভালবাসতেন।

কুড়ারাম ভেবে-চিন্তে ফিরেছিলেন।

ললিতা মণিবেগমের কাছে কিছু বকশিসও পেয়েছিল। বেগম সব শুনে খুশী হয়ে কিছু অলঙ্কার দিয়েছিলেন আর দিয়েছিলেন একখানা কুঠী। কুড়ারামের মিলেছিল চাকরী নবাব-দপ্তরে। নবাবদপ্তরের রস আর বিশেষ ছিল না। নতুন কুঠীতে একটু ভালভাবেই সংসার পেতেছিলেন তিনি।

দেওয়ানী তখন কোম্পানীর হাতে গিয়েছে। আদায় তহশীল সব। নবাববাড়ীতে নবাব থেকে বেগম এবং নবাবজাদা নবাবজাদীরা সব কোম্পানীর তনখাভোগী। শুধু আশে-পাশে কিছু কিছু সম্পত্তির আদায় আছে এই পর্যন্ত। পাওনা-গণ্ডা বিশেষ নেই। কোম্পানীর দেওয়ানী সেরেস্তায় ঢোকা সহজ নয়। তার মুরুব্বি সব কলকাতায়। কিন্তু কলকাতায় নোনা লাগে, বাঘ আসে, ডোরা বাঘ ; তা ছাড়া মুরব্বিরা অচেনা, কলকাতা তার থেকেও বেশী অজানা। কিন্তু কুড়ারাম লিখেছেন—

ভাগ্যে যার থাকে বল শুষ্ক বৃক্ষে ধরায় ফল
মরুভূমি মিলায় জল—বর্ষে বিনা মেঘে।

ব্যাপারটা ঠিক তাই। গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ হঠাৎ পড়ে গেলেন হেস্টিংস সাহেবের সুনজরে। ঘটনাটা অদ্ভুত। নবাব সিরাজুদ্দৌলা যখন কাশিমবাজার কুঠীর উপর চড়াও হয়ে হামলা করেন, তখন হেস্টিংস সাহেব পালিয়ে গিয়ে এক মুদীর দোকানে আশ্রয় চেয়েছিল। মুদীও দিয়েছিল। তাকে রন্ধনঘরে একটা জালায় পুরে তার মুখটা ঢেকে রেখেছিল। তাতে প্রাণে বেঁচেছিলেন তিনি। তিনি গভর্নর হয়েছেন এখন। তিনি খুঁজছিলেন কান্ত মুদীকে। কিন্তু সঠিক কান্ত মুদী কিনা নিঃসংশয় হতে পারছিলেন না। জনকতক লোকই কান্ত মুদী বলে এলেও তিনি ঠিক চিনতে পারছিলেন না, কিন্তু ঠকবার লোক তিনি নন। ফিরিয়ে দিয়েছিলেন তাদের। এদেশের লোকের কাছে সাদা মানুষেরা যেমন সব একরকম দেখতে, সাদা মানুষের কাছে কালো মানুষেরাও প্রায় সেই রকম। গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ বুদ্ধিমান লোক, হেস্টিংস সাহেব কি জন্যে কান্ত মুদীকে চান তা খানিকটা বুঝে খোঁজ করে ঠিক কান্ত মুদীকে নিয়ে গিয়েছিলেন হেস্টিংস সাহেবের কাছে। এবং বলেছিলেন—মি লাড, আপ উসকে এইসা কোই বাত পুছিয়ে যো বাত আপ জানতে হেঁ আউর ই জানতে হে। আউর কোই নো নট।

সাহেব বলেছিলেন—ঠিক বাত। দ্যাটস রাইট! আচ্ছা উসকো পুছো—কোই সাহেব কো উসকে সাথ কাশিমবাজার কুঠী লুট হোনেকা বক্তমে মোলাকাৎ হুয়া?

কান্ত মুদী বলেছিল—এক সাহেব প্রাণের ভয়ে আমার কাছে এসেছিল, আমি আমার

মুদিখানায় লুকিয়ে রেখেছিলাম।

—হ্যাঁ। কিস্ কায়দসে উসকো ছিপাকে রাখা?

—জালার ভেতর পুরে মুখে ঢাকা দিয়ে রেখেছিলাম।

সাহেব বলেছিলেন—ক্যা বোলতা? জালাকে অন্দর রাখ্যা—মু বন্ধ্ করকে। উ তো মর যাগা!

—না হুজুর, আমি জালাতে বাতাসের জন্যে ফুটো করে দিয়েছিলাম।

—হাঁ। হোনে সেক্তা হ্যায়। লেকিন খানে ক্যা দিয়া? রোটী—গোস?

—না হুজুর—পান্তা ভাত আর আমানি দিয়েছিলাম।

—আচ্ছা? আচ্ছা। বহুত আচ্ছা। লেকিন তুমি উ সাবকে পহ্ছানতে পারে?

—না হুজুর।

—হুম হ্যায়। উ হুম হ্যায় কান্তবাবু। আজসে তুম বাবু বন গেয়া। তুম হামারা জান বাঁচায়া, হুম তুমকো বাবু বানায়েগা, রাজা বানায়েগা।---

আর গঙ্গাগোবিন্দ সিংহকে বলেছিলেন—আচ্ছা কামদার হুঁসিয়ার আদমী হো তুম সিংবাবু। তুম হামারা কোম্পানীকে দেওয়ানী সিরাস্তামে কাম করো। আই এ্যাম ভেরী প্লিজড উইথ ইউ। বহুত খুস হুয়া হুম।

গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ কাজ পেয়েই লোক পাঠালেন মুরশিদাবাদ। আপনার অনুগত লোকদের ডেকে আনলেন। তার মধ্যে প্রথম ব্যক্তি ছিলেন কুড়ারাম।

৩

পাঁচালীতে আছে—

দেবী সিংহ রেজা খান হইলেন হতমান
বন্দী হয়্যা শেষে যান কোম্পানীর ফাটকে।

মহম্মদ রেজা খাঁ—রাজা দেবী সিং তখন কোম্পানীর রেভেন্যু বোর্ডের সর্বেসর্বা। তারা নিদারুণ অত্যাচারে খাজনা আদায় করে দেশ উৎসন্ন দিলে। তবু কোম্পানীর খাঁই মিটল না। বিলেতে কোম্পানীর অংশীদাররা শতকরা সাড়ে বারো টাকা লাভ পেলে। ইংলণ্ডের পার্লামেণ্ট বছরে চল্লিশ লক্ষ টাকা ট্যাক্স আদায় করলে কোম্পানীর কাছে। জগৎশেঠের দেনা শোধ হল না। ছিয়াত্তুরে মন্বন্তর হল। রেজা খাঁ, দেবী সিং গেল। রেজা খাঁ ফাটকে গেল। নন্দকুমারের ফাঁসি হল। রায়রাঁইয়া অর্থাৎ কোম্পানীর রাজস্ব বিভাগের দেওয়ান হলেন রাজা দুর্লভরামের পুত্র রাজবল্লভ। ডেপুটি দেওয়ান হলেন গঙ্গাগোবিন্দ সিং। তারপর দেওয়ান! ফ্রান্সিস সাহেবের সঙ্গে হেস্টিংসের পিস্তল লড়াই হল। জখম হলেন ফ্রান্সিস। ফ্রান্সিস সাহেবের দলের একজন সায়েব মারা গেলেন। হেস্টিংসের হল জয়জয়কার, তার সঙ্গে দেওয়ানজীর। তার সঙ্গে কুড়ারামের।

দেওয়ানজীকে কতজনে কত বললে। দেওয়ানজী ছিলেন পাহাড়ী। তিনি নড়েননি।

তাঁর আড়ালে কুড়ারাম টিপি হলেও উইটিপি ছিলেন না—একটা পাথরের ডাঁই ছিলেন। দেওয়ানজীকে দেওয়ানী থেকে একবার নামালে। কিন্তু দেওয়ানজী আবার উঠলেন। বললেন—নিজের কাম করে যাও কুড়ারাম। যার জন্যে আছ, সে কাজ তুমি করো। কেউ তোমাকে নামাতে পারবে না। আজ নামালে কাল উঠবে। বুঝেছ? আমাকে কোম্পানী রেখেছে কোম্পানীর আয় দেখতে বাড়াতে; আদায় করতে। আমাকে করতেই হবে। না করলে নিশ্চয় অধর্ম হবে আমার। রাজা সেপাই রাখে সান্ত্রী রাখে বদমাসকে দুষমনকে মারতে। সে তার কাম। দয়া সেখানে তুমি করবার কৌন-হো? কৌই নেহি হো। সে কাম না করলেই হবে বেইমান। নিমকহারাম। কি করব? দেখো ভটচায, দুনিয়া যে বানিয়েছে সেই বানিয়েছে বাঘ—সেই বানিয়েছে হরিণ। সেই বানিয়েছে ঘাস লতাপাতা। হরিণ ঘাস খায়, বাঘ হরিণ খায়। মানুষ বাঘ মারে। মানুষও মরে। ওসব বিচার আমার নয়। তোমার নয়। আপনা কাম। যে সাধু সে জপ করুক। যে ভিখিরী সে ভিখ মাঙুক। তুমি তোমার কাম কর।

হেস্টিংস চলে গেলেন দেশে। সেখানে পার্লামেণ্টে ঝড় উঠল। হেস্টিংস সাহেবের পর ভান্সিটার্ট সাহেব এল—তারপর এল বুড়ো লর্ড কর্নওয়ালিস। দেওয়ানজীর চাকরী থাকবে এ কেউ ভাবে নি। কিন্তু দেওয়ানজী তবু রইলেন। দেওয়ান থেকে খারিজ হয়ে জমা বাকী সেরেস্তার ভার পেলেন। কুড়ারাম তাঁর দপ্তরেই এলেন। এই সময়ে মারা গেল ললিতা। তখন থাকতেন দেওয়ানজীর সঙ্গে বেলুড়ে। দেওয়ানজীদের পাইকপাড়ার বাড়ী তখনও হয় নি। বেলুড়েই মারা গেল ললিতা। দেওয়ানজী বললেন—এবার বিয়ে করে সংসার কর ভটচায। যা হয়ে গেছে গেছে, শেয়াল চাঁদে খেয়েছে। এবার ফের নতুন করে আরম্ভ কর।

কুড়ারাম চমকে উঠেছিলেন। দেওয়ানজী বলেছিলেন, হেসেই বলেছিলেন—আমি সব জেনেছি ভটচায, লজ্জা পেয়ো না।

রায় ভটচাজের পাঁচালীতে আছে—

দেওয়ানজীর রাজবুদ্ধি ডেকে কন শোন যুক্তি
বংশ বিনে নাহি মুক্তি নরক রৌরবে।
অতএব বিভা কর মিছা কেন কাল হর
স্থাপ বংশ বংশধর মায়াময় ভবে।
ললিতার এন্তাকালে স্নান করি গঙ্গাজলে
দাড়ি গোঁপ চেঁছে ফেলে প্রায়শ্চিত্ত করি।
দর্পণে দেখিনু মুখ হইল আশ্চর্য সুখ—
যৌবন রয়েছে অটুট হরি হরি হরি।
দেখিলাম বক্ষপাটা ঢিলা নয় আঁটাসাঁটা
এ যেন জীবন গোটা সব আছে পড়ি।

অতএব রায় ভটচাজ বিয়ে করবার অভিলাষী হলেন। কিন্তু বয়স্কা কন্যা চাই। সুন্দরী কন্যা চাই। এবং বংশও উচ্চ চাই। পেতেও বিলম্ব হ'ল না। দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দের

প্রিয়পাত্র, কোম্পানীর দেওয়ানী দপ্তরে বিচক্ষণ কর্মচারী, শক্ত সমর্থ রূপবান মানুষ, লোকে বলে অর্থ তাঁর অনেক, তাঁর কি আর কন্যার অভাব হয়? বিবাহ করলেন পছন্দ করে; কালীঘাট গ্রামে, তখন কালীঘাটকে তার বাসিন্দারাই বলত গ্রাম। সুন্দরী বয়স্কা কন্যা; কিন্তু বংশের খুঁত ছিল। লোকে বলত ফিরিঙ্গী সংস্পর্শে দোষ। সেই কারণেই এমন সুন্দরী মেয়ের বিয়ে হয় নি, কিন্তু কুড়ারাম রায় ভট্টাচার্য, যিনি মুসলমান হয়ে যাওয়া বামনের মেয়েকে গোবর খাইয়ে গঙ্গাস্নান করিয়ে ললিতা করতে পেরেছিলেন তাঁর পক্ষে এ বাধা বাধাই হয় নি। বিয়ে ক'রে নবদ্বীপে গিয়ে পোড়া-মা-তলায় আগমবাগীশ কৃষ্ণানন্দ ভট্টাচার্যের বংশধরদের কাছে শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে পাকা ভিত গেড়ে সংসার শুরু করেছিলেন। কলকাতায় তখন জানবাজারে রাণী রাসমণির কাছে জমি পেয়েছেন। বাড়ী করলেন ছোটখাটো। এবং ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ে ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখলেন নিজের গ্রাম নিজের ভিটেকে। দৃষ্টি স্বপ্নের মধ্যেই হোক আর গভীর চিন্তার মধ্যেই হোক, কীর্তিহাট ছাড়িয়ে কাঁসাই নদীতে তরী ভাসিয়ে হলদীতে পড়ে চলে গেছে মেদিনীপুরের দক্ষিণ-পশ্চিমে 'নিমক-মহল' পর্যন্ত। অর্থাৎ যেখানে নুন তৈরী হ'ত সে সব অঞ্চল —হিজলী তমলুক কাঁথি পর্যন্ত।

কোম্পানী হেস্টিংস সাহেবের আমল থেকে নুনের কারবার একচেটে করেছে। খালারি বা নুন তৈরীর খালগুলি কোম্পানীর খাস, সেখানে জমিদারের দাপট চলে না। কোম্পানী দাদন দেয়, ঠিকাদারদের নুন কেনে। ওদিকে দক্ষিণে মারাঠা এলাকার নুন আমদানি বন্ধ হয়েছে। দেশে নুনের দর চড়েছে, নিমক মহলের ইজারার এলাকায় এখন পূর্ণিমা অমাবস্যার জোয়ারের মধ্যে মা লক্ষ্মীর মল বা নূপুরের ঝম ঝম শব্দ শোনা যায়। মা লক্ষ্মী এখানে লক্ষ্মী মেয়ের মত আস্তে হাঁটেন না, চঞ্চলা চপলা দুরন্ত মেয়ের মত দৌড়ে আসেন।

নুনের দেওয়ানীর পদ তখন সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু তার থেকেও ইজারাদারির উপর নজর ছিল বেশী। কীর্তিহাটে পোক্ত আরামদায়ক মাটির কোঠাবাড়ী করিয়ে ওখানেই কারবার শুরু করবার বাসনা করেছিলেন। হঠাৎ বাধল বিপর্যয়। মেদিনীপুরে হল চুয়াড় হাঙ্গামা। প্রথম কোম্পানীর সঙ্গে রাজস্ব নিয়ে লেগেছিল ওখানকার জমিদারদের। লড়াইও দু'চারজন জমিদার করেছিল। সে লড়াই কলকাতার ময়দানে মনুমেণ্টের তলায় সন্ধ্যার পর হিন্দুস্থানীদের কপাটী খেলার মত লড়াই। লড়াইয়ে হেরে জমিদারেরা বাগ মানলে, কিন্তু চুয়াড় পাইকেরা পাইকান জমি বাজেয়াপ্তির জন্যে হাঙ্গামা বাধালে। চুরি ডাকাতি খুনখারাপি দিয়ে শুরু, ক্রমে পাঁচশে সাতশো হাজার দেড়হাজার চুয়াড় পাইক জবরদস্তি ক'রে কোম্পানীর নতুন জমিদারদের কাছারী লুঠ করতে আরম্ভ করেছে, রায়তদের ঘর জ্বালিয়ে দিচ্ছে, বাজার হাট গঞ্জ লুঠ করে খুনখারাপি করতে শুরু করেছে। তখন ১৭৯৮-৯৯ সাল।

দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিং তখনও কাজে রয়েছেন। লর্ড কর্নওয়ালিস দেশে চলে গেছেন। দেওয়ানজীও কাজ ছাড়বার কথা ভাবছেন। কুড়ারামও তাই ভাবছেন—আর কেন? এই-বার কাজ ছেড়ে স্বাধীন হবেন। অনেক ব্রহ্মত্র করেছেন দেশে। কলকাতায় নানান কাজ এখন। টাকা তাঁর আছে, সেই টাকা সায়েবদের ধার দিয়ে বা তাদের কারবারে দিয়ে মুচ্ছুদ্দীর কাজ করলে প্রচুর উপার্জন হতে পারবে। স্ত্রী তার আগেই পাঁচ বছরের সোমেশ্বরকে

রেখে মারা গেছেন। বিবাহের কথা তাঁর মনে হয় নি—তবে অন্য লোকে বলেছিল। কিন্তু তাতে তাঁর মন সায় দেয় নি। মনে কেমন একটা বৈরাগ্য এসেছে। মন গেছে ইষ্টের দিকে। এখন সাধ মায়ের মন্দির ক'রে তাঁর আশ্রয়ে সোমেশ্বরকে নিয়ে একটি সুখের সংসার করেন। আর তার সঙ্গে নুনের খালারির ইজারাদারি। নইলে থাকবেন কি নিয়ে? শুধু জপে কি কাল কাটে? আর আট-নয় বছর পার হলেই সোমেশ্বর ষোল বছরের হবে। সোমেশ্বরকে মানুষ করবার জন্য একটি ব্রাহ্মণ বিধবা এবং একটি শূদ্র ঝি রেখে দিয়েছেন। লোকে হাসতো। বলত —ভটচাজ রাম কিপ্পন! এত টাকা, তাই রাখবি রাখবি একটা ভাল বাঈজী রাখ। দুটো কসবী আনকী রাঁড় রাখ। তা না--দুটো ঝি। কিন্তু কুড়ারাম পাঁচালীতে এই বামুনের মেয়েকে মা বলেছেন—আর শূদ্র ঝিটিকে বলেছেন কন্যা।

হঠাৎ একদিন ডাক পড়ল দেওয়ানজীর কাছে। দেওয়ানজী বললেন, মেদিনীপুর কালেক্টরীতে যেতে হবে তোমাকে। তোমার নিজের এলাকা। ওখানে হাঙ্গামা বেধেছে জান তো? এখন কোম্পানীর ফৌজ গিয়েছে। রাজারা ওই দু চারদিন কেল্লা বন্ধ ক'রে থেকে এবার কোম্পানীর সঙ্গে চুক্তি করছে। ওখানকার হস্তবুদ ঠিক করে কালেক্টরী ধার্য করবে। আর মারাঠী আমলে ওদের যে.পাইকান জমি ছিল, যে জমি পাইকরা ভোগ করত মাইনের বদলে তা বাজেয়াপ্ত ক'রে বিলি ক'রে দেবে। এই সব নিয়ে রেভেন্যু হবে। বুঝলে? রাজাদের তো আর পাইক পুষবার দরকার নেই। আর বর্গী আসছে না। এলে খোদ কোম্পানীর সরকার তার সমঝোতা করবে লড়াই দেবে। আর নিজের জেলায় যাচ্ছ—ব্রহ্মত্র মাল জমি—

—সে আপনাকে জানাব, হুজুর, তারপর।

—এইজন্যেই তোমাকে ভালবাসি, ভটচাজ।

কুড়ারাম মেদিনীপুরে যেদিন পৌঁছুলেন, সেইদিনই পাইকদের সর্দার নষ্টগুড়ের খাজা গোবর্ধন দলপতির ফাঁসি হয়ে গেল। লোকটা বিপর্যস্ত করে তুলেছিল অঞ্চলটাকে। মেদিনীপুরের রাণী শিরোমণি তখন কোম্পানীর একরকম নজরবন্দী।

রেভেন্যু ধার্য করলেন কুড়ারাম। ধর্ম তাকিয়ে কোম্পানীর স্বার্থ ষোল আনার জায়গায় দু আনা বেশী ক'রেছিলেন—

ধর্মকে মাথায় রাখি কোম্পানীর স্বার্থ দেখি
কুড়ারামে দিতে ফাঁকি কেহ নাহি পারে—
যেখানে দু পয়সা পাই নুন খেয়ে গুণ গাই
দিই কিছু সুবিধাই মনিবে না মেরে।

সে সময়ের কালটা সকলে জানে। মেদিনীপুর বাঁকুড়ায় জমিদার-বিদ্রোহ সে সামান্য হলেও পাইক চুয়াড় বিদ্রোহ বাংলার শেষ বিদ্রোহ। কোম্পানীর শক্তিকে ঝড়ের মত বইতে হয়েছিল—শালবন তালবন সমৃদ্ধ মেদিনীপুরের বনস্পতিগুলির মাথা নোয়াতে। পাঠান মোগল আমল থেকে যে সব রাজা উপাধিধারী সামন্তেরা বংশের কুর্শীনামা অক্ষুণ্ণ রেখে প্রাচীন বৃক্ষের মত মাটির গভীরতম প্রদেশে শিকড় চালিয়ে বসে ছিল—তারা এই ঝড়ের মুখে ভগ্নশাখা

হয়েছিল সবগুলিই। কিছু কিছু মধ্যকাণ্ডে দুমড়ে দু'টুকরো হয়ে ভেঙে পড়েছিল—কিছু কিছু একেবারে মূল ছিঁড়ে উল্টে পড়েছিল মুখ থুবড়ে আছাড় খেয়ে। পাইকানের গোডানির কেন্দ্রে বসে কুড়ারাম এই লীলা দেখেছিলেন আর মনে মনে ভেবেছিলেন—ওই ভাঙাগাছের খালি জমির উপর বংশের চারা গাছটি পুত্‌লে হয় না? হঠাৎ চোখে পড়ল বাকী জায়ের তালিকায় দেনদার ময়নার রাজার নাম। উপরি উপরি খাজনা বাকী পড়েছে রাজার। এবার রাজার রক্ষা থাকবে না—রাজা যাবে। ময়নার মধ্যেই কীর্তিহাট!

যদি—।

ময়নার রাজা—সেই ধর্মরাজের আশ্রিত হাজার দু হাজার বছরের পুরনো লাউসেনের বংশধরদের কাছ থেকে মারাঠাদের আশ্রয় নিয়ে রাজ্য কেড়ে নিয়ে রাজা হয়ে থাকলে যদি তাদের দোষ না হয়ে থাকে, তা হ'লে এদের এই বাকী খাজনার দায়ের সময় একটু উল্কে-আল্কে দিয়ে ওদের ঠেলে ফেলেই যদি কেউ দেয়, তবে তাতে আর অপরাধ কোথায়?

ময়নার রাজার জমিদারী থাকবে না, এ নিশ্চিত।

ওই তো ময়না পরগণার ওপাশে কাঁসাইয়ের উত্তরে মহিষাদল। মহিষাদল ছিল মহাপাত্রদের, কল্যাণ রায় মহাপাত্রদের শেষ পুরুষ; জনার্দন উপাধ্যায়কে বিশ্বাস করেছিলেন, সে তাকে পথে বসিয়ে নিয়ে নিয়েছিল মহিষাদল। উপাধ্যায়দের শেষ রাণী জানকী। রাণী পোষ্যপুত্র নিয়েছিলেন। সে অন্ধ হল। মহিষাদল এল গর্গ বাহাদুরের হাতে। লক্ষ্মী ভূমি কখন যে কার বাড়ী ঢোকেন কেউ বলতে পারে না।

ভাবনাটা মনের মধ্যেই ঘুরছিল। মনে মনে কুড়ারাম মাকে ডাকছিল—বল মা, তুমি বল!

এরই মধ্যে এল কোম্পানীর পরওয়ানা।

আসছে কলকাতা থেকে। রেভেন্যু বোর্ডের হুকুমে যেতে হবে তাকে বাঁকুড়া।

বৈশাখ মাস, ঝড়বৃষ্টির সময়। কিন্তু উপায় ছিল না। কাজ জরুরী।

* * * *

হঠাৎ সুলতার কণ্ঠস্বরে সুরেশ্বর ১৭৯৮ সালের কুড়ারাম ভট্টাচার্যের পাঁচালী থেকে এসে পড়ল ১৯৫৩ সালের ২৫শে নভেম্বরে। সামনে দেওয়ালে ছবিগুলি ঝুলছে। এতক্ষণ এরাই যেন সজীব হয়ে তার সঙ্গে কথা বলছিল। সুলতার গলার সাড়ায় ছবির মধ্যে ছবি হয়ে মিশে গেল।

* * * *

—কি, তুমি ধ্যানস্থ হয়ে গেছ মনে হচ্ছে!

ছবিগুলো বাস্তব হয়ে উঠেছিল। সুলতার গলার সাড়ায় তারা যেন ছবি হয়ে ছবির মধ্যে মিলিয়ে গেল।

সুরেশ্বর বর্তমানে ফিরে এসে সুলতার দিকে তাকালে।

সুলতা বললে—আমি দু'বার এসে ফিরে গেছি। ধ্যানভঙ্গ করিনি—হাতে কাজ ছিল বলে! কি এত ভাবছিলে? সেকাল?

সুরেশ্বর বললে—হ্যাঁ। সেকাল। তবে ঠিক এই মুহূর্তটিতে টাকার অঙ্কে এসে পড়েছিলাম। ভাবছিলাম রায়বংশের প্রতিষ্ঠাতা কুড়ারাম ভট্টাচার্য—রায় ভট্টাচার্য নামক ব্যক্তিটি যেদিন দশ এগার বছরের ছেলের বিয়ে দিয়ে জমিদারী কিনে বরকনে নিয়ে কীর্তিহাট গ্রামে প্রবেশ করলেন—যেটা আমার প্রথম ছবির বিষয়বস্তু—সেদিন তাঁর সঞ্চয়ের পরিমাণ ছিল পাঁচ লক্ষ টাকা। তখন জমিদারী কেনার টাকা দেওয়া হয়ে গেছে—কালী প্রতিষ্ঠা, তাঁর মন্দির, পাকা বাড়ী এসব খরচ শেষ হয়েছে। অর্থাৎ ওসব বাদ দিয়েও পাঁচ লক্ষ টাকা। অথচ মাইনে ছিল যৎসামান্য। শতের কোঠায় পৌঁছে আর বেশী দিন চাকরী করেন নি।

সুলতা বললে—তাতে আর আশ্চর্য হবার কি আছে? সে রাজত্বটাই তো লুঠের রাজত্ব। ঘুষ আর কোম্পানীর সাহেবদের লাথি এ দুটো এত সস্তা ছিল যে ছিয়াত্তুরের মন্বন্তরে মানুষের প্রাণ এত সস্তা হয়নি এবং কুলীনের ছেলেদের বিয়ে এত সস্তা হয়নি। তবে একটা কথা বলতে পার যে কুড়ারামেরা ঘুষ নিয়ে দশ বিশ লাখ আটকে বা পুঁতে রেখেছিলেন বলেই দেশে থেকেছিল, নইলে সবই চলে যেত বিলেতে।

হাসলে সুরেশ্বর। ঘুষ তুমি বল আমি আপত্তি করব না। তবে কুড়ারাম রায় ভট্চাজ সামনে থাকলে তিনি প্রতিবাদ করতেন। ঘুষ? আমার ন্যায্য পাওনা। সাক্ষী মানতেন ধর্মকে, সেকালের ধর্মরাজকে। তিনি এসে তাঁর স্বপক্ষে সাক্ষী দিতেন হলফ করে বলতে পারি। মিনিস্টার হলে আজকাল নমস্কার পায়, মিনিস্টারী গেলে পায় না। সুতরাং মিনিস্টার থাকা-কালীন পাওয়া নমস্কারটা ন্যায্য পাওনা নয় বললে তো চলবে না। কিন্তু ও-কথা থাক। এতক্ষণ করছিলে কি?

সুলতা বললে—বাড়ীতে টেলিফোন ক'রে ফিরে আসবার সময় দেখলাম—রঘু ময়দা মাখছে। আমি ভাবলাম আমার জন্যে করছে। বললাম—এসব কেন করছ? দরকার নেই। রঘু বললে—তা বলো না দিদিমণি। তুমি খাও, তা হলে সঙ্গে লালবাবুরও খাওয়া হবে। আজ সারাটা দিন বলতে গেলে কিছু খায়নি। কেন, খাওনি কেন? জমিদারী যাওয়ার শোকে?

—যেটা থাকে সেটার বিয়োগেই শোক। বলতে পার। কিন্তু ঠিক তা নয়। কীর্তিহাটে গিয়ে খাওয়ার পর পিতৃপুরুষের দিবানিদ্রাটা অভ্যেস করেছি। এবং ওর আমেজ এমন যে খাওয়ার পর ঘুমুবার ব্যবস্থার অভাব হলে খাওয়াটাই তাকে তুলে দিতে হয়। কিংবা বমি হয়ে উঠে যায়। আজ সকাল থেকে ছবি টাঙিয়েছি। তিনটের পর অ্যাসেম্বলীতে গিয়েছি। সুতরাং ঘুমুবার সময় কোথায়? তাই খাই নি।

—এসেও তো কিছু খাওনি!

—ঠিক খেয়াল হয় নি। তোমাকে ছবি দেখাবার ব্যগ্রতাটাই সব থেকে বড় হয়ে উঠেছিল। তুমি সময় দিয়েছিলে একঘণ্টা। তার মধ্যে ছবিই বা কখন দেখাই, খাইই বা কখন। ছবি দেখাবার তাড়ায় মনে ছিল না। কিন্তু তুমি রঘুর সঙ্গে হাত লাগালে নাকি? কেন?

—তা একটু লাগালাম। লুচি বেলে দিলাম। এবং সঙ্গে সঙ্গে ইন্টারেস্টিং কিছু পেলাম,

পড়ছিলাম—পড়া হয়ে গেল।

—কেন যে এসব করতে গেল? ছি-ছি-ছি!

—তাতে কি হয়েছে? উদর নামক যন্ত্রটি তো আমারও আছে। সেখানে খাদ্যরসের মোবিল না পড়লে যে যন্ত্রটি জলে যাবার সম্ভাবনা আছে। হলামই বা অনার্ড গেস্ট, একটু হাত লাগালাম। তুমি ক্ষিদে ভোল—তুমি শিল্পী। কিন্তু আমি মাটির জীব।

হেসে সুরেশ্বর বললে—তার ওপর তুমি সোসালিস্ট। গান্ধীজী যে গান্ধীজী তিনি ছিলেন স্পিরিচুয়াল সোসালিস্ট। তিনি রবীন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন—দেশ এখন একটিমাত্র কবিতা চায় —সেটির নাম অন্ন। তুমি তার থেকে বড়ো নিশ্চয়, যদি প্রশ্ন করি খাওয়ার জন্যে বাঁচা—না বাঁচার জন্যে বাঁচা তা হলে কি উত্তর দেবে হলপ ক'রে বলতে পারি না।

—এ তকরার খেতে খেতে হবে। তাও না। তকরার একেবারে বাদই থাক। তুমি তোমার কড়চার কাহিনী বল। তার আগে তোমাকে বলে নিই। তোমার আদিপুরুষের নামাঙ্কিত একটা পাঁচালী, অবশ্য সেটা তোমার হাতে নকল করা, সেটা তোমার টেবিলের উপর পড়ে আছে। বলছিলাম না, ময়দা মাখতে মাখতে ইন্টারেস্টিং কিছু পড়ছিলাম—সেটা ওইটেই। খুব ভাল ক'রে পড়েছি বলব না। তবে মোটামুটি পড়েছি। সমাজে সেকালে যারা বংশপ্রতিষ্ঠা করেছে, তারা এমনি না-হলে হয় না।

রঘু এসে দাঁড়াল।

সুলতাই বললে—কি? খাবার দিয়েছ?

রঘু বললে—হাঁ দিলম।

সুলতা বললে—এস। খেয়ে নাও আগে। এবং খেতে খেতেই বল। তোমার কথা তো অনেক। আমাদের আসরের পরমায়ু এই রাত্রিটুকু। দশটা বেজে গেছে। বসো।

তারা রঘুর পিছনে পিছনে খাবার ঘরে ঢুকল। বসল সামনা-সামনি। রঘু খাবার সাজিয়ে রেখেছিল। আয়োজন দেখে সুরেশ্বর বললে—এত করতে গেলি কেন? লুচি বেগুন-ভাজা আলু-ছেঁচকি—মাংসটা তো না হয় খাবোই। এ যে অনেক।

সুলতা হেসে বললে—আমি বলেছি।

—কেন এত ঝঞ্ঝাট করলে?

সুলতা বললে—আজ না-হয় আমি অতিথি, আমি আমার অনারেই করেছি। অবশ্য তোমার মান রাখতে। কারণ, বলতে তো পারি সুরেশ্বর গল্প শোনাবার ছবি দেখাবার জন্যে ডেকে নিয়ে গিয়ে সারারাত্রি উপোস করিয়েছিল।

সুরেশ্বর অপ্রতিভ হয়ে গেল এবার। বললে—দেখ, আমার কমন সেন্স যেন কমে যাচ্ছে! সত্যিই তো!

সুলতা বললে—সারাদিন তুমি খাওনি। ক্ষিদের খুব বোধ রয়েছে বলেও মনে হল না। রঘু বলছিল—দিদিমণি, আমার সেই লালবাবু যে কি রকম হয়ে গেলো! খায় না। খেতে দিলে পড়ে থাকে। কীর্তিহাটে মেঝলা ঠাকুর-মাই ছিলেন, উনহি উনকে খাওইতেন। লালবাবু বিলায়েৎ চলে গেলেন, ঠাকুর-মাই গেলেন বৃন্দাবন। আর আইলেন না। উসকে

বাদসে এহি হাল। আজ সাত আট বরিষ। আমি জিজ্ঞাসা করলাম—কেন, এমন হল কেন? বললে—হামি নোকর, হামি কি করিয়ে বলি। উনকে পুছিয়ে—উ বলবে। উ ঝুট তো বোলে না!

সুরেশ্বর সুলতার আগেই খেতে শুরু করেছিল। সুলতা বললে—কত ক্ষিদে পেয়েছিল বল তো?

—কেন?

—না-হলে আমি খেতে শুরু করলাম কি না তা লক্ষ্য না করেই খেতে শুরু করেছ তুমি!

—ওই দেখ। ছত্রিশ সাল থেকে তেপ্পান্ন সাল—সতের বছর কীর্তিহাটে একলা থেকেছি,, ভেবেছি, নানান দেশ ঘুরেছি, তার মধ্যে এইরকম হয়ে গেছি। প্রথম মেজঠাকুমাকে পেয়েছিলাম সেখানে।

একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে—মেজঠাকুমা আমার মেজদি, আমার জীবনের পরম সম্পদ। একাধারে মা ছিলেন আবার ঠিক বড়দিদি ছিলেন। হয়তো বা রায়বংশের প্রতিষ্ঠা করা যে যুগলবিগ্রহ আছে তারই মূর্তিমতী রাধা ছিলেন। আমার জন্যে কলঙ্কের ভারও মাথায় নিয়েছেন তিনি।

—কলঙ্ক? কি কলঙ্ক?

—কলঙ্ক সংসারে নারীর একটিই স্থূলতা। ভালবাসার কলঙ্ক! রায়বংশ এমন পচে গেছে যে নিজের বংশের শ্রেষ্ঠ পুণ্যের আশ্রয় মেয়েটিকে কলঙ্কিনী বললে তারাই!

—থাক সুরেশ্বর, ওসব তোমার ঘরের কথা। তার থেকে তুমি বল—তোমার কড়চার কথা বল! আমার পূর্বপুরুষ ঠাকুরদাস পাল খুন হয়েছিলেন। বাবাকে আমি টেলিফোন করলাম, বললাম—আজ ফিরব না বাবা। সেই সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলাম—আমাদের পূর্বপুরুষ ঠাকুরদাসের কি পাল উপাধি ছিল? বললেন—হ্যাঁ, তখন তাই ছিল। কিন্তু আসল উপাধি আমাদের ঘোষ! জিজ্ঞাসা করলাম—তিনি কি খুন হয়েছিলেন? বললেন—শুনেছি তাই। একজন দেশী ক্রীশ্চান গুণ্ডা তাঁকে খুন করেছিল। জিজ্ঞাসা করলাম—ঘটনাটা কি জান? বললেন—সে তো আমারও তিন পুরুষ আগে। তাছাড়া ওই উনি খুন হলে আমার পিতামহ কলকাতায় এসে ব্রাহ্ম হন, দেশের সঙ্গে সম্পর্ক চুকে যায়। তারপর তিনিও আমার বাবাকে ছেলেমানুষ রেখে মারা যান। আমি মামার বাড়াতে থেকে পড়েছি, বিলেত গেছি। ওসব পিছনের খবর আমাদের ঠিক জানা নেই। জানিনে। বাবা কারণ জানতে চাইলেন, বললাম —কাল বলব। তোমার পূর্বপুরুষ কি ওই ক্রীশ্চান গুণ্ডাটাকে দিয়ে খুন করিয়েছিলেন বলছ? কি করে জানলে তুমি? কে বললে তোমাকে?

—বলেনি কেউ, আমি খাতা থেকে পেয়েছি।

—খাতা থেকে?

—হ্যাঁ, প্রথম পেলাম জমাখরচের খাতা থেকে।

অবাক হয়ে গেল সুলতা। জমাখরচের খাতা থেকে? তার হাতে ধরা লুচি আলু-

ছেঁচকি সে ধরেই রইল।

*　　*　　*　　*

সুরেশ্বর বললে—রায়-বংশের সাত পুরুষের পাপপুণ্য ভালোমন্দ সব-কিছুর ফিরিস্তি বুঝি বিধাতার ইচ্ছায় গচ্ছিত ছিল আমার ওই মেজঠাকুমা—মেজদির কাছে। মেজদিকে কলঙ্কিনী অপবাদ না দিলে হয়তো এ ফিরিস্তি তিনি আমাকে দিতেন না! তাই সেই কথাই বলছিলাম তোমাকে। এবং তার সঙ্গে আমার জবানবন্দী যেটা তোমার কাছে প্রথম দেবার আছে সেটাও দেওয়া হয়ে যাবে।

সুলতা বললে—বল।

সুরেশ্বর বললে—মেজঠাকুমাকে ওরা কলঙ্ক দিলে। সেই বৃত্তান্ত থেকেই বলি। মেজঠাকুরদার মৃত্যুর পর থেকে মা ওঁর পঞ্চাশ টাকা মাসোহারা বরাদ্দ করেছিলেন। মা মারা গেলেও সেটা আমি বন্ধ করি নি। আমার সঙ্গে একটি স্নেহের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল বাবার শ্রাদ্ধের সময়। সেটেলমেণ্টের সময় মেজতরফ আমাকে ন্যায্য সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করতে চাচ্ছে বুঝতে পেরে উনিই ছুটে এসেছিলেন কলকাতায়, আমার ওখানকার নিজস্ব নায়েবকে নিয়ে। আমি তোমাকে জানালাম। তুমি তাড়া দিয়ে বললে—যেতে হবে বইকি। যাও। ঠাকুমা-নায়েবের সঙ্গে রঘু চাকরকে পাঠিয়ে দিলাম আগে, পরের দিন আমি কীর্তিহাটে পৌঁছুলাম এগারটার সময়; শেষ চৈত্র তখন। ওখানে গ্রীষ্ম, কীর্তিহাটে বলে 'খরা', তখন প্রখর হয়ে উঠেছে। মেদিনীপুরে নেমে জীপ ট্যাক্সিতে গিয়েছিলাম—ফলে সর্বাঙ্গ ধূলি-ধূসরিত হয়ে গিয়েছিল।

মেজঠাকুমা বিবিমহলের দরজায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। নায়েব ছিল, ডিকু, রোজা, ওরা চাকরী করত, সেই বাবার শ্রাদ্ধের সময় থেকে তারা ছিল; কিন্তু অভ্যর্থনা করলেন মেজঠাকুমা। রায়বংশের যেটুকু স্নেহ আমার প্রাপ্য সেটা যেন ওঁর কাছে জমা ছিল সুলতা। অপরাধ বোধহয় তাঁর এইখানেই।

সব মনে পড়ছে আমার। ছবিতেও এঁকে রেখেছি। সে ছবি অবশ্য অনেক পরে আসবে, কিন্তু তখন আর আমাকে বলে দিতে হবে না সুলতা যে এইটে মেজঠাকুমার ছবি, তিনি সুরেশ্বরকে হাত ধরে বলছেন—

—এস ভাই আমার সোনার নাতি এস।

আমি প্রণাম ক'রে বলেছিলাম—তাইতো ঠাকুমা, নিজের সম্বন্ধে তো তাহলে এবার সাবধান হ'তে হবে। চোরে ডাকাতে না লুঠে নিয়ে যায়!

মেজঠাকুমা হেসে বলেছিলেন—ভয় কি ভাই! আমি তোমাকে ভক্তি করে বুকে ঝুলিয়ে রাখব। নাত-বউ এলে তাকে পরিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হব।

*　　*　　*　　*

কথার জবার খুঁজে পায়নি সুরেশ্বর। মেজঠাকুমা বলেছিলেন—নাও, মুখ হাত ধোও। চায়ের জল চড়ানো আছে। রঘু চা দিক। চা খেয়ে স্নান করে ফেল। আমি তরকারী রেঁধে ফেলেছি। ভাতটা বাকী। চড়িয়ে দি। স্নান ক'রে ঠাকুরবাড়ী প্রণাম করে এসে

খেয়ে নাও। তারপর জিরিয়ে নাও।

—এসব—মানে এত কষ্ট আপনি কেন করলেন ঠাকুমা? রঘু যা হয় করতো।

—কেন? আমি থাকতে রঘু কেন? তুমি আমার নাতি। ছেলে টাকা, নাতি সুদ। টাকার মুখ দেখিনি, ভাগ্যি আমার ভগবান আমাকে সুদ পাবার হকদার করেছেন। ভাতের উপর মিষ্টান্ন। তোমার মেজঠাকুরদা-র ধুলোয় ফেলে-দেওয়া পোঁটলাটা তুমি মাথায় তুলে নিয়েছ। আমি থাকতে রঘু কেন?

দুফোঁটা চোখের জলও পড়েছিল তাঁর।

খাওয়ার সময় কাছে বসে খাইয়েছিলেন। সুন্দর রান্না মেজঠাকুমায়ের। মেজঠাকুমা বলেছিলেন—আমি জানি তুমি মাংস খাও। কিন্তু তোমার মেজঠাকুরদার বৈষ্ণব মন্ত্র, আমারও তাই। ওটা আমি ছোঁব না। ওই গোয়ানদের বললে ওরা গুলতিতে পাখী মেরে দেবে। ওইটে বরং রঘু রেঁধে দেবে তোমাকে।

অভিভূত হয়ে গিয়েছিল সুরেশ্বর। তিনি তাঁর কাছে মাসোহারা পান বলে তোষামোদ করছেন এ ধারণা তার একেবারে মুছে গিয়েছিল।

এই সময়ে বাইরে কাঁসাইয়ের ধারের জঙ্গলে সেই বউ-কথা-কও পাখী ডেকে উঠেছিল। চৈত্র মাস। এটা ওদের পাগল হয়ে ডাকারই মাস।

কথার ধারাটাকে ঘোরাবার জন্যেই সুরেশ্বর বলেছিল—সেই পাখী ডাকছে, না ঠাকুমা?

সঙ্গে সঙ্গে গালে হাত দিয়ে মেজঠাকুমা বলেছিলেন—ও-মা! তাই তো!

অবাক হয়ে সুরেশ্বর তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল।

মেজঠাকুমা বলেছিলেন—এতদিন ছিল না ভাই পোড়ারমুখো পাখী। অন্ততঃ আমার কানে আসেনি। তাই তো ও-মা বলে গালে হাত দিচ্ছি! মনে হচ্ছে তোমার মেজঠাকুরদা পাখীটা তুমি হয়ে ফিরে এলে তাহলে!

সঙ্গে সঙ্গে হেসে উঠেছিলেন।

সেই স্নেহশীলা মায়ের মত মেয়েটি যে এমন যত্ন করে খাওয়াচ্ছিল, সে যেন মুহূর্তে পরিহাস-মুখরা সখী হয়ে উঠেছে।

সুরেশ্বরের বিস্ময়ের সীমা ছিল না। সেই দিন রাত্রেই মেজঠাকুমা তাকে বলেছিল—আজ থেকে আমি তোমার মেজবউদি। ঠাকুমা বললে, কেমন বুড়ী হয়েছি বলে লজ্জা করে! কেমন?

সুরেশ্বর বলেছিল—না।

—কেন?

—একটু খাটিয়ে নেব।

—কি মেজ বউ? হেসে উঠেছিলেন তিনি।

—না মেজদিদি!

—বাঃ, সে খুব ভাল। আর একালে কি বলে—মডার্ন না কি তাও হবে। তাহলে কিন্তু তুমি বলো, আপনি নয়!

—বলব।

মেজঠাকুমা বলেছিলেন—এইবার চলি, তুমি ঘুমোও একটু। আমার অনেক কাজ। গোপালকৃষ্ণের ভোগ হল, এইবার মন্দিরে যাই, সেখানে আমার নাগরকৃষ্ণের ভোগ আছে। তারপর পোড়া পেটের পিণ্ডি আছে। সন্ধ্যেবেলা ঠাকুরের চরণোদক-তুলসীমায়ের বেলপাতা নিয়ে আসব।

এই ভূমিকা সুলতা।

ওই সর্ববঞ্চিতা বিধবা যুবতী ঠাকুমাটি তাঁর সব স্নেহরসভরা জীবনকুম্ভটি আমার মাথার উপর ঢেলে দিলেন।

সন্ধ্যেতেও তিনি এলেন কিন্তু কথাবার্তার সুযোগ হল না। সেরেস্তার আসর পড়েছিল। আমার নায়েব দেবোত্তরের নায়েব সকলে এসেছিলেন; কথাবার্তা হচ্ছিল। সেটেলমেণ্টে স্বত্বের সমস্যা তাঁরা বোঝাচ্ছিলেন আমাকে।

আমি ঠিক বুঝতে পারছিলাম না।

দেবোত্তরের নায়েব বললেন—মেজতরফ বলছেন—বাড়ী—সবই দেবোত্তর। অন্দর, বিবিমহল সব।

—কিন্তু পার্টিশন দলিলে তো সই করেছেন!

—করেছেন। সে করেছেন শিবেশ্বর রায়। তিনি মৃত। ছেলেরা দেবোত্তরের সেবায়েত হিসেবে আপত্তি করছে এরকম পার্টিশন অসিদ্ধ। বাড়ী সব দেবোত্তর।

—তারই বা প্রমাণ কি?

—প্রমাণ? হেসে দেবোত্তরের নায়েব বললে—আমি ওঁদের নায়েব, আপনারও নায়েব। আমি ওঁদের বলেছি—কাগজ যা বলবে, আমার কাছে যা আছে বের করে দেব। কিন্তু আমি ওর মধ্যে নেই। প্রমাণ ওঁরা জানেন। আমাদের ঘোষালও জানেন। বল না ঘোষাল।

সুরেশ্বর বললে—সুলতা, আমার নায়েব এবার বললে, ব্যাপারটা গোলমেলে বটে। ওঁরা সোমেশ্বরের ট্রাস্ট ডিড, রত্নেশ্বর রায়ের ট্রাস্ট ডিড বের করছেন, তার নকল আমাদেরও আছে। তাতে আছে কীর্তিহাটের যাবতীয় জমিদারীপত্তনী সম্পত্তি দেবত্রীকৃত হইল। এবং এই আয় হইতে যে সকল সম্পত্তি অর্জিত হইবে, তাহাও দেবত্র বলিয়া গণ্য হইবে। ওঁরা বলছেন—বাড়ীগুলি দেবত্রের আয় থেকে তৈরী, সুতরাং এও দেবত্র। বিভাজ্য নয়। তবে যে যেমন দখল করছেন, দখল করবেন। দান-বিক্রয় চলে না।

দেবোত্তরের নায়েব বলেছিলেন এবার—ব্যাপারটা আরও একটু জটিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ, বড়তরফ এতে যোগ দিয়েছেন; আপনার জ্যেষ্ঠতাতের বড় ছেলে প্রণবেশ্বরবাবু আসছেন, তিনি এতে যোগ দিয়েছেন। তিনিই বোধহয় বুদ্ধি যোগাচ্ছেন কলকাতা থেকে। এবং সে বুদ্ধি হাইকোর্টের উকিল-ব্যারিস্টারের। তাঁদের জন্যে ব্যাপারটা আরও জটিল হয়েছে, আপত্তির দাবী আরও মজবুত হয়েছে। ধরুন, তিনি আপনাদের

বড়তরফের অর্ধেকের শরিক। বড়তরফই বিবিমহল পেয়েছে। বড়তরফই ছোটতরফ অর্থাৎ রামেশ্বর রায়ের বাড়ীর অংশ কিনেছে। ওঁদেরই বাপ তাঁর অংশ আপনাদের বিক্রী করেছেন। তাঁরা আপত্তি দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার দোষ হয়ে যাচ্ছে যে, দেবেশ্বর রায় যে পার্টিশনের সময় বিবিমহল নিয়েছিলেন টাকা দিয়ে, সে অসিদ্ধ, আবার রামেশ্বরের অংশ খরিদ অসিদ্ধ, আবার যজ্ঞেশ্বর রায়ের বিক্রী অসিদ্ধ।

বিরক্তিভরে আমি বলেছিলাম সুলতা, বেশ তো, বাড়ীর একটা ভাগ তো আমার যাবে না। সেটা তো থাকবে। নিন, ওঁরা বাড়ীর ভাগ নিয়েই যদি তুষ্ট হন তো হোন।

এবার বেরিয়ে এসেছিলেন মেজঠাকুমা। তিনি যে এখনও পর্যন্ত ঘরের মধ্যে আমার প্রতীক্ষায় বসে আছেন, তা জানতাম না। এসে বলেছিলেন—কেন নায়েববাবু, সে আমলের কর্তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের এস্টেটের খাতাপত্র আছে। তা থেকে বের হবে।

তারপর আমাকে বললেন—তুমি ওসব কথা কখনও মুখে আনবে না নাতি। নিয়ে সুখী হয় হোক—এ কথা বলা মানে হার মানা।

দেবোত্তরের নায়েব বললে—খাতা যে সব নেই মা। কোথায় গেল তা কেউ জানে না। সে কি ছোটবাবুর নায়েবকে আমি খুঁজে দেখতে বলিনি? খাতা তো মেজকর্তার আমল থেকে কোথায় কি গেল কেউ বলতেও পারে না। কি ঘোষাল, বলুন না!

ঘোষাল বললে—খাতা নেই।

আমি হেসে মেজঠাকুমার মুখের দিকে তাকালাম।

মেজঠাকুমা কেমন যেন হয়ে গিয়েছিলেন। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন—আমি গিয়ে সাক্ষী দিলে হয় না?

—সে স্বত্বের মকর্দমার সময় দেওয়ানী আদালতে দিতে পারেন, বলতে পারেন—এই শুনেছেন, শুনে আসছেন। তার দাম কতখানি হবে, কাগজপত্রের ওপরে, তা হাকিমের বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করে। কিন্তু সেটেলমেণ্ট কোর্টে ও শুনবেই না তারা।

মেজঠাকুমা আমার দুঃখে দুঃখ পেয়েই চলে গিয়েছিলেন।

* * * *

পরের দিন সকালে সেটেলমেণ্ট আদালতের দুর্ভোগ যা হয়েছিল, তা তোমাকে পত্রে আমি লিখেছিলাম। চারটে পর্যন্ত বসে থাকা, হাকিম হরেন ঘোষের সঙ্গে আলাপ। এসব তুমি জান। একটা কথা লিখিনি। দুপুরবেলা গাছতলায় বসে জমিদার হওয়ার দুর্ভাগ্যের জন্য আপশোস করছি, ক্ষিদে পেয়েছে, ঠিক সেই সময়টিতে রঘু তোয়ালে ঢেকে খাবার নিয়ে গিয়েছিল, মেজঠাকুমা পাঠিয়েছেন।

এরপর আমায় ছবি আঁকতে দেখে হরেন ঘোষ হাকিমের মুগ্ধ বিস্ময়ের কথাও লিখেছি। ঘোষ আমার বন্ধুত্বের জন্য কিছু কিছু মূল্য দিয়েছিলেন। কয়েকটা ব্যাপারে আপত্তির ক্ষেত্রে তিনি ওদের ধমক দিয়েছেন। কাগজ দেখাতে বলেছেন। সে-সব ছোটখাটো ব্যাপার।

মূল বাড়ী নিয়ে ব্যাপারটার তখনও দেরী আছে। আমিও তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্বের জন্য কিছু করেছি। কলকাতা থেকে বই আনিয়েছি, শরৎবাবুর সব বই। কিছু আধুনিক লেখকদের

বই, বিভূতিভূষণ, প্রেমেন্দ্র, অচিন্ত্য, বুদ্ধদেব, শৈলজানন্দ, প্রবোধকুমার—এই সব, আর খানকয়েক মাসিকপত্রও নিয়েছি। সবই হাকিমের জন্য বলতে গেলে। তবে দোহাই ধর্ম, এটাকে তুমি ঘুষ দেওয়া বলো না। ওঁর জন্যে একখানা বাড়ীও দেখে দিয়েছি, ওঁর স্ত্রী আসবেন। মাটির দেওয়াল, খড়ের চাল। কথা দিয়েছি—মেয়েদের জন্যে যে ইস্কুলটা করছি আমি মায়ের নামে, সে বাড়ীটা তাড়াতাড়ি করিয়ে ওঁকে দেব, যতদিন উনি থাকবেন। সুখেশ্বরকাকার ছেলে কল্যাণেশ্বর তার ঠিকেদার, তাকেও বলে দিয়েছি। হাকিমের জন্যে সেও প্রাণপণে খাটছে।

এদিকে খাতাপত্র সন্ধান করে পাওয়া যায়নি। আমি ছেড়েই দিয়েছি সব আশা!

মেজঠাকুমা কেমন হয়ে গেছেন। মধ্যে মধ্যে বলেন—তোকে আমি মিছেই নিয়ে এলাম ভাই। লজ্জায়, দুঃখে যে মরে যাচ্ছি রে।

—কেন ঠাকুমা? এতে তোমার লজ্জা কি?

—ওরে তোর মেজঠাকুরদা যে এর হেতু!

—তা আর তুমি কি করবে?

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলতেন—বুঝতে পারছি না রে! মনকে বোঝাতে পারছি না।

আমার করুণা হত।

এই সময় হঠাৎ মেজঠাকুমাকে ওরা কলঙ্কিনী বললে!

কিছুদিন পর। দিন বিশেক পর। সেদিন রবিবার, বিকেলে গিয়েছিলাম হরেন ঘোষের ওখানে। ওঁর স্ত্রী এসেছেন। দেখা করতে গিয়েছিলাম। রবিবারের সকালটা জমে উঠেছিল। ১৯৩৬ সালের আধামডার্ণ অর্থাৎ ম্যাট্রিক পাশ মেয়ে। যে মেয়ে অন্ততঃ হাকিম-গৃহিণীর মর্যাদা রাখতে পারে। অর্থাৎ আবদার করতে পারে। বেশ লাগল, চা খাওয়ালেন। প্রথমেই বললেন স্বামীকে—ওই ওঁকে বল। তোমায় দিয়ে হবে না।

আমি বললাম—কি?

—একটা ছুতোর মিস্টার রায়। এই ফার্নিচারগুলো একটু ঠুকেঠেকে দেবে।

হরেন ঘোষ বললেন—দেবেন মশায়। নইলে মান আমার আর থাকে না।

—মান তোমার উনি পাঠিয়ে দিলেও থাকবে না। কারণ, উনি তো আমারও বন্ধু। তোমার এতগুলো পিওন, এতগুলো ক্লার্ক, এত ক্ষমতা, তার দামটা তাহলে কি?

আমি বললাম—দেব। নিশ্চয় পাঠিয়ে দেব। এর জন্য নতুন পাতা ঘরে অশান্তি করবেন না।

হাকিম-গৃহিণী বললেন—আর সেই কথাটা বললে না? বললেন স্বামীকে।

হরেন ঘোষ বললেন—তুমি বল না, তোমারও তো বন্ধু।

—বলতাম নিশ্চয়। কিন্তু এ-কথাটা তোমার বলা উচিত।

বললাম—কি? বলুন?

—ছবি মশাই। একখানা ছবি ওঁর এঁকে দিতে হবে।

—দেব। খুশী হয়েই বললাম—দেব।

—আমার কলকাতা যাবার আগে দেবেন কিন্তু। সেখানে দেখাব আমি।

—কখন কলকাতা যাবেন? এই তো এলেন।

—মাস তিনেক পর।

—তাহলে কথা দিলাম।

বলে চলে আসছিলাম। বোশেখ মাস পড়ে গেছে। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, তবু এখনও প্রচণ্ড উত্তাপ। বাড়ী ফিরতে কষ্ট হল। মেজাজও খারাপ হল। এর উপর ঠাকুরবাড়ীর কাছে এসে ধনেশ্বরকাকার গর্জন শুনে ভুরু কুঁচকে উঠল আমার। এরা মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে আমার নীরবতা এবং ভদ্রতার সুযোগ নিয়ে। আজ যেন গর্জনটা বেশী, তবু চলে এলাম। বিবিমহলের সামনে রোজারিওকে পেলাম, বললাম—ওরে, একটা ছুতোর ডেকে হাকিমের বাসায় কাল নিয়ে যাবি তো! মজুরী আমরা দেব। আর—। বলতে গিয়ে থেমে গেলাম। বলতে যাচ্ছিলাম, ধনেশ্বরকাকাকে বলে আসুক বাবু জিজ্ঞেস করছেন, এত চেঁচাচ্ছেন কেন? কিন্তু না থাক। শুধু ছুতোরের বরাত করেই ক্ষান্ত হলাম।

রোজা বললে—যাব হুজুর!

হন হন করে উঠে গেলাম। ভাবছিলাম, একবার তোমাকে আসতে লিখলে কি হয়! হরেন ঘোষের বউয়ের সঙ্গে আলাপ করে যাবে। মন্দ লাগছিল না আইডিয়াটা। উপরে উঠে গিয়ে দেখলাম, মেজঠাকুমা দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসে আছেন শোকাতুরার মত, অতি ক্লান্তের মত। দু চোখ থেকে জল গড়াচ্ছে। তিনি কাঁদছেন।

সেদিন মেজদিকে ঘরে বসে এমন করে কাঁদতে দেখে সে আঘাত পেয়েছিল। একটু চিন্তিত হয়েই প্রশ্ন করেছিল—কি হল মেজদি? কাঁদছ কেন?

মেজঠাকুমা মেজদি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আপনি থেকে তুমি হয়েছিলেন।

মেজঠাকুমা চোখ মুছে চোখের জল গোপন করতে পারেনি, আরও বাড়িয়ে ফেলেছিলেন। যেন ভেঙে পড়ে গিয়ে বলেছিলেন—সুরেশ্বর, আমাকে তুই বৃন্দাবন পাঠিয়ে দে ভাই! নয়তো নবদ্বীপ। যা দিস তুই তার বেশী আমার লাগবে না। আমাকে শুধু পাঠিয়ে দে।

মেজঠাকুরদার বড় ছেলে, মেজদির বড় সতীনপো এবং তার মেজ ছেলে তাঁকে কুৎসিত কথা বলেছে। চরমতম কুৎসিত কথা। এর থেকে বড় অপমান আর কিছু হতে পারত না মেজদির। শুধু মেজদিরই নয়, তারও।

সুরেশ্বর বললে—আমি লজ্জায় মরে গেলাম সুলতা। তার সঙ্গে কি যে দুরন্ত ক্রোধ আমার হল, তা বলতে পারব না। মনে হল, ওই ভাঙাভগ্ন দেহ, ফাটলধরা মানুষটার রন্ধ্রে রন্ধ্রে বিষাক্ত কীট সরীসৃপে ভরা। রায়বংশের ধ্বংসবীজ বিষাক্ত বাষ্প ওর মধ্যে জমাট বেঁধে আছে। ওটাকে আমার ধ্বংস করা উচিত। এখুনি ছুটে গিয়ে ধ্বংস করে দিয়ে আসি! তিরিশ সালে জেলে যখন গিছলাম, তখন পুলিশ আমাদের বন্দুক-রিভলবার বাজেয়াপ্ত করে

নিয়েছিল। আমি স্টেটসম্যানে অনুতাপ করে চিঠি লিখে স্পাই নাম কিনেছিলাম। কিন্তু বন্দুকটন্দুক নিইনি আর। কলকাতায় নায়েব হরচন্দ্র ঘোষাল বলেছিলেন। তাতে মা-আমি দুজনেই না করেছিলাম। বন্দুক থাকলে সেটা নিশ্চয় আমি কীর্তিহাট নিয়ে যেতাম এবং সেই-দিনই আমি খুন করে বসতাম এবং নিজেও হতাম।

উপলক্ষ্য একখানা সাবান। দামী ল্যাভেণ্ডার সোপ ব্যবহার করত সুরেশ্বর। মেজদি একদিন বলেছিলেন—বাহারের খুসবু ভাই নাতি। একে কি সাবান বলে?

—ল্যাভেণ্ডার সোপ বলে মেজদি!

—খুব দামী বুঝি?

—তা দামী বই কি। খাস বিলিতী জিনিস। এক-একখানা আড়াই টাকা।

—ওরে বাপরে! তাই। তারপর হঠাৎ হেসে বলেছিলেন—জানিস ভাই, আমার দাদাশ্বশুর, তোর ঠাকুরদারও বাবার মামা—বুঝতে পারলি?

—হ্যাঁ, বীরেশ্বর রায়।

—হ্যাঁ তিনি। খুব জাঁদরেল লোক ছিলেন। নীলকুঠীর সাহেবদের তখন কুঠী ছিল। তাদের ছেলেদের সঙ্গে খেলা করতেন। তাদের কাছে ইংরিজী শিখেছিলেন। একজন পাদরী-সাহেব ছিল, সে পড়াতো। সে নাকি ডাল-ভাত আর কড়াইবাটা খেতে খুব ভালবাসত। তা আমার দাদাশ্বশুর হয়ে উঠলেন সায়েবী মেজাজের লোক। বন্দুক দিয়ে বাঘ মারতেন, কুমীর মারতেন। ঘরে নাকি, এই বিবিমহলে, খাঁচায় করে বাঘ পুষেছিলেন। তাঁর কুকুর ছিল। এই বড় বড় কুকুর—ডালকুত্তা। কুকুর মণ্ডা খেত। ঘিয়ের মিষ্টি খেলে রোঁয়া উঠবে—তাই খাস মণ্ডার বরাদ্দ ছিল। তিনি মহলে যেতেন, কুকুর সঙ্গে যেত, যেত পাল্কিতে। এ-গাঁয়ে তখন সরকারদের বাড়িতে স্বন্নপিসী ছিল গাঁয়ের পিসী। তা স্বন্নপিসী বলত—মরে এবার ফিরেশ্বরের কুকুর হব। তাই ভাই আমারও বলতে ইচ্ছে করছে—এবার মরে তোর বেটী হয়ে জন্মাব, নইলে নাতনী হয়ে।

হেসে সুরেশ্বর এক বাক্স সাবান তাঁকে দিয়ে বলেছিল—তার জন্যে মরতে হবে জন্মাতে হবে এত ঝঞ্ঝাট করতে হবে কেন? যার নাতি এমন সাবান মাখে, সে কি নিজে এ-সাবান মাখতে পারে না?

লজ্জিত হয়ে মেজঠাকুমা বলেছিলেন—না-না-না সুরেশ্বর। আমাকে কি সাবান মাখতে আছে? তা আবার ওই সাবান!

—আছে ঠাকুমা। কে বললে নেই?

—তুই পাগল!

—না। পাগল নই। এ তোমাকে নিতেই হবে। মাখতেও হবে। না মাখলে আমার দিব্যি রইল।

—এই দেখ্! কি করলি বল তো?

বলে তিনি নিয়েছিলেন সাবানের বাক্সটি।

সুরেশ্বর বললে—আমার মায়ের থেকে মেজদি বয়সে ছোট ছিল। আমার থেকে আট-দশ বছরের বড়। তখন তাঁর বয়স ছত্রিশের বেশী নয়। সন্তান-সন্ততি হয়নি। রূপ ছিল, যৌবনও ছিল। দেখতে যুবতী মেয়ে মনে হত। মনে মনেও তাই ছিলেন, একটি সরস কৌতুক, দুর্লভ নির্মল জলের জোয়ার তাঁর জীবনকে ভরে রেখেছিল। তার সঙ্গে ছিল সাধ-আহ্লাদ : এ-সাধ বোধহয় বুড়ো-বুড়ীরও থাকে। তাঁর অপরাধ তিনি যুবতী, সুন্দরী। তার উপরেও অপরাধ ছিল—আমার প্রতি তাঁর স্নেহ এবং বিষয়ের ঝগড়ায় আমার দিকে তাঁর পক্ষপাত। ফলে—

দুর্নাম রটল কয়েক দিনের মধ্যেই।

ওই সাবান মাখতেন মেজদি। প্রথম ক'দিন ঘরে সকলের অগোচরে মুখে মাখতেন। তারপর একদিন ঘাটে গিয়ে স্নানের সময় গায়ে মেখেছিলেন। ল্যাভেণ্ডারের গন্ধে ঘাট ভয়ে গিয়েছিল। তাঁর গায়েও সে-গন্ধ লেগে ছিল।

সে-খবরটা রটিয়েছিল প্রথম ধনেশ্বরের মেজছেলে, ব্রজেশ্বরের ভাই। তারপর ধনেশ্বর রুদ্র-মূর্তিতে সৎমায়ের ঘরের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছিল।

—সাবান মাখছ? খুসবু সাবান? সুরেশ্বর দিয়েছে? লম্পটের পুত্র ওই সুরেশ্বর দিয়েছে তোমাকে খুসবু সাবান?

হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন মেজগিন্নী!

ধনেশ্বর এবার অ্যাক্টিংয়ের ভঙ্গিতে চীৎকার করে উঠেছিল, তুই ভ্রষ্টা, তুই পাপিষ্ঠা। তুই কলঙ্কিনী!—কলঙ্কিনী, ও যে তোর পৌত্র! ছি-ছি-ছি!

বলতে বলতে চলে এসে ঠাকুরবাড়ীতে দাঁড়িয়ে চীৎকার করতে শুরু করেছিল, তিরস্কার করতে শুরু করেছিল মরা বাপ শিবেশ্বর রায়কে—

—নরকস্থ হও। অনন্তকালের জন্য নরকস্থ হও তুমি। তুমি শিবেশ্বর রায়—তুমি কামার্ত পশু ছিলে, ফলভোগ কর তার। কর ফলভোগ। রত্নেশ্বর রায়, তোমার স্বর্গসিংহাসন নড়েছে। পড়ছে—পড়ছে নরক মুখে। কাঁদছ, তুমি কাঁদছ? তারপর অট্টহাস্য করে উঠেছিল—হা-হা-হা-হা! ধনেশ্বরের পিতৃদত্ত শিক্ষার মধ্যে নাটুকেপনা একটি বড় সম্পদ।

লোক জমেছিল চারিদিকে। পঙ্ক-পঙ্গলে ঝাঁকবন্দী খেয়ো মাছির মত।

মেজদি ভয়ার্ত হয়ে ঘরে খিল দিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছিলেন। মরবার সংকল্প করেছিলেন। কিন্তু ভয় হয়েছিল। নিদারুণ ভয়। তবে কি করবেন? তবে কি করবেন? ওদিকে গোটা মেজতরফের কুৎসিত কথাগুলি গোটা বাড়ীটার খিলানে খিলানে যেন বেজে বেড়াচ্ছিল। মেজদি থাকতেন সুরেশ্বরের অংশের বাড়ীতে। যে-ঘরে মেজকর্তা থাকতেন, সেখানেই থাকেন। বাকী ঘরগুলিও ওদের দখলে। সেখান থেকেও ভেসে আসছে কুৎসিত বিস্ময় প্রকাশের শব্দ ও ধ্বনি। শিউরে-ওঠা, একটি লম্বা টানা ও শব্দ।—ও মাঃ! কোথায় যাব গো! কি লজ্জা, কি ঘেন্না! ঘাটে সুগন্ধি সাবান মাখা! এমন গন্ধ যে, গায়ের পাশে

মৌমাছি উড়ছে! ছি-ছি-ছি! তা-ও আবার কে দিয়েছে? না—নাতি! আপন ভাগুরপোর ছেলে! ছি-ছি-মা! ও যে ছেলের বয়সী গো! সেকালে বারো বছরের মেয়ের ছেলে হয়েছে। কি রুচি, কি প্রবৃত্তি! আর ওই ছেলে, ওই কুলাঙ্গার!

মেজদির হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছিল, বুকের ভিতর হৃৎপিণ্ড যেন মাথা কুটে বাইরে বেরিয়ে আসতে চাচ্ছিল। হঠাৎ এক সময় তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে প্রায় উন্মাদিনীর মত ছুটে এসে উঠেছিলেন বিবিমহলে।

—সুরেশ্বর! সুরেশ্বর! দাদু-ভাই! ওরে!

সুরেশ্বর তখন বাইরে বেরিয়েছিল। তখন থেকে তিনি এখানেই ভয়ার্ত হরিণীর মত লুকিয়ে বসে আছেন।° কাঁদছেন।

সুরেশ্বর ফিরে এসে তাঁকে কাঁদতে দেখে সবিস্ময়ে প্রশ্ন করেছিল—কি হল মেজদি? কাঁদছ কেন?

মেজদি হু-হু করে কেঁদে উঠেছিলেন, বলেছিলেন—সুরেশ্বর, আমাকে দয়া করে বৃন্দাবন পাঠিয়ে দে ভাই। নয়তো নবদ্বীপ। ওরে, যা দিস তুই তার বেশী লাগবে না। আমাকে শুধু পাঠিয়ে দে। ওরে, জগদীশ্বর সেই খুনে পাষণ্ড নেই, সে এলে আমার লাঞ্ছনার বাকি থাকবে না।

* * * *

বহু কষ্টেই কি হয়েছে তা মেজদি বলেছিলেন। সুরেশ্বরের মাথার মধ্যে যেন আগুন জ্বলে উঠেছিল। হাতের কাছে বন্দুক থাকলে বা রিভলবার থাকলে সে আজ নির্বংশ করে আসত রায়বংশকে। শেষ গুলিতে নিজে মরত।

কিছু করবার জন্য সে অধীর হয়ে উঠেছিল। ছুটে বেরিয়ে যেতে ইচ্ছে করেছিল শুধু হাতেই। ইচ্ছে হচ্ছিল ধনেশ্বরের তৃতীয় পুত্র, সেই অতিকায় দানব যেমন সুখেশ্বরের বুকে চেপে বসে গলা টিপে তাকে হত্যা করেছিল, তেমনিভাবেই সেও গিয়ে ওই ধনেশ্বরের বুকের উপর চেপে বসে গলা টিপে হত্যা করে তাকে, তার কলুষিত কণ্ঠটাকে চিরদিনের মত স্তব্ধ করে দেয়।

মেজঠাকুমা বললেন—আমাকে ঠাকুরবাড়ীতে ঢুকতে দেবে না বলেছে। আমি তিনবেলা গোবিন্দের কাছে যাই, সন্ধ্যায় গিয়ে তাঁকে প্রণাম করি, মালা গেঁথে দিয়ে আসি, ভয়ে যেতে পারিনি সুরেশ্বর। মরবার আমি সাহস পাচ্ছিনে, নইলে মরতাম রে। কিন্তু আমি গ্রামে মুখ দেখাব কি করে?

একটা অজুহাত পেয়ে সুরেশ্বর চমকে সজাগ হয়ে উঠল মুহূর্তে। সে মেজঠাকুমাকে বললে—ওঠ। এস আমার সঙ্গে।

—কোথায়?

—ঠাকুরবাড়ী। এস। দেখি। যা হবার হয়ে যাক। এস।

—না সুরেশ্বর। তুই ওদের জানিসনে। ওরে—

—ওদের আমি জানি মেজদি—তুমি আমাকে জান না। এস। দেখি কার সাহস বেশী,

তোমাকে কি বলে ?

—না-রে। ওরে আমার কলঙ্ক মাথায় করে আমি মরব, তুই ওদের—

বাধা দিয়ে সুরেশ্বর বলেছিল—তোমার কলঙ্ক তুমি সইবে, কিন্তু আমি সইব না। এস। যদি না এস, তবে—

—বেশ, তোর কাছে আর আসব না।

—না। চীৎকার করে উঠেছিল সুরেশ্বর।

এবং মেজদির হাতখানা চেপে ধরে আকর্ষণ করেছিল।—এস। ওঠ। তারপর ডেকেছিল —রঘু!

রঘু পাশের ঘরেই উৎকর্ণ হয়ে সব শুনছিল। সে এসে দাঁড়াতেই বলেছিল—রোজা, ডিকু এরা আছে ?

—রোজা আছে। ডিকু আজ সনঝা বেলাসে ছুটি নিয়েছে।

—বেশ, তুই সুদ্ধ আয়।

৪

মদে মাতাল হয় মানুষ। বিষয় নিয়ে তেমনি বিবাদ করে মানুষ। না ক'রে উপায় নেই। সুলতা, রায়বংশের সেরেস্তাখানায় দুটো ঘর আছে, মামলার নথিতে বোঝাই। রায়-বংশের একটা বিখ্যাত মামলা—রত্নেশ্বর রায় আর তাঁর বোন সর্বাণী দেবীতে। রত্নেশ্বর নাকি পোষ্যপুত্র। কিন্তু তাঁকে পোষ্য নেবার পর ওই কন্যা হয়েছিল। কন্যাকে টাকা—দু'লক্ষ টাকা—দিয়েছিলেন বীরেশ্বর রায়, সম্পত্তি দেননি। বাপের মৃত্যুর পর সর্বাণী দেবী মামলা করেন। রত্নেশ্বর হাতজোড় করে আরও টাকা—অনেক টাকা দিয়ে সে মামলা মিটিয়ে-ছিলেন। কিন্তু তাঁর ছেলেরা মামলা অনেক করেছে। আমি দূরে থেকে এর সংস্পর্শ বাঁচিয়ে ছিলাম; মেজঠাকুরদার মামলা করার কথা শুনে প্রশ্ন করতাম নিজেকে; কেন ? কেন করেন ? দু'-চারটে মামলা তিনি করতেন জেদের বশে, কুটিল উদ্ধত জোতদারদের সঙ্গে, তাতে তাস্নিফ করতাম। দু'-একটা মামলা হত অন্য জমিদারের সঙ্গে, তাতেও মন সায় দিত। বাকীর জন্য আমি নিন্দাই করতাম। যাই হোক, মোট কথা বিবাদ-কলহে রুচি আমার ছিল একথা বলে অপবাদ আমাকে কেউ দেবে না। আমি গেলাম মেজঠাকুমাকে নিয়ে। রোজা আর রঘু আমার সঙ্গে গেল, রঘু চাকরখানসামার কাজ করলেও হিন্দুস্থানী। তখন—মানে সতেরো বছর আগে ওর বয়স পঁয়তাল্লিশের বেশী ছিল না। সেও লাঠি নিয়ে লণ্ঠন নিয়ে সঙ্গে এল।

হঠাৎ একটু থেমে সুরেশ্বর বললে—সুলতা, অসাধারণ শক্তিশালী বলে অহঙ্কার আমার কোনকালে নেই। তবে রায়বংশের বংশানুক্রমে আমরা লম্বা-চওড়া কাঠামোর অধিকারী, হাড় আমাদের মোটা শক্ত। বাবা-মা যেভাবে মানুষ করেছিলেন তাতে পুষ্টির অভাবও ছিল না। সেটা ছত্রিশ সাল, আমার বয়স ছাব্বিশ। তবে সাহস আমার ছিল। জেদ আমার ছিল। ভয় কিছুকে করি নি। সেটা তুমি জান। স্টেটসম্যানে যে চিঠিটা আমি ছেপেছিলাম,

সেটা ন্যায় হোক অন্যায় হোক, অর্ধসত্য অর্ধমিথ্যা যাই হোক, আমার যেটা বিশ্বাস সেটা ছাপতে ভয় আমি পাই নি। এবং তারপর সহজ পদক্ষেপে সমাজে এসেছি। এসেই তোমাকে চিঠি লিখেছি। সুতরাং সবচেয়ে বড় বল ছিল আমার দুঃসাহস। বল ত বটে এবং সেইটেই বোধহয় ছিল ইলেকট্রিক পাওয়ারের মত একটা শক্তি, যাতে দুর্দান্ত রাগের সুইচ অন করে আমাকে একটা ক্রাশিং মেশিনের মত চালু করে দিলে। তার ফলে আমার থামবার উপায় ছিল না। দুর্দান্ত ক্রোধে সাহসে আমি চলেছিলাম। হয় ওদের পিষে দেব, নয় আমিই অক্ষম হয়ে ফিউজ হয়ে থেমে যাব। কিংবা গোটা যন্ত্রটা ভেঙে যাওয়ার মতই ভেঙে যাব।

ঠাকুরবাড়ীতে ঢুকে ডাকলাম—ঠাকুরমশায়!

ঠাকুরবাড়ীতে হেজাক বাতি জ্বলছিল মন্দিরের বারান্দায়। কালীমন্দিরে একটা, গোবিন্দ-মন্দিরে একটা। আমিই দিয়েছিলাম কিনে। মেজঠাকুমাই আদায় করেছিলেন।

গমগম করে উঠল গোটা ঠাকুরবাড়ীটা। আমি আমার কণ্ঠস্বর শুনে একটু চমকে উঠলাম। এমন করে তো কখনও কাউকে ডাকি নি! সন্দেহ হল—এ আমার কণ্ঠস্বর?

মেজঠাকুমা সভয়ে বললেন—সুরেশ্বর!

তখন আমি খুশী হয়ে উঠেছি। হ্যাঁ, এই তো রায়বংশের কণ্ঠস্বর!

বাধা কেউ দেয় নি। ধনেশ্বর ব'সে আহ্নিক করছিলেন। তাঁর দুই ছেলে দ্বিতীয় আর চতুর্থ, ভূপেশ্বর এবং রাজেশ্বর, তারা বসে ছিল ঠাকুরবাড়ীর ওপাশে কাছারীবাড়ীর বারান্দায়। কথা বলছিল সুরেশ্বরের আপন জ্যাঠতুতভাই প্রণবেশ্বরের সঙ্গে। প্রণবেশ্বর সেইদিন সকালেই এসেছে। এসেছে এই সেটেলমেণ্টে নিজের স্বত্ব লেখাতে। নিজেদের স্বত্ব সবই বিক্রী করেছে; করেছেন তার বাপ যজ্ঞেশ্বর, কিনেছিলেন সুরেশ্বরের মা। থাকবার মধ্যে আছে মুনাফা বা লাভশূন্য দেবোত্তরের সেবায়েত স্বত্ব। তার জন্যে আসে নি, এসেছে ধনেশ্বদের সঙ্গে যোগ দিতে। যা পারা যায়, যেমন ক'রে পারা যায় কিছুটা খামচে নিতে। খবরটা সুরেশ্বরকে নায়েবরাই দিয়েছিল। প্রণবেশ্বর এসে সুরেশ্বরের সঙ্গে দেখা করে নি। এবং নিজের যে বাড়ী সুরেশ্বরদের বিক্রী করেছে, যে বাড়ীতে এখন ধনেশ্বর ও সুখেশ্বরের ছেলেরা বাস করছে সেখানেও যায় নি। দেবোত্তরের সামিল কাছারীবাড়ীর একখানা ঘরে এসে উঠেছে। আগে এমন ক'খানাই ঘর ছিল যেখানে বিশিষ্ট প্রজা, পত্তনীদার, উকীল, মোক্তার এলে বাসা দেওয়া হত।

সুরেশ্বরের হাঁকে ঠাকুর বেরিয়ে এসে দাঁড়াল—আজ্ঞে!

সুরেশ্বর বললে—মেজঠাকুমা এসেছেন।

কোন দিক থেকে কোন কথা উঠল না। শুধু একটু চাঞ্চল্য ছাড়া। ধনেশ্বর একবার ফিরে দেখে ডেকে উঠলেন—কালী করুণাময়ী! আর কত সহ্য করবি মা?

ওদিকে তাঁর ছেলেরা খানিকটা ফিসফাস ক'রে চুপ হয়ে গেল। শুধু একবার উঁকি মেরে দেখেই প্রণবেশ্বর ঘরে ঢুকে গেলেন।

নির্বিবাদে কালীমন্দিরে প্রণাম ক'রে, রাজরাজেশ্বর এবং গোবিন্দমন্দিরে প্রণাম ক'রে

চরণোদক নিয়ে বেরিয়ে এলেন মেজঠাকুমা। সুরেশ্বর সেদিন বোধহয় একটা ঝোঁকের মাথায় ঠাকুমার সঙ্গে মন্দিরের ভিতরে ঢুকেছিল। সে ঘরে ঢুকে প্রণাম করে উঠে চারিদিক তাকিয়ে দেখে বিস্মিত হয়ে গিয়েছিল। ঘরের কোণে একটা বড় আয়রন-চেস্ট। আলমারী নয়—সিন্দুক। আকারে প্রকাণ্ড। সে জিজ্ঞাসা করেছিল—এখানে ওটা? আয়রন-চেস্ট?

পূজুরী জবাব দিয়েছিল—হ্যাঁ!

—কি থাকে ওতে?

—তা তো জানি না বাবু! আমি তো খোলা দেখি নি!

মেজঠাকুমা বললেন—ওতে গোবিন্দের গহনা থাকত। এখন কতকগুলো পুরনো কাগজ আছে।

—চাবি কার কাছে?

মেজঠাকুমা উত্তর দিলেন না। ঠাকুর বললে—তা তো বলতে পারব না। সিন্দুক তো খোলা হয় না কখনও। আমি দেখি নাই বাবু।

—হুঁ! গহনা আছে, না—নেই? ঠাকুরকে পরানো হয় না?

—না।

মেজঠাকুমা হেসে বললেন—গহনা নেই সুরেশ্বর।

—নেই?

মেজঠাকুমা বললেন—এখন ওসব কথা থাক সুরেশ্বর। পরে যা হয় করবে। রাত্রি হয়েছে, গোবিন্দের শয়নের সময় হয়েছে, চল।

সুরেশ্বর বললে—চল।

তার মনটা খুশী হয়ে উঠেছে। সে আঁচ একটা পেয়েছে। একটা নিষ্ঠুর কলহের সূত্র পেয়েছে সে!

বেরিয়ে এসে সে ডাকলে—নায়েববাবু!

বৃদ্ধ নায়েব বেরিয়ে এল—আজ্ঞে!

—খুব জরুরী দরকার আছে আমার। একবার আসুন আমার ওখানে।

—কাল। কাল আসতে বল্ ভাই। আজ নয়। আজ মেজাজ তোর ভাল নেই। আমার কথা শোন।

সুরেশ্বর একটু চুপ করে ভাবলে। ইতিমধ্যে মেজঠাকুমা মৃদুস্বরে বললেন—আমার কথা-গুলো শুনে নে ভাই আগে।

সুরেশ্বর বললে—থাক। কাল সকালেই আসবেন।

তার নিজের নায়েবকেও ডেকে বললে—কাল সকালে আপনি ওঁকে তাগিদ দিয়ে নিয়ে আসবেন।

আজ সুরেশ্বরের কণ্ঠস্বরে ভঙ্গিমায় অলঙ্ঘনীয় একটি প্রভুত্বের ভার এবং ধার দুইই ছিল।

এতক্ষণে প্রণবেশ্বর বেরিয়ে এসে বললে—কেমন আছ?

—ভাল। আপনি কখন এলেন?

হেসে প্রণবেশ্বর বললে—এই সকালে।

—এখানে উঠেছেন ?

—হ্যাঁ। নইলে আর উঠব কোথায় ! বাবা তো সবই বেচে—।

—বেচলেও তো সেটা বাইরে যায় নি ! ঘর তো ঘরেই আছে।

—তা আছে। কিন্তু বিষয়-ব্যাপার নিয়ে ঘরে-ঘরেই তো বিবাদ আগে লাগে।

হেসে সুরেশ্বর বললে—তা লাগে !

—সুতরাং—

—বুঝেছি বড়দা। থাক।

—কাল একবার যাব তোমার কাছে।

—আসবেন।

বেরিয়ে এসে পথে প্রথমেই মেজঠাকুমা বললেন—তুই ভাই ঘোষাল ম্যানেজারকে আনা। এরা কুরুক্ষেত্র বাধাতে জোট বেঁধেছে !

সুরেশ্বর বলেছিল—তাঁর যে স্ট্রোক হয়ে প্যারালিসিস হয়েছে ঠাকুমা ! সেরেছেন তবে আসা যে অসম্ভব। তা ছাড়া স্মৃতিও ভ্রংশ হয়েছে।

—তা হলে !

—ভেবো না তুমি ঠাকুমা। এ যদি সব চলেও যায় তবু আমি ফকীর হব না। আর তাই বা হব কেন ? মিথ্যের জাল, ও টিকবে না। লড়ব, দরকার হলে হাইকোর্ট পর্যন্ত লড়ব।

তারপর নীরবে পথ হেঁটেছিলেন দুজনে। হঠাৎ নীরবতা ভঙ্গ করে মেজঠাকুমা বলেছিলেন —ঠাকুরের গহনা তোর মেজঠাকুরদা সব বিক্রী করেছেন সুরেশ্বর।

চুপ ক'রে রইল সুরেশ্বর।

—সিন্দুকের চাবি তাঁর কাছেই ছিল। তিনি তো বিষয়বুদ্ধিতে পাকা ছিলেন। তিনি গহনা গালিয়ে, সোনার পরিমাণ কম ক'রে লিখে জমা করে, নিজের বিষয় কিছু—তাও বাজে বিষয়—দেবোত্তরে কেনা হল বলে খরচ লিখেছিলেন। ধরবার তো কেউ ছিল না !

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে সুরেশ্বর। কি বলবে ? এঁর মেজঠাকুমার স্বামী ছিলেন তিনি। তাঁর প্রতি এঁর ভালবাসার কথা সে জানে। আশ্চর্য লাগে। সমস্ত দোষত্রুটি সব অকপটেই বলেন—তবু তাঁর প্রতি এই মেয়েটির ভালবাসা তো কম নয় ! কি দিয়ে গেছেন তিনি ? কিছু না। বলতে গেলে—পথেই দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। তবুও—। আশ্চর্য লাগে সুরেশ্বরের।

মেজঠাকুমা আবার বললেন—কি যে সে খুদ্ধি কি বলব তোকে ! তাঁর বাপ—আমার শ্বশুর —রায় বাহাদুরের আমলে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা। রাজরাজেশ্বর প্রথম থেকেই আছেন। সে আমার বড় শ্বশুরের, ফোমেশ্বর রায়, তোদের যিনি জমিদার প্রথম পুরুষ তাঁর আমলের। মা-কালী প্রতিষ্ঠার অনেক ক' বছর পরের কথা। এক সন্ন্যাসীর কাছে পেয়েছিলেন। তোর মেজ-ঠাকুরদা যখন গহনা বিক্রী করেন, তখন এই দুই আমলের যেসব জমাখরচের খাতায় এই গহনা তৈরীর খরচ আছে তা বেছে বের ক'রে এনে নিজের কাছে রেখেছিলেন। ছেলেদেরও বলেন

নি। তারা গহনা বিক্রীর কথা জানে—খাতার কথা জানে না। গহনা কম ছিল না ভাই। শুধু গহনা নয় অনেক আসবাব—সোনার ফুরসী পর্যন্ত।

সুরেশ্বর ব্যগ্র উত্তেজিত কণ্ঠে বললে—সে সব খাতা তো নষ্ট করে দিয়ে গেছেন তিনি?

হেসে মেজঠাকুমা বললেন—না। তা করেন নি। বলতে আজ লজ্জা পাচ্ছি ভাই, আমি বলেছিলাম—দেখ, করলেই যদি চুরির পাপ, তবে আর ওগুলো রাখছ কেন? কিন্তু তিনি বলেছিলেন—উহুঁ। কোন মকদ্দমায় কখন লাগে! দুই আমলের খাতাতেই অনেক সম্পত্তি কেনার জমাখরচ আছে। অনেক নমুদ আছে। ও থাক। যখন আমার সব যাবে তখন পুড়িয়ে দেব। সেগুলোকে একটা ভাঙা সিন্দুকে কতকগুলো বাজে কাগজের গাদায় লুকিয়ে রেখেছিলেন।

—সেগুলো আছে ঠাকুমা?

—আছে। সেগুলো তুই নিয়ে যা ভাই। আজ তো আর আমার কোন লজ্জাই রইল না। এই যে তোর সঙ্গে ওরা বিষয়ে নানান প্যাঁচ ক'ষে তোকে সম্পত্তি বিক্রী করেও বঞ্চিত করতে চাচ্ছে, এর জন্যে আগেই বের করে দেওয়া উচিত ছিল। ওতে অনেক নজীর পাবি। পূজুরী বামুনের মেয়ে—বুড়ো জমিদারের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল—শিখেছি অনেক, জানি অনেক। দেওয়া উচিত ছিল, তুই আমার ছেলের অধিক, সহোদরের অধিক। তুই খেতে দিস তাই খেতে পাই। তোকে আমিই আনতে গিয়েছিলাম সেটেলমেণ্টের জন্যে। তবু পারি নি দিতে বা বলতে। আজ লজ্জা ঘুচে গিয়েছে—

বলে হেসে উঠলেন, বোধ করি সেদিন সেই প্রথম হাসলেন, বললেন—নাতি, তুই শেষে ল্যাভেণ্ডার সাবান দিয়ে আমার লজ্জাটজ্জা সব ধুয়েমুছে শেষ ক'রে দিলি! সিন্দুকের চাবিও আমার কাছে আছে, সেও তুই নিয়ে যা। ওরে, সব আজ রাত্রেই নিয়ে যা।

সে অনেক কাগজ অনেক খাতা। মোটা মোটা রোকড় খাতা খেরোতে বাঁধানো—শক্ত সুতো পাকানো দড়িতে বাঁধা, প্রায় এক একটার ওজন আড়াই সের, সংখ্যায় পঁচিশ খানা। ওজনে দেড় মণের উপর। আর কাগজ, সে স্তূপীকৃত। তার মধ্যে তারের ফাইলে গাঁথা চিঠি। সে ফাইলও অনেক। আরও কতকগুলো ছোট ছোট দপ্তর। তার সঙ্গে বের করে দিয়েছিলেন একটা সুন্দর বাক্স। এক বারে নিয়ে যাওয়া সম্ভবপর হয়নি রোজা এবং রঘুর পক্ষে। দুবারে নিয়ে যেতে হল। বিবিমহল মূল বাড়ী থেকে কম রাস্তা নয়। বেশ খানিকটা। সবশেষে মেজঠাকুমা দুটো চাবি দিয়েছিলেন। ওই লোহার সিন্দুকটার দুটো চাবি। মেজকর্তার মৃত্যুর পর ও দুটোরও কেউ খোঁজ করেনি। কারণ ওটার গজভুক্ত কপিত্থের মত অবস্থার কথা মেজ-তরফের কারুর কাছেই অজ্ঞাত ছিল না। মেজকর্তা যতই তৈরী করা হিসেবের আড়াল দিয়ে থাকুন, আসল সত্যটা চাপা থাকবার কথা নয় কোন লোকের কাছেই। ধনেশ্বর প্রভৃতির মনে মনে সেই বোধটা ছিল। চাবি যার কাছে থাকবে সেই দায়ে পড়তে পারে এই কারণেই কেউ চাবির খোঁজ করে নি। চাবি দুটোর একটা বলতে গেলে অতিকায় ইঞ্চি পাঁচ ছয় লম্বা, তেমনি মোটা; ওজনে হয়তো পোয়া খানেক। আর একটা সেকালের কামারের তৈরী গা-তালার চাবি, সেটাও বেশ বড়।

মেজঠাকুমা দিয়ে বললেন—আমার পুরনো কর্তা সিন্দুকটা ফাঁক করে গেছেন, নতুন কর্তাকে দিচ্ছি, তুই ওটাকে ভ'রে দিস ভাই।

চাবি দুটো এবং ওই বাক্সটা সুরেশ্বর নিজে নিয়ে এসেছিল। বাক্সটা থেকে চন্দনের গন্ধ উঠেছিল।

প্রথমেই সুরেশ্বর খুলেছিল ওই বাক্সটা। হাতীর দাঁতের কাজকরা চন্দন কাঠের বাক্স। তারই মধ্যে ছিল প্রাচীনকালের পুঁথির আকারের একখানি খাতা। প্রাচীনকালের কাগজ। চন্দনের গন্ধ উঠছিল। পাতাগুলোর কোণ দুমড়ে গেছে। সন্তর্পণে সেখানা বের করেছিল সুরেশ্বর, ভেবেছিল কোন পুরনো দলিল জাতীয় কিছু হবে। কিন্তু উপরের মোড়ক কাগজখানা খুলে তার আর বিস্ময়ের অবধি ছিল না। খাতা বা পুঁথিখানার উপরে সেকালের শর বা লটের কলমে কষের কালিতে লেখা—

ওঁ কালী চরণ ভরসা।

কালিকা মঙ্গল—তথা, পাঁচালী রায়বংশস্য, রচিতং কুড়ারামেণ রায়বংশস্য স্থাপয়িতা। বসতি কীর্তিহাট গ্রাম—পরগণা ময়না অন্তর্গত। সরকার—গোয়ানপাড়াভুক্ত ; জেলায়াৎ মেদিনীপুরে। রাজত্ব কোম্পানী বাহাদুরস্য, বর্গী নবাব নিসূদন। শকাব্দ ১৭২৮। বঙ্গ-সাল ১২১৩। আংরেজী ১৮০৭।

কবি কালিদাস যদি বিক্রমাদিত্যের অনুগ্রহে রাজ্যখণ্ড পেয়ে রাজা কালিদাস হতেন, তাতে বিস্ময়ের কিছু থাকত না, বর্ধমানের রাজার সেরেস্তায় রামপ্রসাদ সেন রোকড়ের খাতায় হিসেবের বদলে শ্যামা-সঙ্গীত লিখে ধরা পড়ে রাজার কৃপায় ব্রহ্মত্র পেয়ে সাধক হয়েছিলেন এমন নজীর অনেক আছে, কিন্তু বিক্রমাদিত্য কালিদাসের মত হতে কোনদিন চাননি—চাইলে হতে পারতেন না। বর্ধমানের রাজাও রামপ্রসাদ হতে পারতেন না। সেই নজীরে সুরেশ্বরের কাছে কুড়ারামের এই পাঁচালী রচনার নিদর্শন এক মহাবিস্ময়ের সঞ্চার করেছিল। তাঁর একসঙ্গে জমিদার আর পাঁচালীকার হওয়া তার কাছে আশ্চর্য মনে হয়েছিল। সারারাত জেগে সে সেদিন এই পাঁচালী পড়েছিল।

* * * *

সুরেশ্বর বললে—সুলতা, আমার ভাল লেগেছিল। আশ্চর্য লেগেছিল। শুধু রচনা নয়, কাহিনী এবং এই লোকটিকে আমার আশ্চর্য ভাল লেগেছিল। যদি বল নিজের বংশের আদি-পুরুষ বলে ভাল লেগেছে, তাও অস্বীকার করব না। যদি বল আমার মধ্যে সেদিন জমিদার জেগেছিল বলে ভাল লেগেছে, আমি রি-অ্যাকশনারী, তাতেও তকরার করব না। কোন ভান নেই, কোন ধর্মের বা ইজমের দোহাই নেই—আশ্চর্য অকপট মানুষ।

শেষের লাইনগুলো পড়েছ? মন দিয়ে পড়েছ কিনা জানিনে, আমি বলছি, তুমি আবার শোন—

পাপপুণ্য নাহি জানি, যাহা করিয়াছি আমি
সবার মালিক তুমি, জয় কালী-করালী।

ছিলাম দরিদ্র সুত ন ভবিষ্য নাহি ভূত
বর্তমানে দুঃখ কত তুই মা দেওয়ালি।
সেই দুঃখ পার করিলি, তুই সেই শক্তি দিলি
শেষে জমিদারী দিলি, মোর ঘরে এলি।
ছত্রি জমিদারের টাকা চুয়াড়েরা ডাকাবুকা
লুঠে দিল গাত্র ঢাকা, সে তুই লুঠালি।
থাক মা অচলা হয়ে, বিপদ আপদ জয়ে
সোমেশ্বরে ভাগ্য দিয়ে, দিয়ে বংশাবলী।
দিয়ো মাগো অতঃপর লক্ষ্মী-সরস্বতী বর
রায়কুল বংশধর ভরিয়া অঞ্জলি।
কোম্পানীকে দিয়ো জয় তাদের অনুগ্রহ যেন রয়
রায়বংশ হয়ে অক্ষয় মা তোর কৃপায়।
তোমাতে দেবত্র করি, বিষয় আদি জমিদারী
আমি মা ভাসাই তরী, রাখো রাঙা পায়।

আবৃত্তি শেষ ক'রে সুরেশ্বর বললে—সুলতা, মায়ের যদি চরণ থাকে আর যদি রাঙা টুকটুকেই হয় তবে তা কুড়ারাম পেয়েছিলেন। আর মা না থাকলে কথাই নেই, চরণ নেই, কুড়ারাম চোখ বুজে ফুরিয়ে গেছেন, তিনি মা-হারানো ছেলের মত খুঁজেও বেড়াচ্ছেন না। তবে আজ যদি কুড়ারাম জন্মাতেন, তবে একজন দুর্ধর্ষ রাজনৈতিক কর্মী এবং নেতা হতেন তাতে সন্দেহ নেই।

সুলতা হাসলে। হেসে বললে—অ্যাসেমব্লীতে সুবোধ বাঁড়ুজ্জের এবং আর সবদের গালাগালি তোমাকে আঘাত দিয়েছে, তুমি ভুলতে পারছ না।

—না। সে গালাগালির জন্যে দুঃখ নেই—মনে কোন ক্ষতও নেই। আমি বলছি সুলতা, এত ক'রে এমন ক'রে বলছি এই জন্যে যে, আমি যেন তাঁকে অবিচার না করি।

—না। সে অবিচার তুমি করনি। আমিও করছি না। আমি অ্যাসেমব্লীর মেম্বর হলে হয়তো এমনি গালাগালিই করতাম। আর তার জন্যে দোষও তুমি দিতে পারতে না। কারণ আজ এইটেই মানুষের বিশ্বাস। পারমানেণ্ট সেটেলমেণ্টের সময় লোকে কর্নওয়ালিশকে আশীর্বাদ করেছিল। আমি কালই চণ্ডীচরণের দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিং পড়ছিলাম। সে কথা থাক। ও নিয়ে মীমাংসার জন্যে আমি বসে নেই সুরেশ্বর। আজ আমি যার জন্যে এই রাত্রেও তোমার এখানে রয়ে গেলাম, বসে রয়েছি, সেই কথা বল। তোমার পূর্বপুরুষ আমার পূর্বপুরুষকে খুন করেছিলেন বা করিয়েছিলেন, যার জন্যে তুমি আর ফিরে এলে না কীর্তিহাট থেকে। আমার সঙ্গে জীবনে পাক বাঁধবার জন্যে আঁচলের যে খুঁটটা ধরে ছিলে সেটা ছেড়ে দিয়ে লিখলে—এ গ্রন্থি বাঁধা চলে না। ওখানে বিধাতা ছুরি উদ্যত করে রেখেছেন, বাঁধতে গেলে কেটে খানখান হয়ে যাবে। আমি সেই কথাটা শুনতে চাই। তুমি তাই বল। কীর্তিহাটের কড়চা তুমি দশজনকে ডেকে দেখিয়ো। তার থেকে তোমার জবানবন্দীতে

আমার গরজ বেশী।

সুরেশ্বর বললে—একটার সঙ্গে আর একটা এমন ভাবে বাঁধা সুলতা, যে বিধাতার ছুরিও তাকে কেটে আলাদা করতে পারবে না।

—কুড়ারামের পাঁচালীতে রায়বংশের খামখেয়ালী প্রকৃতি, ক্ষেত্রবিশেষে উন্মত্ত আচরণের একটা বীজ আছে। হেরিডিটি সায়েন্সে আছে, লুন্যাসি আর প্রতিভা, যদি তাকে পাপপ্রবৃত্তি পুণ্যপ্রবৃত্তি বলি, তবে তর্ক করো না। মেনে নাও, ও দুটো বংশে নানা মিশ্রণের মধ্যে একসময় ঢুকে বসলে সে থেকেই যায় এবং তার খেলা আর থামে না, চলে। এই খেয়ালীপনা পাগলামির বীজ রায়বংশে ঢুকিয়েছিলেন কুড়ারাম রায়। তুমি তার পাঁচালীটা পড়ে এলে। কিন্তু সন্ধানটা ধরতে পারনি।

সুলতা সবিস্ময়ে বললে—কোনটা বল তো? কুড়ারাম ভট্টাচার্যের পাগলামী বীজ? তিনি ভাল না মন্দ সে বিচার না করে একটা কথায় নিশ্চয় তুমি বিস্মিত হবে না যে, তিনি দুই আর দুইয়ে চারের ছিলেন। মনুষ্য বলব না, ও শব্দটি ব্যঙ্গ করে ব্যবহার করি আমরা। পাগলামির একবিন্দু অপবাদ তাঁকে দিয়ে রেহাইয়ের কোন অজুহাত কেউ তৈরী করতে পারবে না। তা তাঁর ছিল না।

—কিন্তু আমার মধ্যে আছে। আমার বাবার মধ্যে ছিল। বাবার দুর্দান্ত খেয়ালীপনা বা যা তিনি করেছিলেন—যথেষ্ট শিক্ষা সত্ত্বেও—সেটা যে পাগলামির সামিল তা তুমি অস্বীকার করতে পারবে না।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সুলতা বললে—না, তা করব না। কারণ, যারা তোমার আমার কথা জানত, তারা তুমি ডুব মারলে এই কথাই বলেছে। বলেছে ওই বাপেরই ছেলে তো! তবে আমি বলি, তা ঠিক নয়। ওটা তাঁরও এসেছিল, তোমারও এসেছে—অনেক টাকা থেকে। অনেক টাকা থাকলেই মানুষ মদ খেয়ে ব্যভিচার করে। সেটা অভ্যাসে দাঁড়ায়। ও থেকে দেহে মনে দুদিক থেকেই বিষ ঢোকে।

সুরেশ্বর বললে—অস্বীকার অবশ্যই করব না। সে বললে—সবার মধ্যেই ও বীজ আছে। কারণ আদিম কালে ওইটেই ছিল জীবন-ধর্ম, জীব-ধর্ম তো বটেই। কিন্তু তার থেকেও প্রত্যক্ষ কারণ রয়েছে, সেই কথা বলছি। কুড়ারাম ভট্টাচার্যের পাঁচালীতে আছে তিনি সোমেশ্বরের বিয়ে দিয়েছিলেন—

সুলতা বললে—হ্যাঁ, বিয়ে দিয়েছিলেন—তার তারকেশ্বরে যে মেয়েটির সঙ্গে ভালবাসা হয়েছিল তার মেয়ের সঙ্গে। ওটা একটা অতৃপ্ত ভালবাসার তৃপ্তিসাধনের একটা সস্তা পথ বটে।

সুরেশ্বর বললে—সস্তা বা সুগম পথ ছেড়ে বাঁকা পথ বা সূক্ষ্ম পথ ধরবার লোক তো ছিলেন না কুড়ারাম। ভালোবেসে ভালোবাসার জনকে, তুমি চন্দ্রলোকে থাকবে আমি পৃথিবীতে বা শুক্রগ্রহে থেকে ভালোবেসে যাব অনন্তকাল, এ ধাঁচের মানুষই তিনি ছিলেন না। যাক গে। মানুষ কথাটা এখানে আমিই ব্যবহার করলাম। সে কথা থাক। মোটকথা শোন। এই মেয়েটির বিয়ে হয়েছিল এক মুসলমান আমলের জমিদারের ছেলের

সঙ্গে। কুড়ারাম সুপুরুষ ছিলেন, কিন্তু সে ছিল বামুনে সুপুরুষ। এ একেবারে রাজোয়াড়ী সুপুরুষ। বর্ণনায় রাত্রি কাটাব না, ওটা কল্পনা করে নাও। তাঁর ছবি এখন মনে হচ্ছে আমার আঁকা উচিত ছিল: কিন্তু আঁকিনি। বাড়ী বাঁকুড়া এবং হুগলীর বর্ডারে। সেই বাড়ীতে কুড়ারাম রায় হঠাৎ গিয়ে পড়লেন বা উঠলেন একান্ত আকস্মিকভাবে। ইচ্ছে করে নয়। তিনি যাচ্ছিলেন কোম্পানীর কাজে বাঁকড়ো জেলা। পথে হঠাৎ এল জল ঝড় দুর্যোগ। পাইক সওয়ার বেহারারা প্রথম একখানা গাঁয়ের ধারে গাছতলায় আশ্রয় নিয়েছিল। কুড়ারাম ছিলেন পাল্কিতে। জল ঝড়ে গাছতলা মন্দের ভাল, কিন্তু তার সঙ্গে দু-একটা বজ্রপাত হলে গাছতলা সাপের গর্ত কি বাঘের দেখার সমান বিপজ্জনক হয়ে ওঠে।

পাঁচালীতে আছে—

শিয়রেতে সর্পরন্ধ্র অরণ্যে ব্যাঘ্রের গন্ধ
এ থেকেও আরও মন্দ বজ্রপাতে বৃক্ষ।
সুতরাং উঠায়ে পাল্কী
হাঁকায়ে চলিনু জলদি
সওয়ার বেহারা লগ্দী গ্রাম গৃহ লক্ষ্য।

গ্রাম সামনেই ছিল, এবং বড় একখানা শ্যাওলা-ধরা পাকাবাড়ীর মাথাও দেখা যাচ্ছিল। সেই গ্রামে ঢুকে আশ্রয় নিয়েছিলেন। সওয়ার-বরকন্দাজদের তগ্‌মা দেখে গৃহস্বামী ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। কোম্পানীর কানুনগো, খোদ দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের ডানহাত কুড়ারাম ভটচাজের নাম শুনে গৃহস্বামী ত্রস্ত হয়ে উঠেছিলেন। কুড়ারামও গৃহস্বামীকে দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। ওই রাজোয়াড়ী চেহারা। সর্বাঙ্গে দুঃখ দৈন্যের ক্লেশের ছাপ, কিন্তু মাথাটা উঁচু সোজা। মিষ্ট কথা। কিন্তু লোকটি বোকা-বোকা।

বলেছিলেন—তাই তো ভাঙা ঘর। ছাদ ভেঙেছে। খড়ের চাল করেছি, তাতেও জল পড়ে, এখানে আপনাকে কি করে কোথায় বসাই! কি খাওয়াই! আমি তো বলতে গেলে সর্বস্বান্ত!

বাড়ীর ভিতর থেকে হুকুম এসেছিল, উনি বাড়ীর ভেতর দোতলায় থাকবেন। হুকুম এনেছিল একটি আশ্চর্য রূপসী সাত বছরের মেয়ে। পরনে ফিরানী। যা নাকি চাষা-ভুষাদের মেয়েরা পরে। কুড়ারাম বলেছিল—বাঃ বাঃ বাঃ, এ তো অপরূপ মেয়ে!

বাপ বোকার মত হে-হে করে হেসেছিলেন। বাপকে মেয়ে বলেছিল—মা তুমাকে ডাকছে বাবা। বললে ধরে নিয়ে আসবি! এস!

তখনও কুড়ারামের মনে হয়নি এই মেয়ের সঙ্গে সোমেশ্বরের বিবাহ দেবার। তিনি চারিদিক তাকিয়ে দেখছিলেন। বৈঠকখানার ছাদ নেই। ধসে পড়েছে। খড়ের চাল তুলেছে। সামনে পাঁচিল ভেঙে পড়েছে। এদিকে বড় পুকুরটার বাঁধা ঘাট, তারও দু পাশের রানা দুটো কাত হয়ে পড়েছে। এসবের ইতিবৃত্ত কুড়ারামের অজানা নয়। বাংলাদেশের জমিদারদের বাড়ীর নাড়ীর খবর তাঁর নখ-দর্পণে। এ সব বাড়াকে তিনি ভয়

করেন। ভাঙা বড় বাড়া আর পূর্ববঙ্গের কীর্তিনাশা রাক্ষসী নদী, ও দুইয়ে কোন তফাৎ নেই। বরং কীর্তিনাশার চেয়েও ভাঙা বাড়ী ভয়ঙ্কর। কীর্তিনাশা একূল ভাঙলে ওকূল গড়ে। বড় বাড়ী যখন ভেঙে পড়ে তখন সব চেপে পিষে মাটিতে মিশিয়ে দেয়। ধুলো হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

রাজহাটের রায়বাড়ী, মুসলমান আমলের রাজা উপাধিধারী। নিজেরাই রাজা উপাধি নিত। বড়রাজা মেজরাজা সেজরাজা। রাজা অনেক। অনেকেই দেশ ত্যাগ করেছে। অনেক মরেছে। যেমন পলুপোকার মধ্যে রোগ হলে ঝাঁকে ঝাঁকে মরে। তাদের সম্পত্তি দু-চার বিঘে বা দশ বিঘে জমি দৌহিত্র বংশে গেছে। এখন এই পুরনো বাড়ীতে আছে এই একা মানুষটি আর তার স্ত্রী এবং এই একটি মাত্র কন্যা। লোকে বলে পাগল। পাগলামি রাজাগিরি। পাগলামি নিশ্চয়, নইলে সামান্য হাজার কয়েক টাকা আয় নিয়ে কোম্পানীর প্রথম আমলে মেদিনীপুর বাকুড়া ঝাড়গ্রাম বিষ্টুপুর প্রভৃতির রাজারা যখন কোম্পানীর সঙ্গে রাজস্বের নতুন চুক্তি করতে অস্বীকার করলে, তখন তাদের দেখাদেখি শিবনারায়ণ দেবরায় সেও বললে—খাজনা দেব না। কোম্পানী কে খাজনা বাড়াবার? ফলে মেদিনীপুর থেকে ফার্গুসন সাহেব একজন সাজেণ্টের অধীনে ষোলজন বন্দুকধারী সিপাহী পাঠিয়ে দিলেন। রাজার চাকরানভোগী পাইক ছিল জন চল্লিশেক। তারা বন্দুকের শব্দ শুনে পালাল। রাজা ঘরে গিয়ে খিল বন্ধ করলেন। কোম্পানীর সিপাহীরা বন্দুকের গুলিতে দরজা ঝাঁঝরা করে দিলে। তখন জানালা দিয়ে বেরিয়ে এল সাদা কাপড়ের ফালি আর একখানা গয়না-পরা আশ্চর্য সুন্দর হাত। রাজাকে নিয়ে রাণী বেরিয়ে এসে সাজেণ্টের কাছে হার মেনে চুক্তি সই করলে। লোকে বলে সেটা রাজার জন্যে নয়, সেটা সেই আশ্চয সুন্দর হাতের অধিকারিণী রাণীর জন্য। কোম্পানীকে খেশারত দেবার জন্য রাণীই দিলেন তাঁর অলঙ্কার খুলে। তখন সব রক্ষা হল বটে, কিন্তু বছর কয়েকের মধ্যেই সূর্যাস্ত নীলাম আইনে সব জমিদারীই চলে গেল। রয়েছে এখন এই গ্রামখানি। তাও আজ যায় কাল যায়। রাজাকে বার-দুই ধরেও নিয়ে গিয়েছিল হুগলীর কালেক্টরীর পেয়াদা এসে। এসব বিবরণ সব জানতেন কুড়ারাম ভটচাজ। কিন্তু এই বাড়ীতে সেই তারকেশ্বরের হৃদয়হারিণীর বিয়ে হয়েছে এ কথাটা তিনি ঠিক স্মরণ করতে পারেন নি। তাই বাড়ীর ভিতর যখন তাকে আহ্বান করে নিয়ে গেলেন রাজা, তখন অন্দরের প্রবেশপথে তাকেই দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে স্তম্ভিতের মত দাঁড়িয়ে গেলেন।

রাণী নমস্কার করে বললেন—আসুন। আজ আমাদের বাড়ী ধন্য হল। রাজকর্মচারী অনেক আসে, কিন্তু ব্রাহ্মণ কর্মচারী তো আসে না। তা ছাড়া আপনার হাত তো শুধু কলমে ধন্য নয়। বাবা তারকেশ্বরের পূজায় ধন্য, মা হংসেশ্বরীর পূজায় ধন্য। আসুন। আসুন।

রাজা হে-হে করে হেসেছিলেন।

রাত্রিতে তাঁর খাওয়ার সামনে পাখা হাতে বসে রাণী খাওয়াচ্ছিলেন তাঁকে। রাজা

তখন আফিঙের মৌজে নিজের ঘরে বসে তামাক খাচ্ছেন।

রাণী বলেছিলেন—অদৃষ্টই সব থেকে বলবান, নয় কানুনগো সাহেব?

কুড়ারাম বলেছিলেন—দৃষ্ট হলে সেদিন তার সঙ্গে লড়তাম। আজও যদি পাই সেই মরে নয় আমি মরি!

রাণী একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলেছিলেন—তারপর বিয়ে-টিয়ে হয়েছে? ছেলে-পিলে কি? নাতিপুতি?

কুড়ারাম বলেছিলেন—বিয়ে অনেক কালই করিনি। তবে ললিতা বলে একটি মেয়ে সেবাটেবা করত।

ফিক করে হেসে ফেললেন রাণী। বললেন—ও তো পুরুষের ভূষণ। তারপর?

—সে মারা যাবার পর বিয়ে করেছিলাম কালীঘাটে। সে একটি সন্তান হবার পরই মারা গেল। বিবাহ করিনি। করবও না।

—কটি সেবাদাসী? হঠাৎ থেমে গিয়ে বললেন—থাক গে। নিজের গরজ গজিয়ে উঠেছে কথা শুনে। ছেলেটি কত বড় হল?

—দশ বছরের।

পাখাখানি নামিয়ে রেখে রাণী বলেছিলেন—তাহলে অদৃষ্টের মুখে একটু চুনকালি দিয়ে দাও না। তুমি তো পুরুষসিংহ।

একদৃষ্টে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন কুড়ারাম।

হেসে রাণী বলেছিলেন—আমাদের যা হবার তা তো হয়েছে। আমার ওই একটি মেয়ে। সাতটা ছেলে-মেয়ে আঁতুড়ে মরেছে তা ছাড়া। তা আমার মেয়ের সঙ্গে তোমার ছেলের বিয়ে দিয়ে আমাদের বিয়ে না হতে দেওয়ার ঠাট্টার শোধটা নাও না অদৃষ্টের উপর। তোমার তো আজ টাকার অভাব নেই। আমার মেয়েকে দেখেছো। আমার থেকেও সুন্দরী হবে!

পাঁচালীতে আছে—

রাণী মোরে কয় হেসে বেহান হইব শেষে
মধু সাথে অন্ন মিশে মিষ্ট হবে আরও
সাথে তার চোখে পানি কাতরে কহিল রাণী
কন্যাদায়ে দিবাযামী নিদ্রা নাহি মোরও॥

কুড়ারাম বলেছিলেন—কেঁদো না তুমি। নিলাম, তোমার কন্যা আমি নিলাম। তোমার কন্যা আমার পুত্রবধূ হল। তোমার মেয়ে রাজবংশের মেয়ে, ওই রক্তে আমার বংশও ধন্য হবে!

মানুষ ভাবে না স্থূলতা—মানুষের শুদ্ধ রক্ত আর রাজবংশের রক্ত এক নয়! ওইখানে মিশল!

তারপর ভট্টাচার্য উপাধি রায় উপাধির তলায় চাপা দিয়ে জমিদারী কিনে কুড়ারাম ছেলের

বিবাহ দিয়ে ঘরে আনলেন সর্বস্বান্ত রাজার রাজকন্যা। তার সঙ্গে রাজরক্ত। ভট্টাচার্য রায় হল।

তার কারণ আছে স্থূলতা। রাণী তাঁর কন্যাকে কুড়ারামের পুত্রের হাতে দিতে চাইলেও মেয়ের বাপ মুঘল আমলের রাজা খেতাবধারী নিঃস্বপ্রায় ব্যক্তিটি কানুনগো চাকুরীজীবী এবং ভট্টাচার্য উপাধিধারী বাপের ছেলের সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিতে.চান নি। তিনি কোম্পানীর সঙ্গে যুদ্ধ করে হেরেছেন। তার গোলামি করেন নি।

লোকটির মস্তিষ্ক ছিল না কিন্তু আশ্চর্য একটি সহনশীল জেদ ছিল। তাঁর কাছে কুড়ারাম যখন প্রস্তাব করলেন এই বিবাহের, তখন তিনি ঘাড় নেড়ে একটু হেসেই বললেন—তা কি করে হবে? আমাদের রাজবংশ! আমাদের মেয়ে ভট্টাচার্যবাড়ীতেও যায় না। ও জোতদার কি কানুনগোর ঘরেও যায় না।

হেসে সবিনয়ে বলেছিলেন—আমরা ধরুন নদীর মাছ, পুকুরের জল আমাদের সইবে ক্যানো গো মশায়! ও হয় না!

স্ত্রী অন্তরালে ছিলেন। বেরিয়ে এসে এবার বলেছিলেন—পাগলামি করো না।

—পাগলামি কি হল?

—হল না? রাজা। রাজার ঐশ্বর্য তো ষোল আনা। বাড়ী ভেঙে হাঁ করে আছে, ভেঙে পড়ে কোন দিন চাপা দেবে। রাজার থাকবার মধ্যে তো বাড়ী পুকুর ব্রহ্মত্র, রাণী কাঁখে কলসী করে জল আনে। ঘাটে চান করে। রাজা নিজে হাতে সেজে তামাক খায়। বাকী খাজনার দায়ে কোম্পানী মধ্যে মধ্যে নিয়ে গিয়ে জেলে ভরে রাখে—

চোখ লাল হয়ে উঠেছিল কন্যার পিতার। এবার তিনি ভাঙা পাঁচিল দিয়ে গাছপালা শূন্য বাগানটায় ঢোকা একটা গরুকে তাড়া দিয়ে প্রায় একটা ব্যাঘ্রগর্জন করে উঠেছিলেন।

কুড়ারামেরও মুখ চোখ লাল হয়ে উঠেছিল।

রাজার গৃহিণী রাণী সারদা দেবী থমথমে মুখে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনিও প্রাচীন জমিদার ঘরের মেয়ে। তাঁর বিয়েও ঠিক এই কারণেই তাঁর বাবা কুড়ারামের সঙ্গে দেন নি। সে ক্ষোভ তাঁর অন্তরেও ছিল, প্রবলভাবেই ছিল। এবং তিনি এই অক্ষম অপদার্থ শিমুল ফুলের মত মানুষটার হাতে পড়ে যে দুঃখ জীবনে পেয়েছেন তা তাঁর জীবনে তুষানলের মতই জ্বলছে অহরহ। তাঁর বাপ বিবাহে তাঁকে অলঙ্কারে অর্থে কম কিছু দেন নি। কিন্তু সেসব গিয়েছে। গিয়েছে এই মূর্খ জেদসর্বস্ব ব্যক্তিটির জন্য।

তিনি কঠিন কণ্ঠে বলেছিলেন, মেয়েকে ভাসিয়ে দিতে আমি দেব না।

রাজা গ্রাহ্য করেন নি, পাগলের মতই নেমে গিয়েছিলেন এবং গরুটাকে একটা লাঠি দিয়ে পিটতে আরম্ভ করেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার।

কুড়ারাম রাণীর দিকে ফিরে বলেছিলেন—ঠিক আছে সারদা, হবে। সে ব্যবস্থা আমি করব। তুমি নিশ্চিত থাক। শুধু দুটো বছর সময়। দুটো বছর!

দু বছরও লাগে নি, দেড় বছরের মধ্যেই সব হয়ে গিয়েছিল। জমিদারী কেনা, সরকারী

আদালতে—একেবারে সুপ্রীম কোর্টে—দরখাস্ত করে ভট্টাচার্যকে রায়ভট্টাচার্য করে নিয়ে, ঘটক এবং একজন কর্মচারী পাঠিয়েছিলেন কুড়ারাম রায়।

ঘটক পরিচয় দিলে বোকা মনুষ্য রাজা দেবরায় বলেছিলেন—এ তো সেই ভটচাজ!

সারদা দেবী বলেছিলেন—না রায়ভটচাজ। ভটচাজ বাদ যাবে।

—তা কি করে যাবে?

—কেন, তোমরা কি ছিলে? গুরুগিরি করতে না ছত্রি রাজাদের? চক্রবর্তী নও তোমরা?

—হুঁ, বটে। তা সে অনেকদিনের কথা!

—তাই জন্যে তো সব গিয়েছে। ঘরে আজ পাঁচটা টাকা নেই যে ঘটককে দেব।

রাজা চুপ ক'রে ছিলেন।

পরদিন সকালে ঘটকের সঙ্গে কথাবার্তা হবার কথা। কিন্তু বাধা পড়েছিল। এসেছিল কোম্পানী কালেকটারীর চাপরাশী। সঙ্গে পরোয়ানা। নীলেম-হয়ে-যাওয়া জমিদারীর বাকী অনাদায়ী টাকার জন্যে ক্রোক। না দিলে রাজাকে বেঁধে নিয়ে যাবে।

সেকালের আইনের প্যাঁচ। মবলকে এগার হাজার সিক্কা টাকা দশ আনা সাড়ে বারো গণ্ডা রাজস্ব পাওয়ার জন্য লাট নম্বর বারোশত তিয়াত্তর নিলাম হয় দশ হাজার টাকায়। সে টাকা কোম্পানীর কালেকটারী ভুক্তান হওয়ার পর এক হাজার সিক্কা দশ আনা সাড়ে বারো গণ্ডা কোম্পানীর প্রাপ্য দরুণ এই পরোয়ানা জারী হইতেছে।

রাজা শিবনারায়ণ কোম্পানীর চাপরাশী দেখে অত্যন্ত ভয় পেতেন। তিনি যে সেই রাজস্ব দেব না ঘোষণা ক'রে লড়তে গিয়ে কোম্পানীর ষোল ষোলটা বন্দুকের পাঁচবার আওয়াজে আশিটা বিস্ফোরণ শব্দ শুনেছিলেন এবং এমন পুরনো মোটা কাঠের দরজা জোড়াকে ফেটে যেতে দেখেছিলেন সে স্মৃতি তিনি কিছুতেই মুছতে পারেন না। তাঁর আফিঙের নেশা, সোজা নেশা নয়, সকালে দুপুরে সন্ধ্যায় প্রায় ছ মটর কলাই ভোর আফিঙের নেশা। চোখ দুটো শিবের মতই বড় এবং ওই নেশায় শিবের চোখের মতই বারো আনা বুজে থাকত। সে চোখও পুরো খুলে বিস্ফারিত হয়ে উঠত কোম্পানীর চাপরাশী দেখলে। সুতরাং তিনি বাইরে বেরিয়ে চাপরাশী দেখেই দ্রুত ফিরে অন্দরে গিয়ে ঢুকে ঘরে খিল দিয়েছিলেন।

রাণী সারদা দেবী ডেকে বলেছিলেন—দরজা খোল ভয় নেই। ফিরে গিয়েছে।

রাজা শিবনারায়ণ ঘরের মধ্যে একটা শালগ্রাম হাতে ক'রে বসেছিলেন। শালগ্রাম নয়, তাঁর সঞ্চয়ের আফিঙ। সেটা গিলবেন কি ক'রে সেইটে সমস্যা হয়েছিল তাঁর। তিনি রাণীকে বলেছিলেন—মিছে কথা বলছ। আমাকে তুমি ধরিয়ে দেবে।

—না। না। না।

রাণীর কথা শেষ হতেই মেয়ে কাত্যায়নী বলেছিল—না বাবা, সত্যিই হারামজাদ কুত্তারা চলে গেল। সেলাম করে চলে গেল বাবা।

তখন দরজা খুলেছিলেন শিবনারায়ণ। মেয়ে কাত্যায়নী বলেছিল—ওই ঘটকবুড়োর সঙ্গে যে নায়েব বেটা না গোমস্তা বেটা এসেছে সে জামিন হয়ে সই করে দিলে। জমিদারবাবু

সোমেশ্বর রায়বাহাদুরের বকলমে সই দিলে। কুত্তারা লেজ গুটিয়ে সেলাম ক'রে চলে গেল !

কুড়ারাম রায় ভট্টাচার্য সদর হুগলীতে বসে নিজে কালেকটারীর আমলাদের নিয়ে ব্যাপারটা করেছিলেন।

শিবনারায়ণ রায় হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছিলেন। এবং কৃতজ্ঞ হয়েছিলেন বাবু জমিদার সোমেশ্বর রায়ের উপর। সুতরাং তারপর আর বিবাহের পথে একটি কণ্টকও মাথা তুলে ওঠেনি।

আট বছরের কনে কাত্যায়নী কীর্তিহাটে এসেছিলেন, সঙ্গে এসেছিল ওঁদের বাড়ীর একমাত্র ঝি বুড়ী কুন্তী। কুন্তী ওদেশের মেয়ে—বাপ ছিল দেবরায়দের ছত্রি চাপরাশী, মা ছিল কাহার বা কূর্মী। আজীবনই এদের বাড়ী আছে। প্রথম জীবনে শিবনারায়ণের ঝি ছিল, বিয়ে কখনও হয়নি। কাত্যায়নীকে মানুষ করেছিল সেই। সে আগলে আগলে রেখেছিল কাত্যায়নীকে। কিন্তু তবু কাত্যায়নী প্রথম দিন থেকেই শ্বশুরবাড়ীতে চাকরদের ঝিদের দু-চার-বার শাসন ক'রে ডেকেছিল—এই হারামজাদা ! শুনতে পাস না ? এই হারামজাদী—কানে তোর ক'ভরি সোনা আছে ?

কুন্তী তাদের বলেছিল—কিছু মনে করো না। লেড়কী মেয়ে—বাচ্চা। তবে ও তো রাজার বেটী ! বেতরিবৎ ওর সয় না !

শুনে কিন্তু কুড়ারাম রায় ভটচাজ খুশী হয়েছিলেন। খুব খুশী !

হাঁ। এইবার বাড়ীতে সত্যিই জমিদারী মহিমা এসেছে।

রাজকুমারী কাত্যায়নী কীর্তিহাটের কড়চায় রায়দের বংশধারায় বইয়ে দিলেন এদেশের পাঁচশো বছরের আমীরশাহী চাল-চলন, ধারা-ধরণ, হাঁটা, কথা বলা, রীতিনীতি সব। ঝি-চাকরেরা তাঁকে ভয় করতো বাঘের মত। রাগ হলে হাতের কাছে যা থাকত তাই ছুঁড়ে মারতেন। আবার বকশিশ দিতেন। দেবতায় ছিল অচলা ভক্তি। ব্রতে উপবাসে তাঁর মত নিষ্ঠা বিরল। দেবসেবায় যে কত নতুন নতুন ধারা তিনি প্রচলন করেছিলেন তার হিসেব কাগজে পাওয়া যায়। হাঁটতেন তিনি আস্তে কিন্তু পা ফেলতেন তাতে শব্দ হ'ত। ছিপছিপে পাতলা অসাধারণ রূপসী ছিলেন, ওজন বেশী ছিল না কিন্তু তিনি নড়লেই কীর্তিহাটের বাড়ীর মেঝে সাড়া দিয়ে জানাতো যে রাজকুমারী বধূ কাত্যায়নী সচলা হয়েছেন। আবার অতিথি অভ্যাগত কুটুম্ব সজ্জনের কাছে তাঁর মত অনুগ্রহপরায়ণা কেউ ছিল না। মধ্যে মধ্যে পাগল হতেন। বাপের রোগটা পেয়েছিলেন। শুধু বাপের নয় দেবরায়দের বংশে এখানে ওখানে যারা ছড়িয়ে ছিল, যাদের কথা জানত লোকে. তাদের মধ্যে দশ পনের জন আধপাগলের নাম আমি পেয়েছি সুলতা। রাজকুমারী কাত্যায়নীর এসব বিবরণ কুড়ারাম রায় ভটচাজের পাঁচালীতে নেই। পাঁচালী তো তুমি সদ্য পড়েছ। তবে তাড়াতাড়ি পড়েছ। আমি বিশদ করে বলে গেলাম। এ বিবরণ আমি শুনেছি।

কিছু শুনেছি রায়বাড়ীতে মেজঠাকুমার কাছে। তিনি এসব শুনেছিলেন মেজঠাকুরদার কাছে। কিছু কিছু এখনও গ্রামে চলিত আছে। বাড়ীতে বাড়ীতে পুরুষ পরম্পরায়—

অবশ্য মেয়েদের মধ্যে—চলে আসছে।

রায়বাড়ীর পিছন দিকে দুধসায়র পুকুর আছে। বাঁধানো ঘাট। আগে পাঁচিল দিয়ে ঘেরা ছিল। কুড়ারাম রায় কাটিয়েছিলেন পুকুর রাজকুমারী বউমার স্নানের জন্য। পুকুরে জল ভ'রে একশো ঘড়া দুধ ঢেলেছিলেন, প্রথম যেদিন বউমা পুকুরে স্নান করেন সেই দিন। পুকুরটা এখনও আছে, মজে এসেছে, পাঁচিল পড়ে গেছে। এখন বাড়ীতে কুয়ো হয়েছে। ওটায় এখন বাসন মাজা হয়। কিন্তু সেদিন ও পুকুরে রায়বাড়ীর ছেলে বউ ছাড়া কেউ স্নান করত না। দুধপুকুরে স্নান করলে রঙ ফরসা হত। রাজকুমারী বউ কাত্যায়নী নিজেই ছিলেন রূপের ঝর্ণা।

রায়বংশে আমীরশাহী চাল—পাগলামি ব্যাধির সঙ্গে আর একটি জিনিস তিনি এনেছিলেন সেটি রূপ। কুড়ারাম রায় রূপবান ছিলেন কিন্তু বলেছি তো সেটা বামুনে রূপ। যে রূপ কপালে চন্দনে তিলকে খোলে। এ রূপের জাত আলাদা। এ রূপ প্রসাধন ভূষণ ভূয়া ছাড়া খোলে না।

নূরজাহান, পদ্মিনী এ তো সহজ পথে আসে নি সুলতা। অনেক ঐশ্বয অনেক শক্তির উপর সাধনপীঠ বানিয়ে তার উপর আলপনা পেতে বাছাইকরা দশ বিশটা রূপের বাটি থেকে রক্ত মিশিয়ে মিশিয়ে তবে এসেছে। গালে গোলাপ কোন দেশের কোন মৌলিক রূপেই ছিল না বলেই আমার বিশ্বাস। ওটা হয়েছে অনেক সাধনায়। রাজকুমারী কাত্যায়নী তাই এনে দিয়ে গেছেন রায়বংশে। কুড়ারাম ভট্টাচার্য তাতে নিজেকে কৃতকৃতার্থ মনে করতেন। বলতেন—সম্পদ সৌভাগ্য এ আমার ছিল। কিন্তু বউমা আমার যে শ্রী নিয়ে এসেছে তাতে সম্পদ সৌভাগ্য উজ্জ্বল হল।

এইখানেই কুড়ারাম রায়ের পাঁচালী ইতি। দুটো কথা আছে। তিনি কিন্তু ছেলে-বউ নিয়ে কীর্তিহাটে থাকেন নি। থেকেছিলেন কলকাতায়। থেকেছিলেন ছেলেকে গড়ে তোলবার জন্য। তখন দেশে নতুন হাওয়া বইতে শুরু করেছে। কর্ণওয়ালিশ সাহেবের পর লর্ড ওয়েলেসলী এসেছেন। নতুন লাটপ্রাসাদ তৈরী হয়েছে। বিশাল সিঁড়ির দুধারে তকমা আচকান জড়িজড়ানো পাগড়ী পরা খানসামা বেয়ারা আর্দালী চোপদার দাঁড়িয়ে থাকে। নতুন গাড়ী ঘোড়া আসছে, বিলেত থেকে সাহেব ব্যবসাদার আসছে, রাইটার আসছে, বড়াটাঁকি লালদীঘির উত্তর পাড়ে লম্বা রাইটার্স বিল্ডিং সেরেস্তাখানা পড়েছে। ব্যবসাদার আসছে, নতুন উকীল অ্যাটর্নী আসছে, ডাক্তার আসছে। জেনারেল কাপ্তেন আসছে। মেমসাহেব আসছে এখানে বেশ্যাবৃত্তি করতে। সায়েবী সরাইখানা কাফিখানা হচ্ছে। পাদ্রীরা আসছে। তারা এখানে গির্জে করছে। ইস্কুল করছে। কিরিশ্চান করছে। লেখাপড়া শেখাচ্ছে। ক'জন সাহেব এখানে ইস্কুল করেছে—শেরবোর্ন সাহেব ড্রামণ্ড সাহেব আরও কত সাহেব।

ওদিকে হিন্দুস্থানে—ভারতবর্ষে গোলমাল। সেই গোলমাল তামাম মুলুক ভরই কোম্পানীর সঙ্গে। সাহেবানরা পাকাপোক্ত ভাবে বসেছে। এখন সরকারী সেরেস্তায় চাকরী বড় ব্যবসা বড় জমিদারী যা কর—ইংরিজী না শিখলে হবে না। ইংরিজী তরিবৎ না হলে

বড় সমাজে ঠাঁই পাবে না। রামমোহন রায় পথ খুলেছেন। কলকাতার কায়স্থরা সুবর্ণবণিকেরা ঠেঙেভেঙ্গে ইংরিজী শিখে মুৎসুদ্দি দালালী কাজ করছিল, তাদেরও ইংরিজী শেখার তাড়া পড়েছে। কুড়ারাম নিজে কোনরকমে কাজ চালান। মুখে মুখে শিখে নিয়েছেন। কিন্তু ছেলেকে ভালরকম ইংরিজী, তাঁর সঙ্গে সহবৎ তরিবৎ না শেখালে তার জীবনের সাধ অঙ্কুরেই মরে যাবে এ তিনি জানতেন বলেই সোমেশ্বর এবং পুত্রবধূ রাজকুমারী কাত্যায়নীকে নিয়ে কলকাতায় এলেন। সোমেশ্বর ড্রামণ্ড সাহেবের ধর্মতলার ইস্কুলে ভর্তি হল।

বেয়ান সারদা দেবী এবং বেয়াইকে কালীঘাটে মাতৃদর্শন করতে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে এলেন। আলাদা বাড়ী ভাড়া ক'রে দিয়েছিলেন। নইলে পৌত্র না হলে মেয়ের মা-বাপকে জামাইঘরের ভাত খেতে নেই। কিছুদিন তাঁদের এখানে রেখে কাত্যায়নীসহ পাঠিয়ে দিলেন স্বগ্রামে। ইতিমধ্যে ওখানকার বাড়া মেরামত করিয়ে দিয়েছিলেন, কারণ সবই তাঁর সোমেশ্বর পাবে। এই সময়ের মধ্যে বেয়ানের সঙ্গে অনেক গল্প অনেক রহস্যরসিকতায় পরম আনন্দে কেটেছে তাঁর। বেয়াই আফিঙ খেতেন। বিলিতী মদও খাওয়াতেন কুড়ারাম। তিনিও খুব খুশী ছিলেন। কুড়ারাম মাসে মাসে যেতেন কীর্তিহাট। চাঁদপাল ঘাটে বড় বজরা বাঁধা থাকত তাঁর। নাম ছিল—ললিতা। সেই বজরায় যেতেন। হলদী নদীতে ঢুকে জোয়ার এলাকা পর্যন্ত গিয়ে নামতেন। সেখানে থাকত তাঁর হাতী। হাতীর নাম ছিল জংবাহাদুর।

লোকে অনেক কথা বলত,—বেয়ান সম্পর্ক নিয়ে।

কিন্তু তিনি কড়চায় লিখেছেন—

ছেলে বউ সাথে আনি বেয়ান সারদা রাণী
সর্বসুখী মনে মানি কাটে দিন কয়।
কত হাসি কত কথা আগামী জন্মের তথা
কল্পনা পূরাবে মাতা জানিনু নিশ্চয়॥

তারপর সেই কটা লাইন—আগে বলেছি—

পাপপুণ্য নাহি মানি যাহা করিয়াছি আমি
সবার মালিক তুমি জয় কালী করালী।

তার শেষ লাইন—

তোমাতে দেবত্র করি বিষয় আদি জমিদারী
আমি মা ভাসাই তরী রাখো বাঙালায়।

মায়ের চরণেই তিনি দেহত্যাগ করেছিলেন। একবার কীর্তিহাট গিয়ে অসুখে পড়লেন। ছেলে সোমেশ্বরকে লোক পাঠিয়ে আনালেন। লিখলেন, "অবিলম্বে আসিবা।" সোমেশ্বরের বয়স তখন কুড়ি। বধূ কাত্যায়নীর বয়স সতের। তখন তার তিনটি সন্তান হয়ে মারা গেছে। এই এক খেদ নিয়ে তিনি গেলেন। ওই দেখ তাঁর দেহত্যাগের ছবি। এর মধ্যে তারা খেয়ে উঠে এসে সেই ছবি টাঙানো বারান্দায় ঢুকল। সুরেশ্বর

ছবিখানা দেখালে। একটা প্রকাণ্ড গাছ উপড়ে পড়েছে। গাছটার কাণ্ডটায় একটা মানুষের দেহের আভাস।

প্রচুর ধুমধাম ক'রে শ্রাদ্ধ করেছিলেন সোমেশ্বর। টাকা খরচ হয়েছিল চল্লিশ হাজার। চাল খরচ হয়েছিল চল্লিশ মণ। ময়দা খরচ হয়েছিল দশ মণ।

শ্রাদ্ধের পর ও-অঞ্চলে কলেরা হয়েছিল। সোমেশ্বর সস্ত্রীক কলকাতায় চলে এসেছিলেন।

* * *

সুরেশ্বর পরের ছবিখানা দেখালে। আশ্চর্য একটি রূপসী মেয়ে। সর্বাঙ্গে অলঙ্কার। চোখে প্রদীপ্ত দৃষ্টি। সুরেশ্বর বললে—পরের ছবি দেখ সুলতা। এরও চার বছর পরের। সোমেশ্বরের বয়স তখন চব্বিশ। ইংরাজী ১৮১৫ সাল। রাজকুমারী বধূ কাত্যায়নীর বয়স একুশ।

তাঁর কোল শূন্য। রাজরক্তের সঙ্গে উন্মত্ততা উগ্রতার সঙ্গে আর একটি ব্যাধি তিনি নিয়ে এসেছিলেন, সেটি তাঁর মৃতবৎসা দোষ।

হয়তো এ যুগ হলে রক্ত পরীক্ষা ক'রে কোন ব্যাধির বীজ বের হত এবং তার প্রতিষেধকও পাওয়া যেত। কিন্তু সে যুগে ইংরেজ ডাক্তারও তার প্রতিকার করতে পারে নি। কুড়ারামের মৃত্যুর পূর্বে তিনটি মৃত সন্তান প্রসব করেছিলেন। তারপর আরও দুটি মৃত সন্তান প্রসব করেছেন। মধ্যে মধ্যে উন্মাদ হয়েছেন।

অন্তর্বত্নী হলেই তাঁর মস্তিষ্ক অসুস্থ হ'ত। প্রথম হত মেজাজ খারাপ। উগ্র মেজাজ উগ্রতর হত। পাঁচ ছ মাসে তিনি বোবা হয়ে যেতেন। অনবরত ঘুরতেন ঘরের মধ্যে। তারপর প্রায় উন্মাদ। প্রলাপ অসংলগ্ন কথা বলতেন। চাকর-বাকরের লাঞ্ছনার আর সীমা থাকত না। সব থেকে বিপদ হ'ত সোমেশ্বরের। স্বামীকে দেখলে ক্রোধ আক্রোশের আর সীমা থাকত না।

বলতেন—ইচ্ছে করে তোমার বুকে বসে গলাটা টিপে ধরে শেষ ক'রে দি।

দু তিনবার ধারালো দা নিয়ে তাঁকে কাটতে গিয়েছিলেন। তাকে আটকেছিলেন তাঁর মা বা সারদা দেবী। সোমেশ্বর পালিয়ে বেঁচেছিলেন। অনেকে বিবাহ করতে পরামর্শ দিয়েছিল তাঁকে কিন্তু তা তিনি করেন নি। কারণ ছিল—কুড়ারাম মৃত্যুর সময় ছেলেকে প্রতিশ্রুত করিয়ে নিয়েছিলেন—কাত্যায়নী বদ্ধ উন্মাদ হলেও সে যেন বিবাহ না করে। তাঁর শিয়রে তখন ও-দিকে বসেছিলেন কাত্যায়নীর মা তাঁর বেয়ান রাণী সারদা দেবী।

সারদা দেবী তখন বিধবা। তিনি কন্যার এই সময় আসতেন, কাছে থাকতেন। তিনিই কন্যাকে বলে রাজী করিয়ে তাকে অর্থাৎ কাত্যায়নীকে দিয়েই সোমেশ্বরকে বলিয়েছিলেন, তখন অবশ্য কাত্যায়নীর সুস্থ অবস্থা; বলিয়েছিলেন—দেখ আমার তো এই অবস্থা। তুমি বাড়ীতে তোমার সেবার জন্যে দুটো ভালো ঝি রাখো। মন ভাল রাখতে গানটান শুনবার জন্যে একজন বাঈজী রাখো। নইলে তুমিও যে পাগল হয়ে যাবে!

সোমেশ্বর ঠিক জমিদার বাচ্চা জমিদার ছিলেন না। হতে পারেন নি। তিনি কৌশলী মানুষ ছিলেন, তার সঙ্গে সাহসীও ছিলেন। কিন্তু বেপরোয়া মানুষ ছিলেন না। নইলে

নিজেই এসব ব্যবস্থা করতেন। অবশ্য বাঈজী তাঁর ছিল। তবে বাঁধা ছিল না। এখানে ওখানে বাগানে বজরায় আমোদ-আহ্লাদ করতেন।

দু চারটে খরচ পেয়েছি খাতায়—এসব খাতা সোমেশ্বরের খাস খাতা। তিনি কলকাতায় যে ব্যবসা করতেন অর্থাৎ সাহেবদের মুৎসুদ্দির কাজ করতেন, টাকা লগ্নী করতেন তার জমাখরচের খাতা। সোমেশ্বর একজন সাহেব অ্যাটর্নীর টণ্ডি ছিলেন, তাঁকে টাকা ধার দিয়ে তাঁর কেসগুলির থেকে কমিশন পেতেন। তাছাড়া টাকা লগ্নী করেছিলেন নুনের ব্যবসায়ে। মেদিনীপুর কাঁথী অঞ্চলে 'খালারি' ইজারা নিয়ে নুন তৈরী করাতেন। নুনের ব্যবসা একচেটে কোম্পানীর, কোম্পানী নুন কিনত। এ ছাড়া রবিনসন সাহেব বলে একজন সাহেব তাঁদের অঞ্চলে নীলের কুঠী করেছিল, সেই কুঠীতেও তাঁর অনেক টাকা খাটত। জীবনে স্ত্রীকে নিয়ে সুখশান্তির যতই অভাব হোক না কেন, তিনি বাইরের ব্যবসায়ে কাজে মেতে থাকতেন দিনে, সন্ধ্যায় যেতেন বাঈজীবাড়ী। রাত্রে বাড়ী ফিরে ওই ঝিদের সেবায় পরিতুষ্ট হয়ে ঘুমিয়ে যেতেন। উঠতেন বেলা এক প্রহরের সময়। মধ্যে মধ্যে দু'চারদিন দরজায় আঘাত পড়ত। করাঘাত করতেন কাত্যায়নী দেবী। তাঁকে ধরে নিয়ে যেতেন তাঁর মা রাণী সারদা দেবী। কাত্যায়নীর একটা সুস্থ অবস্থাও ছিল। সেটা প্রসবের পর আসত। মৃত সন্তান প্রসব করার পর তিনি কাঁদতে শুরু করতেন এবং পনের বিশ দিনের মধ্যে অনেক কান্না কেঁদে বিষণ্ণ প্রতিমার মত থাকতেন কয়েকদিন, তারপরই হতেন আর এক মানুষ। স্বামীর ঘরে তাঁর বিছানা হ'ত। ঝি দুটিকে হয় তাড়াতেন, নয় তারা সরে যেত এই বাড়ীর দূরতম প্রান্তের একতলার ঘরে। তখন গোটা সংসারটা চলত তাঁর অঙ্গুলিহেলনে। তিনি বাসনের ঘরের বাসনগুলি গুনতেন, কতগুলি হারিয়েছে হিসেব করতেন। আসবাবপত্রও এইভাবে হিসেব করতেন। যা হারাত সেগুলি তৎক্ষণাৎ পূরণ করেও সোমেশ্বরের নিষ্কৃতি ছিল না, কাত্যায়নী তাঁকে দিয়েই চাকর-বাকর, সরকার, নায়েব সকলকে তিরস্কার করিয়ে ছাড়তেন। এবং ডাক্তার-বদ্যি ইত্যাদি ডাকিয়ে সমারোহ জুড়ে দিতেন। মধ্যে মধ্যে স্বপ্ন দেখতেন—কোন দেবস্থলের স্বপ্ন। সেখানে যাওয়ার সাড়া পড়ত।

তারপর একখানা শুধু কালো ছবি। তার মধ্যে সোমেশ্বরের আভাস মাত্র রেখায় ফুটে আছে। কিন্তু ওই দেখ সুলতা—কতকগুলো বাইরের ঘটনা আঁকা আছে ওই যে ছবিটার প্যানেলে। সোমেশ্বর নিজের জীবনের কোন ঘটনায় মনের কোন ছায়া রেখে যান নি। চিঠি যা পেয়েছি তা ব্যবসায় সংক্রান্ত। যেমন নুনের দেওয়ান দ্বারকনাথ ঠাকুরের চিঠি; পাইকপাড়ার দেওয়ান গঙ্গা গোবিন্দ সিংহের ছেলে—তিনি তখন কোম্পানীর কানুনগো রয়েছেন, তাঁর চিঠি। রবিনসন সাহেবের চিঠি। কীর্তিহাটের প্রধান নায়েবের চিঠি, কালীমাতার পূজকের চিঠি,—তা ছাড়া দু'চারজন প্রজা সজ্জনের চিঠি—

মহামহিম মহিমান্বিত শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু সোমেশ্বর রায় জমিদার মহাশয় অশেষ প্রতা-পান্বিতেষু।

হুজুর বরাবর অধীন প্রজার দরখাস্ত এই যে, ইত্যাদি ইত্যাদি। দরখাস্ত তার ঘরের জন্য জোতের মধ্যে একটি তাল গাছ কি শাল গাছ কি তার পুত্রকন্যার বিবাহে পোড়া কাষ্ঠের জন্য একটি বটবৃক্ষের ডাল বা মাতৃশ্রাদ্ধে একটি তিন্তিরী বৃক্ষ কাটবার অনুমতি প্রার্থনা। অথবা একটি ছোট পুষ্করিণী খননের অনুমতি প্রার্থনা। তখন কোম্পানীর সঙ্গে জমিদারের চুক্তি অনুযায়ী জমিদার জমিদারীর জলকর ফলকর বনকর, লাহা-মহল, পাতা-মহল, কাষ্ঠকয়লা-মহল এমন কি উর্ধ্ব-অধঃ—সমস্ত কিছুর একছত্র অধিপতি। কন্যার বিবাহে জমিদার প্রণামী পান —তার নাম মারোচা। পিতৃমাতৃশ্রাদ্ধে জলদানের পাত্র, ঘড়ি বা ঘটি কাছারীতে পৌঁছে দিতে হয়।

এর মধ্যে কাত্যায়নী সম্পর্কে কোন কথা নেই। কাউকে সোমেশ্বর রায় লেখেন-নি। একবার পোষ্যপুত্র নেওয়ার কথা তুলে—কাত্যায়নীর হাতের কঙ্কণের আঘাতে কপাল কেটে ছিলেন—সে কথা শুনেছি, মেজঠাকুমার কাছে। আর তাঁর ছবিতে দেখছি একটা লম্বা কাটা দাগ। অন্য যারা প্রবীণ তাঁদের কাছেও শুনেছি। কিন্তু কোন নমুদ পাইনি।

জমাখরচের খাতায় মধ্যে মধ্যে পেয়েছি—বিদায়-বকশিশ খাতে খরচ ২৫০৲ টাকা। শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু সাহেব হুজুর বাহাদুরের খাস ঝিকে বিদায় উপলক্ষ্যে—নগদ বকশিশ—। ২৫০৲ টাকাই উচ্চতম বকশিশ নয়। নিম্নতর। উচ্চতম বকশিশ ১০০০ টাকাও আছে। কাত্যায়নী দেবী সুস্থ হলে যে সব খাস ঝিদের বিদায় করা হত—এ বকশিশ তারা পেয়েছে।

দেখ প্যানেলটা দেখ, দেখতে পাবে, পুঁটলি বগলে ক'টি মেয়ে চলে যাচ্ছে।

তারপরই দেখ এই ছবিটা। সে আমলের চৌরঙ্গীর পথে সোমেশ্বর চলেছেন স্ত্রীকে নিয়ে কালীঘাটে! এ ঘটনার গল্প রায় বংশে সুপ্রচলিত এবং সুপ্রসিদ্ধ। রায়-বংশের গল্প উঠলেই স্মৃতিপথে এসে যায়। রায়-বংশের ছেলেমেয়ে—সে আধুনিকই হোক আর প্রতিক্রিয়াশীলই হোক—শুনেছে, জানে এবং মানেও। ঘটনার যে শেকল একটার সঙ্গে একটাকে গেঁথে কার্য এবং কারণ হিসেবে ব্যাখ্যা টেনে নিয়ে যায় তার মাঝখানে এক একটা ঘটনা আকস্মিকভাবে ঘটে থাকে। যেন হঠাৎ একটা বাইরের আংটা কোন এক অদৃশ্য চুম্বকের টানে ছুটে এসে শেকলটার প্রান্তে জুড়ে যায়। এও তাই।

বহুশ্রুত ঘটনাটি এই। কালীঘাট সোমেশ্বরের মামার বাড়ী। কুড়ারাম রায় ভট্টাচার্য তাঁর আমলে এই মধ্যবিত্ত গৃহস্থ পরিবারটিকে সাহায্য করে নানান সুযোগ-সুবিধা পাইয়ে দিয়ে তাদের বর্ধিষ্ণু করে তুলেছিলেন। তাঁরা অনুগত ছিলেন এবং সত্যকার হিতৈষী ছিলেন। সোমেশ্বরও বাল্যকালে কিছুদিন মাতুলালয়ে থাকতেন যখন কুড়ারাম বিদেশে বা মফস্বলে যেতেন তখন। সোমেশ্বরও ভালবাসতেন তাঁদের।

একদিন তাঁর মামাতো-ভাই এসে খবর দিয়ে গেল, কালীঘাটে এক তান্ত্রিক এসেছে। ক'দিন আগে আশ্চর্য ঘটনা ঘটেছে। তান্ত্রিক আধ পাগলা—।

মামাতো-ভাই হরিপ্রসাদ চাটুজ্জে বলেছিল—তান্ত্রিকরা আধ পাগলা হয়। মুখ খারাপ হয়। অনেকে গাইয়েও হয়। লোকটা আশ্চর্য গাইয়ে। গাইয়ে-বাজিয়ে—সব যন্ত্র বাজাতে পারে; প্রথম যখন কালীঘাটের শ্মশানে আসে তখন একটু সুস্থ ছিল—মধ্যে মধ্যে গান-

বাজনার আসর বসলে জয় কালী বলে এসে ঢুকে বসত। বলত—আমাকে একটু বাজাতে দেবে? কখনও বলত—গাইতে দেবে? দিত, সবাই—সে অদ্ভুত ব্যাপার। লোকে একটু ভালটাল বাসত। মধ্যে মধ্যে মার খেতো। লোকে মারত। বলত—মেয়েদের দিকে নাকি ড্যাব-ড্যাব্ করে তাকায়। পলক পড়ে না। এক একজনের কাছে এসে তার মুখের কাছে মুখ এনে বলে—তুমি সেই বট?—বেশ কয়েকদিন মার খেয়েছে। কিন্তু এর বেশী কিছু নয়। কিন্তু ভাই এই দশদিন আগে জোয়ারে একটা যুবতী মেয়ের দেহ ভেসে এসেছিল। একাদশীর জোয়ার। সেদিন জোয়ারটা বেশী। মাঝখানে দেহটা ভেসে চলছিল—একবার ডুবছিল একবার উঠছিল। চোখে পড়েছিল সবারই কিন্তু তান্ত্রিক জয় কালী বলে জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল। তুফান-জোয়ার—তারই মধ্যে থেকে সে দেহটা টেনে এনে তুললে। টাটকা মড়া। রূপসী একেবারে বোধ হয় ষোড়শী মেয়ে। সকলে জিজ্ঞেস করলে—কি করবে! বললে—আসন করে সাধন করব। সামনে পরশু চতুর্দশী, পরের দিন অমাবস্যে। তারপর তাই চলে গেল নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে। লোকে ভেবেছিল বাঘে খাবে। নয়ত মড়ার লোভে শেয়াল এসে শুদ্ধ ছিঁড়বে! তিনদিন কেউ দেখেনি। চারদিনের দিন নৌকোর মাঝিরা দেখতে পেয়েছিল। পাড় থেকে গড়িয়ে ভাঁটার কাদার ওপর পড়ে আছে অজ্ঞান হয়ে। তুলে এনে মন্দিরের ঘাটে নামিয়ে দিয়েছিল। জ্ঞান হয়ে লোকটা ক'দিন হয়ে গিয়েছিল ঘোর উন্মাদ। কেবল চেঁচাতো—ফেলে দিলি! ফেলে দিলি! দে—! আর খিস্তি গালাগালি। এখন শান্ত হয়েছে। লোকে বলছে সিদ্ধ হয়ে গেছে লোকটা। তা ছাড়া এখন শুনছি লোকটা অনেকজনকে অনেক ওষুধ—মানে জঙ্গল থেকে লতাপাতা ছিঁড়ে এনে হাতে দলে দেয়, ভাল হয়ে যায়। কটি বাঁজা মেয়েরও সন্তান হবে শুনেছি ওর ওষুধে। যাবে একবার বউমাকে নিয়ে?

সেই চলেছেন সোমেশ্বর ওই দেখ।

৫

পশ্চিম দিকে সেকালের কলকাতার ময়দানে উলুখাগড়ার জঙ্গল, দু-চারটে জলা, গঙ্গার ধারে বড় বড় অশথের গাছ। জাহাজ বজরার মাস্তুল দেখা যাচ্ছে। চৌরঙ্গীর পূব পাশে সেকেলে বাড়ী। তখন হোয়াইটওয়ে লেডল তৈরী হয়নি, গ্র্যাণ্ড ফিরপোর বাড়ী তৈরী হয়নি। বাতা-ওয়ালা ছোট বাড়ী, গোল থাম, কাঠের রেলিং।

ব্রুহাম গাড়ী চলছে, সহিসেরা সামনে ছুটছে, পাল্কী চলছে। তালপাতার ছাতা মাথায় দিয়ে রাহী চলছে। ঘোড়ায় চলছে সওয়ার। গরুর গাড়ী চলছে।

ওই দেখ, পাল্কীতে কাত্যায়নী।

ব্রুহামে সোমেশ্বর। চোগা চাপকান পরেন নি, পরেছেন পাটের কাপড়-চাদর। কাত্যায়নীর পরনে বালুচরের বুটীদার রেশমী শাড়ী।

* * * *

সোমেশ্বর রায় আশ্চর্য হয়ে গেলেন তান্ত্রিককে দেখে। আরে!

—কি? জিজ্ঞাসা করলেন মামাতো-ভাই হরিহর।

সে প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে সোমেশ্বর তান্ত্রিককে বললেন, কি বাবা চিনতে পারছেন আমাকে?

তান্ত্রিক হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন, হাহা-হা! রায়বাবু? হাহা-হা! পারি বৈকি চিনতে। কেন পারব নি! হাহা-হা!

—এ পথে কত দিন বাবা?

—তা তিন জন্ম হল গো। এ জন্মে বছর পাঁচেক হয়ে গেল গো। হাহা-হা! আমি ভাবছিলাম গো তোমার কথা। হাহা-হা!

অবাক হয়ে গেলেন সোমেশ্বর। তাঁর কথাই ভাবছিলেন? তবু জিজ্ঞাসা করলেন, কে বললে আমি আসব?

—হাহা-হা। আমার মন বললে গো! তোমাকে আমার দরকার আছে যে! হাহা-হা!

আশ্চর্য! এ লোককে তিনি চেনেন। শ্যামনগরের ভটচাজবাড়ীর জামাই, পেশাদার কুলীনের ছেলে। ওর শ্বশুর খুব নামজাদা গৃহীতান্ত্রিক ছিলেন। শ্মশানে কালীপূজা করতেন। শ্মশানে জপতপ করতেন। তন্ত্রমতে স্বস্ত্যয়ন করতেন। কুলীনের ছেলে শ্যামকান্ত চাটুজ্জে—ভটচাজের কন্যাকে বিয়ে করে ঘরজামাই ছিলেন। প্রথম প্রথম বেড়াতেন গান-বাজনা করে। গান-বাজনার শিক্ষা ছিল। নিজেও বড় বড় বাড়ীতে থেরুয়ার খোলে পোরা তানপুরা কাঁধে নিয়ে গান শোনাতে আসতেন। অসাধারণ গাইয়ে বলেছে মামাতো-ভাই, তা এক বিন্দু বাড়িয়ে বলে নি। যেমন সঙ্গীতে জ্ঞান তেমনি কণ্ঠস্বর। তন্ত্রের ঝোঁকও ছিল। পাঁচ টাকা পার্বণী করে দিয়েছিলেন, কালীপূজোর পর এসে গান শুনিয়ে নিয়ে যেতেন। আজ বছর পাঁচেকই হবে আর আসেন নি। পাঁচ বছরে শ্যামাচরণ একেবারে অন্যরকম হয়ে গেছেন। ক্ষ্যাপা-ক্ষ্যাপা কথা, হাহা-হা, হাহা-হা, যেন একটা উল্লাস উথলে উঠছে ওই শব্দের গমক মেরে। চাউনিও বদলেছে, চোখ দুটো বড়, সে চোখ লাল হয়ে আছে। চোখের তারা কখনও স্থির, কখনও অস্থির। কিন্তু যেন জ্বলছে জ্বলন্ত আঙরার মত।

তিনি বললেন—তা আমার বাঞ্ছা যে পূর্ণ করতে হবে।

—হাহা-হা। তোমার আবার বাঞ্ছা কিগো বাবু, জমিদারি, বাড়ী-টাকাকড়ি, হাতী-ঘোড়া, লোক-লস্কর,—আবার বাঞ্ছা? বলে হা-হা করে হেসে উঠল।

—আমার সন্তান নাই বাবা! সন্তান হয়, সব মরা সন্তান। অনেক প্রার্থনা করেছি—মায়ের কাছে—

—কার কাছে? ওই ন্যাংটা মাগীর কাছে! শ্মশানে ওটা ন্যাংটা হাহা-হা! সংসারে ওটা ভিখিরী! হাহা-হা। ওই দেখ না কালীমন্দিরের আশে-পাশে ওই টেনা-পরা দুষ্যো দুষ্যো কুমারী মেয়ে একটা পয়সা দাও, একটা পয়সা দাও বলে বেড়াচ্ছে, ওর মধ্যে সেটাও আছে। চোখ থাকলেই দেখবে। সেদিন আবার ঢং করে ভেসে এসেছিল মড়া হয়ে।

হাহা-হা। ফেলে দিলে। তা ওই করবে তোমার বাঞ্ছাপূরণ? ধূর-ধূর-ধূর! মন্দিরে যেটা আছে সেটার মুখ চোখ জিভ সব তো তৈরী করা! হাহা-হা!

লোক জমে গিয়েছিল অনেক। জনকতক লোক কালীর নিন্দে করার জন্তে রেগে উঠেছিল। তান্ত্রিক হাহা-হা করে হেসেছিলেন। সে হাসি আর থামে না। সোমেশ্বরের রোমাঞ্চ হয়েছিল সে হাসিতে। তিনি তাঁর হাত চেপে ধরেছিলেন।—বাবা!

উঠে দাঁড়িয়েছিলেন তান্ত্রিক। তিনিও হাত চেপে ধরেছিলেন সোমেশ্বরের। সোমেশ্বর শিউরে উঠেছিলেন। তান্ত্রিকের হাতে যেন আগুনের মত উত্তাপ। চোখ দুটো ঝকমক করে উঠেছিল।

তান্ত্রিক বলেছিলেন, হবে। হবে। বাঁচবে ছেলে হেহে-হে! নিশ্চয় বাঁচবে। কিন্তু যজ্ঞ করতে হবে। করব আমি। আর ওষুধ দোব। খেতে হবে। হ্যাঁ।

—তাই করুন।

—হেহে-হে। সে এখানে নয়। বুঝেছ। এখান থেকে আমার ঘাড়ধাক্কা হয়ে গিয়েছে হেহে-হে। আমি তাতেই মনে মনে তোমাকে ডাকছিলাম, হেহে-হে! কীর্তিহাটে যেতে হবে। বুঝেছ! ওখানে সিদ্ধেশরীর আসন আছে। ওখানে বসে সাধন করব। হেহে-হে। হবে।

—তার সঙ্গে আমার স্ত্রীর মাথার দোষ হয় মধ্যে মধ্যে, তা-ও ভাল করে দিতে হবে।

—সব হবে, সব হবে, হেহে-হে! কি মজা, হেহে-হে। দেখ দেখ, যোগটা দেখ—হেহে-হে!

তারপর হঠাৎ একেবারে যেন উন্মাদ হয়ে গেলেন—জলন্ত দৃষ্টিতে মন্দিরের দিকে তাকিয়ে গালাগাল শুরু করলেন—হারামজাদী বেহায়া ন্যাংটা মাগী! এবার তোর একদিন কি আমার একদিন!

সোমেশ্বর তাঁর দৃষ্টি দেখে শিউরে উঠেছিলেন। কাত্যায়নীর মাথার ঘোমটা খুলে গিয়েছিল।

স্থূলতা, অলৌকিক শক্তিটক্তির কথা আমি তোমার মনে বা কারুর মনেই প্রতিষ্ঠিত করতে চাচ্ছিনে—চাইও না। কিন্তু পাগলের মত মানুষ যখন কিছু খোঁজে, ক্ষ্যাপা যখন পরশপাথর খুঁজে খুঁজে ফেরে, তখন এমনি দৃষ্টি চোখে ফোটে। আয়নায় আমিও মধ্যে মধ্যে আমার চোখে এমনি দৃষ্টি দেখেছি।

স্থূলতা কিছু বলতে যাচ্ছিল। এবং সে কিছু যে ব্যঙ্গ-শ্লেষাত্মক, তার আভাসও ফুটে উঠেছিল তার দৃষ্টিতে এবং ঠোঁট দুটির ভঙ্গিমার মধ্যে চাপা হাসিতে।

বাধা দিয়ে সুরেশ্বর বললে, থাম স্থূলতা, ব্যঙ্গ-শ্লেষ আমাকে. আজ বিঁধতে পারবে না। আমার মনে একটি বিশ্বাসের দুর্ভেদ্য বর্ম আমাকে ঢেকে রেখেছে। বহু সন্ধানে যা আমি পেয়েছি, তাই আমি বলছি। এই মুহূর্তে আমার চোখের দিকে—ঠিক ওইরকম না হলেও, অনেকটা ওইরকম দৃষ্টি দেখতে পাবে। ওতে আমি বিশ্বাস করেছি। কারণ, সোমেশ্বরের

স্ত্রীর এর পরের সন্তানটিই জীবন্ত অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হয়েছিল এবং বেঁচেও ছিল। সেটি কন্যা। তার তিন বছর পর হয়েছিল পুত্র। এবং কাত্যায়নী দেবীর মাথার গোলমাল ভাল হয়ে গিয়েছিল। তান্ত্রিক যজ্ঞ করেছিলেন, ওষুধও খাইয়েছিলেন। এবং এখনও আমাদের ওখানে বায়েনরা আছে, যারা ওই তান্ত্রিককে যথাসর্বস্ব দিয়ে সেবা করেছিল, তাদের তিনি বন্ধ্যাত্বের ওষুধ দিয়ে গিয়েছিলেন। আরও দুটি ওষুধ দিয়েছিলেন—একটি দু'দিন অন্তর পালাজ্বরের ওষুধ। একটি পয়সা একটি সুপুরী নিয়ে তারা ওষুধ আজও দেয়, শিকড় এবং কোন উদ্ভিদের পাতা, তারা দলে পিষে দেয়, লোকে চিনতে পারে না, তাতে লোকে সারে। আমি দেখেছি। তোমরা বিশ্বাস কর বা না-কর, রাসপুটিনের ইতিহাস রাশিয়ার কম্যুনিস্ট ইতিহাস থেকেও মোছে নি!

সুলতা তাকিয়েছিল ছবিটার দিকে।

সোমেশ্বরের হাত ধরে তান্ত্রিক দাঁড়িয়ে আছেন। দীর্ঘকায় সোমেশ্বরের হাত ধরে একটি সোজা মানুষ দাঁড়িয়ে আছে, মাথায় তাকে সুরেশ্বর সোমেশ্বরের থেকেও উঁচু করে এঁকেছে। বুকের মোটা মোটা হাড়গুলি প্রকট হয়ে উঠেছে।

আশ্চর্য রকমে সজীব হয়ে উঠেছে এই তান্ত্রিকটি। তার চোখ দুটো ধ্বক ধ্বক করে জ্বলছে। বড় বড় চোখের সাদা ক্ষেতে লালের আভা ফুটিয়েছে; প্রকট পঞ্জরাস্থিগুলির অন্তরালে রুক্ষ কঠোর বা ক্ষুধার্ত হৃদয়ের স্পন্দনের পর্যাপ্ত আভাস মিলছে। একটা রহস্যময় হাসি তার মুখে, ধূসর কালো গোঁফ-দাঁড়ির মধ্যে সাদা সুগঠিত দাঁতের সারি। বিদ্রূপ ব্যঙ্গের বাঁকা রেখায় সে-হাসি ধারালো তীক্ষ্ণ। হয়তো খানিকটা হিংস্র কিম্বা সেটার অর্থ ক্রুদ্ধ প্রভুত্ব! গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, পরনে গেরুয়া কাপড়, পায়ে খড়ম।

সুলতাকে ছবিটা আকর্ষণ করলে। সে উঠে কাছে গিয়ে দেখতে লাগল। সুরেশ্বর বললে—ব্যাকরণ নির্দেশ লঙ্ঘন করলে রূপ হয়তো থাকবে কিন্তু রূপের অন্তরালের রূপসী বা মোহিনী যিনি, তিনি মুখ ফেরাবেন নতুন বউয়ের মত। লজ্জা না বলি, সরম যাকে বলি, তা যার মধ্যে বেশী আছে, তিনি হয়তো এই মর্ডান যুগেও চোখ বুজে ফেলবেন। ছবি একটু দূর থেকেই দেখো, তাতে রূপসী অসঙ্কোচে রূপের রঙ-রেখার বাতায়নে মুখ রেখে চেয়ে থাকবেন। ছবিটার বৈশিষ্ট্য আছে। আশেপাশে যে বনচ্ছায়ার আভাস তার মাঝখানে তান্ত্রিক—কাছ থেকে একরকম, দূর থেকে দেখলে মনে হবে আঁধার ভেদ করে বেরুচ্ছে।

সুলতা হেসে পিছিয়ে এসে ছবিখানাকে দেখতে দেখতে বললে—সত্যিই ছবিটা বড় ভাল হয়েছে, সুরেশ্বর। তান্ত্রিক যেন কাছে টেনে নিয়ে যায়।

সুরেশ্বর জানলা দিয়ে বাইরে রাত্রির আকাশের সন্ধানে চোখ ফিরিয়ে বললে—ছবিটাকে বারকয়েক আমি এঁকেছি। বাস্তবের সত্যকে ফোটাতে চেয়েছি। রায়বাড়ীর কুলজী আর কীর্তিহাটের কড়চার উপকরণ খুঁজতে খুঁজতে একটা সত্য আমি আবিষ্কার করেছি, সেটা হল এই যে, একটা দুর্নিবার আকর্ষণে কিছু যেন টানে। আমি ওখানে গিয়ে তারই টানে যেন পড়ে গিয়েছিলাম। যত হাতড়াই, যত ভাবি এই পেয়েছি, ততই দেখি আরও গাঢ়তর অন্ধকারের মধ্যে গিয়ে পড়েছি। আর যত অন্ধকার গাঢ় হল, ততই মনে হল, এর চেয়ে সত্য

আর কিছু নেই।

বিচিত্র হেসে সুরেশ্বর বললে—গল্প শুনে ভেবেছিলাম, এর পর নিশ্চয় তান্ত্রিক ধরা পড়বে বুজরুক বলে। ক্রনোলজি ভেঙে একটা গল্প বলি—সেটা ঘটেছিল আমার পিতামহের অর্থাৎ রায়বংশের বিদগ্ধ শিরোমণি দেবেশ্বর রায়ের আমলে। এক তান্ত্রিক এসেছিলেন, ঘোর কৃষ্ণবর্ণ মানুষ, দাড়ি-গোঁফে-চুলে বেশ ঘোরালো চেহারার মানুষ। এসে রায়বাড়ীতে ওঠেন নি, বসেছিলেন রায়বাড়ীর বিমলদিঘির বাঁধা ঘাটে। তারপর পথচারীদের অতি পরিচিতের মত নাম ধরে ডেকে কাছে এনে কিছু কিছু গোপন কথা বলে বিমূঢ় করে দিয়েছিলেন। কিছু-ক্ষণের মধ্যে রটে গেল—ত্রিকালদর্শী পুরুষ এসেছেন। সব থেকে বিস্ময়কর কথা কিছু কানে কানে বলেছিলেন দেবেশ্বরকে। চমকে উঠেছিলেন তিনি। মেজঠাকুরদা শিবেশ্বর তখন প্রচুর খেয়ে খেয়ে ডিসপেপসিয়া ধরিয়েছিলেন, তাঁকে বলেছিলেন—বাবা, আপনার পাকস্থলীতে তিনটি অপাচ্য অন্ন রয়েছে। একটির বর্ণ লাল, একটির কালো, আর একটি নীলাভ। কোন বন্ধুরূপী শত্রুর বাড়ীতে সমাদরের নিমন্ত্রণের মধ্যে আপনাকে খাইয়েছে তারা। তার থেকেই এর সৃষ্টি। এবং এই অন্নই হয়তো—। অন্তত আপনার জীবনে সকল অন্নকেই বিষাক্ত করে দেবে। আর তার ছেলে ধনেশ্বরকে দেখে বলেছিলেন—এর সাংঘাতিক ফাঁড়া আছে। রায়-বাহাদুর তখন বেঁচে কিন্তু তিনি তখন তীর্থে। অবশ্য তিনি থাকলেও প্রভাবমুক্ত রাখতে পারতেন না নিজেকে। সে-কথা যাক। এর পর প্রতিকারের জন্য শ্মশানে কালীপূজার ব্যবস্থা হল। কৃষ্ণবর্ণ ছাগ থেকে শুরু করে আয়োজন উপকরণ অনেক।

লোকটা বুজরুক। খেলাটা শেষ পর্যন্ত গুটিয়ে তুলতে পারেন নি। মহানিশায় শ্মশানে কালীকে একাকিনী অবস্থায় ফেলে দিয়ে মূল্যবান দ্রব্যগুলি পোঁটলা বেঁধে নিয়ে পালিয়ে ছিলেন। মূল্যবান দ্রব্যের মধ্যে সব থেকে মূল্যবান ছিল একটি নীলা আর একটি পান্না। শনি এবং রাহুর দশা বলে নীলা ধারণের ব্যবস্থা করেছিলেন। কলকাতা থেকে নীলা এসেছিল, সে আমলে দুটি রত্নের দাম নিয়েছিল সাতশো টাকা। দেবোত্তরের খাতায় খরচ পড়ে আছে।

এদের আপসোস হয়নি। এঁরা নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন এই কারণে যে, লোকটা যেহেতু বুজরুক ভণ্ড, সেইহেতু তার সব কথাই মিথ্যা হতে বাধ্য।

এসব গল্প মুখরোচক। ওই গুণে শুধু বেঁচেই নেই, হাত পা ছড়িয়ে বেঁচে আছে। আমারও শোনা ছিল। সুতরাং সোমেশ্বর তান্ত্রিককে নিয়ে এসে কীর্তিহাটে যজ্ঞ করিয়েছিলেন শুনে ভেবেছিলাম এমনি কিছু একটা সত্য প্রকাশ পাবে। যেটা কীর্তিহাটের বক্তাদের কাছে দুর্বোধ্য এবং দুর্ভেদ্য হলেও আমার মত বিদগ্ধ শ্রোতার কাছে ধরা পড়বে। কিন্তু বিস্ময়ের কথা তা পড়ে নি। শুধু তাই নয়—আজও সেই তান্ত্রিকের ওষুধ ওখানে অনেক জনের মধ্যে সফল হচ্ছে। আমার দু'দিন অন্তর জ্বর হয়েছিল, ডাক্তারি ওষুধে, কুইনিন-ইনজেকশনে বন্ধ হয় নি। আমি ভাল হয়েছি ওই ওষুধে। খেতেও হয় নি। একটা পয়সা আর একটা সুপুরী নিয়ে ওখানকার বায়েনরা একটা জলজ উদ্ভিদ দলে পিষে হলুদমাখা ন্যাকড়ায় বেঁধে শুঁকতে দিয়েছিল। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত শুঁক জলে ফেলে দিতে হয়। এও সেই তান্ত্রিকের ওষুধ।

সেই তান্ত্রিকের ওষুধে আর যজ্ঞের ফলে রায়বাড়ীর বধূ রাজকুমারী কাত্যায়নী দেবী বৎসর খানেক পরেই জীবন্ত-কন্যা প্রসব করলেন। এ প্রত্যাশা সকলেই করেছিলেন, কারণ অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় তিনি আগে দু'মাস থেকেই বিষণ্ণ হতেন, তিন-চার মাসে ঘরে ঢুকতেন, বোবার মত হয়ে যেতেন। পাঁচ-ছ' মাস থেকে আগুনের মত উগ্র হয়ে উঠে সমস্ত সংসারটাকে দাহন করতেন। এবার তার কিছুই হয়নি।

তান্ত্রিক বলেছিলেন—পুত্র হোক, কন্যা হোক—ব অক্ষর আদিতে রেখে নামকরণ করো।

তান্ত্রিক তখন গত হয়েছেন। কংসাবতীর জলে নৌকাডুবিতে ভেসে গেছেন। সোমেশ্বরের আর আপসোসের সীমা ছিল না। তিনি তান্ত্রিককে কীর্তিহাটে এনে এখানেই বাস করিয়েছিলেন। তান্ত্রিকের প্রায় ক্রীতদাস হয়ে পড়েছিলেন। উগ্র তান্ত্রিক উপদ্রবের শেষ রাখতেন না। কালী-মায়ের পূজক তাঁর ভয়ে পালিয়েছিল। পূজা করতেন তান্ত্রিক নিজেই। বিচিত্র লোক। তাঁর নিজের কাছে ছিল এক শালগ্রাম শিলা—তাঁর পূজা আর কালীর পূজা করতেন একসঙ্গে। শিউরে উঠত সকলে। কিন্তু কেউ কিছু বলতে সাহস করত না। কারণ, কাত্যায়নী তখন অন্তঃসত্ত্বা হয়েও সুস্থ স্বাভাবিক আছেন। ওদিকে কলকাতায় একটা প্রকাণ্ড মামলায় জয়ী হয়েছেন সোমেশ্বর।

তান্ত্রিক খবর শুনে হেসে বলেছিলেন, হাহা—হাঃ। হাহা—হাঃ। হবে না। হাহা—হাঃ—সৌভাগ্য-শিলা রাজরাজেশ্বর—হাহা—হাঃ!

এরই কিছুদিন পর।

তান্ত্রিক তখন যেন অতি অস্বাভাবিক হয়ে উঠেছেন। কাঁসাইয়ের ওপারে যে জঙ্গলটার কথা এবং যে শিমুলগাছটার কথা আমি বার বার বলেছি, যেখানটাকে তান্ত্রিক চিনেছিলেন এক সিদ্ধাসন বলে, লোকে যেটাকে বলত সিদ্ধেশ্বরীতলা, সেখানে তিনি পঞ্চপর্বের রাত্রে যেতেন সাধনা করতে। রাত্রে যেতেন নৌকা করে, সঙ্গে যেতেন সোমেশ্বর, তাঁকে উত্তর সাধক হবার প্রতিশ্রুতি তিনি করিয়ে নিয়েছিলেন। আর বায়েনদের একজন খুঁজে খুঁজে তাঁকে শব এনে দিত। সেদিন ছিল চতুর্দশীর রাত্রি।

ভাদ্র মাস। কাঁসাই তখন দুকূলপ্লাবিনী। সোমেশ্বর, তান্ত্রিক আর সোমেশ্বরের অতি অনুগত দু'জন—তারা হাড়ি এবং শিবে বাগ্দী, এরা যেত নৌকা নিয়ে। তারা হাড়ি আর শিবে বাগ্দীকে বলা চলে তাল আর বেতাল, যদি সোমেশ্বরকে বলা যায় বিক্রমাদিত্য। উৎসবে, ব্যসনে, দুর্ভিক্ষে, রাষ্ট্রবিপ্লবে, রাজদ্বারে ছাড়াও এরা বন্যায়, অগ্নিদাহে, শত্রুহননে সর্ববিধ কর্মেই সোমেশ্বরের সঙ্গী। এদের হাতে নৌকাখানা কংসাবতীর প্রলয়ঙ্করী উন্মাদনাকে মথিত করে ঠিক ওই জঙ্গলে গাছের গোড়ায় গিয়ে লাগত। এঁরা দুজনে সব উপকরণ নিয়ে গিয়ে উঠতেন শিমুলতলায়। উপকরণ সব সাজিয়ে নিয়ে তান্ত্রিক বলতেন সোমেশ্বরকে —যাঃ।

চলে আসতেন সোমেশ্বর। ফিরে এসে নৌকায় বসতেন। যতক্ষণ না সাড়া দিতেন তান্ত্রিক ততক্ষণ যাবার হুকুম ছিল না। ওদিকে জঙ্গলে থাকত ভরু বায়েন। তার কর্ম ছিল ওই শবটিকে বেশ ভাল ক'রে তালপাতার চ্যাটাইয়ে জড়িয়ে গাছের উপরে বেঁধে রাখা। ভোর-

বেলা উঠে আসতেন তান্ত্রিক। ধরে নিয়ে আসত ভরু, তারপর ধরতেন সোমেশ্বর। এনে নৌকায় চাপাতেন। এপারে এসে সেই শেষ রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে তারা এবং শিবে তাঁকে ধরাধরি করে এনে শুইয়ে দিত তাঁর ঘরে। সোমেশ্বর স্নান করে চলে যেতেন অন্দরে।

এরই মধ্যে সেদিন ওপার থেকে ফিরবার সময় হঠাৎ নৌকোখানা গেল উল্টে। ভরা কাঁসাই। তার উপর আকাশে ছিল মেঘ-ঝড়। সমুদ্র খুব দূরে নয়। তুফান এখানে বেশী হয়। নৌকা উল্টে সকলে ডুবল জলে। সোমেশ্বর, শিবে, তারা তিনজনে কোনক্রমে সাঁতার দিয়ে পাড়ে উঠলেন কিন্তু সারারাত্রির সাধনার পর মদ্যপান এবং সাধন-ক্লান্তিতে বিবশচৈতন্য এবং অবশ-দেহ তান্ত্রিক গেল ভেসে। এঁরা কাদা মেখে ঘরে ফিরলেন। তান্ত্রিকের আর সন্ধান মিলল না। হয়তো এখানে তাঁর সাধনা সিদ্ধ হবার নয়, সিদ্ধি অপেক্ষা করছিল গঙ্গাসাগর সঙ্গমে। কাঁসাই হয়ে হলদী। হলদী হয়ে ভাগীরথী। তারপর হিজলীর পাশ দিয়ে ওপাশে কাকদ্বীপকে রেখে রসুলপুরের মোহনা পার হয়ে সাগরদ্বীপে সাগরসঙ্গমের আবর্তের মধ্যে সিদ্ধি তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিল।

সোমেশ্বর লজ্জায় ভয়ে মুহ্যমান হয়ে গেলেন। খোঁজ তিনি করালেন অনেক। কিন্তু পেলেন না। লজ্জা এই জন্যে যে, নিজে বাঁচলেন অথচ তান্ত্রিক শ্যামাকান্তকে বাঁচাতে পারলেন না। ভয়, এরপর যদি বিঘ্ন ঘটে, যদি কাত্যায়নীর উন্মত্ততা দেখা দেয়। কিন্তু তা দেয় নি। তবু তিনি আতঙ্কিত হয়ে বজরায় অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে কাত্যায়নীকে নিয়ে চলে গেলেন কলকাতায়। কীর্তিহাটে যেন আতঙ্ক দেখছিলেন। কলকাতায় জন্ম হল তাঁর প্রথম জীবিত সন্তান—কন্যার। নাম হল বিমলা।

বিমলার অন্নপ্রাশন হল কীর্তিহাটে। শুধু অন্নপ্রাশন নয়—সঙ্গে সঙ্গে তান্ত্রিকের শালগ্রাম, সৌভাগ্য-শিলা রাজরাজেশ্বরের প্রতিষ্ঠা হল।

খরচ হয়েছিল কুড়ি হাজার টাকা।

রাজরাজেশ্বরের স্বতন্ত্র চত্বর এবং মন্দির—দশ হাজার টাকা। রাজরাজেশ্বরের এক মুকুট তৈরী হয়েছিল সায়েব জুয়েলারদের বাড়ীতে। হীরে বসানো ছিল পাঁচখানা। মিহি মুক্তোর ঝালর ছিল। দাম এক হাজার টাকা।

বাকীটা উৎসব, ভোজন, দান।

যে মামলাটায় জিতেছিলেন, তাতে সোমেশ্বর পেয়েছিলেন এক লক্ষ টাকার ডিক্রী। বাকী আশী হাজার টাকায় কিনেছিলেন নতুন জমিদারী। সেরেস্তা বড় হল। ম্যানেজার বহাল হল নায়েবের বদলে। বরকন্দাজ বহাল হল পশ্চিমদেশী; ভোজপুরী জোয়ান। শিবে-তারার মধ্যে তারা থাকত কলকাতায় সোমেশ্বরের কাছে। শিবে মরেছে বাঘের হাতে। হলদীর মোহনার কাছে গিয়ে আর ফেরেনি।

নতুন ম্যানেজার পাকা লোক ছিলেন, মহিষাদলের রাজা গর্গবাহাদুরদের স্টেটের অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ম্যানেজার। দেওয়ানদের নতুন নাম হয়েছে ম্যানেজার। গিরীন্দ্র আচার্য। গর্গবাহাদুরদের কুনজরে পড়েছিলেন। তাঁকে আশ্রয় দিলেন সোমেশ্বর, বসবাস করালেন।

আর আনলেন নবদ্বীপ থেকে রামব্রহ্ম স্মৃতিতীর্থকে। কুড়ারাম রায় ভট্টাচার্য দীক্ষা

নিয়েছিলেন নবদ্বীপে, কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের এক বংশধরের কাছে। তিনি গত হয়েছেন, আছেন গুরু-মা। সোমেশ্বর দীক্ষা নিয়েছেন গুরু-মার কাছে। সেই গুরু-মাই দিলেন এই তরুণ ছেলেটিকে, বাইশ-তেইশ বৎসর বয়স, নিষ্ঠাবান ধার্মিক এবং পণ্ডিত ছেলে, ওঁদেরই জ্ঞাতি। মায়ের পূজায় বা প্রভু রাজরাজেশ্বরের সেবার কোন ত্রুটি হবে না, হতে পারে না।

এ ব্যবস্থা সোমেশ্বরের নয়, এ-ব্যবস্থা কাত্যায়নী দেবীর। তাঁর মস্তিষ্ক এখন সুস্থ। কন্যাকে কোলে নিয়ে বর্ষার পৃথিবীর মত শান্ত শীতলা। তবে মধ্যে মধ্যে ঝড় উঠলে সেটা ছোটখাটো সাইক্লোন হয়ে দাঁড়ায়। দেবসেবায় ত্রুটি হলে তাঁর কন্যার অমঙ্গল হবে। সুতরাং সে-ব্যবস্থা তিনি করলেন। শুধু এখানের নয়, তাঁর পিত্রালয়েরও। এরপর থেকে রায়বংশে কাত্যায়নী দেবী এক দীপ্তিময়ী দেবী।

সমস্ত রায়বংশ, কীর্তিহাট কাত্যায়নী দেবীর ভয়ে কাঁপত।

তিন বছর পর ভূমিষ্ঠ হল পুত্র।

ব দিয়ে নাম। নাম হল বীরেশ্বর রায়। বীরেশ্বরের জন্ম কলকাতায়। সোমেশ্বর রায় তখন কলকাতায় খুব কর্মব্যস্ত। তাঁর অভ্যুদয় হচ্ছে, অপ্রত্যাশিত অভ্যুদয়। ইংরেজ অ্যাটর্নীর কাছে টণ্ডির কাজ করে আইনে তাঁর খ্যাতি হয়েছে। অনেক বড়ঘরের ল-এজেণ্ট হয়েছেন। দ্বারকানাথ ঠাকুর তখন এদিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। তাঁর কাছে যান। তিনি পছন্দ করেন। দ্বারকানাথ তখন নুনের দেওয়ানের চাকরী ছেড়ে স্বাধীনভাবে নানান ব্যবসা করছেন। তাঁর মধ্যে আইনের পরামর্শদাতা হিসেবে নাম তাঁর খুব। তিনি ল্যাণ্ড হোল্ডারস সোসাইটি স্থাপন করেছেন, প্রসন্নকুমার ঠাকুর তাঁর সহকারী ; সোমেশ্বর প্রসন্নকুমারের সহকারী বা সহযোগী। এই সময়টা তখন জমিদারদের একটা দুঃসময়। কোম্পানী নতুন আইন করে লাখেরাজ ব্রহ্মত্র নানকার প্রভৃতির উপর কর ধার্য করতে চেষ্টা করছেন। ওদিকে লিমিটেশন এ্যাক্ট ক'রে লর্ড ওয়েলেসলী জমিদারদের একটা বড় ঘা দিয়ে গেছেন। প্রজার চার বছর খাজনা বাকী হলেই বৎসরান্তে শেষ বছরের খাজনা তামাদি বলে গণ্য হবে। অবশ্য চার বছর খাজনা বাকী হলে শতকরা ২৫ টাকা সুদ জমিদার পাবে। এদেশে সুদ ছিল মহাজনীতে খাজনায় জমিদার সুদও নিতেন না এবং প্রজার খাজনা যত কালেরই বাকী থাক, দিতে সে অস্বীকার করত না। ছ আইন সাত আইন উঠে গেছে। প্রজাকে বেঁধে রেখে খাজনা আদায় করা যায় না। জমিতে গাছ ধান ক্রোক করে টাকা আদায় নিষিদ্ধ হয়েছে। এর উপর এই লাখেরাজ বাজেয়াপ্ত বা তার উপর খাজনা ধার্য হলে জমিদার এবং তার সঙ্গে বাংলার মধ্যবিত্ত গৃহস্থের সর্বনাশ হয়ে যাবে।

সব থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হতে চলেছেন রাণী কাত্যায়নী, পাইকপাড়ার রাণী, কান্দীর রাণী। দ্বারকানাথ তাঁর এস্টেটে আইনের পরামর্শদাতা। সোমেশ্বর তাঁর সহকারী। এ-বাড়ী রায়-বংশের স্থাপয়িতা কুড়ারাম রায় ভট্টাচার্যের মনিব-বংশ বলতে গেলে। তারপর লালাবাবু এ-বংশের সব অপরাধ মুছে দিয়ে পুণ্যবংশে পরিণত করেছেন। এ-সব লাখেরাজ রাজস্বমুক্ত সম্পত্তি, কোম্পানী সরকারের প্রকাশ্য নীলামে লাখেরাজ বলে সরকারই নীলেম করিয়েছেন, কিনেছিলেন লালাবাবু দেবত্র হিসাবে। বিহারে এবং অযোধ্যা অঞ্চলে বৃন্দাবনের কাছে সে

সম্পত্তি অনেক সম্পত্তি।

এখন কোম্পানীই দাবী করছেন, খাজনা দিতে হবে। নতুন কালে খবরের কাগজ হয়েছে। ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া, ক্যালকাটা কুরিয়ার, ইংলিশম্যান। বাংলা কাগজও হয়েছে।

এসবের মধ্যে সোমেশ্বর জড়িয়ে পড়েছেন। তাতে তাঁর প্রতিষ্ঠাও হয়েছে। তবে তিনি হিসেবী লোক, সব কাজেই হিসেব করে নামেন। রামমোহন রায়ের সতীদাহ প্রথা বন্ধ করবার মত আন্দোলনের বাইরে থেকেছেন। সে-সব ক্ষেত্রে তিনি রাধাকান্ত দেবের দলের লোক। দ্বারকানাথের একখানা মজার পত্র আছে তাতে। তিনি সোমেশ্বরকে লিখেছেন, "আমি জানিয়া আশ্চর্য হইলাম যে, স্ত্রীর কথায় তুমি সতীদাহ ও বিধবাবিবাহ সমর্থন হইতে পশ্চাদপদ হইতেছ। ইহা লজ্জার কথা। অতীব লজ্জার কথা।" কাত্যায়নী দেবীর ভয়ে সোমেশ্বর রাধাকান্ত দেবের দলে যোগ দিয়েছিলেন।

এ-সবের নজীর থাকে-থাকে সাজানো ছিল এই জানবাজারের বাড়ীতে। এ-সব আমি অনেক পরে-পরে আবিষ্কার করেছি। আগেরটা পেয়েছি পরে, পরেরটা পেয়েছি আগে। তোমাকে বলবার সময় গুছিয়ে বলছি। আর কিছু শুনেছি গল্প, তার বেশীর ভাগ মেজঠাকুমার কাছে।

* * * *

সুলতা, মেজঠাকুমা আমার মধ্যে-মধ্যে দুঃখ করে বলতেন, সুরেশ্বর, ওরে আমার ভয় হয় কি জানিস? ভয় হয় আমার না রাবণের মা নিকষার দশা হয়! রায়বংশের পুরী আগ্‌লে আমাকে না বসে থাকতে হয়, সেই পৃথিবীর শেষদিন পর্যন্ত।

সুরেশ্বর বললে—আমি সেদিন সকালে যেন অন্য মানুষ হয়ে গেছি সুলতা। আমি সেই মডার্ন আর্টিস্ট, বিদ্রোহী আধ-পাগলা সুরেশ্বর নই; একটা ভাবের ঘোরের মধ্যে চলে গেছি ১৮৩৭-৩৮ সালে। মধ্যে-মধ্যে সোমেশ্বর রায় হতে চেষ্টা করছিলাম। ওই তান্ত্রিক সন্ন্যাসীকে কল্পনা করেছি, মনে হয়েছে চোখে তাকে দেখছি। তোমাকে কাত্যায়নী ভাবতে চেষ্টা করেছি, এমন কি ব্রজদার সেই শেফালি মেয়েটিকে ভাবতে চেষ্টা করেছি, সোমেশ্বরের প্রেয়সী-বাঈজী। ওই যাদের হাতে টাকা দিয়ে সেদিন ঘরে যেতে বলে এসেছিলাম, তাদের ভাবতে চেষ্টা করেছি, সোমেশ্বর রায়ের সেবাদাসী ঝি।

সুলতা হেসে ফেললে। বললে—মনে-মনে পরম তৃপ্তি নিশ্চয় পেয়েছিলে। কিন্তু আমার নামটা টানছ কেন? যদি-বা সেদিন তোমার তা মনে হয়ে থাকেই তবে ওটা বাদ দিয়েই বল। ওর জন্যে তোমাকে ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের মত অশ্বত্থামা হত ইতি গজ বলার জন্য নরক-দর্শন করতে হবে না, বা তোমার রথখানি মাটির উপরে বাতাসলোকে চলে না যে ধপ করে মাটিতে আছড়ে পড়বে।

হেসে সুরেশ্বর বললে—এত আছাড় খেয়েছি সুলতা যে, তা খেয়ে আছাড়-প্রুফ হয়ে গেছি। পাহাড়ের শিখর থেকে সমতলে পড়েছি, স্বর্গ থেকে নরকে পড়েছি; তা নইলে আজ তোমার এই কথাটিতেই আছড়ে প'ড়ে হাত-পা ভাঙতাম। ঝগড়া করব না, ধরে নাও কাত্যায়নী তোমাকে ভাবি নি। তবে কথাটা এই যে আমি সেদিন সকালে যেন মৃত্যুপুরী

বা অতীত কালের যবনিকা ঠেলে বর্তমানের দিকে পিছন ফিরে অভিভূতের মত হাতড়ে-হাতড়ে চলেছিলাম, হঠাৎ পথ হারিয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছিলাম। এই সময়ে বেলা তখন দশটা, মেজঠাকুমা এলেন, আমাকে চরণোদক দিয়ে নির্মাল্য মাথায় ঠেকিয়ে ওই কথাগুলি বললেন।

অভিভূত সুরেশ্বর ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞাসু হয়ে মেজঠাকুমার দিকে তাকালে।

মেজঠাকুমা অত্যন্ত ম্লান হেসে বললেন—ধনেশ্বর গাল দিচ্ছে রে! ওই কথা বলে গাল দিচ্ছে। বলছে, আজ ওই বিশ্বাসঘাতিনীই সুরেশ্বরকে সব লাগাচ্ছে। ধ্বংস করছে মেজ-তরফকে। নিকষার মত হবে তুমি!

সুরেশ্বর বললে—না ঠাকুমা, পুরাণের কোন দুঃখিনীর সঙ্গে যদি তোমাকে তুলনাই করতে হয়, তবে তুমি গান্ধারী। গান্ধারীর স্বামী অন্ধ ছিলেন বলে সারাজীবন চোখে কাপড় বেঁধে ছিলেন, আলো দেখেন নি। তুমি বিয়ে করেছিলে ষোল বছর বয়সে ষাট বছরের শিবেশ্বর রায়কে। কুশণ্ডিকার হোমের আগুনে তুমি তোমার ষোল থেকে পঞ্চাশ, এই যৌবন কালটিকে আহুতি দিয়ে একেবারে একান্ন বছরের প্রৌঢ়া হয়েছিলে। তুমিই তো দুর্যোধন, দুঃশাসনকে উপেক্ষা করে সত্য কথা বলবে। নইলে কে বলবে বল!

মেজঠাকুমা বললেন—মনটা জুড়িয়ে দিলি ভাই। আমি এখন যাই রে। একবার বাপের বাড়ী যাব, ওপাড়ায়, আমার বিধবা ভাজ খালাস পাচ্ছে। ভুগছে অনেক দিন থেকে। ডাক্তার বলেছে, আজ আর পার হবে না, একবার দেখে আসি।

সুরেশ্বর চমকে উঠে বললে—আর কোন বড় ডাক্তার দেখালে না?

—ডাক্তার? কি হবে?

—মানে?

—মানে বিয়ের এক বছরের মধ্যে বিধবা হয়েছে। ছেলে নেই, পুলে নেই। লোকের বাড়ী বলতে গেলে খেটে খায়। প্রথম যৌবনে লোকে এত মিথ্যে কলঙ্ক দিয়েছে যে, বেঁচে ছিল শরশয্যেতে ভীষ্মের মত! আমার থেকেও বছর চারেকের ছোট। কি করবে বেঁচে?

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে চুপ করে রইল সুরেশ্বর।

মেজঠাকুমা একটু হাসলেন, যে হাসিতে অন্যের চোখে জল আসে। পা বাড়িয়ে আবার ফিরলেন, বললেন—হ্যাঁরে, চায়ের আগে দুখানা বাতাসা দিয়েছিল রঘু? খেয়েছিস?

—বাতাসা?

—হ্যাঁ, রাজরাজেশ্বরের শয্যাভোগ?

—শয্যাভোগ?

—হ্যাঁ। এখানে শয্যাভোগ হয় ঠাকুরের। আমি বাড়ীতে বলে রেখেছিলাম, তারা ভোর বেলাতেই দিয়ে গেছে। আমাকে বললে তারা?

রঘু বললে—হ্যাঁ, উতো দিয়ে গিয়েসে।

—তা দিস নি কেন ?

—উ।

—ওরে বড়লোকের চাকর বড়লোক! উ! মানে উ কি খাবে আমার বাবু! দে এনে দে। খা ভাই। আমি দেখে যাই। খা।

দুখানি ছোট বাতাসা। মেজঠাকুমাই মুখে ফেলে দিলেন। খেতে হল সুরেশ্বরকে। তবে গুড়ের বাতাসা, খারাপ লাগল না।

মেজঠাকুমা বললেন, আগে বরাদ্দ ছিল কাঁচা মিষ্টির। দুটি করে কাঁচা মিষ্টি, ঠাকুরের শয়নের সময় পাশে রেকাবীতে করে রাখা থাকত। আর জল। বরাদ্দ করেছিলেন রাজকুমারী বউ-কাত্যায়নী। ফোমেশ্বর রায়ের স্ত্রী। লোকে বলত, বাঘিনী ঠাকরুণ। সুরেশ্বর হেসে বললে, সোমেশ্বর রায়কে মেজঠাকুমা বলেন, ফোমেশ্বর রায়। শ্বশুর-স্বামীর নাম তো করতে ছিল না সেকালে। তারপর সুরেশ্বর জের টেনে বললে—মেজঠাকুমা বললেন—তাঁর মেয়ে বিমলা যখন দু বছরের তখন শেষরাত্রে উঠে সে ক্ষিদে পেয়ে কাঁদত। উপরি উপরি দিন কয়ের পর একদিন ঝিকে বললেন—মাথার গোড়ায় দুটো করে মিষ্টি রেখে দিস, আর এক গ্লাস জল। সঙ্গে সঙ্গে মনে হল কীর্তিহাটেও তো খুকী-খোকা আছে, মা মুক্তকেশী খুকী আর রাজ-রাজেশ্বর গোপাল! তাহলে তো তাঁদের ক্ষিদে পায়! এই পরদিন উঠেই হুকুম হল, বজরা সাজাও, আমি কীর্তিহাট যাব। এসেই সেই দিন থেকেই এই ব্যবস্থা হল। সেকালে মিষ্টান্ন তৈরী হ'ত বাড়ীতে। বড় বড় গাই ছিল, মোষ ছিল। ঠাকুরবাড়ীতে হালুইকর বামুন ছিল। তারা ক্ষীর করে, ক্ষীরের নাড়ু তৈরী করে দিত। তারপর তোমার ঠাকুরদাদের আমলে চাকরান জমি দেওয়া হয়েছিল ময়রাদের। তারা কাঁচা মিষ্টি দিয়ে যেত। তারপর তোমাদের সেরেস্তা থেকে ময়রার নিজের খাজনার জোতের উপর যখন বাকী খাজনার নালিশ হল, তখন ওই মিষ্টির জমিটা সমেত ভুক্তান করে নালিশ হল। নালিশের ডিক্রীর দায়ে জোত নীলেম হয়ে গেল। কিনলে ধনেশ্বর। তারপর ময়রা মিষ্টি বন্ধ করলে। তখন থেকে দুখানা বাতাসা ব্যবস্থা হল।

হাসলেন মেজঠাকুমা। বললেন—ওবেলা আসব ভাই, এবেলা যাই। ছুঁড়িটাকে বড় ভাল বাসতাম। শেষ দেখাটা করে আসি।

—চল আমি যাই।

—তুই যাবি ?

—যাব না ? তুমি যাচ্ছ, আমি যাব না কেন ?

—আয়। তার ভাগ্য! যাচ্ছিস যদি তবে তার অস্থিটা অন্ততঃ যাতে গঙ্গা পায় তার ব্যবস্থা ক'রে দে ভাই। দেহ নিয়ে আর কেউ যায় না; আর তাতে বাস্‌মড়াও হয়ে যায়। অস্থিটা পাঠিয়ে দে।

—সে তুমি দেবে। তুমি হুকুম করবে, আমি তামিল করব।

বিহ্বল হয়ে গেল মেজঠাকুমা। নীরবেই পথ চলতে লাগল। সদর রাস্তায় না গিয়ে রায়বাড়ীর পাশ দিয়ে স্নানের পুকুর, দুধপুকুরের বাগানের মধ্য দিয়ে চলছিল মেজঠাকুমা।

হঠাৎ এক জায়গায় থমকে দাঁড়িয়ে বললে—এই খানটায় গোপেশ্বর সুখেশ্বরকে মেরে ফেলেছিল।

সুরেশ্বর বললে—চল। দুঃখ আর কত করবে?

মেজঠাকুমা বললেন—তা ঠিক বলেছিস ভাই। দুঃখ আর কত করব। তাই তো এত বড় ঘেন্নার কথার কলঙ্ক দিয়ে সেদিন ওরা যখন গুজব রটালে তখন প্রথমটা বুকে যেন শেল বিঁধেছিল। কি দুঃখ যে হয়েছিল কি বলব! কিন্তু ওই বলেই বুঝিয়েছি, দুঃখ আর কত করব!

হঠাৎ দাঁড়িয়ে গিয়ে বললেন—আঃ হায় হায় হায়! এ্যাঁ! এ গাছটাও কেটে ফেলেছে! সামনে একটা প্রকাণ্ড থালের মত গর্ত। কোন বড় গাছ সমূলে কাটার চিহ্ন!

—হ্যাঁ, কোন বড় গাছ ছিল এখানে।

বাগানের সব থেকে বড় আমগাছ ছিল এখানে। গাছটা দুধপুকুরে বাগান করবার সময় কুড়ারাম মশায় রাজকুমারী পুত্রবধূকে দিয়ে পুঁতিয়েছিলেন। মালদা'র আমের গাছ। আঁটির গাছ, গুঁড়িটা ছিল এত মোটা যে, দুটো মানুষে হাত বাড়িয়েও জড়িয়ে ধরতে পারত না। হুঁঃ! বলে একটি আক্ষেপসূচক ধ্বনি তাঁর কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে এল। তারপর বললেন—এ সুখেশ্বরের ছেলেদের কাজ! ওই যে কল্যাণেশ্বর, ওর মত কুটিল আমি দেখি নি। ওর বাপ বাইরে যত ভদ্র ছিল, ভেতরে তেমনি ছিল কুটিল। ওই তো তোর মেজ-ঠাকুরদাকে ঠাকুরদের গয়না বিক্রী করে বিঘে-কতক ডাঙ্গা কেনা হল এই জমাখরচ দেখিয়ে টাকাটা মারবার ফন্দী দিয়েছিল। ঠিকেদারী করে কল্যাণেশ্বর গাছ থেকে তক্তা তৈরী করিয়েছে।

—চল ঠাকুমা বড় বাজে বকছ।

—বাজে বকছি?

—বকছ না?

—তুই ছোঁড়া বুঝবি নে রে। এর বেদনা তুই বুঝবি নে। কলকাতার মানুষ তুই, এখানকার তো নস! জানিস, এ গাছের একটা গল্প আছে। গাছটা তখন বেশ বড় হয়ে উঠেছে। কাত্যায়নী ঠাকরুন পুকুরে চান করছেন, তখন বয়স পঁয়তাল্লিশের পার। এই গাছে এক ছোঁড়া ডোম উঠেছিল আম পাড়তে। ঠাকরুণ এসে ঘাটে বসেছেন, গায়ের কাপড় খুলে দাসীতে তেল মাখাচ্ছে। ছোঁড়ার কপালে দৈবঘাত, সে ওই রঙ দেখে হাঁ করে তাকিয়ে দেখেছিল। আর পড়বি-তো-পড় ঠাকরুণের নজরেই পড়। ঠাকরুণ হেঁকেছিলেন, কে রে শূয়ারের বাচ্ছা! ছোঁড়াটা ভয়ে হুড়মুড় করে ডালে-ডালে পাঁচিলে নেমে লাফিয়ে পড়ে পালিয়েছিল। পাঁচিলের বাইরে এই যে ঢিবিটার উপর দিয়ে যাচ্ছি, এইটেই ছিল তখন ডোমপাড়া। কত্তারাই বসিয়েছিলেন। বাড়ীতে তারা জমাদারের কাজ করত। ঠাকরুণ তৎক্ষণাৎ উঠে দাসীকে বলেছিলেন, মাহুতকে বল জংবাহাদুরকে পাঁচিলের ওপাশে নিয়ে আসবে। পিঠে সাজটাজের দরকার নেই। আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। হারামজাদী হেলে-দুলে আস্তে-আস্তে যাবি নি, দৌড়ে যাবি। বুঝলি—আমি একশো গুনব। তার মধ্যে না

এলে ঝাঁটা-পেটা করব। যা। একশোর মধ্যেই সে এনেছিল। তারপর বোধ হয় দুশো-তিনশো গুনতে গুনতে হাতী এল। হুকুম হল, ডোমরা সব জিনিসপত্র বের করে নাও ঘর থেকে! পাঁচশো গুনব আমি। তারপর হাতী ঘর ভেঙে দেবে। কাত্যায়নী ঠাকরুণ বাঘিনী ঠাকরুণ। ডোমরা বাদ-প্রতিবাদ করেনি, বেরিয়ে এসে সরে দাঁড়িয়েছিল। ঠাকরুণ মাহুতকে বলেছিলেন, সমশের জংবাহাদুরকে বল—পাড়াটা ভেঙে মাঠ করে দেবে। তারপর অবিশ্যি ডোমদের জায়গা দেওয়া হয়েছিল, ঘর করবার জন্যে, টাকা, খড়, বাঁশ, তালগাছ দেওয়া হয়েছিল, তা হয়েছিল। কিন্তু ওই ছোঁড়াটাকে গাছে বেঁধে দশকোড়া লাগিয়েছিল চাপরাশীরা। এ গাছটা সেই গাছ রে!

৬

সুরেশ্বর এসে ভালই করেছিল, নইলে হতভাগিনী বিধবার শেষকৃত্যটাও হত জীবনকালের বেঁচে থাকার লাঞ্ছনার চেয়েও কঠিনতর লাঞ্ছনার মধ্যে।

একটি সংখ্যাগরিষ্ঠ দল ঘোঁট পাকিয়েছে—এর প্রায়শ্চিত্ত হয় নি। একজন ম্যাট্রিক ফেল হাফ-মাতব্বর ছেলে বলেছে—ডাক্তারের কাছে শুনেছে রোগটা টিবি ইণ্টেস্টাইন।

প্রবীণদের মধ্যে কয়েকজন ধনেশ্বরের নেতৃত্বে আলোচনা করেছেন, ওর যৌবনে যে অপবাদ হয়েছিল তা অপবাদ নয় সত্য। তার জন্য ওকে কোন যজ্ঞিতে রাঁধতে পর্যন্ত কাঠি দিতে দেওয়া হ'ত না। এ ক্ষেত্রে অন্তত প্রায়শ্চিত্ত একটা হয়ে থাকলে কথা ছিল না। কিন্তু যখন হয় নি তখন এতে কে কাঁধ দেবে!

ধনেশ্বর বলছেন—আমাদের স্টেট থেকে পাঁচ টাকা দেবার কথা ছিল এইসব অনাথা দরিদ্রের সৎকারের জন্যে। তাই বা কি করে দেব? এ তো একরকম ধর্মচ্যুত! রায়বাড়ীর দলিলে এ নিয়ে দুটি নির্দেশ আছে। এক, ওই পাঁচ টাকা বরাদ্দ। দুই রায়বাড়ীর দেবোত্তরের ট্রাস্টি, যাঁর পালা পড়বে দেবোত্তরে, তাঁর তরফ থেকে কারুকে উপস্থিত থাকতে হবে।

পালাটা এখন ধনেশ্বরদের। ধনেশ্বর এসেছেন। তা ছাড়াও যার বাড়ী কেউ মারা যায় সেখানে ধনেশ্বর পালা থাক বা না-থাক যান। এখানে তাঁর উদারতা কেউ অস্বীকার করবে না। কিন্তু অধর্মের কাজ তিনি করবেন না।

প্রতিবাদ করছে অতুলেশ্বর। শিবেশ্বরের ছোট ছেলে। যে ম্যাট্রিক ফেল করে কংগ্রেস করে বেড়ায়। ১৯৩০ সাল থেকে অগ্নিগর্ভ মেদিনীপুর কংগ্রেস। তবে ভাগ্য ওর ভাল আর ধরা পড়ে নি। গ্রামে প্রায়ই থাকে না। কংগ্রেস করে কীর্তিহাটের বাইরে। সে হঠাৎ গ্রামে এসে গেছে আজকের দিনটিতেই।

অতুলেশ্বর দাদাকে প্রশ্ন করছে—তাহলে হবেটা কি? পচবে ঘরে? গ্রামের মধ্যে?

প্রশ্নটা মারাত্মক, এর জবাবে আমি কি জানি বলা চলে না। যাদের মড়া তারা যা হয় করবে এও বলা চলে না, কারণ মেয়েটি সামান্যমাত্র একখানা ঘর সম্বল করেই কোনক্রমে দিনপাত করে এসেছে। তার শ্বশুরবংশের অন্যদের সঙ্গে পৃথক অনেকদিন।

সুরেশ্বর এবং মেজঠাকুমা এসে উপস্থিত হলেন এই মুহূর্তটিতেই। ধনেশ্বর বলে উঠল—দুর্গা দুর্গা।

দুর্গা শব্দটির ব্যঞ্জনা এখানে অনেক গভীর ছিল, সুলতা। ধনেশ্বরকাকার দুর্গা স্মরণে আমার শরীরে পর্যন্ত জ্বালা ধরেছিল। কিন্তু মেজঠাকুমা দেখলাম অবিচল। বললেন—হতভাগী সত্যিই মরেছে না এখন বেঁচে থাকতেই হচ্ছে কথাগুলো?

অতুলেশ্বর বললে—কি রে? তুই তো ভিতরেই ছিলি! বললে সে রায়দের জ্ঞাতি ভটচায-দের একটি ছেলেকে।

সে বললে—না মারা গেছে তা আধঘণ্টা হবে! ওই মেজমাকে খবর যখন পাঠালাম তখনও উঁ—আঁ করছিল, তারপর যখন চুপ করেছে তখনই বোধহয় হয়ে গেছে। গ্রহণীর রুগী তো! একটু দেখে—আমি ভিতরে গিয়ে দেখলাম—চোখ স্থির হয়ে গেছে, নিশ্বেসও পড়ছে না।

মেজঠাকুমা ভিতরে গেলেন এবং ফিরে এসে বললেন—না, গেছে। খালাস পেয়েছে। তা ওর গতির কি হবে বাবা ধনেশ্বর?

—কি হবে? অনেকে বলছে এটা ওর পেটের যক্ষ্মা। ভয়ঙ্কর সর্বনেশে রোগ। তাছাড়া তোমার তো অজানা নয়, ঠাকুর-দেবতা ব্রাহ্মণভোজনে ভটচাজবাড়ীর বউ হয়েও ছুঁতে নাড়তে পেত না। এখন কাকে বলব—যাও হে গতি ক'রে দিয়ে এস।

—কিন্তু লোকে তো ওর হাতে খেতো। তোমার বাবাও খেয়েছেন। আমার কাছে যখন যেতো ও তখনই বলতেন, নেড়ী, একটা কিছু রান্না করে দিয়ে যা। তোর হাত নয়তো, অমৃত।

ধনেশ্বর বলে উঠল—সেটা ধর্তব্যের মধ্যে নয়। ওটা মানুষের একটা ব্যাধি। তা নইলে তাঁর বৃদ্ধ বয়সে তোমার সঙ্গেই বা গিঠ বাঁধবেন কেন? আর তুমিই বা ঘাটে বসে ল্যাভেণ্ডার সাবান মাখবে কেন?

মুহূর্তে সব স্তব্ধ হয়ে গেল। শুধু কুৎসিত কিছুই নয় ভয়ঙ্কর কিছুও যেন তার সঙ্গে সেই জায়গাটায় ছড়িয়ে পড়ল। আমিও কিছু বলতে পারলাম না। কিন্তু মেজঠাকুমা সেই মুহূর্তটি বোধকরি একমুহূর্তের জন্য রায়গিন্নী হয়ে উঠলেন। বললেন—তোমার মুখ দেখলে পাপ হয় ধনেশ্বর! তুমি এখান থেকে যাও! গোপেশ্বরের বাপ তো তুমি!

আশ্চর্য শক্তি ছিল ওই কণ্ঠের মধ্যে, কথার মধ্যে। ধনেশ্বর যে ধনেশ্বর সেও একেবারে বোবা হয়ে গেল। মুখখানা হয়ে গেল ফ্যাকাসে! সমস্ত জনতাও স্তব্ধ হয়ে রইল। ফিস্-ফাস্ করেও কেউ একটি কথা বললে না।

মেজঠাকুমা বললেন—একখানা গরুর গাড়ী কেউ এনে দেবে, গাড়ীর দাম দেব আমি। আমিই ওকে গাড়ীতে চাপিয়ে নিয়ে গিয়ে কাঁসাইয়ের জলে ভাসিয়ে দিয়ে আসব।

ধনেশ্বর মাথা হেঁট করে একটি কথা না বলে ওখান থেকে চলে গেল।

আমি তখন কথা ফিরে পেলাম, বললাম—তুমি চুপ কর মেজঠাকুমা, আমি ব্যবস্থা করছি। না হয় ইস্কুলে যাচ্ছি, সেখান থেকে ছেলেদের ডেকে আনছি, তাদের নিয়ে আমি যাব।

অতুলেশ্বর এগিয়ে এল, বললে—রাজী তো আমরাই রয়েছি।

এর পর আর কোন বেগই পেতে হয় নি। মেজঠাকুমার বিধবা ভাজের সৎকার হয়ে গেল নির্বিবাদে। লোক অনেকগুলিই হল। তবু আমি গেলাম সঙ্গে। মেজঠাকুমা একবার বললেন —তুই যাবি? শরীরে—

হেসে বললাম—শরীরটা কি আমার ননীর পুতুলের মত মেজঠাকুমা? আমি ইচ্ছে করলে তো ওই হাড় ক'খানাকে একলাই ঘাড়ে করে দিয়ে আসতে পারি! পারি না?

—রায়বাবুরা সব পারে। তা—যা। বারণ করব না। হতভাগী চিরকাল ভাগ্যের লাথি ঝাঁটাই খেয়েছে। মরবার পর যদি এইটে ওর ভাগ্যে ছিল যে তুই ওর শ্মশানবন্ধু হবি, ঘাটের খেয়ায় তুইও থেকে ওকে তুলে দিয়ে আসবি, তাহলে সেটাতে আর আমি বাগড়া দি কেন? যা!

অতুলেশ্বর এসে বললে—একটু এদিকে শোন। বয়সে ছোট অতুলেশ্বর আমার সম্বন্ধে খুড়ো। তুমি বলে ডাকলে। কথা বললে এই প্রথম। বললে—শ্মশানে যারা যায় তারা কিছু নেশা ভাঙ করে। কেউ মদ কেউ গাঁজা। তা—

বললাম—বেশ তো। সে এদেশে সর্বত্রই করে। শিবঠাকুরের এলাকা। বলে পকেট থেকে মানিব্যাগটা বের করে দশ টাকার নোট একখানা বের করে দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল খাট চাই, জিনিসপত্র চাই। বললাম—খাট-টাটের ব্যবস্থাও তো করতে হবে।

হেসে অতুলেশ্বর বললে—এখানে খাট-খাটিয়া নেই, বাঁশের মাচান বেঁধে নিয়ে যায়। আগে রায়বাড়ীতে খাটের রেওয়াজ ছিল, এখন সেখানেও বাঁশের মাচান। সুখেশ্বরদা বাবা একদিনে গেলেন—সে তো ভয়ঙ্কর ব্যাপার। এমন ব্যাপারটা না হলে অন্তত বাবার জন্যে ঘরের খাটই একখানা দেওয়া হত। কিন্তু সে হয় নি ওই ব্যাপারটার জন্যে। সুখেশ্বরদার লাশ, পুলিস পোস্ট মর্টেমের জন্যে নিয়ে গেল গরুর গাড়ীতে চাপিয়ে মেদিনীপুর। বাবার দেহটা এইখানেই ছেড়ে দিলে বোনাফাইডি সুইসাইড বলে। বাবা গেছেন বাঁশের মাচায়। খাট বের করবার কথা কেউ মুখেও আনে নি।

চমৎকার কথা বলে অতুলেশ্বর। মেদিনীপুরী টান অবশ্যই আছে। কিন্তু বাঁধুনীতে গাঁথুনীতে শহরের বাগ্‌বিন্যাস থেকে মলিন নয়।

অতুলেশ্বরই বললে—বাঁশের ব্যবস্থা আছে। ওই কাঁসাইয়ের জঙ্গলে বাঁশ আছে, ওটা দেবোত্তরের সম্পত্তি, কিন্তু গ্রামের কারুর মৃত্যু হলে ওখান থেকে বাঁশ পায়। শুকনো গাছ দু-চারটে থাকেই। কাঠও কেটে নেয় ওখান থেকে। তবে নতুন কাপড় চাই একখানা, খানিকটা ঘি, একটুকরো সোনা, একটুকরো রুপো, বালি, কুঁচকাঠি, তা আরও পাঁচটা টাকা দাও। ওতেই হয়ে যাবে।

নোট আর একখানা দশ টাকারই দিলাম। বললাম—বাকিটা এখন রাখ।

মেয়েটার দেহ বের করতে আমিও গিয়েছিলাম। বোধ হয় মেজঠাকুমাকে খুশী করতেই। দুর্গন্ধে আমার বমি আসছিল। বহু কষ্টেই দমন করে বের করে আনলাম। মেজঠাকুমা বোধ হয় দেখলেন না, কারণ তিনি উপু হয়ে দাওয়ার খুঁটিতে ঠেস দিয়ে বসে হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে

কাঁদছিলেন।

বাড়ী ফিরতে সন্ধ্যে উতরে গিয়েছিল। মেয়েটির বাড়ী হয়ে ফিরতে হয়, সেখানে তখনও মেজঠাকুমা বসে ছিলেন, বাইরে পোড়া মালসায় আগুন রেখে এবং দরজার পাশে নিম রেখে। কিছু মিষ্টিও আনিয়ে রেখেছিলেন। এ টাকাটা উনি দিয়েছিলেন। আমি বললাম—মিষ্টি আমি খাব না ঠাকুমা।

অতুল বললে—ও বমি করেছে ওখানে গিয়ে। ওকে বারবার বললাম—তুমি কাঁধ দিয়ো না। ভীষণ দুর্গন্ধ। ও শুনলে না। শ্মশানে গিয়েই হড় হড় করে বমি করে ফেললে। কি করব ফিরে পাঠাতেও পারলাম না। ও—ও এল না। আমি ভাবলাম—ফিরে পাঠালে দুর্নাম করবে, বলবে কলকাতার বাবু!

মেজঠাকুমা বললেন—একটা কণা ভেঙে মুখে দে। তার তৃপ্তি হবে। ওর ঘর পরিষ্কার করতে গিয়ে একটা ন্যাকড়ায় বাঁধা গোটা আষ্টেক টাকা পেলাম—পয়সায় সিকিতে আধুলীতে টাকায়। বোধহয় শেষ কাজের জন্যেই রেখেছিল। তুই ওর ছেলের কাজ করলি, বাপের কাজ করলি, সধবা হলে বলতাম স্বামীর কাজ করলি। নে, একটু ভেঙে নে। কই তোর গা দেখি!

বুকে হাতের উল্টো পিঠটা ঠেকিয়ে বললে—গা গরম হয়েছে সুরেশ্বর! দাঁড়া আমি সঙ্গে যাই। বলেই ডাকলে—রাধারমণ!

রাধারমণ মেজঠাকুমার আর এক ভাই। সেও আমাদের সঙ্গে শ্মশানে গিয়েছিল। তাকে বললেন—বউ আর তুই সব ব্যবস্থা কর এবার। বুঝলি, আমি চললাম।

আলো নিয়ে ডিকু শ্মশান পর্যন্ত গিয়েছিল। পাঠিয়েছিলেন মেজঠাকুমাই। বললেন—চল্ ডিকু!

নীরবে পথ হাঁটছিলেন, হঠাৎ বললেন—চল্ ঠাকুরবাড়ী হয়ে চল্। প্রণাম করে চরণোদক নিয়ে যাবি।

ধনেশ্বর কারণ নিয়ে সন্ধ্যা করছিল, বার দুই কালী কালী বলে গম্ভীরস্বরে ডেকে উঠলেন। প্রণবেশ্বর, কল্যাণেশ্বর এবং কয়েকজনই বসে ছিল কাছারীর দাওয়ায়।

প্রণবেশ্বর বললে—শ্মশানে গেছলে?

বললাম—হ্যাঁ।

—বড় বাড়াবাড়ি করছ। এত কেন?

কল্যাণেশ্বর বললে—তুমি এবার এম-এল-এ হবার জন্য দাঁড়াও সুরোদা। আমরা প্রাণপণে খাটব। টাকা আছে। তার উপর যা নাম হয়ে গেল না ঠিক বেরিয়ে যাবে!

আমি কিছু বলবার আগেই মেজঠাকুমা বললেন—কল্যাণ, দুধপুকুরের সব থেকে বড় আম গাছটা—যেটার নাম ছিল গিন্নীর গাছ—সেটা কে কাটলে রে? তুই?

—কি?

—দুধপুকুরের গিন্নীর গাছটা! তুই কেটেছিস আমাকে বললে—

—কে বললে?

—বললে তোর যারা মজুর খাটে তারা।

—হ্যাঁ, সেটা বাবার আর দাদুর শ্রাদ্ধের সময় কাটিয়েছি।

—সে সব শ্রাদ্ধ তিন দিনে হয়েছে। বারোটি ক'রে বামুন খেয়েছে, তুই এতবড় গাছটা কাটালি—

—কি— ? হঠাৎ সন্ধ্যারত ধনেশ্বর চীৎকার করে উঠলেন—দুধপুকুরের পাড়ের গিন্নীর গাছ ? তাতে যে একশোখানা তক্তা হবে ! আমি পিতৃশোকে ভ্রাতৃশোকে পুত্রের লজ্জায় কাতর সেই ফাঁকে—

নাটমন্দিরটা কুৎসিত কোলাহলে ভরে উঠল।

সুরেশ্বর বললে—ঠাকুমা, আমার শরীরটা বড় ক্লান্ত—

—চল্ ভাই চল্ ! না, একটু দাঁড়া। ঘোষালমশাই !

ঘোষাল সুরেশ্বরের নিজস্ব কর্মচারী। ঘোষাল এসে বাইরে দাঁড়াল। মেজঠাকুমা বললেন সুরেশ্বরের একটু জ্বর হয়েছে, ডাক্তারবাবুকে ডেকে পাঠান।

জ্বর নেহাৎ একটু নয়, টেম্পারেচার উঠল একশো চার। তার উপর সর্বাঙ্গে বেদনা, কাঁধের ব্যথাটা অসহ্য।

ডাক্তার অ্যাসপিরিনের পুরিয়া তাঁর ব্যাগ থেকেই বের করে দিয়ে গেলেন। সুলতা, আমার ভিতরটা তৃষিত হয়েছিল স্কচ হুইস্কির জন্যে। শ্মশানে আমি ভাল ছেলে সাজবার অভিপ্রায়ে ঠিক নয়, ওই ওদের সঙ্গে দেশী কারণ পান করি নি। করতে পারি নি।

এখানে মেজঠাকুমা বসে। রঘুকে বরাত করতে পারছিলাম না। বললাম—ঠাকুমা, তুমিও তো সারাদিন বসে। বোধহয় খাও নি কিছু। যাও বাড়ী গিয়ে খাও। তুমি ভেবো না, ছেলে ঘুমলো পাড়া জুড়লো বলে আমি এক্ষুনি ঘুমিয়ে যাব !

মেজঠাকুমা বললেন—না। রঘু—যে ঘরে বউমা, তোর বাবুর মা এসে থাকতেন ওইটে পরিষ্কার ক'রে দে। আমি ওখানেই কাপড় ছেড়ে সন্ধ্যে করে নেব। শোবও ওই ঘরে। এক বার চল্ আমার সঙ্গে ও বাড়ী, কখানা কাপড় আর পূজোর ঝোলাটা নিয়ে আসব।

—কি দরকার ঠাকমা। কেন এত ব্যস্ত হচ্ছ ?

—ল্যাভেণ্ডার সাবান মাখা নিয়ে যে কেলেঙ্কারী করছে ধনেশ্বর তারপর প্রকাশ্যে কপালে কৃষ্ণনামের ছাপ না আঁকলে তো রাধার পূজো লোকে করত না রে ! আমার ষোল বছরে ছেলে হলে তার বয়স আজ একুশ বাইশ হ'ত। তুই না হয় আমার নাতি—পৌত্র। ভাসুর-পোর ছেলে। আমি ঠাকুমা। সেই ঠাকুমা হয়ে এই বাড়ীতে বাসা গাড়ব, দেখি কার সাধ্যি আমাকে কি বলে এরপর। চল্ রঘু। ডিকু বাবুর কাছে বস্। রাত্রে আজ দুজনেই থাকবি। বাবুর জ্বর।

ঠাকুমা নিচে নেমে দরজা খুলতেই আমি উঠে গিয়ে তৃষ্ণা নিবারণ করে ফিরে এসে শুলাম। এবং শরীরের ক্লান্তি তাঁর সঙ্গে হুইস্কী ও অ্যাসপিরিনের যৌগিক ক্রিয়ায় ঠাকুমা ফিরবার আগেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

ঘুম ভেঙে ছিল অনেকটা রাত্রে, তখন অ্যাসপিরিনের ক্রিয়া শেষ হয়েছে। গায়ের মাথার

বেদনা ধীরে ধীরে অ্যাসপিরিনের বাঁধ ভেঙে বাঁধা জলের আস্তে আস্তে ঝ'রে ঝ'রে একসময় সশব্দে ভেঙে নামার পড়ার মত জেগে উঠল। আমি কাতরে উঠলাম—আঃ! পাশ ফিরে শুলাম।

ও-ঘর থেকে সাড়া উঠল। কেউ যেন উঠে দরজার কাছে এল। রঘুর নাক ডাকার শব্দ পাচ্ছি। সে আমার খাটের পাশেই মেঝেতে শুয়ে আছে। আর একটা পুরিয়া খেতে হবে। আকণ্ঠ তৃষ্ণা পেয়েছে। হুইস্কীর রিঅ্যাকশনও বটে, তার সঙ্গে জ্বরের উত্তাপেও জলের তৃষ্ণা আছে।

দরজাটা খুলে গেল। বললাম—কে? ঠিক মনে ছিল না মেজঠাকুমা এখানে আছেন সে কথা। মেজঠাকুমা উত্তর দিলেন—আমি।

—মেজঠাক্‌মা!

—হ্যাঁ। তিনি ঘরে এসে ঘরের কোণে টিপয়ের আড়াল থেকে নীল কাচ দেওয়া হ্যারিকেনটা বের করে উস্কে দিয়ে টিপয়ের উপরে রাখলেন। এবং এসে খাটের পাশে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলেন। বললেন—কাতরাচ্ছিস কেন?

বললাম—দেখ তো জল কোথায়!

জলের গ্লাসটা এগিয়ে দিলেন। আমি একটু উঠে এক নিঃশ্বাসে জলের গ্লাসটা শেষ ক'রে বললাম—ওষুধের পুরিয়া দাও, আরও জল আন। গায়ের উত্তাপটা বেড়েছে কিনা দেখ দেখি।

গায়ে হাত দিয়ে দেখে বললেন—বেড়েছে বলেই মনে হচ্ছে। কিন্তু আবার অ্যাসপিরিন খাবি? আর এই জ্বরে ও ছাই গিল্‌লি কেন?—

—কি?

—কি আর? রায়বংশের যাতে নাড়ী কাটা!

—তুমি টের পেয়েছ?

—পাব না? ও-বাড়ী থেকে ফিরে এসে ঘরে ঢুকেই দেখি সৌরভে সুবাসে ঘর মো-মো করছে। আমি জানি তুই খাস।

বললাম—বকবে না?

—বকব? অন্নপ্রাশনের সময় সেকালে সোনার ছোট্ট গ্লাসে কালীমার প্রসাদী কারণ দিত, তাই ঠেকিয়ে দিত ছেলের মুখে।

বললাম—তাই নাকি?

বললেন—হ্যাঁ। কিন্তু এখন ঘুমো। মাথায় হাত বুলিয়ে দি।

তিনি মাথায় হাত বুলতে লাগলেন। কিন্তু ঘুম আমার এল না। বললাম—ওই জানালাটা খুলে দাও। কাঁসাইয়ের ধার থেকে ঠাণ্ডা হাওয়া আসে।

—ওটা আমিই বন্ধ করে দিয়েছি। জলো বাতাস তো!

—তা হোক। ওতে ক্ষতি হবে না।

—তার থেকে আমি বাতাস করি।

—বেশ।

পাখা ঘুরতে লাগল। বললেন—টানাপাখাটা মেরামত করিয়ে নে না। টানবার লোক অনেক মিলবে।

—পাখা কোথায় ?

—পাখা কোথায় ? বাবা, পঞ্চাশখানা পাখা চলত সেকালে। ছোট ঘরে একটা বড় ঘরে জোড়া। যে পাখা টানত তার হাত-পা কোনখানে দড়ি দিয়ে বাঁধা থাকত আর দড়ির অপর দিকটা থাকত বিছানায়। পাখা টানতে টানতে বন্ধ হলে সেই দড়িতে হ্যাঁচকা টান পড়ত আর হাঁক উঠত, এ্যাও হারামজাদা ! কাত্যায়নী ঠাকরুণের আমলে বিধি ছিল রাত্রে যে পাঙ্খাওলা য'বার থামবে, সকালে তাকে জওলাপ্রসাদের কাছে তত দু কিল ক'রে খেতে হবে। জওলা না কি একবারে দেড় সের আটা খেতো, পাওভর ঘিউ খেতো। বরাদ্দ ছিল ভাণ্ডার থেকে। খোরাক আর তার ওপর মাইনে পেতো তিন টাকা। সারারাত ছাদে জেগে পাহারা দিত আর হেঁকে হেঁকে ফিরত—অঃ—হ—হ ! অ—হ—হ ! হৈ ! সারারাত। জওলা থামলেই কাত্যায়নী হাঁকতেন—জওলাপরসাদ, থামলে কেন ? জওলা বলত—তনি তিয়াস পাইল। পানি খাইছিলাম মাঈজী !

থেমে কাত্যায়নীর কথায় ছেদ টেনে বললেন—পাখা ওই নিচের তলার একটা ঘরে ডাঁই হয়ে পড়ে আছে। সবই ভাঙা। তবু দু-চারটে কি ভাল থাকবে না ! থাকবে। একটু মেরামত করিয়ে কাপড় লাগিয়ে টাঙালেই নতুন। ছাদে কড়িতে কড়া-টড়া সব লাগানো আছে।

—সে হবে। তুমি কাত্যায়নীর গল্প বল তো !

—ওরে বাবা ! সে তো মহাভারতের একটা পর্ব রে ! তার ভয়ে শুধু রায়বাড়ী নয় খোদ কর্তা ফোমেশ্বর রায় পর্যন্ত টটস্থ।

* * * *

অসুখে ভুগেছিলাম সুলতা সাতদিন। সাতদিন ধরে গল্প করেছিলেন মেজঠাকুমা কাত্যায়নী দেবীর।

সন্তান হয়ে বাঁচাবার সঙ্গে সঙ্গে সুস্থ হয়ে উঠে কাত্যায়নী স্বামী থেকে আরম্ভ করে জমাদারনী পর্যন্ত এবং কলকাতা থেকে কীর্তিহাট পর্যন্ত কঠিন শাসনে নিয়ন্ত্রিত করে আশ্চর্য শৃঙ্খলায় বদ্ধ করেছিলেন।

স্বামীর কলকাতা ছেড়ে আসবার সময় ছিল না। কাত্যায়নী নিয়মিত আসতেন কীর্তি-হাটে। যে দেবতার দয়ায় তাঁর সন্তান বেঁচেছে, তিনি সুস্থ হয়েছেন, তাঁর প্রতি ভক্তির অন্ত ছিল না। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে পূজো করাতেন, ভোগ শেষ হলে বাড়ী ফিরতেন। তারপর তাঁর রান্না চড়ত। সেই রান্না হ'লে খেতেন। সন্ধ্যে পর্যন্ত ঘুমোতেন। সন্ধ্যের পর উঠে গা ধোওয়া চুল বাঁধা শেষ ক'রে আসতেন ঠাকুরবাড়ী, সেখানে আরতি, শীতলভোগ, শয়নের ব্যবস্থা ক'রে এসে বসতেন কাছারীর ঘরে। ফটক বন্ধ হ'ত। আমলা মুহুরী ছাড়া কেউ থাকত না। তিনি বিষয়ের কথা বলতেন ম্যানেজার গিরীন্দ্র আচার্যের সঙ্গে। কোথায় কোন

মামলা হচ্ছে, কোথায় কোন্ সম্পত্তি বিক্রী হচ্ছে, খবর নিয়ে বাড়ী ফিরে জল খেতেন। তখন খাবার করা শুরু হত। লুচি তরকারি মাছ ক্ষীর সব তৈরী হ'ত সেই সময়। মেয়ে বিমলা ছেলে বীরেশ্বর মানুষ হত দুজন সুন্দরী সুশ্রী ভদ্রঘরের মেয়ের হাতে। তিনি শুধু খোঁজ নিতেন ঘণ্টায় ঘণ্টায়, আর কয়েকবার স্তন দিতেন কোলের সন্তান ছেলেকে। রাত্রে খেতে বসতেন ঘরে, বাইরে বারান্দায় এসে বসত ভাণ্ডারী সরকার চাকর ঝিদের প্রধানরা, আর ছিল একজন তার ভার ছিল গ্রামখবরদারির। ঝি চাকরের সর্দারেরা কোন্ চাকর কোন্ ঝি কি দোষ করেছে তা পেশ করত, তিনি বিচার করে দণ্ড দিতেন। ভাণ্ডারী বলত কি আছে কি নাই। সরকার লিখে নিত, কাত্যায়নী বলতেন, কত কি আসবে। গ্রামখবরদারির লোক গ্রামের খবর বলত। কোথায় কে রায়বাড়ীর নিন্দে করেছে, কে ভাল বলেছে, কার বাড়ীতে অসুখ, কার অভাব—নিবেদন করত। সরকারকে হুকুম দিতেন খোঁজ করতে, অভাবীর ঘরে চাল-ডাল পৌঁছে দিতে; অসুখের জন্যে বাড়ীর বাঁধা বদ্যিকে বলতে। আর নিন্দে-বান্দার কৈফিয়ৎ নিতে তাদের ডাক পড়ত খোদ তাঁর কাছে। যারা প্রশংসা করত, তাদেরও তিনি সম্মান করতেন। নোট করা থাকত; কোন উপলক্ষে—বিয়ে, অন্নপ্রাশন, উপনয়ন—কিছু তাদের বাড়ী হলেই হয় দামী কাপড়, নয় সোনার কিছু, নয়তো নোকুতো বলে এক টাকা দু'টাকার জায়গায় দশ টাকা দিতে হুকুম দিত।

এই সময় ভাই, দেশ থেকে 'সতী যাওয়া' উঠিয়ে দেবার জন্যে উঠেপড়ে লেগেছিল দেশের সব মাতব্বরেরা। কেউ রাজা, কেউ জমিদার—সব সায়েবী মতের বড়লোকরা। তার মধ্যে দ্বারকা ঠাকুর ছিলেন মাথার লোক। এই রবি ঠাকুরের ঠাকুরদাদা। তাঁর সঙ্গে ফোমেশ্বর রায়ের জানাশোনা দহরম-মহরম ছিল। ওঁরা একবয়সী ছিলেন। তাছাড়া উনি ছিলেন নুনের দেওয়ান। আর ফোমেশ্বর রায় কাঁথি তমলুকে হলদীর ধারে তখন নুন তৈরীর 'খালারী' বন্দোবস্ত নিয়ে নুনের কারবার করতেন। সেজন্য ঠাকুরবাবুর কাছে যাওয়া-আসা করতে হত। ঠাকুরবাবু কড়া লোক ছিলেন। আর ইনি খুব হুঁসিয়ার ব্যবসাদার ছিলেন। ওঁর সায়ে সায় দিতেই হত তাঁকে।

কাত্যায়নী ঠাকরুণ তখন কীর্তিহাটে এসে রয়েছেন।

হাসলেন মেজঠাকুমা। বললেন, তখন তো তাঁর স্বামীর শখ মিটেছে। মানে—মেয়ে হয়েছে একটি, ছেলে হয়েছে একটি, আর কি দরকার স্বামীতে? কিন্তু—কথা শেষ না করে বেশ একটু সশব্দে হেসে উঠলেন।

অস্পষ্ট আবছায়ার মত নীল লণ্ঠনের আলোয় সুরেশ্বর খোলা জানালার দিকে তাকিয়ে শুনছিল। বাইরে জ্যোৎস্না উঠেছে, একফালি জ্যোৎস্না তেরচা হয়ে একপাল্লা জানালার গায়ে লেগে যেন মেঝের উপর পিছলে পড়েছে। হাসির শব্দে সে মেজঠাকুমার মুখের দিকে তাকালে। বললে, হাসলে কেন?

—হাসলাম তোমাদের গুষ্টির ধারা মনে করে।

—কি সেটা?

—সেটা? সেটা হল—যেটা এখনও তোমার মধ্যে দেখছি নে সেইটে। রায়বাড়ীর

বেটাছেলেরা একলা বিছানায় শুতে পারে না। কাত্যায়নীদেবীর সবসুদ্ধ সাতটা ছেলে। তার মধ্যে শেষের দুটো বেঁচেছে। কাত্যায়নীর শরীর ছিল দুর্বল। তিনি ছেলেমেয়ে নিয়ে এখানে সরে আসতেন তার ওটাও একটা কারণ। স্বামীর জন্যে দুটো সেবাদাসী নিজে দেখে পছন্দ করে বহাল করে দিয়ে এসেছেন। তার ওপর বাঈজী আছে। এখন আর সেবাদাসীদের চাকরী যেত না। মাথা গরম তো সেরে গিয়েছিল।

সুরেশ্বর অতি বিষণ্ণ হাসি হাসলে। বললে, মিথ্যে দোষ তুমি দাও নি ঠাকুমা! বাবার কথা মনে পড়ছে। বাবার মত মানুষ তো আমি কমই দেখেছি। এত পণ্ডিত, এমন ভদ্রলোক! আর মাকে আমাকে কি ভালোই বাসতেন! তিনি—।

—তুই এবার ঘুমুতে চেষ্টা কর, আমি মাথায় হাত বুলিয়ে দি। কথা থাক। চোখই বুজে ছিল সুরেশ্বর। মাথায় লঘু চালনায় মেজঠাকুমার হাতখানি ঘুরছিল। সুরেশ্বর বললে, চুলগুলো বরং টানো ঠাকুমা, ওরকম করে দিলে সুড়সুড়ি লাগছে। না, আরও জোরে টানো। টানো না যত জোর আছে তোমার। মা দুর্গার অসুরের চুল টানার মত টানো না!

মেজঠাকুমা বললেন—বোঁটায় কেন খাড়া, না বংশাবলীর ধারা। তোর মেজঠাকুরদার এই রোগ ছিল। একবার চুল টানতে টানতে আমার ঢুল এসেছে, টানতে টানতে হাতেও ব্যথা ধরেছে। উনিও যেন ঘুমিয়েছেন। আমি টানা ছেড়ে এমনি আস্তে আস্তে হাত বুলিয়েছি। আর চমকে জেগে উঠে দিলেন হাত ছুঁড়ে। লাগল আমার নাকে। রক্ত পড়তে লাগল। তখন বলে, এমনি সুড়সুড়ি দেয়, আমার মনে হল বিছেটিছে কিছু বেড়াচ্ছে চুলের মধ্যে।

হেসে সুরেশ্বর বললে, মেজঠাকুরদাকে তুমি খুবই ভালবাসতে, না মেজদি?

অত্যন্ত প্রসন্ন ধীরকণ্ঠে বললেন মেজঠাকুমা, আমি খুব সুখী হয়েছিলাম সুরেশ্বর। মিথ্যে বলব না ভাই তোর কাছে, প্রথম যখন বিয়ে হয়, তখন বুড়ো বলে দুঃখু হয়েছিল, কেঁদেছিলাম। কিন্তু কেরমে কেরমে দুঃখ কোথায় গেল জানি নে, মনে হত আমি খুব সুখী। তবে যদি বলিস, সুখ কাকে বলে তুমি জানোই না, তবে তার জবাব আমার নেই। যা পেয়েছি, তাই অঢেল। ওঁর জন্যে লজ্জা অনেক পেতাম। উনি যেসব কাজকম্ম করেছেন, সেসব তো চোখেই দেখছিস। আমি বারণ করলেও শুনতেন না। কাত্যায়নী ঠাকরুণের মত দাপটও আমার ছিল না, তিনি ছিলেন রাজকন্যে। রাজবংশ। আমি পুজুরী বামুনের মেয়ে। সে ক্ষমতাও ছিল না। তবে বেশী লজ্জা পেতাম ওঁর মেজবউ মেজবউ রব তোলা বাতিক দেখে। চোখের আড় হয়েছি তো সঙ্গে সঙ্গে মেজবউ! মেজবউ! তারপর বাড়ীর ছাদ কাঁপিয়ে মে-জ-বউ! এলেই জুড়িয়ে যেতেন, বলতেন, যাও কোথা? চটকদুলালী আমার! এই আছে এই নেই। ফুরুত আর ফুরুত। আমাকে আদর করে একলা পেলে বলতেন, চটকদুলালী। বলতাম, একটা কথাই বলতাম—বলতাম, মরতে। বলতেন, সে আমি মরার পর যেয়ো। না হয় যদি পার সেইদিনই যেয়ো, চিতায় পুড়ে মরো আমার। বলে আক্ষেপ করে বলতেন, কলিতে ধর্ম একপদ! তাও এরা ঠেঙিয়ে ঠেঙিয়ে আধখানা থেকে সিকিখানায় এনেছে। নইলে সতী অধর্ম অন্যায় হয়! কাত্যায়নীদেবী যা লিখেছিলেন তা অক্ষরে অক্ষরে ফলছে।

অক্ষরে-অক্ষরে !

বললাম না, কাত্যায়নীদেবী ছেলেমেয়ে নিয়ে তখন এখানে, তাঁর কানে এল, সতী ওঠাবার জন্যে দরখাস্ত করছে কলকাতার বড় বড় লোকেরা। তার মধ্যে দ্বারকা ঠাকুর একজন প্রধান। উনি জানতেন নুনের কারবার করেন স্বামী, তিনি দ্বারকানাথের কত অনুগত। তিনিও তা হলে সই দেবেন। তিনি তৎক্ষণাৎ চিঠি লেখালেন স্বামীকে। ভাল লিখতে জানতেন না নিজে, কোনমতে সই দিতে জানতেন মোটা মোটা করে, তিনি প্রেমপত্র লেখাতেন মুহুরীকে দিয়ে। তিনি বলতেন মুহুরী লিখত। তারপর পড়ে শোনাতো। তাতে তিনি সই দিতেন মোটা আঁকাবাঁকা হরফে—কাত্যায়নী।

ওদিকে তখন ভোর হয়ে এসেছে। আমার জ্বরটা যেন ছেড়ে আসছে মনে হল। ঘাম হচ্ছিল। দেশে তখন ম্যালেরিয়া ছিল প্রচুর। ১৯৩৬ সাল। শীত করে জ্বর আসে, ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ে।

ঠাকুমা বললেন, দেশের সম্পত্তি পেলে তো ! এখন ভোগ। সকালে উঠেই ডাক্তারকে বল কুইনিন ইন্‌জেকশন দিয়ে দিক।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

* * * *

ভোরে জ্বর ছাড়ল, আবার বিকেলে শীত করে জ্বর এল। কুইনিন মানলে না। সেদিন জ্বর প্রবলতর হল, একশ তিন উঠল টেম্পারেচার।

মেজঠাকুমা ডেকে পাঠালেন বুড়ো ভটচাজ মশাইকে। তিনি নাড়ী দেখে ঠিক বলে দেবেন, ক'দিন হবে জ্বরের ভোগ। নাড়ীতে সর্দি না পিত্তি না বায়ু, না সর্দি পিত্তি, না বাতপিত্তি, কি কি ঠিক বলে দেবেন। ডাক্তারেরা ওসব জানে না, ওরা নাড়ী গোনে ঘড়ি ধরে।

মেজঠাকুমাকে বাধা দেবার ক্ষমতা আমার ছিল না। উনি মেজঠাকুরদার কাছে যা হতে পারেন নি, আমার কাছে তাই হয়েছিলেন, হয়েছিলেন কাত্যায়নী দেবী।

দয়াল ভটচাজের বয়স আশী। সম্পর্কে মেজঠাকুমার শ্বশুর। লাঠি ধরে এলেন। পাকা আমের মত চেহারা, তেমনি টকটকে রঙ। মাথার চুল-ভুরু সব পাকা। দেখে বললেন, সাদা জ্বর মেজ-মা। চিন্তা নেই। দিন-পাঁচেক লাগবে। তবে বাবুর মালোয়ারী ধরলে মনে হচ্ছে গো ! দুটো ঠায় উপোস দাও।

বসে রইলেন ভটচাজ কিছুক্ষণ। মেজঠাকুমা বললেন, রায়বাড়ীর গল্প শুনতে ওঁর খুব ঝোঁক। ওঁকে বলুন।

দন্তহীন মুখে হেসে দয়াল ভটচাজ বলেছিলেন, আজ নয় মা, কাল বলব। কাল এসে আবার দেখে যাব। বলব তখন।

আমি কি করব। উপোস দিয়েই পড়ে রইলাম আর ডাক্তারের মিকশ্চার খেলাম। কিন্তু কাল কাটে কি করে? পুরনো খাতা আর কাগজ নিয়ে পড়লাম। পুরনো খাতায় পেলাম কল্যাণীয়া শ্রীমতী বিমলাকুমারী দেবীর শুভপরিণয় উপলক্ষে খরচ। জামাতা আশীর্বাদী ! হীরার আংটি একটি, মারফৎ হ্যামিল্টন এণ্ডো কোং, মোকাম কলিকাতা, মূল্য এক হাজার

টাকা! বিস্ময় লাগল। জমা-খরচের খাতাটার সাল ১২৩১ সাল, ইংরিজী ১৮২৪। বিমলা-কুমারীর বয়স সাত, ১৮১৭ সালে তার জন্ম।

কাত্যায়নীরও বিয়ে হয়েছিল সাত বছর বয়সে।

খরচের পাতাতেই চোখ বুলাচ্ছিলাম। সে এলাহি কাণ্ড। পরিশেষে একটা খরচের ফর্দ পেলাম। একসঙ্গে সব হিসেব। খরচ যোগ করে দাঁড়িয়েছে পনের হাজার টাকায়!

তারপরের দিন মেজঠাকুমা ঠাকুরবাড়ী গিছলেন; সেখান থেকে ফিরবার পথে পুরনো বাড়ী হয়ে ফিরলেন, সঙ্গে নিয়ে এলেন রেশমী কাপড়ে বাঁধা একটা কাগজের পুলিন্দা। রেশমী কাপড়-খানা এককালে সুদৃশ্য এবং বেশ মূল্যবান ছিল। বললেন, এটা তাঁর বাক্সের মধ্যে রাখা ছিল রে। দেখ এতে কি আছে।

দেখছিলাম পাল্টে পাল্টে। দেখলাম সবই প্রায় চিঠি। চিঠিগুলি রত্নেশ্বর রায়ের লেখা, লিখেছিলেন অধিকাংশই শিবেশ্বরকে। কয়েকখানা দেবেশ্বর রায়কে লেখাও আছে। তিরস্কারপূর্ণ চিঠি। তার একটাতে লেখা আছে "প্রয়োজন হইলে তোমাকে ত্যাজ্যপুত্র করিতেও পশ্চাৎপদ হইব না। তুমি লিখিয়াছ দেবত্র টিকিবে না আইনে। দেখা যাইবে কি হয়। মোট কথা তোমার অহিন্দু আচরণ আমি সহ্য করিব না ইহা জ্ঞাত হইবে।" শেষে কতকগুলি কথা আছে, যেগুলিকে বেদবাক্যের মত বলা যায়।

আমি ভাবছিলাম। এমন সময় জাঠতুতো ভাই প্রণবেশ্বর, খুড়তুতো ভাই সুখেশ্বর কাকার ছেলে কল্যাণেশ্বর এল আমাকে দেখতে। বসলে, বললে—অসুখ ধরালে তো!

বললাম, অসুখ নয়। মানে ওই মেয়েটির অসুখ আমাকে ধরে নি।

কল্যাণেশ্বর ছড়ানো কাগজগুলো দেখে বললে, ওগুলো কি?

—চিঠি। পুরনো চিঠি সব। রায়বাহাদুরের লেখা তাঁর ছেলেদেরকে।

—ও কোথায় পেলে?

—বাড়ীতেই। আবার কোথায়!

চুপ করে রইল কল্যাণেশ্বর। প্রাণবেশ্বরদা বললে, দেখ, কল্যাণেশ্বর গার্লস স্কুলের ঠিকে নিয়েছে। ঘর তৈরী হয়ে গেছে, জানালা-দরজা লাগাতে বাকি আছে। এখন ওটা থাকবার জন্য দিতে হবে সেটেলমেণ্ট অফিসারকে তুমি বলেছ। কল্যাণ কাজ শেষ করতে গিয়ে থমকাচ্ছে। কারণ, কাল মেজঠাকুমা সন্ধ্যের সময় বললেন, কল্যাণেশ্বর দুধপুকুরে আমগাছ—কি গিন্নীগাছ না কি নাম—সেটা কাটিয়েছে। ও সেটা কাটিয়েছে ঠিক। কিন্তু সে পোড়া কাঠের জন্যে। ওদিকে ধনেশ্বর কাকা কাল রাত্রে যাচ্ছেতাই করেছেন। যত গাল তোমাকে মেজঠাকুমাকে দিয়েছেন, তত কল্যাণেশ্বরকে। সে যা হয় হবে। এখন জিজ্ঞাস্য হচ্ছে—আমতক্তার দরজা-জানালা লাগালে বিলের সময় তার টাকা দেব না—এ বলবে না তো?

কল্যাণেশ্বর বললে, আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি সুরেশ্বরদা, উনি যাই করুন তোমার বিপক্ষে, তাতে আমি আর থাকব না।

একটু বিষণ্ণহাসি আমার মুখে দেখা দিয়েছিল। লজ্জা হয়েছিল। নিঃস্ব রায়সন্তানদের চেহারাটা যেন সাসপেকটেড টি বি পেশেণ্টদের মত সকরুণ হয়ে উঠেছে অবিকল।

স্তাবকতায় বাধে না। সামান্য স্বার্থের জন্যও স্তাবকতা করতে পারে। এরা আজ চুরি করে গাছ কাটে। আজ ঝগড়া করে কাল এসে গড়িয়ে পড়ে সামান্য স্বার্থের জন্য। নারীর কাছে এদের দাম হয়েছে বিষাক্ত পোকার মত। তারা ঘেন্নাই করে, ভয় পর্যন্ত করে না সাপ কি বাঘ বলে। বললাম, না, ও-বিষয়ে আমি কোন আপত্তি তুলব না। তুমি ঘরখানার দরজা-জানালা লাগিয়ে দাও। মিস্টার ঘোষ প্রায় নির্বাসিত বিরহী যক্ষ হয়ে উঠেছেন—ভয় হচ্ছে সেটেলমেণ্টের পরচা থেকে সেগুলো পরচা-দূত হয়ে না দাঁড়ায়। ক্রোধবশে এর নাম কেটে ওর নাম না বসিয়ে দেন।

খুব হেসে উঠল কল্যাণেশ্বর, অযথা উচ্চহাসি। তারপর বললে, ওই চিঠিগুলো থেকে কি খুঁজছ বল দেখি?

—খুঁজছি কিছু, ঠিক বিষয় নয়।

—তবে?

—রায়বাড়ীর ইতিহাস জানতে চাচ্ছি।

—তা কি চিঠিপত্রে পাবে?

—তাই পাব।

কল্যাণেশ্বর বললে, তাহলে তোমাকে সন্ধান দি সুরেশ্বরদা। দেখগে ঠাকুরের গহনা থাকত যে আয়রনচেস্টে, সেটার মধ্যে অনেক চিঠি আছে। সেসব রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায় রেখে দিয়েছিলেন। মিথ্যে বলব না, দুখানা ডায়রীর মত ছিল, একখানা রায়বাহাদুরের, একখানা বীরেশ্বর রায়ের, আমার বাবা তো দাম বুঝতেন, তিনি রেখেছিলেন। কিন্তু তিনি যখন খুন হলেন, তখন যে সে কে নিলে? কে নিলে কেন, নিলে বেজোদা নিয়েছে। না হলে হারিয়েছে!

আমি তার মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম, খুঁজে দেখ কল্যাণ, আমাকে দিলে আমি এক হাজার টাকা পর্যন্ত দেব।

অবাক হয়ে গেল কল্যাণেশ্বর।

প্রণবেশ্বর বললে, তুমি ঠিক কি খুঁজছ বলবে?

বললাম, বিশ্বাস করবে?

—বল।

—প্রথম নিজের বংশের কথা কে না জানতে চায় বল! দ্বিতীয়, রক্তের মধ্যে একটা কি আছে। সেটা কি জানতে চাই। বিষয় চিরকালের নয় বড়দা, সে সবাই জানে। আমি খুঁজছি আমার বাবার কেন এমন হল? আরও অনেকের ওই পাপ দেখতে পাচ্ছি। তোমাদের কথাও আমার অজানা নয়। হয়তো বলবে এটা মানুষের পাপ। হয়তো তাই। কিন্তু এ-বংশের পুণ্য তো কম নয়! তবু কি করে পাপ কোথা থেকে এল? একে আমি বড় ভয় পাই বড়দা।—কেন পাই? এই আর কি—পাগলামি বলতে পার।

হাতটা উল্টে দিলে প্রণবেশ্বর। অর্থাৎ কিছুই বুঝলাম না।

কল্যাণেশ্বর বললে, ঠাকুরের সিন্দুক খুলে দেখ, অনেক কাগজ-চিঠিপত্রের গাদা পাবে।

মেজঠাকুমা এসে দাঁড়ালেন। চাবি তো তোকে দিয়েছি সুরেশ্বর। তুই সিন্দুকটা খুলে আজ দেখ। কল্যাণকে হাজার টাকার কথা যখন বলেছিস, তখন এখুনি নিজে গিয়ে দাঁড়িয়ে বের করে আন, নইলে আজ রাতেই কেউ সিন্দুকটাকে ভেঙে ফেলবে।

* * *

সেই কাগজের মধ্যে উপকরণ পেলাম। খানকতক মূল্যবান চিঠি। কাত্যায়নী দেবী লিখছেন স্বামীকে—শতকোটি প্রণামান্তর স্বামীচরণে নিবেদনমিদং, স্বামীন, তদীয় পত্র প্রাপ্ত হইয়া অধিনী দুশ্চিন্তায় আশঙ্কায় জীবনমৃতা হইয়া কালযাপন করিতেছে। আপনি কি এমন দুঃস্বপ্ন সন্দর্শন করিয়াছেন যে, নিশাকালে ভয় প্রাপ্ত হইয়া বু-বু করিয়া উঠিয়াছেন? কিন্তু আপনার কাছে কি রাত্রিকালে কেহ শয়ন করে না? অধিনী তো ব্যবস্থা করিয়া আসিয়াছিল, সে ব্যবস্থা কি বলবৎ নাই? যদি বলবৎ না থাকে, তবে আপনি আপনার পছন্দমত লোক নিযুক্ত করিয়া কাছে লোক রাখিবেন। কদাচ একাকী রাত্রে শয়ন করিবেন না। তাহাতে অধিনী কোন আপত্য করিবে না। এখানে দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছেন বলিয়া দেবতার বিশেষ পূজার ব্যবস্থা করিলাম। ৺রী চরণে স্বর্ণ-বিল্বপত্র, শ্রীশ্রীরাজরাজেশ্বর জিউর নিকট স্বর্ণতুলসী অর্পণের ব্যবস্থা হইল। অত্রস্থ কুশল। শ্রীমতী বিমলা এবং শ্রীমান বীরেশ্বরের সর্বাঙ্গীণ কুশল। বীরেশ্বর এমন দুর্দান্ত ও বলশালী হইয়াছে যে, তাহাকে আমি ক্রোড়ে লইতে ভয় পাই। আমার প্রেমচন্দনসিক্ত প্রণাম গ্রহণ করিয়া অধিনীকে কৃতার্থ করিবেন। কারণ কম করিবেন।—ইতি তদীয় শ্রীচরণাশ্রিতা কাত্যায়নী দেবী।

মোটা হরফে লেখা কাত্যায়নী। চিঠি লিখেছে কোন পাকা-হাত মুহুরী। তারপর পেলাম সোমেশ্বরের পত্র।

প্রাণাধিকা প্রিয়তমাসু—

শ্রীমতী কাত্যায়নী আমার প্রেম-আশীর্বাদ জানিবা। তোমার পত্র প্রাপ্ত হইয়া সমুদয় অবগত হইলাম, কিন্তু কোন আশ্বাস বা কোন ভরসা আজও পাই নাই। প্রায় নিশাযোগে দুঃস্বপ্ন দেখিতেছি। কাছে লোক থাকে। কিন্তু সে কি করিতে পারে? সামান্য মানবকুলের কোন্ ক্ষমতা যে দেবরোষের প্রশমন করিবে? প্রায়শঃই অর্থাৎ দুই-এক দিবস অন্তর স্বপ্ন দেখিতেছি—যেন রাজরাজেশ্বর প্রভু জীউ বালকের মূর্তি ধরিয়া আমাকে শাসন করিতেছেন, আর তান্ত্রিক শ্যামাকান্ত দূরে রক্ত চক্ষুতে তাকাইয়া হি-হি করিয়া হাসিতেছে।

রামব্রহ্ম ন্যায়রত্নের একখানা চিঠি আমি পেয়েছি স্থলতা। সুন্দর চিঠি। যেমন হাতের লেখা, তেমনি সেকালের কথার গাঁথুনির নমুনা। লিখেছেন সোমেশ্বর রায়ের পত্রের উত্তরে। কারণ তার উল্লেখ রয়েছে।

লিখেছেন—অশেষ কল্যাণ ও তস্তসহ সম্মানপূর্বক নিবেদনমেতৎ আপনার লিপিখানি পাইয়া তত্র বাটীর সমাচার অবগত হইয়া চিন্তান্বিত হইয়াছি। আমি তো অত্র ধামে থাকিয়া মহামহিমময়ী শ্রীশ্রীকালিকা দেব্যা মাতাঠাকুরাণীর এবং মহামহিম পরম দয়াল শ্রীশ্রীরাজরাজেশ্বর জিউ প্রভুঠাকুরের পূজা-অর্চনা এবং সেবাদি যথাসাধ্য করিতেছি। কোন ত্রুটি বা সেবা-

অপরাধ হইতে দিই নাই। নিয়মিত মাতার চরণে ১০৮ বিল্বপত্র এবং প্রভুজিউয়ের মস্তকে ১০৮ তুলসীপত্র প্রদত্ত হইতেছে। তত্রাচ এরূপ দুঃস্বপ্ন আপনি দেখিতেছেন কি কারণ তাহা ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বোধগম্য করিতে পারিতেছি না। এবং সমস্ত আনুপূর্বিক বিচার করিয়া আপনার ন্যায় ধর্মপরায়ণ ভক্তিভাজনের অপরাধ খুঁজিয়া পাইতেছি না। আপনার দুঃস্বপ্ন দর্শনকেও উড়াইয়া দিতে পারিতেছি না। উপর্যুপরি দুঃস্বপ্ন দর্শন কিমতে উপেক্ষা করিতে পারা যায়। তবে এথানকার সেবা ইত্যাদিতে ত্রুটি হয় নাই এবং হইবেক না জানিবেন। তবে হিতৈষী হিসেবে যদি মদীয় চিন্তায় যাহা মনে হইতেছে তাহা নিবেদন করি, তবে আপনি দুষ্য মনে করিবেন না। আপনার অপরাধ ওই শ্যামাকান্তের অপঘাতমৃত্যুতে কিছু অর্শিয়া থাকিবেক বলিয়া মনে লইতেছে। সম্ভবতঃ জলে ডুবিয়া আপনি নিজে বাঁচিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন। তাঁহাকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিতে পারেন নাই। হইয়া থাকিলে এইখানে অপরাধ হইয়া থাকিবেক। অন্যথায় তাঁহাকেই বা স্বপ্নে দেখিবেন কেন? আমার বিবেচনায় আপনি যদি ৺শ্যামাকান্তের বংশাবলীকে তুষ্ট করেন, তবে অবশ্যই তিনি তুষ্ট হবেন। শ্যামাকান্তের এক শ্বশুরালয় শ্যামনগর। আমার কন্যারও বিবাহ শ্যামনগরে ভট্টাচার্য বংশে দিবার স্থির করিতেছি। তাহার সপ্তমবর্ষ অতিক্রান্ত হইতে চলিতেছে। সেই সূত্রে সেখানে গিয়া জানিলাম, শ্যামাকান্তের এক পুত্র আছে। পুত্রটি পিতৃমাতৃহীন। মাতামহী লালনপালন করিতেছেন। অবস্থা ভাল নহে। তাহাকে কিছু অর্থ, কিছু সম্পত্তি দান করিলে মনে হয় ইহার প্রতিকার হইতে পারিবেক। অধিক কি আর, নিবেদনমিতি, পূঃ—শ্রীযুক্তা গিন্নীঠাকুরাণীর সহিত পরামর্শ করিয়াই ইহা লিখিলাম। তিনি সাতিশয় বিব্রত এবং ভীত হইয়াছেন।

সোমেশ্বর রায় এই পত্র পেয়ে পত্র উপেক্ষা করলেন না, নিজে স্বয়ং এসে হাজির হলেন কীর্তিহাট। এবং পুরোহিত রামব্রহ্মকে এবং নায়েব গিরীন্দ্র আচার্যকে সঙ্গে নিয়ে রওনা হলেন শ্যামনগর। যাতায়াতের জন্য বজরা ছিল নিজস্ব। দুখানা বজরার সঙ্গে পাহারাদারি ছিপে লাঠিয়াল সঙ্গে নিয়ে রওনা হলেন। সঙ্গে অর্থ নিয়েছিলেন। দিয়ে আশীর্বাদ নিয়ে আসবেন। কাঁসাই ধ'রে হলদী হয়ে গঙ্গার উজান বেয়ে এসে উঠলেন শ্যামনগরের ঘাটে। কোথায় কার বাড়ীতে আতিথ্য নেবেন? শ্যামনগর ব্রাহ্মণ সদগোপ-প্রধান গ্রাম। ব্রাহ্মণেরা ব্রহ্মত্র ভোগ করেন, যাজন-যাজন গুরুগিরি করেন। সদগোপেরা চাষবাস ক'রে খায়। এদের কারুর খড়ের চালের বাড়ীতে সোমেশ্বর রায় স্বচ্ছন্দবোধ করতে পারবেন না। খড়ের চাল মাটির দেওয়ালের ঘরে শুলে মনে হত ঘরে আগুন লাগবে, রাত্রে কোন না-দেখা গর্ত থেকে সাপ বেরিয়ে কামড়াবে, এমন কি ভূমিকম্প হয়ে ঘর ভেঙে পড়বার আতঙ্কও তাঁর ছিল। স্থির করলেন বজরাতেই তিনি থাকবেন। রামব্রহ্ম ন্যায়রত্ন তাঁর ভাবী বৈবাহিককে খবর দিতেই গ্রাম ভেঙে এসে দাঁড়াল। কীর্তিহাটের রায়বাবু এসেছেন। তাঁর সাজানো বজরা, সেই বজরা দেখতেই তাদের কৌতূহলের অন্ত ছিল না।

ভট্টাচার্যেরা এসে সসম্মানে তাঁকে আহ্বান করলেন, বললেন—মহাভাগ্য আমাদের! আপনি পদার্পণ করেছেন।

সোমেশ্বর তাঁদের কাছেই খোঁজ নিলেন—শ্যামাকান্ত তান্ত্রিকের বিগত বিবরণ এবং তাঁর

ছেলের বর্তমান অবস্থার সংবাদ।

রামব্রহ্ম ন্যায়রত্নের ভাবী বৈবাহিক বললেন—শ্যামাকান্ত চট্টোপাধ্যায় কাশ্যপ গোত্রীয় কুলীন সন্তান বাবু, মূলবাড়ী ওদের যশোহর জেলায়। শ্যামাকান্তের বাপ কাশীনাথ অনেক বিবাহ করেছিলেন। এই হুগলী জেলাতেই সাত আটটি বিবাহ ছিল। শুদ্ধাচারীর বংশ। সাধনা-টাধনার ঝোঁক তাঁরও ছিল। শ্যামাকান্তকে নিয়ে তিনি ঘুরতেন। ওইটিই তাঁর ঘরণী স্ত্রীর সন্তান। গান তিনিও গাইতেন। শ্যামাকান্তকে বলতে গেলে তিনি মূলধন দিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর পর শ্যামাকান্তও বাপের বৃত্তি নিয়েছিলেন। সুন্দর সুপুরুষ চেহারা। গানবাজনায় যাকে বলে ওস্তাদ। ওস্তাদও বটে সাধকও বটে।

আমাদের এখানে, আমার জ্ঞাতিভাই অবশ্য, বয়সে আমার থেকে অনেক বড়, বলতে গেলে পিতৃতুল্য জ্যেষ্ঠ ছিলেন—পদ্মনাভ ভট্টাচার্য। পণ্ডিত লোক। টোল ছিল বড়। নাম ছিল। নিজে পণ্ডিতই শুধু ছিলেন না, ক্রিয়াকর্ম, বিশেষ করে তান্ত্রিক পূজা, খুব ভাল জানতেন। তন্ত্রমতে স্বস্ত্যয়নে খুব খ্যাতি ছিল। পঞ্চপর্বে জপতপ-ক্রিয়াও করতেন। শ্যামাকান্ত কোত্থেকে তাঁর খোঁজ পেয়ে তার তানপুরা ঘাড়ে এসে হাজির হল। তখন নবীন যৌবন বলতে গেলে। আমরাও তখন নবীন। কিছু কম বয়স। পদ্মনাভ ভটচাজকে জড়িয়ে ধরলেন —আমাকে পুরশ্চরণ করাতে হবে। দীক্ষা আমার বাবার কাছে নিয়েছি। পুরশ্চরণ করা হয় নি। সেটি করিয়ে পূর্ণাভিষেকে দীক্ষিত করতে হবে। রূপবান চেহারা বাবু, তার উপর সুন্দর কণ্ঠ, তারা তারা বলে গান গাইতে গাইতে বিভোর হয়ে যেতো; পদ্মনাভ-দাদা ফেরাতে পারলেন না। বললেন—বেশ থাকো। কিন্তু তন্ত্র-শাস্ত্র পড়েছ? সেটা কিছু প'ড়ে নাও। থাকবে আমার এখানে পুত্রের মত। এই থাকতে থাকতে মায়া জন্মাল। নিজের একটি কন্যা ছিল। বললেন—আমার মেয়েকে বিয়ে কর। তুমি শিবের মত পাত্র, আমার কন্যাও সুলক্ষণা। গৃহস্থ হয়ে ঘরে স্বামী-স্ত্রীতে সাধনা করবে। আমি বলছি, যা চাও তাই পাবে। আমার টোল আমার যজমান—ব্রহ্মত্র রয়েছে, নিশ্চিন্ত সাধনা করতে পারবে। তাই হয়ে গেল। তিনি মানে শ্যামাকান্ত একটা পুরুষ ছিলেন। গানে বাজনায় হাসিতে একেবারে আমাদিগে মাতিয়ে রাখতেন। মধ্যে মধ্যে থ্যাপার মত হাসতেন।

সোমেশ্বর বললেন—সে তো আমি জানি—দেখেছি।

—হ্যাঁ শুনেছি। কিন্তু প্রথম বয়সে দেখেন নি। মানে কুড়ি বাইশ বছরে। তখন বলতেন—জান হে শিবানন্দ, কালী এলে কি বলব জান? আমি বলতাম—কি? বলতেন—বলব—রাজা কর্ আমাকে, রাজা করে দে। হা হা করে খানিকটা হেসে আবার বলতেন —তোমাকে মন্ত্রী করব হে। আর বিয়ে করব একশো আটটা। তোমার ভাইঝির সব দাসী ক'রে দোব।

মধ্যে মধ্যে চলেও যেতেন তানপুরো ঘাড়ে ক'রে। কোথাও ওস্তাদ এসেছে শুনলে কি কোথাও কোন সাধুটাধু এসেছে শুনলে আর তাকে রাখে কে?

পদ্মনাভ শেষটায় আপশোষ করতেন, ওকে বাঁধতে গিয়ে ভুল করেছি। কন্যেটার কপালে কষ্ট আছে। ইতিমধ্যে তিনি হঠাৎ জ্বরবিকারে মারা গেলেন। শ্যামাকান্তকে বলে গেলেন

—দেখ, ঘরে বসে সাধনা কর। এমন ক'রে ছুটো না। তখন আমার ভাইঝি মানে পদ্মনাভ-দাদার কন্যা বড় হয়েছে। কিছুদিন এই সময় সুস্থ হয়ে ছিলেন তিনি। তারপর এই সন্তান হল। সন্তানটি বছরখানেকের যখন তখন একদিন উধাও হলেন। শুনেছেন এক সাধু এসেছে, খুব বড় সাধু। দেখতে গিয়ে বাস মানুষ সেই গেল আর ফিরল না। এর মধ্যে কাণ্ড হল, ওঁর স্ত্রী আমার ভাইঝি মারা গেল। তারপর থেকে আমার বউদিদি, পদ্মনাভ-দাদার স্ত্রী, ওই নাতিকে নিয়ে মানুষ করছেন আর কাঁদছেন। দেখবার শুনবার মানুষ নাই। জমি জেরাত, মালের জোত নিলেম করালে জমিদার, মানে সরকার বাবুরা। এখন ব্রহ্মত্রটুকু আছে। বাড়ীতে নারায়ণশিলা আছে। ওই পালেরা খুব অনুগত ওদের। ও বাড়ীর মহাভক্ত। ভাগে চাষ করে ষোলআনার উপরেও কিছু এনে দেয়। তাতেই চলে। বালকটিও অত্যন্ত সুশীল মেধাবী, নবম বৎসরে উপনয়ন হয়েছে। ভক্তিমান, সুন্দর কান্তি। আমি তাকে শালগ্রাম সেবাপূজা শিখিয়ে দিয়েছি। এখন পূজাও সেই করে। এই কোনরকমে চলছে আর কি! তা আপনি যখন এসেছেন তখন তার আর চিন্তা কি? এবার তার বৃহস্পতির দশা হল। শুধু একটা আপশোস হচ্ছে তিনি জলে ডুবলেন, সে সময় যদি একটা সংবাদ পেতাম তবে শ্রাদ্ধটা করাতাম।

সোমেশ্বর ঘাড় হেঁট ক'রে রইলেন, তারপর বললেন—ওটা আমার অপরাধ হয়েছে। নিশ্চয় অপরাধ হয়েছে। তবে কি জানেন। আমার মনে হয়েছিল সংসারাশ্রম ত্যাগী সন্ন্যাসী তো। তাঁর আবার শ্রাদ্ধ কি? তবে আমি সন্ন্যাসীর পারলৌকিক যা তা করেছিলাম।

শিবানন্দ বলেছিলেন—তা করবেন বইকি। নিশ্চয়, তাতে ত্রুটি হবে কেন? রাজাতুল্য ব্যক্তি। গৃহে দেবতা অবস্থান করছেন। না, তা আমরা বলি নি। তবে ছেলেকে দিয়ে কিছু করানো যেত এই আর কি!

—এইবার করুন। শাস্ত্রে নিশ্চয় বিধি আছে। পতিত শ্রাদ্ধ উদ্ধার তো হয়! চলুন আমি একবার ছেলেটিকে দেখে আসি।

—আপনি কেন যাবেন। সে আসবে।

—না—না। তার মাতামহীকে প্রণাম ক'রে আসব। দেখে আসব ঘরদোর। পদব্রজে শ্যামনগরের ধুলো পায়ে মেখে সোমেশ্বর রায় এসে উঠেছিলেন পদ্মনাভ ভট্টাচার্যের ভাঙা ঘরে। ঘর তখন ভাঙাই বটে। নিদারুণ অর্থকষ্টের লক্ষণ গৃহস্থের গৃহস্থালীর সর্বাঙ্গে ভগ্নদেহ রোগীর দেহের মত ফুটে উঠেছে।

সেই ভাঙা দাওয়ায় খুঁটি ধরে একটি সুকুমার কিশোর দাঁড়িয়েছিল বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে। পিছনে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁর মাতামহী, মাথায় দীর্ঘ অবগুণ্ঠন।

সোমেশ্বর প্রথম দৃষ্টিতেই মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। বাঁশীর মত নাক, আয়তটানা চোখ, গৌর-বর্ণ রঙ। দেখতে শ্যামাকান্তের মতই। তাঁর দাড়ি গোঁফ চুল ছিল বলে সাদৃশ্যটা অবিকল তা বোঝা যায় না তবে বললে সঙ্গে সঙ্গে মনে হবে হ্যাঁ, এই তো তার ছেলেই বটে।

সুলতা, এই টিকলো নাক আর টানা আয়ত চোখ এটা রায়বংশের নয়। এটা শ্যামাকান্ত

চট্টোপাধ্যায়ের বংশের। রায়বংশও সুপুরুষ বংশ। কিন্তু ওই ছবির দিকে চেয়ে দেখ—কুড়ারাম ভট্টাচার্যের, সোমেশ্বর রায়ের, বীরেশ্বর রায়ের রঙ গৌরবর্ণ কিন্তু নাকের ডগাটা মোটা, চোখ বড় হলেও টানা নয়, তার মধ্যে উগ্রতা আছে। কিন্তু রত্নেশ্বর রায়ের চোখ, তারপর থেকে আমাদের চোখ টানা, তাতে একটা মাদকতা আছে।

আঃ, যদি তুমি আমাদের বাড়ীর কোন মেয়েকে দেখতে সুলতা তবে বুঝতে। অর্চনা, জগদীশ্বর-কাকার মেয়ে তার দৃষ্টি যেন মদির!

ঘড়িতে ঢং শব্দে আধঘণ্টা বাজল।

সুরেশ্বর বললে—ঘড়ির দিকে তাকিয়ো না। আমাদের ঘড়ির কাঁটা একশো পনের কুড়ি বছর পিছিয়ে গেছে।

যা বলছিলাম।

সোমেশ্বর যা করলেন তা যে করবেন তা নিজেও বোধ হয় ভাবেন নি। ছেলেটিকে কোলে তুলে নিলেন। কষ্ট তাঁর হয়নি। বত্রিশ তেত্রিশ বছর বয়স, সবল রায়বংশের পুরুষ, অনায়াসে এগার বছরের বিমলাকান্তকে কোলে তুলে নিয়ে বললেন—তোমার নাম কি বাবা।

—আমার নাম শ্রীবিমলাকান্ত দেবশর্মা চট্টোপাধ্যায়।

—কি নাম? বিমলাকান্ত?

—আজ্ঞে হ্যাঁ বাবু।

ছেলেটিকে কোল থেকে নামিয়ে দিয়ে বললেন—হে ভগবান। একেই বলে প্রাক্তন ভগবদ্ নির্দেশ। ন্যায়রত্নমশাই—

—আজ্ঞে!

—শ্যামাকান্ত যখন যাগযজ্ঞ করেন আমার সন্তানের জন্য তখন যজ্ঞশেষে বলেছিলেন—কন্যা পুত্র যাই হোক নাম রেখো ব দিয়ে। আমার মেয়ের নাম বিমলা। ছেলের নাম বীরেশ্বর। তিনি ব দিয়ে নাম রাখতে বলেছিলেন। বিমলা রাখতে তো বলেন নি। সেটা তো আমি রেখেছি। তা—হলে?

রামব্রহ্ম বলেছিলেন—হ্যাঁ, যোগাযোগটা অদ্ভুত বটে।

—অদ্ভুত নয়, বিধিনির্দিষ্ট। বলেই হাতজোড় করে পদ্মনাভ ভট্টাচার্যের স্ত্রীকে বলেছিলেন—মা, ভিক্ষা চাইছি। আমার কন্যা বিমলার জন্য আপনার বিমলাকান্তকে যে ভিক্ষা চাইছি মা। আমার মা এক কন্যা এক পুত্র সন্তান, আর হবে না। বিমলাকান্তের সঙ্গে বিমলার বিবাহ দিয়ে আমি সম্পত্তি দু অংশে ভাগ করে দোব। ওকে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে লেখাপড়া শেখাব। শ্যামাকান্ত আমার জন্য যজ্ঞ করে পুত্র কন্যা বাঁচিয়েছেন, আমার বাড়ীতে গুরুর মত পুরোহিতের কাজ করেছেন। মা, তাঁর আমলে আমার বৃদ্ধির সীমা নাই। একসঙ্গে নৌকোডুবিতে ডুবলাম, আমি বাঁচাতে চেষ্টাও করি নি মা, নিজে সাঁতার কেটে কূলে এসেছি। ভাবি নি তাঁকে বাঁচাতে গিয়ে মরলেও আমার অক্ষয় স্বর্গ হত। এ আমার

মহাপাপ হয়েছে। সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করব মা, আমি বিমলাকান্তকে জামাই করে।

প্রৌঢ়া মাতামহী বলেছিলেন—ঘোমটার ভিতর থেকে ফিসফিস করে—সে ঘোমটার মুখে কান না-পাতলে শোনা যায় না। সোমেশ্বর বলেছিলেন—বিমলাকান্তের দিদিমা আপনি, আমি তার শ্বশুর হব সুতরাং আমি তো আপনার ছেলে মা। আমার সামনে কথা বলতে দোষ কি।

ঘোমটা-ঢাকা মাথাখানি ঘন ঘন নড়ে উঠেছিল—না। অর্থাৎ তা পারবেন না।

শিবানন্দ হেঁট হয়ে ঘোমটার গায়ে কান পেতে বলেছিল—তবে আমাকে বল আমি বলছি। তখন শিবানন্দকে বলেছিলেন—ওরে বাপরে, এর উপর আমি কি বলব? কি আছে বলবার। আমি তো বাঁচলাম। উনি আমাকে বাঁচালেন। কত্তা স্বপনে বলেন—গিন্নী এস। তা আমি বলি এখন আমি পারব না। এইবার আমি নিশ্চিন্ত। ওকে দিলাম। তবে দুটি কথা। আমি যতদিন আছি ওকে নিয়ে যাবেন না।

সোমেশ্বর বলেছিলেন—নারায়ণ, নারায়ণ। কালী, কালী। তাই পারি? তবে আপনি চলুন—

—ছি—ছি—ছি!

—কেন তীর্থস্থানে কালীঘাটে! আলাদা থাকবেন।

—তা আমার ঠাকুরসেবার কি হবে?

—হবে। যেমন চলছে তেমনি চলবে। পূজো ভোগ সবের ব্যবস্থা বিমলাকান্তের বউ যে হবে তার কাজ, তার ব্যবস্থা করবে সে!

—ভিটেটি থাকবে তো?

—নিশ্চয়, বিমলাকান্ত আমার জামাই হবে, আমার মেয়ে এই ভিটের বউ হবে—এ ভিটে না-থাকলে যে তাদের অকল্যাণ হবে।

—বেশ বেশ বাবা বেশ! যা করবে তুমি তাই হবে।

প্রণাম করে চলে এসেছিলেন সোমেশ্বর বজরায়। বাড়ী থেকে বের হতেই বৃদ্ধার কান্না শুনতে পেয়েছিলেন, ওরে মা রে—ওরে বাবা শ্যামাকান্ত রে, কোথায় তোরা গেলি রে মানিক, ওরে তোদের বিমলাকান্ত রাজা হল রে, একবার এসে দেখে যা রে।

চোখের জল মুছেছিলেন সোমেশ্বর। এবং তিনদিনে শ্যামাকান্তের শ্রাদ্ধ করিয়ে শ্রাদ্ধান্তে বিমলাকান্তকে আশীর্বাদ করেছিলেন। একজন চাকর একজন কর্মচারী রেখে বাড়ী মেরামত করবার বন্দোবস্ত করেছিলেন। চাকর মানে সর্বক্ষণ-স্থায়ী চাকর নয়, ভগবান পালই ওদের তিন পুরুষের জোতদার, ভাগে জমি করে, তাকে ডেকে আনিয়ে মাসে দেড় টাকা মাইনের ব্যবস্থা করেছিলেন। একজন বিধবা ব্রাহ্মণকন্যাকে বাড়ীর রান্নার জন্য দেড় টাকা বেতনে নিযুক্ত করেছিলেন।

বিষয়-সম্পত্তি কি আছে কি গেছে তাও খোঁজ নিলেন। খাজনার জোত সবই গেছে। ব্রহ্মত্র আছে সামান্য। সোমেশ্বর গিরীন্দ্র আচার্যকে পাঠালেন জমিদারবাড়ী। পত্তনীদার সরকারবাবুদের বাড়ী সন্নিকটেই, শ্যামনগরের একটা মাঠ পার হয়ে রাধানগর। শ্যামনগর

রাধানগর দুটি মৌজা মিলিয়ে লাট যুগলপুর। এর জমিদারেরা প্রাচীন, পরগনা গোকুলশাহী, নবাবী আমলের দানেশমন্দ পেত্তাধারী রাজার এলাকা! কিন্তু দশশালা বন্দোবস্তের পর 'সানসেট ল'য়ের আমলে পরগনা রাখতে পারেন নি। কিছু কিছু মৌজা লট অষ্টম আইন হতেই পত্তনী বন্দোবস্ত করেছেন। যুগলপুর লাট বন্দোবস্ত নিয়েছে এখানকার সরকাররা। জাতিতে কায়স্থ। পেশা পূর্বে ছিল ওই পরগনাতেই তহশীলদারী। এখন পত্তনী স্বত্বে জমিদার। পাকা হিসেব, গোমস্তা থেকে জমিদার। এবং মহাজনীও করেন।

বলতে গেলে স্থলতা, আমার পূর্বপুরুষ কুড়ারামেরই জাতের লোক তবু তফাৎ একটু আছে। ভারত অধীশ্বর যদি সিংহ হয় তবে ভূস্বামী বৃদ্ধ বাঘের জাত। কুড়ারাম ছিলেন চিতা। আর এরা নেকড়ে বলা যায়। যারা কোল থেকে ঘুমন্ত ছেলে তুলে নিয়ে গেলে জানতে পারা যায় না। আমি জমিদারবংশের ছেলে—আমার কাঁধের উপর ভারীদের মত দুদিকে মস্ত ভারী দুটো ভার। তার একটাতে ভাল কাজের বোঝা আছে, অন্যটায় হয়তো তার থেকেও ভারী মন্দ কাজের বোঝা আছে। সেই আমিই বলছি এদের মাথায় একটা মোট ছিল, সেটা মন্দ কাজের মোট। বগলে ভিক্ষের ঝুলির মত একটা ঝোলা আছে তাতে ভাল কিছু নিশ্চয়ই থাকবে। না থাকা হতেই পারে না।

ঝুলিটার মধ্যে যা ছিল সেটা হল দেব-দ্বিজে মৌখিক ভক্তি। ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করার পুণ্য, কপালে তিলক কাটতেন—তার পুণ্য। মধ্যে মধ্যে ব্রাহ্মণভোজন করাতেন এবং উচ্ছিষ্ট পাতা-গুলি বিতরণ করতেন ব্রাত্যদের। কীর্তন গান শুনে কাঁদতেন। এগুলি কৃত্রিম ছিল তা বলছি না। অকৃত্রিমই ছিল।

অন্যদিকে অর্থাৎ মোটটায় ছিল অনেক কিছু। সেগুলো মোটা ভারী কিছু ছিল না। খুন-খারাবী দাঙ্গা ঘর জ্বালানো এসব ছিল না। কিন্তু হিসেব যোগটি ছিল জোঁকের মত। তাই-ব কেন ওই নেকড়ের মত।

কোন ব্রাহ্মণ প্রজা এলে তাঁর পদধূলি নিয়ে প্রণাম করত, যত্ন করে খাওয়াতো। তারপর সুদ মাপের সময় হাতজোড় করে বলত—ওইটি পারব না। টাকা ধার করতে এলে সম্পত্তির খোঁজ-খবর নিয়ে 'কটে' টাকা দিত। কট মানে ব্যারিস্টারের বাড়ীর মেয়ে তোমার বোঝা উচিত। তবে কট আর নেই। কট ছিল মেয়াদী বন্ধকী। দশ বছর, পাঁচ বছর সময় নির্দিষ্ট থাকত, তার মধ্যে টাকা শোধ দিতে হবে। না দিলে মেয়াদ-অন্তে ওই ধারের দলিলই বিক্রী দলিল হয়ে যাবে।

এই সরকারেরাই বিচিত্র কৌশলে বিমলাকান্তের মাতামহের জোতগুলি খাস করে নিয়েছে! সরকারদের আয় বিশেষ ছিল না। হাজার চারেক টাকা জোত। তবে প্রজার বাড়ীর চালের লাউ-কুমড়ো, শাক-আড়ার শাক, গরুর দুধ, পুকুরের মাছ প্রভৃতির একটা রাজভাগ বলে ভাগ নিয়ে মন্দ চলত না। ছেলেরা শুধু দুধে-ভাতেই মানুষ নয়, মাছে-ভাতেও বেশ প্রোটিন পুষ্ট দেহ। মাংসটা খেতো না কারণ বৈষ্ণব।

সোমেশ্বরের আগমনবার্তা শুনে তাঁরা নিজেরাই এলেন। সে কি কথা ব্রাহ্মণ। রাজতুল্য ব্যক্তি! তিনি এসেছেন, পদার্পণ করেছেন আমার ভূমিতে, দেখা করতে যাব না!

যাবার সময় চাদরের খুঁটে হিসাব করে পুরাতন জমির জন্য সুদসহ পাওনা এবং নতুন এতশত বিঘা জমির মূল্য বা সেলামী হিসাব করে—প্রায় চার হাজার টাকা—বেঁধে নিয়ে চলে গেলেন। বলে গেলেন—হরি বোল হরি বোল। গোবিন্দের মহিমা কাকে যে কখন কি করেন এক তিনি ছাড়া কেউ বলতে পারে না। জয় গোবিন্দ, জয় গোবিন্দ।

বৃদ্ধ সরকারের একটি চোখ ট্যারা ছিল। কোন্‌টি তা খবর পাইনি। পরবর্তী কালে বীরেশ্বরের একখানি চিঠি পেয়েছিলাম। লিখেছিলেন গোমস্তাকে, ওই লোকটা যেন আমার কাছে না আইসে। তাহাকে দেখিলেই আমার ক্রোধ হয়, চোখটা গালিয়া দিতে ইচ্ছা হয়।

এই লাট যুগলপুর বিক্রী করেছিল সরকারেরা বীরেশ্বর রায়কে।

এই ঘটনার প্রায় একত্রিশ বছর পর। ১৮৬২ সাল। মিউটিনীর পর। তখন ইংলণ্ডেশ্বরী ভারতেশ্বরী হয়েছেন।

যাক স্থূলতা, সে কথায় পরে আসব। সে একত্রিশ বছর পরের কথা। ১৮৩১ সালে বিমলা-কান্ত চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে বিমলার বিবাহ হয়ে গেল। সে বিবাহ মহাসমারোহের বিবাহ। তার খরচের অঙ্কটাই আছে জমা-খরচের খাতায়, বিশদ বিবরণ কোন কাগজপত্রে নেই। বেঁচে আছে লোকের মুখে মুখে, আর কয়েকটি নিদর্শনে।

রায়বাড়ীর খিড়কীতে দুধপুকুর হয়েছিল। সোমেশ্বরের বিয়ের সময় বধূ কাত্যায়নী তাতে স্নান করবেন। এবার কাটানো হয়েছিল বিমল সায়র—কন্যা বিমলার বিবাহে। বিমলা কন্যা। তার গ্রামে বের হতে লজ্জা নেই। তাই কাটানো হয়েছিল ঠাকুরবাড়ীর পিছন দিকে। ঠাকুরবাড়ীর সামনে 'মায়ের পুকুর' কালীমন্দির প্রতিষ্ঠার সময় কাটানো হয়েছিল। সে পুকুরে স্নান করত পুরুষে মেয়েতে সকলে। জলও খেতো। এবার কাটানো হল বিমল সায়র। এ সায়রে স্নান করবে গ্রামের মেয়েরা। তবে হাড়ি বাউড়ী ব্রাত্যদের মেয়েরা নয়। দু দিকে দুটো ঘাট বাঁধানো হয়েছিল। সে বাঁধাঘাট এখনও আছে। রানাগুলো ভেঙেছে, সিঁড়ি পায়ে পায়ে ক্ষয়ে গেছে, তবুও আছে। এখনও বিমল সায়রই গ্রামের সব থেকে ভাল পুকুর।

আর সে খাওয়া-দাওয়ার গল্প কাহিনীর মত এখনও লোকের মুখে মুখে আছে। মেয়ের বিয়েতে একটা পর্ব ছিল ক্ষীর চিঁড়ে। ক্ষীর চিঁড়ে কলা গুড় দিয়ে সধবাদের খাওয়ানো হত। সোমেশ্বর ক্ষীর চিঁড়ে করেছিলেন ; তার গল্প করে লোকে বলে—ক্ষীর ছিল খুসবু ক্ষীর, গন্ধে মৌ-মৌ করেছিল নাটমন্দির। যারা খেয়েছিল তারা সারাটা দিন খুসবু ভরা ঢেকুর তুলেছিল। চিঁড়ে ছিল গোবিন্দভোগ ধানের, যে ধানে যখন শীষ বের হয় তখন গোটা মাঠটা সুগন্ধে ভরে ওঠে। তাছাড়া কলকাতার সন্দেশ মিষ্টি ; তখন কলকাতায় নতুন রসগোল্লা হয়েছে, পান্তুয়া হয়েছে। গ্রামের লোক খায়নি। তার সঙ্গে মর্তমান কলা। দেশের মিষ্টি ছিল মণ্ডা আর বোঁদে। মণ্ডা বলতে চিনির চেলা।

বল্লভ পাল গ্রামের প্রবীণতম চাষী সদ্‌গোপ। সে আমার কড়চায় অনেক উপকরণ

যুগিয়ে দিয়েছে। সে শুনেছিল তার বাপ-মায়ের কাছে, ঠাকুমার কাছে। পাল এখন ঘোষ উপাধি নিয়েছে। সে বলেছিল, বাবু, মণ্ডা মানে চিনির ঢেলা, বাড়ীতে ভাঁড়ে থাকত। কখন আসে কুটুম-সজ্জন অতিথি-ফকীর, মাসাবধি থাকলেও গন্ধ হত না। কিন্তু যার দাঁত ভেঙেছে তাকে চুষতে হত। যার নড়া দাঁত তারও জলে গুলে খেতে হত। একবার ওই ঘোষলবাড়ীতে, যিনি আপনাদের নায়েব গো, তার বাড়ীতে এক রাগী বামুন এসেছিল দুপুরবেলায়। তাকে দিয়েছিল মণ্ডা। ব্রাহ্মণ কামড় মেরে বেকুব, নড়া দাঁত ছিল, মট করে গেল ভেঙে, তেষ্টা-ক্ষিধের সময় দাঁত ভেঙে ব্রাহ্মণ আগুন। সেই মণ্ডা নিয়ে ছুঁড়ে মেরেছিল গেরস্ত কত্তার কপালে। কপাল কেটে রক্ত পড়ল, মণ্ডা ভাঙল না।

আর গল্প আছে অন্দরমহলের সঙ্গে জোড় লাগিয়ে আর এক মহল অন্দরের পত্তন। কন্যা-জামাতার জন্যে আর এক মহলের বনেদ গোড়া হয়েছিল ওই বিয়ের অষ্টমঙ্গলের মধ্যে। এ কথাটা চলিত আছে কীর্তিহাটে।

অষ্টাহব্যাপী উৎসব। বাঈ নাচ, খেমটা নাচ, তার সঙ্গে বহুবল্লভ পাল বলে—এসেছিল বাবু তর্জা গান! মহাদেব মোদক আর কেষ্ট ঘোষ। বাবার কাছে শুনেছি, তিনি ত্যাখন বালক। বুয়েচেন, মহাদেব মোদক এই কালো রঙ আর শিবের মত ডাগর রাঙা রাঙা চোখ। আর ধবধবে সাদা মাথার চুল। তেমুনি এক জোড়া সাদা মোচ। নেপুর পায়ে দিয়ে কি নাচন ধুয়ো ধরেছিল।

নেচে নেচে আয় রে আমার কেষ্ট নীলমণি
যতনে তোমার পিঠে পট্‌পটাপট লাগাই পাঁচনী।
রাজাবাবুর মেয়ের সাদী পাত্র ব্রাহ্মণ কুলের নিধি
নিখুঁত আচার বেদ বিধি তার সাথে নাচে যবনী
বেটা তোর তার পিছে কিসের ঘুরঘুরানি
পিঠে তোর লাগাই পাঁচনী!

তর্জা গানে সাধারণ লোকে মেতে গিয়েছিল। এখনও লোকে ওই কয়েক ছত্র মনে করেই রাখে নি শুধু, গান করেও গেয়ে থাকে। চাষের সময় মাঠে গেলে চাষীর মুখে শোনা যায়, আমি শুনেছি।

একটা হাসির কথা এর সঙ্গে আছে। পাঁচ বছরের বীরেশ্বর খুব কেঁদেছিলেন। বলেছিলেন দিদির বিয়েতে সব হয়ে গেল তো আমার বিয়েতে কি হবে?

* * *

এর পর জামাই ছেলেকে নিয়ে—ছেলে জামাইয়ের শিক্ষার জন্য বাধ্য হয়ে—কাত্যায়নীকে যেতে হয়েছিল কলকাতা।

গ্রামের গল্প এখানেই ফুরিয়ে গেছে। কিন্তু চার বছর পর সোমেশ্বর আবার সপরিবারে এসেছিলেন কীর্তিহাটে। শুধু জামাইকে রেখে এসেছিলেন কলকাতায়, সে তখন কলকাতায়

হিন্দু কলেজে পড়ছে। বয়স পনের বছর। মেয়ে বিমলার বয়স বার। সে তখন অন্তঃসত্ত্বা হয়েছে। আর সঙ্গে সঙ্গে মাথায় দোষ দেখা দিয়েছে। শিউরে উঠেছেন সোমেশ্বর এবং কাত্যায়নী। মা ছাড়া এ বিপদে উপায় কি? এ ছাড়াও সোমেশ্বরের আর একটা টান ছিল। নীলকর রবিনসন তখন নীলের কুঠীতে লাভ করে ব্যবসা বাড়াচ্ছে। একটা কুঠী থেকে তিনটে কুঠী করছে। নতুন কুঠীর একটা এখানেই মাইল দুয়েক দূরে। আর একটা শ্যামনগরে। শ্যামনগরের সরকারেরা তখন অবস্থায় ঘায়েল হয়েছে। তাদের সঙ্গে রবিনসনের যোগাযোগ সোমেশ্বরই করে দিয়েছিলেন। এবং অন্য দিকে তাঁর ঝোঁক পড়েছে নতুন নতুন ভূসম্পত্তি কেনার উপর। দ্বারকানাথ ঠাকুর মশায়ের মত পরগনা কেনার ঝোঁক তাঁর ছিল না। ছিল বাছাই করে লাট মৌজা খরিদের। নতুন ম্যানেজার গিরীন্দ্র আচার্য বিচক্ষণ লোক, তাঁর পরামর্শে তিনি কিনেছিলেন সেই সব মৌজা যে সব মৌজায় পতিত আছে বেশী। পতিত আবাদ করিয়ে বিলি করে তা থেকে মোটা লাভ হবে।

৮

সুরেশ্বর বললে—সুলতা, তুমি নিশ্চয় জান, অন্ততঃ এম-এল-এ সুবোধবাবুর বক্তৃতায় শুনেছ, পশ্চিম বাংলায় জমিদারেরা পার্মানেণ্ট সেটেলমেণ্টের সময় প্রজার কাছে খাজনা আদায় করে কোম্পানী সরকারকে দিত তার ৯০ ভাগ, নিজেরা পেত ১০ ভাগ। সেই স্থলে তারা ক্রমে খাজনা বাড়িয়ে যে আয় করেছিল বা করেছে তাতে এখন সরকারের ভাগ হয়েছে ২১, জমিদার লাভ করে ৭৯। বাংলার সরকারের রাজস্ব আয় এখন এক কোটি বারো লক্ষ—আর জমিদারের আয় সাত কোটি উনআশী লক্ষ। তার পথ আবিষ্কার করেছিলেন যাঁরা, তাঁদের মধ্যে সোমেশ্বর একজন।

সোমেশ্বর এতেই মেতেছিলেন।

জামাই কলকাতায় পড়ছিল। জামাই বিমলাকান্ত সুপুরুষ, শান্ত বুদ্ধিমান। তার সম্বন্ধে তাঁর চিন্তা ছিল না। কাত্যায়নী কিন্তু বলতেন—বিমলের সম্পর্কেই ভাবনা আমার। ও চালকলা-বাঁধা বামুনের ছেলে, ছেলেবেলায় যজমান চরিয়েছে তো। বিমলাকে যদি আমার রোগেই পায় তবে কুলীনের বেটা সংস্কৃতজানা যজমান-চরানো ছেলে ও কি—?

অর্থাৎ ও কি আবার তাহলে বিয়ে না করে সেবাদাসী বাঈজী নিয়ে সন্তুষ্ট থাকবে? আমি যে মাথায় মাথায় ভাবছি গো।

তারপর ছেলে বীরেশ্বরকে দেখিয়ে বলতেন, আর দেখ না, এই ভটচায্যি থেকে রায় হওয়া হারামজাদাকে দেখ না! সেই যে না, হিঁদুর ছেলে মুসলমান হলে কালাপাহাড় হয়, ঠিক তাই। একেবারে মেলেচ্ছ হল।

নয় বছরের বীরেশ্বরের সঙ্গে রবিনসন সাহেবের ছেলে জনি, জন রবিনসনের খুব ভাব হয়েছে। তার বোন মেরীর সঙ্গেও ভাব। সে সকালবেলা উঠেই টাটু ঘোড়ায় চড়ে চলে যায় কুঠী-বাড়ীতে। বেলা বারোটায় এসে খায়। তাতেও তার আপত্তি। ওখানে খাবে না কেন?

ওখানে সে জনির সঙ্গে হুটোপুটি করে, গুলতিতে শিকার করে। বন্দুক নিয়ে বড় রবিনসন শিকার করে, সঙ্গে সঙ্গে ফেরে। বীরা, বীরেশ্বরকে পাদরী হিল সাহেব বলে, বীরা ; বীরা হেলে সাপের লেজ ধরে ঘুরপাক খাইয়ে ওদের বিস্ময় অর্জন করে বীর হয়ে ওঠে।

মায়ের কথা শুনতে পেলে সে ক্ষেপে যায়, বলে, খবরদার, হারামজাদা তুমি বলবে না।

মা বলত—বললে কি করবি রে হারামজাদা !

প্রথম প্রথম আপন মনে গজগজ করত সে, তারপর বলত, তাহলে তোমাকেও বলব হারামজাদী।

প্রথম দিন শুনে রাগে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন তিনি।

সেবারেই বিমলার প্রথম সন্তান হল—হল সেই কাত্যায়নীর মত মরা ছেলে। শিউরে উঠলেন কাত্যায়নী।

মেয়েকে নিয়ে কলকাতায় এসে ডাক্তার দেখিয়ে কাত্যায়নী ফিরে গেলেন। রেখে গেলেন জামাইয়ের সেবার জন্য একটি—

হেসে সুরেশ্বর বললে—কি বলব সুলতা। খারাপ কথা একটু ভাল কথায় ঢেকে বা গিল্টি দিয়েই বলি। রেখে গেলেন একটি 'তাম্বূলকরঙ্ক বাহিনী'। কলকাতার বাড়ীর নায়েব বা ম্যানেজারকে ডেকে শলাপরামর্শ করে ষোল বছরের জামাইয়ের জন্য একটি ষোড়শী মেয়েকে রেখে গেলেন। তার মাসোহারার বন্দোবস্ত করে, টাকা মাস কয়েকের অগ্রিম দিয়ে গেলেন। এবং তার কর্ম কি তাও বুঝিয়ে দিলেন।

অনেক ভেবে-চিন্তে করেছিলেন।

তাঁর লেখা একখানি চিঠি আছে, তাতে লিখছেন—কুলীনের ছেলে তদুপরি ভট্টাচার্য বংশের পুত্র পাগল বিমলাকে লইয়া ঘর না করিয়া পলায়ন করিয়া বিবাহ করিলে কি করিব ? এই সমুদয় চিন্তা করিয়া তাহাকে বাঁধিয়া রাখিবার জন্য সেবাদাসী রাখাই স্থির করিলাম। আপনার জন্য বিধবা ব্রাহ্মণ কন্যা রাখিয়াছিলাম, কিন্তু কলিকাল পূর্ণ হইয়াছে, ওদিকে ব্রাহ্মধর্ম অনাচার শুরু করিয়াছে। আবার বিধবা-বিবাহের হুজুগ উঠিয়াছে। সুতরাং ব্রাহ্মণকন্যা ভয়ে রাখিলাম না। মুসলমান বাঈজী রাখিলেও বিষম বিপদ ঘটিতে পারে। যদি মুসলমান হইয়া যায়। অগত্যা নানাবিধ শলাপরামর্শ করিয়া ও খোঁজ করিয়া একটি বেশ্যা-কন্যাকেই পছন্দ করিলাম। মেয়েটির মা অত্র কলিকাতার বিখ্যাত ঘোষালবাবুদের বাড়ীর বড়কর্তার বাঁধা খেমটাওয়ালী।

চিঠিখানা সোমেশ্বর রায়ের চিঠির দপ্তর থেকে পেয়েছি। যা ছিল ওই সিন্দুকের মধ্যে।

বাড়ী এসে কাত্যায়নী চারিদিকে খোঁজ করতে লাগলেন সাধু-সন্ন্যাসীর—বিশেষ করে তান্ত্রিক সাধুর। তান্ত্রিক শ্যামাকান্তের ওষুধ এবং যাগ-যজ্ঞের ফলে তাঁর অসুখ ভাল হয়েছে। সুতরাং তাঁর দৃষ্টিতে ওছাড়া পথ দেখতে পান নি। তান্ত্রিক শ্যামাকান্ত তাঁর কিছু ওষুধ গ্রামের বায়েনদের দিয়ে গেছেন কিন্তু সে-সব জ্বর-জড়ির ওষুধ আধ-কপালে মাথাধরার ওষুধ ; বন্ধ্যা মেয়ের সন্তান হয় এমন জড়ি বুটি ওষুধও তারা জানে। কিন্তু মৃতবৎসাদোষ সারে, মাথার পাগলামির ওষুধ—এ তারা পায় নি।

ওদিকে ঘটেছিল বিপর্যয় !

জামাই বিমলাকান্ত পলাতক হয়েছিলেন কলকাতা থেকে। একেবারে এসে উঠেছিলেন মাতামহের ভিটেতে। মাতামহী তখন গত হয়েছিলেন বৎসর দুয়েক পূর্বে। ঘর-দোর অবশ্য সোমেশ্বর রায়ের বন্দোবস্তেই সুরক্ষিত ছিল। সোমেশ্বর রায় ঘর-দোর মেরামত করিয়েছিলেন, নতুন কোঠাঘর করিয়েছিলেন, যে ঘর পাকাঘরের মতই অথচ তার থেকেও আরামদায়ক। পাকা বারান্দা, পাকা মেঝে, চুনকাম করা দেওয়াল, শুধু চালই খড়ের। ইচ্ছে ছিল পাকা ঘরই করিয়ে দেবেন। কিন্তু আপত্তি হয়েছিল দু দিক থেকে। প্রথম স্ত্রী রাজকুমারী কাত্যায়নী দেবীর দিক থেকে, বলেছিলেন, না। তারপর মুখ নেড়ে বলেছিলেন—ঘটে যদি বুদ্ধি থাকে তবে এসব কি খুলে বলতে হয় ? জন জামাই ভাগনা তিন নয় আপনা। মেয়ের বিয়ে হলেই মেয়ের আবার মান বাড়ে। এখানে একটা কিছু হবে আর পাকাবাড়ী থাকলে হনহন করে গিয়ে ঘরে উঠে খিল দেবে। পাকা ঘরে বাস করে খড়ের চালে মানুষ থাকতে পারে না। মনে হয় সাপে কামড়াবে, আগুন লাগবে, ঝড়ে উড়বে। ও থাক।

আর আপত্তি করেছিলেন বিমলাকান্তের মাতামহী, ও থাক বাবা। পাকা ছাদ ঘর করতে নেই। ও গরমে মানুষকে পচিয়ে দেয়। তোমার বাড়ীতে মহল করে দিয়েছ সেই ঢের। এই ভটচাজের ভিটেতে ওটা কর না।

বিমলাকান্ত পাকাবাড়ীতে বেশ ক বছর থেকেও ওখানে গিয়ে থাকতে অসুবিধা বোধ করেন নি। আসবার সময় শ্বশুরকে চিঠি লিখে এসেছিলেন, সে চিঠি আমি পেয়েছি। লিখেছিলেন, ভক্তিপূর্বক অসংখ্য প্রণামান্তর নিবেদনমিদং পরে লিখি যে, আমি অদ্যই শ্যামনগর রওনা হইতেছি। অতঃপর স্থির করিয়াছি যে, সেখানেই জীবন নির্বাহ করিব। এ ধনৈশ্বর্য, এ সম্ভোগ আমার কোনমতেই সহ্য হইতেছে না। সারমেয়ের ঘৃত যদ্রূপ সহ্য হয় না, তদ্রূপই বলিতে হইবে। কিন্তু আমি ভট্টাচার্য ব্রাহ্মণ ঘরের সন্তান। আমার পিতা সাধক ছিলেন। মাতামহ ক্রিয়াবান শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। আমি বাল্যকালে ভক্তিমতী ভট্টাচার্য-গৃহিণী মাতামহীর নিকট যে সকল শিক্ষা লাভ করিয়াছি তাহা বিস্মৃত হইতে পারিতেছি না। উপনয়নের পর আমিও স্বহস্তে 'নারায়ণশিলা'র সেবা করিয়াছি। ইহার পর এবম্বিধ রাজৈশ্বর্য বাদশাহী, ম্লেচ্ছসুলভ ভোগ আমার জন্য নহে। বাল্যকালে কোন কদাচার হইলে মাতামহী বলিতেন, কদাচার করিলে ব্যাধিগ্রস্ত হয়, কুষ্ঠরোগ হয়। তাহা আমার পক্ষে বিভীষিকার সৃষ্টি করিয়াছে। যাহাই হউক অতঃপর গৃহে থাকিয়া শাস্ত্রচর্চা ও কুল-কর্ম করিয়াই কাল কাটাইব ! পূজ্যপাদ মহাশয়, আমার কোন অভাবও রাখেন নাই। শ্বশ্রূমাতাঠাকুরাণী আমার জন্য দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইয়া মদীয় মনোরঞ্জন এবং পরিচর্যার জন্য গীতবাদ্যনৃত্যকুশলা পরিচারিকা নিযুক্ত করিয়া দিয়া গিয়াছেন। ওদিকে হিন্দু কলেজেও আমার জীবন প্রায় অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। মহাশয়ের ইহা অগোচর নহে যে, তত্রস্থ ছাত্রবৃন্দের মধ্যে পরলোকগত ডিরোজিও সাহেবের মতাবলম্বী ধর্মবিশ্বাসহীন অনেক ছাত্র আছে। তাহারা মদ্যপান করে, গো-মাংস ভক্ষণ করে। তাহারা আমার মতামতের জন্য ব্যঙ্গ করে, অনেক সময় আমার পিরানের পকেটে উচ্ছিষ্ট হাড় ভরিয়া দেয়। জোরপূর্বক

মদ্যপান করাইবার জন্য টানাটানি করে। আমি তাহাদের সহিত কলহে অপারগ। তাহার উপর এই পরিচারিকা নিয়োগকরণের জন্য আমি সব অন্ধকার নিরীক্ষণ করিতেছি। ধর্ম চরিত্র গেলে আর কি থাকে মনুষ্যের? সুতরাং আমি শ্যামনগর রওনা হইতেছি। শ্বশ্রূমাতাকে চিন্তা করিতে নিষেধ করিবেন। চিন্তার কোন কারণ নাই। আমি শপথপূর্বক কহিতেছি যে বিমলার অবস্থা যে মতই হউক না কেন, আমি দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ কদাপি করিব না। ইহা ত্রিসত্য বলিয়া কহিতেছি। করিলে আমার চতুর্দশ পুরুষ নরকস্থ হইবেক। আমাকে যখন স্মরণ করিবেন তখনই শ্রীচরণে গিয়া হাজির হইব। কেবলমাত্র ধর্মাচরণ ও ধর্মরক্ষা হইলেই হইল। মহাশয়ের শ্রীচরণে আমার অসংখ্য কোটি প্রণাম নিবেদন করিতেছি। পরমারাধ্যা পূজনীয়া শ্বশ্রূমাতার চরণে—ইত্যাদি ইত্যাদি—।

পত্রখানি আশ্চর্যই শুধু মনে হয় নি আমার সুলতা, একটি সত্যও আমি প্রত্যক্ষ করেছি। কোন দেশের সকল মানুষই পতিত হয় না। কোন ধর্মের এমন বিকৃতি কোন কালে ঘটে না, যাতে সব মানুষ বিকৃত হয়ে যায়। কোন কালেই এমন প্রমাণ নেই যা একটা জাতির সাধনার সবটুকুকে গ্রাস করে অবশেষে যা ফেলে রাখে তার সবই আবর্জনা। সেই কারণেই আজ মানুষ মাটি খুঁড়ে চলেছেই এবং তাদের মিলছেও অতীতের ধনরত্ন। সেকালে বিমলাকান্তের মত কিছু লোক ছিলেন। রেভ্যারেণ্ড কৃষ্ণমোহনদের দলকে যে গুড়ুম সভা মারধোর করেছিল, তাদের যত অপরাধই থাক, এদের ছিল না। আর গুড়ুম সভার বলেই সেদিন জাতটা বাঁচে নি। বেঁচেছিল এদের জোরেই।

সুলতা হেসে বললে—মতপার্থক্য থাকতে পারে।

—অর্থাৎ একে তুমি বাঁচা বল না। বল ভূতের উপদ্রবে জীবনের মৃত্যু।

সুলতা বললে—বললে ঝগড়া বাধবে, তর্ক উঠবে। তা করতে আমি আসি নি। আমি শুনতে রয়ে গেলাম, তাই বল।

—বলছি। তবে সেদিন পথের মোড় না-ফিরলে গোটা জাতটাও ক্রীশ্চান হয়ে যেতে পারত। এবং তাতে সম্ভবত তোমার মতে ভালই হত। আমরা তখন থেকেই কোটপেণ্টালুন পরতে শিখতাম। মন্দিরগুলো গির্জে হয়ে যেত। তার সঙ্গে মসজিদগুলো যেতো কিনা আমার ঘোরতর সন্দেহ আছে। তাহলে তোমরা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-আন্দোলন করতে না, করত এই মসজিদ-ওয়ালারা। তোমরা ক্রীশ্চান হয়ে সাদা গুরুদের অনুগমন করতে।

—না। কিন্তু ও রাখ সুরেশ্বর। বল, কড়চার কথা বল। আমি অবশ্যই বিমলাকান্তের এ আশ্চর্য দৃঢ়তা ও চরিত্রবলের প্রশংসা করছি, নমস্কার জানাচ্ছি। চরিত্র যেখানে বড় হয়ে ওঠে সেখানে যা ধরেই সে উঠুক না কেন তাই সত্য, তাই শ্রদ্ধার, তাই প্রগ্রেসিভ।

—আর ঝগড়া রইল না। মিটিয়ে ফেললে তুমি। হাসলে সুরেশ্বর। তারপর শুরু করলে—এর পর তুমি যা বললে, তাই হল অর্থাৎ জিতলেন বিমলাকান্তই। জমিদার সোমেশ্বরের বজরাটা সেদিন আবার রওনা হল শ্যামনগর। এবার তিনি একা নন, সঙ্গে শ্রীরাজকুমারী কাত্যায়নী দেবী এবং জমিদার-কন্যা বিমলা। গেলেন না কেবল বীরেশ্বর। তিনি বাড়ীতে হিল সাহেবের কাছে রইলেন। রবিনসন সাহেবের কুঠীতে গিয়ে জনি

রবিনসনকে নিয়ে পাখী শিকার করে বেড়ালেন। তখন বন্দুক ছুঁড়তে শিখেছেন তিনি।

সোমেশ্বর এবং কাত্যায়নী গিয়ে জামাইকে বলেছিলেন—বাবা, তুমি দেবতা। আমরা বুঝতে পারি নি। ইষ্টদেবতার নামে শপথ করে বলছি বাবা, তোমার রান্না আর রাজরাজেশ্বর প্রভুর রান্না একরকম পবিত্রতার সঙ্গে হবে।

বিমলাকান্ত লজ্জিত হয়েছিলেন। এবং এসেও ছিলেন। বিমলা নাকি হাত ধরে বলেছিল, যাবে না তুমি? আমি কি করে থাকব?

এর পর সোমেশ্বর বাড়ীতে জামাতা ও পুত্রের সংস্কৃত পড়ার জন্য পণ্ডিত এবং পার্সী পড়ার জন্য মৌলবী রেখেছিলেন, ইংরিজী শেখাতেন ওই পাদরী হিল সাহেব। কড়াই বাটা আর ভাত পরিতোষ সহকারে খেয়ে ভিক্টোরিয়া যুগের খাঁটি ইংরিজী শেখাতেন। পণ্ডিত লোক ছিলেন।

তিনি বলতেন, বীরা দি ইণ্টেলিজেণ্ট, বিমলা দি ডিলিজেণ্ট। বিমলা খুব বড়া পণ্ডিটা হইবে। কিন্তু জিমিডার হইটে পারিবে না। বীরা জিমিডার হইবে। বিমলা টুমি যডি—শেষটা বলতেন না। কি সেটা তুমি অনুমান করতে পার। অর্থাৎ ক্রীশ্চান!

* * *

সুলতা, একটা সিগারেট খেয়ে নিই। একটু জলও খাব। বকেছি অনেক না? দাও, জলের গ্লাসটা অনুগ্রহ করে এগিয়ে দাও।

সিগারেট ধরিয়ে এক রাশ ধোঁয়া গিলে মুখে-নাকে উদ্গারণ করে সুরেশ্বর বললে, এইসব উপকরণের মধ্য থেকে সেই অসুখের মধ্যে ফুরসীতে তামাক খেতে ইচ্ছে হত। পাঁচ-ছ দিন জ্বরে ভুগেছিলাম। তার মধ্যে মেজঠাকুমা আমাকে তাঁর ঠাকুরমার ঝুলি প্রায় উজার করে ঢেলে দিয়েছিলেন। এবং একদিন ডেকে এনেছিলেন জ্ঞাতি ভটচাজদের প্রবীণতম ব্যক্তিটিকে। তিনি সম্পর্কে তাঁর শ্বশুর হতেন। মেজঠাকুরদার থেকে বয়সে বড়। প্রায় আশির কাছাকাছি বয়স। ডেকেছিলেন আমার নাড়ী দেখতে। তিনি নাড়ী দেখে বলে দিতে পারেন, জ্বর কদিন থাকবে, কবে ছাড়বে। তিনি নাড়ী দেখে বলেছিলেন, সাদা জ্বর বউমা। ভয় নেই। পাঁচ দিন ভোগ। তবে কুইনিন যদি ফোঁড়ো তবে এক-আধ দিন কম হবে।

হয়েছিল তাই। কুইনিন ইঞ্জেকশনে তিন দিনে জ্বরটা বেমক্কা ছোট ঘোড়ার রাশের টানে বাগ মানার মত বাগ মেনেছিল কিন্তু পা ঠুকতে মাথা নিয়ে এপাশ-ওপাশ করতে ছাড়ে নি, মানে একটু করে টেম্পারেচার আরও দুদিন হয়ে ছাড়ল।

সে যাক। পরে বলব।

ঠাকুমা বলেছিলেন, সেকালের কথা শুনবে তো ওঁকে ধর ভাই। উনি আমার থুড়শ্বশুর। তোমার ঠাকুরদার বয়সী। উনি অনেক জানেন।

—কি ব্যাপার?

—ও, মায়বংশের কথা শুনবে। জানে না তো। বাপ গেছেন অল্পবয়সে। মা এ বাড়ী আসেন নি। আমি কাত্যায়নী দেবীর গল্প বলছিলাম।

—ওঃ, তিনি ছিলেন রাজার মেয়ে, এখানে বলত রাজকুমারী বউঠাকরুণ। আড়ালে বলত বাঘিনীঠাকরুন। শুনেছি, আমরা দেখি নি। তাঁর দাপে এ গাঁয়ে কোন অন্যায় কেউ করতে পারত না। স্বয়ং সোমেশ্বর রায় তটস্থ। পাদরী হিল সাহেব পর্যন্ত তটস্থ। একদিন কি হিন্দু-ধর্মের নিন্দে করেছিল। তিনি শুনে বলেছিলেন—ওই পাদরী মিনসেরে বলিস তো ওই সব যদি বলবে তো ওর দাড়ি চাঁচিয়ে দেব। আবার ভক্তিমতীও ছিলেন। শুনলেন কাঁদীর বাড়ীতে সিংহরাজাদের রাধাবল্লভ ঠাকুর সোনার ফুরসীতে তামাক খান তিনবার। একবার বাল্যভোগের পর, একবার ভোগের পর, একবার রাত্রে। অমনি হুকুম হল, রাজরাজেশ্বরেরও সোনার ফুরসীর ব্যবস্থা করতে হবে।

পাঁচ দিনই তিনি এসে নাড়ী দেখে যেতেন, ঠাকুমা তাঁকে মিষ্টি খাওয়াতেন, চা খাওয়াতেন, তিনি আমাকে একদিন বলেছিলেন সোমেশ্বর রায়ের গল্প। বলতে তাঁর দ্বিধা ছিল বোধহয়। সোমেশ্বর রায়ের কোন ভাল দিক তাঁর মনে স্মৃতির ঘরে বোধহয় স্থানই পায়নি। যেটুকু পেয়েছিল সেটুকু সবই তাঁর আমিরীর কথা। বিশেষ করে দেহবিলাসের।

সেদিন ঠাকুমা ছিলেন না। হঠাৎ বললেন—তাই তো হে, বলব কি করে? একটু চুপ করে থেকে বলেছিলেন—তা তোমার বয়স অনেক হয়েছে, ঘোল অনেক দিন পার হয়েছে। আমি তো তোমার ঠাকুরদাদার খুড়ো। বাহাত্তুরে পেরিয়েছি। তা শোন। সরস করে বলেছিলেন, সোমেশ্বরের এখানকার নৈশজীবনের কথা। কাত্যায়নী দেবী এক কন্যা এক পুত্রের পর স্বামী থেকে অব্যাহতি চেয়েছিলেন, তাঁর ভয় ছিল, তান্ত্রিক গত হয়েছেন, আবার যদি সন্তান গর্ভে এলে তিনি পাগল হন অথবা মৃতবৎসা রোগ আবার ধরে! এইজন্যে কলকাতা থেকে তাঁর পরিচর্যার জন্য দাসী তিনি এনেছিলেন। কিন্তু সোমেশ্বর তাতেও তৃপ্ত হতেন না। রাত্রিকালে বজরায় তাঁর আসর বসত ব্রাত্য মেয়েদের নিয়ে। কিন্তু জামাই বিমলাকান্ত আসতেই তাতে ছেদ টানতে হল। বৃদ্ধ হেসে বলেছিলেন, ভাই, সে আসর যেমন-তেমন আসর নয়। স্বর্গের দেবালয়ের আসরের মত আসর। সোমরসে বিভোর হয়ে সোমেশ্বর বসতেন চন্দ্রের মত আর ব্রাত্য মেয়েরা তাঁকে ঘিরে বসত নক্ষত্রের মত।

শুনেছি। কানে-কানে বলেছিলেন, সে নাকি উলঙ্গের আসর। বাইরে বন্দুকধারী সিপাহী পাহারা দিত। বজরার কামরায় দরজা আগলে থাকত তারাচরণ হাড়ি। সে ছিল একটি ব্যাঘ্র বিশেষ।

স্থূলতা, হয়তো বুড়োর নিজের মনেও এ নেশার ঘোর কাটে নি। সেই নেশার ঘোরেই দন্তহীন মুখে গল্প করেছিলেন। বলা শেষ করেও হাসি মিলায় নি তাঁর। বৃদ্ধের জিভখানা ফোকলা মুখের মধ্যে থরথর করে কাঁপছিল। বলব কি তোমাকে, তার ছোঁয়াতে আমার জরজর্জর দেহে-মনেও একটা নেশা লেগেছিল। সেই সময় তোমাকে একখানা পত্র লিখেছিলাম তাতে জ্বরের কথা লিখি নি, লিখেছিলাম এখানকার গোয়ানপাড়ার মেয়েদের কথা। তাতে খুব রসিকতা এবং উল্লাস ছিল। সেটা আমার নেশালাগার সত্যকে গোপন করবার জন্যেই বোধহয় লিখেছিলাম।

গোয়ানদের মেয়েগুলো কাঁসাইয়ের ধারে এসে দাঁড়িয়ে ডাকত—ঐ বাবু সাহেবের নোকর ! এ রঘু মহারাজ !

রঘু যেত না—যেতেন মেজঠাকুমা—বলতেন, কি লা বজ্জাত ছুঁড়ীরা ?

—বাবু কেমন আছে গো মাঝলা বিবি রাণী ।

—মরণ ! ফের যদি বিবি বলবি তো ডিকুকে বলব, চুলের ঝুঁটি ধরে কিল মারবে পিঠে । বিবি কি লা ? মা বলতে পারিস না ?

ওরা হাসত । খিলখিল করে হাসত ।

মেজঠাকুমা বলতেন, বল না পোড়ামুখীরা কি বলছিস ?

—বললাম তো । বাবু হুজুর কেমুন আছে গো !

—জ্বরে আছে ! যা পালা ।

কোন-কোন দিন আমি নিজেই যেতাম ! ওরা যে কত আহা উহু করত সে কি বলব । হায় হামারা নসীব ! বাবুর কাহে বোখার হল গো ! হামার কেনো হলো না ! আঃ বাবু ! তোমার চাঁদের পারা মুখ শুখায়ে গেল গো । রোজী বেচারীর নিদ নাই গো !

সঙ্গে সঙ্গে দলটাকে দলটা হেসে উঠত । আমার অসুস্থ দেহের উত্তপ্ত রক্ত আরও উত্তপ্ত হত । মনে হত রায়বংশের ধারাটা যেন এই রক্তসমুদ্রের ঈশান কোণে ঝড়ের মত উঁকি দিচ্ছে ।

সাত দিনের দিন, ছদিন উপবাস করে যেদিন পথ্য করলাম সেদিন, মেজঠাকুমা কাত্যায়নীর মৃত্যু পর্যন্ত এসে পৌঁচেছিলেন ।

তবে মৃত্যুর কথাটা বলি । সেটা আমার ভাল লেগেছিল ।

মেজঠাকুমা বলেছিলেন, ভাই, স্বামী পুত্র এবং জামাই রেখে কাত্যায়নী দেবী ডঙ্কা বাজিয়ে চলে গেলেন । সজ্ঞানে দেহত্যাগ যাকে বলে, তাই । সামান্য তিন দিনের জ্বর । তিন দিনের দিন সকালে স্বামীকে ডেকে বললেন, ও গো, আজ আমি যাব ।

—সে কি ? কি যা তা বলছ ?

—ঠিক বলছি । কবরেজ ভাল আছে বলে গেল, ও ধরতে পারলে না । আজ যেন কোথাও যেয়ো না । তাই হল ভাই । সেই রাত্রেই গেলেন । স্বামীকে ডেকে বললেন, তোমার পা দুটো আমার মাথায় ঠেকিয়ে দাও । আবার আসছে জন্মে যেন তোমাকে পাই । এই আশীর্বাদ কর ।

হাউহাউ করে কেঁদেছিলেন সোমেশ্বর ।

কাত্যায়নী দেবী ধমক দিয়েছিলেন, দেখ দেখ, বুড়োবয়সে ছেলে জামাই মেয়ের সামনে ঢঙ দেখ ! চুপ কর ! চুপ কর বলছি ! হ্যাঁ !

জামাইকে বলেছিলেন—বাবা, তুমি আমার দেবতা । বিমলাকে তোমার হাতে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে যাচ্ছি ।

ছেলেকে বলেছিলেন, আমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছিস । আমি হারামজাদা বললে, তুই আমাকে হারামজাদী বলেছিস । যা বারণ করেছি তাই করেছিস । বুড়ো বাপকে যেন কষ্ট

দিস না! বুঝলি!

বীরেশ্বর ভুরু কুঁচকে বসেছিলেন।

—আর বিমলাকান্ত দেবতা। তার অসম্মান করিস না। তোর দিদি—

বীরেশ্বর বলেছিলেন—তুমি দিদিকে যত ভালবাস তার থেকে আমি দিদিকে বেশী ভালবাসি। তুমি বরং চুপ কর। এত বকলে অসুখ বাড়বে। অসুখ হয়েছে ক'দিন, অমনি মরব বলে একটা হৈ-হৈ লাগিয়ে দিলে!

—তুই একটা হারামজাদা রে! একেবারে নাস্তিক। আমি বুঝতে পারছি, আজ আমি যাব! তাই তিনি গিয়েছিলেন। বীরেশ্বরেরও ওকথা বলার দোষ ছিল না, কারণ জ্বর মাত্র তিন দিনের। তিন দিনের সকালবেলা থেকে ওই শুরু করলেন, সন্ধ্যে নাগাদ চলে গেলেন।

মেজঠাকুমা হেসে বলেছিলেন, কাত্যায়নী বলতেন, চিঠিতেও স্বামীকে নাকি লিখেছিলেন। সতী-যাওয়াকে যারা অত্যাচার বলে উঠিয়ে দিচ্ছে, দিতে চাচ্ছে তারা মেলেচ্ছ, তারা যবন। স্বামীকে বলেছিলেন, তুমি যদি দরখাস্তে সই কর তবে তোমার মুখ আমি দেখব না। সতীপ্রথা উঠে গেল, কোন লাট জানি উঠিয়ে দিলে, তোর মেজঠাকুরদা নামটা তার বলতেন।

আমি নামটা বলে দিয়েছিলাম সুলতা। লর্ড বেন্টিঙ্ক!

—হ্যাঁ-হ্যাঁ। লাটসাহেব বেন্টিক। কাত্যায়নী গাল দিতেন বেন্টিঙ্ককে। বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বলতেন, আইন করলি করলি; কলার পাতে লেখা রইল। কাত্যায়নী যদি বিধবা হয় তাহলে সে তোর ওই আইন মানবে না, মানবে না, মানবে না। সতী সে যাবেই।

সেইটেই তাঁর পূর্ণ হল না। তার বদলে সিঁথিতে সিঁদুর নিয়ে দলমল করে চলে গেলেন।

তাঁর চন্দনধেনু শ্রাদ্ধ হয়েছিল। সে উপলক্ষ্যে কীর্তিহাটের ব্রাহ্মণদিগে সবৎসা গাভী দান করেছিলেন। সে সব বড় গাই। মেজঠাকুমা বলেছিলেন, ভাগলপুরের গাই। গ্রামে বড় পাঞ্জাবী গাইকে ভাগলপুরের গাই বলত। সধবা যে, ব্রাহ্মণ শূদ্র সব, শাড়ী সিঁদুর শাঁখা দিয়েছিলেন। প্রতিষ্ঠা করেছিলেন অতিথিশালা।

* * *

সুলতা, এসব জেনে যখন গুলাম রাত্রে তখন কাত্যায়নীর মৃত্যু শ্রাদ্ধ সব কোথায় গেল—মনে জেগে রইল সোমেশ্বর রায়ের ওই নৈশআসরের কথা। যারা সেদিন অ্যাসেম্বলীতে জমিদারের ব্যভিচারের কথা বললেন, তাঁদের দোষ দেব না। আমার পূর্বপুরুষের সব কথা বাদ দিয়ে ওইটে যখন আমার মনেই সাড়া তুললে, তখন আর তাঁদের দোষ দেব কি করে?

শেষ পর্যন্ত নিজের উপর রাগ করে বললাম, যাক ও খাতাপত্র ঘেঁটে আর কাজ নেই। যে বিষ চাপা আছে, সে চাপাই থাক। তাকে খুঁড়ে বের করে কাজ নেই। ছেদ টেনে দেওয়াই ভাল কীর্তিহাটের কড়চার। মন থেকে মুছে ফেলাই ভাল।

মুছে দিয়ে ছেদ টেনে দিতে চাইলেও তা হয় না। ইতিহাসের একটা চক্রযন্ত্র আছে, তাতে অতীতকাল দাঁতওলা চাকার মত বর্তমানের চাকার গর্তে গর্তে ঢুকে নিজের সঙ্গে যুক্ত রেখে মানুষের জীবনকে চালায়। অতীতের কর্ম কর্মফল হয়ে তার আস্বাদ বর্তমানকে আস্বাদন না করিয়ে ছাড়ে না। সে তিক্ত হোক—বিষ হোক—আর অমৃত হোক বা মধুরই হোক। কাল যা খেয়েছি, তার পুষ্টিতেই আজ বাঁচি। এক যারা আহার নিদ্রা ত্যাগ ক'রে তপস্যা করে, সব ত্যাগ ক'রে সন্ন্যাসী হয়—বুদ্ধ চৈতন্য যাঁরা তাঁরা আলাদা।

সুরেশ্বর তা নয়। সে কি ক'রে রেহাই পাবে স্থূলতা, এ থেকে? জ্বরের সময় উপবাস করা অবস্থায় যা ভেবেছিল, সংকল্প করেছিল, তা পথ্য পাবার দিনটিতেও উল্টে গেল। অবিচার সুরেশ্বরের উপর করো না, সে ইচ্ছে ক'রে তা করে নি।

ব্যাপারটা ঘটল এইভাবে। সে-দিন সে পথ্য করে উঠেছে। মেজঠাকুমা কইমাছ আনিয়ে ঝোল রেঁধে বসে পথ্য করিয়েছেন, এমন সময় তার নায়েব এল—আজই একবার ক্যাম্পে যেতে হবে—ওঁরা হাজির হয়েছেন—আপত্তি দিচ্ছেন। পরিশেষে বললে—ব্যাপার খুব জটিল ছোটবাবু!

—সেই বাড়ীরই ব্যাপার তো! বাড়ী দেবোত্তরের টাকায় হয়েছে এই তো? ও আর আমি পারছি না, ঘোষালমশাই। নিন, তাই নিন ওঁরা।

—ব্যাপারটাকে এমন ছোট ক'রে দেখবেন না বাবু! জাল ওঁদের প্রকাণ্ড। মতলব সাংঘাতিক। আমি তো হতভম্ব হয়ে গিয়েছি।

—কি হ'ল?

—কাল ওঁরা গিয়েছিলেন মেদিনীপুরে। প্রণবেশ্বরবাবু, কল্যাণেশ্বরবাবু আর ধনেশ্বরবাবুর মেজছেলে ভূপেশ্বর তিন জন মিলে গিয়েছিলেন মেদিনীপুরে সব থেকে বড় দেওয়ানী উকীল সুধাবাবুর কাছে। প্রণবেশ্বরবাবু কলকাতার ব্যারিস্টারের কাছ থেকে যে মত এনেছিলেন তা যাচাই করতে। সুধাবাবু বলেছেন—হ্যাঁ, এ একটা খুব জোরালো পথ বটে। পয়েন্ট খুব স্ট্রং পয়েন্ট।

—বুঝলাম—। কিসের? এরই তো?

—শুনুন আগে। এখানে যদি এই হয় যে সব দেবোত্তর। বাড়ী দেবোত্তর। দেবোত্তরের বাইরে সম্পত্তি নাই—তা হলে—সেই নজীরে এঁরা—ওঁদের পূর্বপুরুষ কলকাতায় যে-সব বাড়ী পেয়েছিলেন, তাও দেবোত্তর হবে। জানবাজারের আপনার অংশের বাড়ী, তাও তাই হবে। হবে না? বুঝে দেখুন! সেটেলমেণ্টের পরচার বলে, এখানকার সম্পত্তি নিয়ে মামলা ক'রে, তারই নজীরে তখন কলকাতার বাড়ী নিয়ে মামলা করবে। শিবেশ্বরবাবু কলকাতার বাড়ী বেচেছেন—তা ক্যান্সেল হবে, যজ্ঞেশ্বরবাবু বেচেছেন—সে ক্যানসেল হবে, আপনার জানবাজারের বাড়ীর পার্টিশনে পাওয়া তাও ক্যানসেল হবে। বুঝে দেখুন!

চমকে উঠল সুরেশ্বর। অর্থাৎ তাকে একরকম সর্বস্বান্ত হ'তে হবে। জানবাজারের বাড়ীই তার একমাত্র সম্পত্তি—যা সমস্ত দেবোত্তরের মূল্যের চেয়েও মূল্যবান। এর তিন আনা অংশ মাত্র থাকবে তার।

মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠল তার। পরক্ষণেই হল দারুণ ক্ষোভ—তারপর সেটা রূপান্তরিত হ'ল দুরন্ত ক্রোধে। ওঃ!

দুর্যোধন কপট পাশায় যে রাজ্য চৌদ্দ বছরের জন্য জিতেছিলেন, চৌদ্দ বছর পর সেই রাজ্য ফিরে দেবার সময় বলেছিলেন—বিনা যুদ্ধে নাহি দেব সূচ্যগ্র মেদিনী। রায়বাড়ীর পার্টিশন কপট পাশার দান নয়। কুরু-পাণ্ডবদের মধ্যে যে আপোস বিভাগে রাজ্যভাগ হয়ে কৌরবেরা হস্তিনাপুরে—আর পাণ্ডবেরা ইন্দ্রপ্রস্থে রাজ্য করেছিলেন; তাই নাকচ করে সবটা গ্রাস করবার জন্য এটা ওদের পাশা খেলার চ্যালেঞ্জ—কপট পাশার দান ফেলার মত ব্যাপার। সুরেশ্বর যুধিষ্ঠির নয়—সে তাকে খুব পছন্দও করে না। সে অর্জুন ভীম এই দু'জনের ভক্ত। ও পাশার দান ও মেনে নেবে না। উত্তেজনায় উঠে দাঁড়িয়ে সে চুপ করে ভাবলে, বললে—দলিল আবার ভাল ক'রে দেখুন।

—দেখেছি বাবু। দলিলে বাড়ীর কথার কোন উল্লেখ নেই। ঠাকুরবাড়ীর কথাই আছে। কিন্তু ওদের যুক্তিটা তো বুঝছেন! দেবোত্তরের টাকা থেকে তৈরী সব। দেবোত্তরের বাইরে কিছু নেই। সুতরাং বাড়ীও দেবোত্তর!

—কলকাতায় যে-ব্যবসা ছিল সোমেশ্বরের, তার থেকেই বলতে গেলে সম্পত্তি কিনেছিলেন তিনি। পত্তনী নিয়েছিলেন। বাড়ী তা থেকে হয়েছে।

—কিন্তু তার নমুদ কোথায়? নমুদ চাই।

—কেন? জানবাজারে খাতাপত্র নিশ্চয় থাকবে।

—আজ্ঞে না। সেসব আছে দেবেশ্বর রায়ের আমল থেকে। তাও কলিয়ারীর খাতাপত্র, সেসব বড়বাবু যজ্ঞেশ্বরবাবুর কাছে। তার আগেকার যা কিছু খাতাপত্র, সে রায়বাহাদুরের আমল থেকে এখানে এসেছিল।

হঠাৎ সুরেশ্বরের মনে পড়ে গেল, মেজঠাকুমা বলছিলেন, সোমেশ্বরের কন্যা বিমলার বিবাহের আটদিনের মধ্যে অন্দরের নতুন মহলের ভিত কাটা হয়েছিল। সাল-সন-মাস এ পাওয়া গেছে একরকম কিন্তু খাতা চাই। দেবোত্তরের খাতা আছে। দেবোত্তর থেকে এ-খরচ হয়ে থাকলে নিশ্চয় খরচ থাকবে।

দেবোত্তরের খাতার গাদা সে পেয়েছে। সেদিন খাতা ওল্টাতে ওল্টাতে রাজরাজেশ্বরের মুকুট এবং গয়না খরিদের খরচ দেখেছে। সে খাতার গাদা ওল্টাতে ওল্টাতে বিমলার বিয়ের বছরের খাতাটা পেলে। বিয়ের খরচের একজায়গায় ফর্দ তার পড়া ছিল। সে খাতাখানা ওল্টাতে লাগল। বিয়ে হয়েছে আষাঢ় মাসে। বৈশাখ থেকে সে বিমল সায়র কাটানোর খরচের আরম্ভ আবিষ্কার করলে। কল্যাণীয়া শ্রীমতী বিমলা দেবী মাতার শুভবিবাহ উপলক্ষে নূতন পুষ্করিণী বিমল সায়র কাটানোর শুভারম্ভ; মুনিষ (অর্থাৎ মজুর) দুইশত ষোলজন

দৈনিক খাটুনীর দাম—এক আনা হিসাবে মোট সাড়ে তের টাকা।

পাতার পর পাতা ওল্টালে সে। নজরে পড়ল বিচিত্র, অবিশ্বাস্য অনেক কিছু। গব্য ঘৃত খরিদ পাঁচ টাকা মণ দরে ষোল সের ঘৃতের দাম—দুই টাকা। কিন্তু সেসব দিকে মন দেবার সময় ছিল না। বিয়ের দিন থেকে আটদিনের খরচ সে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে খুঁজে পেল কিন্তু অন্দরমহলের বা কোন বাড়ীঘরের পত্তনের জন্য ভিত খোঁড়ার খরচ সে পেলে না। ভিত খোঁড়া শুধু হয় না। ভিত পূজা হয়। সোনা-রূপো-তামা দিয়ে বাস্তুদেবতার অর্চনা হয়। তার কোন নিদর্শন মিলল না।

এই সময় এলেন মেজঠাকুমা। সুরেশ্বর বললে—তুমি ঠিক জান ঠাকুমা, ওই মাঝের মহলটা বিমলা দেবীর বিয়ের আটদিনের মধ্যেই পত্তন হয়েছিল?

—তাই তো গল্প শুনেছি। যার তার কাছে তো শুনিনি, তাঁর কাছে শুনেছি। তাছাড়া মাটির পোড়ানো টালিতে সাল-সন তো লেখা আছে রে। একবারে দ্বিতীয় মহলে ঢুকবার যে বড় দরজাটা আছে, তার মাথায় লাগানো আছে। পুষ্পশীর অনন্তরাজ, মেদিনীপুরের ফারাতুল্লা রাজ এরাই গেঁথেছে। নক্সা কাটবার মিস্ত্রী এসেছিল কলকাতা থেকে।

সুরেশ্বর নায়েবকে বললে, দেবোত্তরের খাতায় কোন খরচ নেই। এই খাতা দেখালেই হবে।

—ঠিক তা মানবে না। বলতে পারে—আরও খাতা ছিল।

—তা বলুক। সেও ওদের বের করে দেখাতে হবে। শুধু আপত্তি দিলেই হবে না। ওদেরও দেখাতে হবে!

—তাহলে আপনি একবার যদি আসেন—

—চলুন।

মেজঠাকুমা বললেন, আজই পথ্যি করে উঠেই রোদে রোদে যাবি কি? ম্যালেরিয়া জ্বর, অম্বল হবে আর হুঁ-হুঁ করে কাঁপন দিয়ে আসবে। তুই বরং চিঠি লিখে হাকিমের কাছে সময় চেয়ে পাঠা।

কথাটা সমীচীন বলে মনে হল। বেশ যেন ঘুমের আমেজও ধরে আসছিল। তাছাড়া চড়া রোদ্দুর মাথায় করে খারাপ মেজাজ নিয়ে বেরিয়ে শেষ পর্যন্ত যদি ওই মেজতরফের ধনেশ্বর প্রমুখদের ছোঁয়াচে বিশ্রী কিছু করে বসে সে, এই ভয়টাও হল। মাথাটা সত্যিই যেন উত্তপ্ত প্রথর হয়ে রয়েছে। কলকাতায় ফ্যানের তলায় যে-মেজাজ গড়ে উঠেছে, মেদিনীপুরের কড়া রোদের আঁচে ঝলসে সে-মেজাজ ঠিক থাকার কথা নয়। একখানা কাগজ টেনে নিয়ে সে দরখাস্তের ফর্মে একখানা পত্র লিখে দিলে নায়েবের হাতে—এটা দেবেন, তিন-চার দিন পর যেদিন দিন দেবেন, আমি যাব। লিখেও দিয়েছি, মুখেও বলবেন।

নায়েব চলে গেল। সুরেশ্বর একটা সিগারেট ধরিয়ে গিয়ে কাঁসাইয়ের দিকের জানালাটার ধারে দাঁড়াল। বেলা বারোটা বাজছে। সূর্য প্রখর হয়ে উঠেছে। ওপারে বনটা স্তব্ধ হয়ে গেছে প্রায়। ক্বচিৎ দুটো চারটে পাখী এ-গাছ থেকে উড়ে ও-গাছে বসছে। গোটা দুয়েক ঘুঘুর সেই একটানা করুণ ঘু-ঘু, ঘু, ঘু-ঘু ঘু শব্দ, একটা এদিক একটা ওদিক

থেকে ভেসে আসছে। আর কয়েকটা বনকাক ডাকছে কক্-কক্ শব্দে। প্রখর উত্তপ্ত বাতাসের স্পর্শ তার মুখে-বুকে লাগছে। কংসাবতীতে জল এখন কম, ওপারে বালির চড়া পড়েছে। জলস্রোতটা প্রায় বিবিমহলের বনেদের হাতবিশেক দূরে বাঁধানো পোস্তার গা ঘেঁষে চলছে। কাঁসাইয়ের জল কাঁচা স্বচ্ছ, তাতে স্রোত ক্ষীণ, ক্ষীণ স্রোতের ধারায় দুপুরের সূর্যের ছটা গলানো রূপোর মত ঝলছে, মনে হচ্ছে তার উত্তাপও যেন অনুভব করা যায়। দুটো কুকুর উত্তাপক্লিষ্ট হয়ে জলে গা ডুবিয়ে বসে আছে।

হঠাৎ পিছনদিক থেকে মেজঠাকুমা এসে বললেন---সর।

পিছনের দিকে সুরেশ্বর তাকাতেই বললেন---জানালা বন্ধ করে দি। বিছানা করে দিয়েছে রঘু, শুগে যা। ভালো লাগবে। ছুঁড়িদের আসতে এখনও দেরী আছে। ওঃ কি দরদ বাবুসাহেবের জন্যে ওদের! অর্থাৎ গোয়ান মেয়ে।

সুরেশ্বরের জ্বরের ক'দিন তারা রোজ খোঁজ নিয়েছে। বাবুসাহেব কেমুন আছে? উত্তর মেজঠাকুমা দিয়েছেন—মরণ মুখপুড়ীদের, বাবুসাহেবের জন্যে চোখে ঘুম নেই। যা—পালা। বাবুর জ্বর হয়ে আছে।

সুরেশ্বর এসে বিছানায় গড়িয়ে প'ড়ে বললে—যার মেজঠাকুমা নেই তার কেউ নেই।

ঠাকুমা বললেন—তুই বড় ডেঁপো!

—তুমিই ক'রে তুললে!

—তোর সঙ্গে ফক্কুড়ি করবার সময় নেই আমার। আমি চললাম ঠাকুরবাড়ী, ভোগের সময় হয়েছে। তোর জ্বরের আগে বলেছিলাম—ভোগের মাছের মুড়ো যেন তোর জন্যে আসে। পাঠায় নি। তার পরদিন আমার ভাজ মরল, সেখানে গেলাম, তুইও গেলি, তার পরদিন থেকে তো জ্বরে পড়লি। আজ দাঁড়িয়ে থেকে মুড়ো এখানে পাঠাব তবে আমার কাজ!

—কি হবে? আমি তো খেয়েছি।

—ওবেলা পর্যন্ত দিব্যি থাকবে, ওবেলা খাবি। তুই যেন উঠে পড়বি নে বুঝলি! একটু ছবি-টবি আঁক না। খেয়ে ঘুমুলেও অম্বল হয়। বুঝলি। আমার ফিরতে দেরী হবে। সেই সন্ধ্যেবেলা। আমি ওই খাতা খুঁজব! অনেক খাঁতা সুখেশ্বর হাতিয়ে রেখেছিল। কল্যাণকে পেটে পুরে বের করবার চেষ্টা করব। আমি ওকে টাকা কবলাব। খাতা দিলে সেটা দিবি। অ্যাঁ!

—তুমি মেজদি অদ্ভুত!

—কেন রে?

—তুমি না পারো কি বল তো? মেজঠাকুরদার মত মানুষকে বশ মানাতে পার—ঝগড়া করতে পার। গোয়েন্দাগিরি করতে পার।

—আরও পারি রে। ল্যাভেণ্ডার সাবান মেখে কলঙ্ক কিনতে পারি। তুই যে তুই কলকাতার আমীর তোকেও বশ মানাতে পারি।

বলে হেসে তিনি চলে গেলেন। সুরেশ্বর প্রসন্ন বিস্ময়েই মুগ্ধ হয়ে ঠাকুমার কথা ভাবছিল

ছাদের কড়িকাঠগুলোর দিকে তাকিয়ে। হঠাৎ টানাপাখাটা সচল হয়ে উঠল। ব্যাপারটা বুঝলে সুরেশ্বর ; —মেজঠাকুমাই পাখাটানা ছোঁড়াটাকে, কিল না মারুন, ধমক মেরে সচেতন ক'রে দিয়েছেন।

চোখ জড়িয়ে আসছিল আরামে। ঘুমিয়েই পড়তো, হঠাৎ ওই বন্ধ জানালাটার ওপার থেকে বোধহয় কাঁসাই নদীটাই খলখল ক'রে যেন হেসে উঠল।

গোয়ান মেয়েগুলো এসেছে নদীর ধারে তার জানালার সামনে।

তোমাকে বলব কি সুলতা, সে স্মৃতি আমার মনের মধ্যে আমি আজও অনুভব করি। এবং শিউরে উঠি।

আমার বুকের ভিতরে যেন ওই হাসির প্রতিধ্বনি উঠল, আমার হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনের মধ্যে। কান দুটো মুহূর্তে গরম হয়ে উঠল। হাতের তেলোয় ঘাম দেখা দিল। আমি শুয়ে থাকতে পারলাম না। রায়বংশের রক্ত উদ্বেল হয়ে উঠল, আমি বিছানা থেকে উঠে জানালার ধারে এসে দাঁড়ালাম। হাঁপাচ্ছিলাম এবং অন্ধকারের মধ্যেও নিষ্পলক হয়ে চেয়ে ছিলাম কিন্তু কিছু দেখি নি। ভয় এবং আকর্ষণের নিদারুণ দ্বন্দ্ব হচ্ছিল। তারই মধ্যে আকর্ষণই জিতেছিল। জানালার খড়খড়ি সন্তর্পণে তুলে চোখ রেখেছিলাম। খড়খড়িতে চোখ রেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। যা দেখলাম, তা দেখব এ কল্পনা ছিল না। কল্পনায় ছিল ওরা দল বেঁধে কাঁসাইয়ের পাড়ে এসে দাঁড়িয়ে আমার বন্ধ জানালার দিকে তাকিয়ে হাসছে। সাড়া দিচ্ছে আমাকে। আমি যে কেমন আছি সে খবর ওরা রাখে, দু তিন বেলা রাখে। ভিকু পিদ্রু য' বার পাড়ায় যায় ত' বার আমার স্বাস্থ্য সম্পর্কে মুখে মুখে এক একটি বুলেটিন ছড়িয়ে দেয়। ওরা তার উপরে এই ভরাদুপুরে কাঁসাইয়ের ওপারে ডাল ভাঙতে পাত কুড়াতে এসে একবার খবর নিয়ে যায়। আজ নিশ্চয় খবর পেয়েছে যে, বাবুসাহেব আজ ভাত সুরুয়া খেয়েছে, সুতরাং বন্ধ জানালার ধারে এসে ওরা হেসে সাড়া দিয়ে ডাকছে। কিন্তু তা নয়। যা দেখলাম সুলতা, সে কল্পনার বাইরে। মেয়েগুলো কাঁসাইয়ের জলে নেমেছে, সামান্য স্বল্পবাস অর্থাৎ ডুরে গামছা পরে এবং উদ্দাম হয়ে সাঁতার কাটছে আর হাসছে।

রবীন্দ্রনাথের কাশীর মহিষী করুণার যৌবনোচ্ছলা শত সখীর মত ব্যাপার। তফাত সেটা ছিল শীতকাল, কাশীর শীত, সুতরাং তারা কিনারার উপরে উঠে ছুটোছুটি করেছিল আর এরা এই প্রখর গ্রীষ্মে কাঁসাইয়ের এক বুক জলে উবছে উঠছে, সাঁতার কাটছে আর জল ছুঁড়ছে আমার জানালার দিকে এবং খিলখিল ক'রে হাসছে।

কাচস্বচ্ছ জলের ভিতর অর্ধনগ্ন নারীদেহ, সে যে কি মোহের সঞ্চার করে পুরুষের মনে—সে তুমি নারী তোমাকে বোঝাতে পারব না। পুরুষে অনুমান করে বুঝতে পারে। আদিম উষার কাল থেকে প্রকৃতি এমনি করেই পুরুষকে হাতছানি দেয়। পুরুষ যেখানে সভয়ে মা ব'লে কন্যা ব'লে সরে এসেছে সেখানে সে বেঁচেছে, আশীর্বাদ পেয়েছে। আর যেখানে তাকে প্রিয়া বলে দু হাত মেলে এগিয়ে গেছে সেখানে তাকে সে পায়ের তলায় ফেলে বুকের উপর চড়ে নেচেছে। জীবজীবনে প্রকৃতি প্রথমদিকে পুরুষকে কাছে ডেকে তার সঙ্গে নর্মলীলা শেষ ক'রে খেয়ে পেটে পুরেছে! তবু সেই কাল থেকেও তো পুরুষের এই সর্বনাশীর মোহে

তার পিছনে ছোটার শেষ নেই। বুকের রক্ত তোলপাড় ক'রে উঠল আমার। তোমাকে দেখে কখনও এ মোহ জাগে নি। এমন কি ওই সেই শেফালির ঘরে টাকা দিতে গিয়েছিলাম, ওদের পাড়ায় পথের মেয়েকে টাকা দিয়ে তাদের বিস্মিত করে দিতে চেয়েছিলাম, তাদের দেখেও এ মোহ জাগে নি!

দেহ বোধহয় অবশ হয়ে যাচ্ছিল—মন মোহমগ্ন হচ্ছিল। হঠাৎ একটা দমকা বাতাসে জানালাটা সজোরে খুলে গিয়ে কপালে আমার আঘাত করলে, কপালটা কেটে গেল। আমার মোহ ভেঙে গেল। আমি চোরের মত ফিরে এলাম। কপালে রক্ত পড়ছিল, রঘুকে ডেকে বললাম—তুলো টিঞ্চার আইডিনে ভিজিয়ে লাগিয়ে দিয়ে ন্যাকড়া বেঁধে দিতে।

বসে ভাবতে ভাবতে গোপেশ্বরের কথা মনে পড়ল।

শিউরে উঠলাম। নিজেকে তিরস্কারই করছিলাম, কঠিন তিরস্কার।

অনেকক্ষণ পর মন শান্ত স্থির হল। আমি কাজের অভাবে ওই পুরনো খাতাগুলোই দেখতে লাগলাম। ওল্টাতে ওল্টাতে এসে পড়ল রাজরাজেশ্বরের মুকুট খরিদের পাতাটা। মাঃ হ্যামিল্টন এণ্ড কোং, মোকাম কলিকাতা, মূল্য এক হাজার টাকা!

কালীমায়েরও সোনার মুকুট ছিল। সে শুধু সোনার। তাতে হীরে ছিল না। দাম কম ছিল। সোনার ভরি তখন চৌদ্দ-পনের-ষোল। দশ ভরি সোনার মুকুটের দাম একশো ষাট আর বানি। মানে মজুরী—সে কত? বেশী হলে পঞ্চাশ টাকা। কুড়ারাম জহরত কেনেন নি। তিনি সোনা কিনতেন। সোমেশ্বর কিনেছিলেন জহরৎ। তাঁর হাতে হীরের আংটি ছিল, দাম আড়াই হাজার টাকা। প্রসন্নকুমার ঠাকুরের বাবার হাতের আংটি হারিয়েছিল, তার দাম ছিল পঁচিশ হাজার টাকা। সে আংটি শ্যামবাজারের এক মিস্ত্রী কুড়িয়ে পেয়ে ফেরত দিয়ে বকশিস পেয়েছিল এক হাজার টাকা। সোমেশ্বর কালীর ভক্ত তা হ'লে ঠিক ছিলেন না।

খাতা ওল্টাতে লাগলাম।

কত বিচিত্র আইটেম; কত দুর্বোধ্য খরচ। বারবরদারী খাতে খরচ। মানে বুঝতে অনেক কষ্ট হয়েছিল। বুঝেও বুঝতে পারিনি। ইনাম বকশিস সহজ কথা। বারবরদারী হল ট্রাভেলিং খরচ। টি-এ। রোশনাই জলুস থেকে শুরু করে সংসার খাতে খরচে ঘুঁটে দেওয়ার খরচ—প্রত্যেকটি লিখে গেছে। জলসা নৃত্যগীত খাতে মোটা মোটা খরচ। বকশিস খাতে বাঈজী বিদায়ে দরাজ হাতের পরিচয়। দানখয়রাত খাতে খরচ তার থেকে কম নয়। ভিক্ষুককে এক পয়সা থেকে ব্রাহ্মণকে এক টাকা থেকে একশো টাকা। আবার হাজার টাকাও আছে। কীর্তিকলাপে মন্দিরনির্মাণ, পুষ্করিণী-কাটা টোল-প্রতিষ্ঠা ইস্কুল-প্রতিষ্ঠা মেদিনীপুর সরকারী স্কুলে দান চার অঙ্কের হিসাব। জমিদারী তদ্বির উন্নতি খাতে খরচ দেখে চমকে উঠেছিলাম। কাঁসাইয়ের ধার বরাবর সাত আট মাইল লম্বা বাঁধ মেরামত খাতে কয়েক হাজার টাকা। হঠাৎ একখানা খাতায় চোখে পড়ল শুভবিবাহ খাতে খরচ। শ্রীমান দেবেশ্বরের বিবাহের খরচ।

আমার মন কৌতূহলে উতলা হয়ে উঠল।

পাতার পর পাতা উল্টে যেতে লাগলাম। আরম্ভ হয়েছে সিদ্ধি থেকে। সিদ্ধি এক পয়সা।

* * *

সে বিরাট খরচ।

কয়েকটা পৃষ্ঠা জুড়ে এক পয়সা থেকে হাজার দু হাজার পর্যন্ত দফায় দফায় খরচ জুড়ে সে এক পাঁচ অঙ্কের হিসাব। বারো হাজার পাঁচশো পঁয়ত্রিশ টাকা কয়েক আনা কয়েক গণ্ডা। দফায় দফায় পড়ে গেলাম। প্রতিটি আইটেম। কলকাতায় বউভাত হয়েছিল একটা। আর একটা বউভাত হয়েছিল কীর্তিহাটে। ব্রাহ্মণভোজন, শূদ্রভোজন, অপরাপর ভোজন, গোয়ানদের সিধা, মুসলমানদের সিধা। বারুদের কারখানা। রোশনাই খরচ। কলকাতায় বাঈনাচ। কীর্তিহাটে যাত্রাগান। লাঠিয়াল বিদায়। কত খরচ, খরচের অন্ত নাই। এর মধ্যে পেলাম একজনের নাম। ঠাকুরদাস পাল। ঠাকুরদাসের ও তস্য পুত্র-কন্যার পোশাক বাবদ। গাত্রহরিদ্রা লইয়া যাইবার খরচ মাঃ শ্রীঠাকুরদাস পাল। শ্রীঠাকুরদাসদের পাথেয়। আবার দেখলাম অষ্ট-মঙ্গলার খরচ বরকন্যাসহ ঠাকুরদাস তত্ত্ব লইয়া যায়, তদ্বাবদ খরচ একশত টাকা। কন্যা বাড়ীতে চাকর-বাকরদের বকশিস বাবদ একশত টাকা, জিম্মা ঠাকুরদাস পাল।

আশ্চর্য এই ঠাকুরদাস পাল।

পিতামহ দেবেশ্বর রায়ের বিবাহের সর্বত্র যেন সে বিচরণ ক'রে বেড়াচ্ছিল। আমার আর বিস্ময়ের সীমা ছিল না।

চাকর ? চাকরের আগে তো শ্রী লেখার রেওয়াজ ছিল না।

অনেকক্ষণ চুপ ক'রে বসে রইলাম স্তব্ধ হয়ে। আমার প্রপিতামহ রত্নেশ্বর রায় ছিলেন সে-আমলেরই শুধু নয় সকল আমলের দুর্লভ মানুষ। শুনেছি প্রথম জীবনে মামা বীরেশ্বর রায়ের সঙ্গে বিরোধ করেছিলেন তাঁর দুর্দান্ত জমিদারপনার প্রতিবাদে। অথচ এ বংশের দৌহিত্র হিসেবে তিনিই ছিলেন রায়েদের উত্তরাধিকারী ; পরে মামার সঙ্গে মিটেছিল, মামা তাকে পোষ্যপুত্র নিয়েছিলেন। তিনি মামার সঙ্গে বিবাদ করেই ক্ষান্ত ছিলেন না। তা হলে সকলেই বলত, তিনি ঝগড়া করেছিলেন সম্পত্তির জন্য। তিনি নীল বিদ্রোহের সময় নীলকরদের বিরুদ্ধেও রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। পরে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়ে তিনি ইস্কুল করেছিলেন দুটো। চ্যারিটেবল হসপিটাল দিয়েছিলেন। ল্যাণ্ডহোল্ডারস অ্যাসোসিয়েশনের মেম্বর ছিলেন। সেকালের বড় বড় ধনী জমিদারমহলে তাঁর প্রতিষ্ঠা ছিল। তাঁর কজন পরম প্রিয়পাত্র ছিল, তাঁরা গ্রামজীবনের সাধারণ লোক। তাঁদের ভাইয়ের মত সমাদর করতেন। ঠাকুরদাস তাহলে তাঁদের কেউ ? হঠাৎ মনে পড়ে গেল শ্যামনগরের ইস্কুলের একটা বৃত্তি আছে, মেডেল আছে, যার নাম ঠাকুরদাস স্কলারশিপ, মেডেলটার নাম ঠাকুরদাস মেডেল। গোল্ড সেণ্টার্ড মেডেল। তাহলে ? কে ঠাকুরদাস পাল ? খাতা ওল্টাতে লাগলাম যদি আর তার কোন পরিচয় মেলে। কিছুদিন পরেই খরচ দেখলাম ঠাকুরদাস পালের পুত্রের বিবাহে বধূ সমাদরের যৌতুকের জন্য গহনা খরিদ একদফা এক হাজার টাকা !

সে আমলে এক হাজার টাকা তো কম নয়। তখন চৌদ্দ টাকা সোনার ভরি ! তাছাড়া

সাধারণ গৃহস্থঘরে সোনার গহনার প্রচলন হয়নি। গহনা ছিল রূপোর। উল্টেই যাচ্ছিলাম খাতার পাতা। নানান বিচিত্র খরচ। সেকাল যেন খরচের আইটেমগুলোর মধ্য দিয়ে নিজের একটা বিচিত্র রূপ উদ্ঘাটিত করছিল। কথকতার খরচ, রামায়ণ গানের খরচ, গায়ক বিদায়, আবার পাল্কি বহনের বেহারা খরচ, মদের জন্য ইনাম বকশিস, ভট্টাচার্যপাড়ায় শ্যামাচরণ ভট্টাচার্যের কন্যার বিবাহে সাহায্য ; সে দু চার টাকা নয়, একশো টাকা। সন্ন্যাসীদের জন্য গাঁজা খরচ। সাপুড়েকে বকশিস। গোয়ানপাড়ার সাহায্য। ঘরতৈরীর জন্য দশ ঘর গোয়ানকে একশ টাকা হিসাবে এক হাজার টাকা! ওই গোয়ানরা! মনে আবার গোয়ানপাড়া জায়গা জুড়ে বসল।

গোয়ানদের এনে কংসাবতীর ওপারে ওই শক্তিসাধনার সিদ্ধপিঠ থেকে কিছুটা দূরেই বসত করিয়েছিলেন রত্নেশ্বর রায়। এই হুকুম দিয়ে গিয়েছিলেন বীরেশ্বর রায়—সোমেশ্বরের পুত্র, রত্নেশ্বরের দুর্দান্ত মামা এবং রত্নেশ্বর তার পুত্রও বটেন পোষ্যপুত্র হিসেবে।

অতীত কালের স্বপ্নের মধ্যে একটা বেলা কোথায় কোন্ দিকে কেটে গিয়েছিল ঠিক ছিল না তার। অনেকক্ষণ ওই গোয়ান পাড়ার দিকেই আমি তাকিয়েছিলাম। ওদের পাড়ায় যাই নি কোনদিন। ওদের সঙ্গে ভাল করে কথাও বলিনি, ওদের দিকে তাকাইওনি। তবে দেখছি বইকি। শুধু দেখা নয়, একটা আকর্ষণী বন্ধন যেন বেঁধে ফেলেছে। ডিকু—ডি ক্রুজ, রোজা রোজারিও আমার পেয়াদা হিসেবে কাজ করছে। কথাবার্তায় হিন্দী টান, হিন্দী-উর্দু মেশানো বিচিত্র বাংলা। ওরা নাকি পর্টুগীজদের বংশ। গোয়া থেকে ওদের নিয়ে এসেছিলেন গোলন্দাজী করবার জন্য। এনেছিলেন হিজলীর নবাব। মহিষাদলের গর্গ বাহাদুররাও কিছু এনেছিলেন। বাস করিয়েছিলেন। সে ইংরেজ আমলের আগে। তখন একদিকে বর্গীরা আসছে অন্যদিকে ফিরিঙ্গী জলদস্যু ওই হারমাদরাই আসছে ; ইংরেজ কোম্পানীর সঙ্গে হিজলী নিয়ে নবাবের ঝগড়া লাগছে। এরা তখন এখানে কামান দাগত। গোলন্দাজের কাজ করত। এরা তাদেরই বংশধর। কি জন্যে যে বীরেশ্বর রায় তাদের এখানে এনেছিলেন তা জানতেন তিনি আর জানতেন রত্নেশ্বর রায়। কিন্তু এরা এ অঞ্চলে মানুষদের বিচিত্র মেলার মধ্যে একটি অতি বিচিত্র রং এবং প্রকৃতি নিয়ে এসেছিল তাতে সন্দেহ নেই। এ দেশে এতকাল বাস ক'রে তার সবই একে একে এখানকার জলে বাতাসে রোদে মুছে মুছে প্রায় এক হয়েই এসেছে তবু কিছু বৈচিত্র্য এখনও আছে। সে মুখে আছে চোখে আছে চুলে আছে, কারু কারু রঙেও আছে। একটা পিঙ্গলাভা ফুটে বেরোয়। চোখে বারসাদী উগ্রতা এবং চোখের তারায় পিঙ্গলাভা আছে। প্রচুর মদ খায়। নিজেরাই চোলাই করে। মেয়েরা উগ্র অপকর্ষ প্রসাধন করে। নির্লজ্জার মত হাসে। জামা একটা ক'রে পরে। বুড়ী মেয়েরা এখনও সেমিজ ধরণের ফ্রক বা গাউন পরে। আবার তরুণীরা আঁটোসাঁটো করে কাপড় সর্বাঙ্গে জড়িয়ে দেহভঙ্গিমাকে যথাসাধ্য প্রকট ক'রে এদেশের মেয়ের মত ঝুড়ি কাঁখে কাঠকুটো ভেঙে বেড়ায়। এবং নদীর ধারে কয়েকজন একসঙ্গে জুটলেই গলা মিলিয়ে গান গায়—নির্জন প্রান্তরে বা জঙ্গলের ভিতরে—"তিলেক দাঁড়াও হে নাগর, নয়ন ভরিয়া তোমায় দেখি।" সে নাগর। ব্রজের কানাই তাও তারা জানে। বাইবেলের কথা সামান্যই জানে। ওই

সামান্যেই তাদের গভীর শ্রদ্ধা। মেইরী বলে কপালে বুকে আঙুল ছোঁয়ায়!

বিবিমহলের নিচেই কাঁসাই। তার ওপারের জঙ্গলের মধ্য থেকে কাঁসাইয়ের কিনারায় এসে কতদিন ওরা দাঁড়িয়ে সমস্বরে গেয়ে যায়—তিলেক দাঁড়াও হে নাগর! কোনক্রমে যদি আমার দেখা পায় সুলতা, তবে খিলখিল ক'রে হেসে ওরা এ ওর গায়ে ঢলে পড়ে। আমি কখনও বিরক্ত হই কখনও খুশী হয়ে হাসি। তার উপর আজ যেন দারুণ মোহে পড়ে গেছি। আজই দুপুরে তাদের অর্ধনগ্ন দেহে সাঁতার দিতে দেখে কিছুক্ষণের জন্য যেন জগতের আদিম যে ঊষায় পুরুষ এবং প্রকৃতি নর এবং নারীরূপে এসে দাঁড়িয়েছিল সে ঊষাকে প্রত্যক্ষ করেছি।

সেদিন চোখে ওদের সেই আগেকার কালের আসল চেহারাটা কল্পনা করে মনে আবার একটা রঙ ধরিয়েছিলাম। সেকালের ওদের একটা পোশাকও মনে মনে ছবি আঁকিয়ে আমার মনে ভেসে উঠেছিল। আজকাল যারা ব্যাণ্ড বাজায় তাদের যে ধরনের বিচিত্র পোশাক সেই পোশাক পরিয়েছিলাম ওদের পুরুষদের। এবং মেয়েদেরও এমনি একটা ঢংয়ের পোশাক ও চুল বাঁধার ঢং মনে মনে ছকতে ছকতে এসে আবার দাঁড়িয়েছিলাম কাঁসাইয়ের ধারে বিবিমহলের দক্ষিণের খোলা বারান্দাটায়। তাকিয়েছিলাম ওপারে জঙ্গলের পশ্চিম ধার ঘেঁষে একটা টিলার উপর ওদেরই গ্রামটার দিকে। মধ্যে মধ্যে জঙ্গলের কোলে নদীর কিনারাটার দিকেও তাকাচ্ছিলাম। ওই মেয়েগুলোর প্রত্যাশায়। ওদের দেখতে ইচ্ছে হচ্ছিল। ইচ্ছেটা ঠিক কথা নয়, ঠিক কথাটা হল 'বাসনা'। ওদের ভাল করে দেখতে পেলে মনে মনে পুরনো ছাঁদের পোশাক পরিয়ে একটা ছবি দাঁড় করানো যায়। কিন্তু ওদের সাড়াশব্দে অন্ততঃ গানের সাড়া ছিল না। দূরে গ্রামটা থেকে গরুর ডাক শুনতে পাচ্ছিলাম, মনে হচ্ছিল ওদের ঘরের চালের ওপর কটা মোরগ গলা ফুলিয়ে লড়াইয়ের হাঁক হাঁকছে। মধ্যে মধ্যে কুকুরের ঝগড়ার শব্দ উঠেছে। আর একটা মানুষের আভাস! কখনও একটা তীক্ষ্ণ উচ্চ নারীকণ্ঠ। ঠিক কি বলছে বোঝা যায় না। স্বরটা চিলের ডাকের মত ছড়িয়ে পড়ছে।

মনে আছে সুলতা, নদীর জলে তখন বিকেলের হলদে রোদের ছটা পড়ে রঙীন ঝকমকানি উঠছে। কাঁসাইয়ে জোয়ার আসে নীচের দিকে, এতদূর আসে না। ওপারের বন উজ্জ্বল রোদে ঝলসাচ্ছে। পাখীর ডাক উঠছে প্রচুর। কল-কল, কল-কল। কিচি-মিচি। কিন্তু সব আমার কাছে নিঝুম মনে হচ্ছে ওই মেয়েগুলোর সমবেত কণ্ঠের গানের অভাবে আর হাসির খিলখিল শব্দের অভাবে। এবং মনে হচ্ছে সামনের এই ছবিটা শুধু ব্যাকগ্রাউণ্ড, কটা মেয়ের ছবির অভাবে অসম্পূর্ণ।

এমন সময় পিছন থেকে শুনলাম সরস মধুর কণ্ঠ আমার মেজদির। মেজদির পিছনে এসে দাঁড়িয়ে বলছেন—কি রে, এই দুপুরে এই বারান্দায় রোদ মাথায় ক'রে দাঁড়িয়েছিস? তোর মেজদাদু পাখীটার ডাক উঠছে নাকি?

ফিরে তাকিয়ে বললাম—না!

—তবে?

মেজদিকে দেখে রসিকতা করতে ইচ্ছে হল—গোয়ানপাড়ার মেয়েগুলোর গান শুনব বলে

দাঁড়িয়ে আছি।

—সে আমি বুঝেছি। কিন্তু ও শখ কেন বল তো? গোয়ানপাড়ার মেয়ে পাখীগুলোই বেশী রে। ও সুরে ভুলিস না। ওখানকার পুরুষগুলো মোর্গা ভাই, গলা ফুলিয়ে লড়ুয়ে হাঁক ছাড়া ডাক জানে না, আর সবই লড়ুয়ে মোর্গা! খুনখারাপিতে সিদ্ধহস্ত! মাসে দু-চারটে কাটাকাটি ওরা করেই। ওদের পিদ্রু গোয়ানের গল্প শুনেছি, গায়ে কাঁটা দেয়। কি বাড়! আমার শ্বশুরের দাপে বাঘে বলদে জল খেত। সেই তাঁর ছেলেবেলার সাকরেদ-ভক্ত প্রিয়পাত্র ঠাকুরদাস পালকে দিনেদুপুরে ওই কাঁসাইয়ের পাড়ের উপর এই এতবড় ছোরা বুকে বসিয়ে দিয়েছিল। মরে গেল ঠাকুরদাস পাল। বলতে গেলে আমার শ্বশুরের চোখের সামনে। শুনি নাকি তাঁর ঘরেই দুজনের কথা কাটাকাটি শুরু হয়। সেখান থেকে বেরিয়ে কাছারীর বাইরে গিয়ে ওই খানিকটা নদীর ধার পর্যন্ত গিয়েই ঠাকুরদাস হাত চেপে ধরলে, অমনি—! শুনেছি নাকি ঘড়া দরুণে রক্ত পড়েছিল।

—গোয়ানটার কি হল?

—তার অবিশ্যি ফাঁসি না দ্বীপান্তর কি হয়েছিল। সে আর ফেরেনি। লোকটা ডাকাত ছিল। তার মেয়েটা ওই যে হলদি বুড়ী—ওকে তো দেখেছ। সেই যে! সেই ভাস্থরপোর শ্রাদ্ধের সময় এসে তোকে বউমাকে সেলাম দিলে। সালাম পহুঁছে হুজুরাইন, হামার ছোটা হুজুর! যে বললে—হমি লোক তো হিয়া পাতা পেড়ে নেই খাবো মালেক। হামরা তো হিন্দু নেহি। হমি লোক কিরিস্তান। আর হারমাদ হামরা—

মনে পড়ল সুরেশ্বরের। বুড়ীকে দেখেছিল বাবার শ্রাদ্ধের সময়।

অনেকটা বয়স বুড়ীর। রঙটা সত্যিই ফরসা। মাথার চুলগুলো শনের মতই সাদা হয়ে গেছে প্রায়। চৌকো গৌরবর্ণ মুখখানায় দাগে দাগে একটা মাকড়সার জাল আঁকা হয়ে গেছে। চোখ দুটো বেড়ালের চোখের মত কটা বা পিঙ্গল। পরনে ছিল একটা সেমিজের মত ছিটের গাউন। অর্থাৎ তার গাউনত্ব ছিল না। কিন্তু সেটা তার তোলা পোশাকী গাউন; সেদিনের বিশেষ ক্ষেত্রে তাদের বাড়ী আসবার জন্যই প'রে এসেছিল, তা বোঝা গিয়েছিল। তাতে ন্যাপথলিনের গন্ধ ছিল।

মেজঠাকুমা বলেছিলেন—পিদ্রুর সাজা হলে গোয়ানপাড়ার সকলে, গাঁয়ের সকলে ওকে ওর মাকে তাড়াবার জন্য বলেছিল আমার শ্বশুরকে। কিন্তু তাঁর বিচার ছিল অতি ন্যায্য। তিনি তো তাড়ানই নি বরং রক্ষে করেছিলেন। বলেছিলেন—যা ক'রেছে পিদ্রু করেছে তার জন্য ওদের সাজা হবে কেন? সেজন্যে হলদি রায়বাড়ীর অবস্থা এত হীন হলেও খাতির না ক'রে পারে না। তবে তোমাদের মানে ভাস্থরের বংশের উপর খাতির বেশী। তার মানে জান?

—কি?

হেসে ঠাকুমা বললেন—আমার ভাই তোর মেজঠাকুরদার কাছে শোনা। তিনি বলতেন দাদার চেহারা ছিল কন্দর্পের মত। তাই বা কেন? কন্দর্পের চেয়ে বেশী। কন্দর্প তো কোমল কিশোর বা যুবক। দাদার ছিল বীরের মত চেহারা। এই লম্বা। তেমনি মুখ

তেমনি চোখ তেমনি রঙ। তেমনি বুকের ছাতি। তাঁকে দেখে ওই হারামজাদীদের লালসার অন্ত ছিল না। দাদারও ক'জন গোয়ান শিকারী ছিল, তারা সঙ্গে যেত, বাঘ মারবার সময়।...

হঠাৎ ঠাকুমা মুখে কাপড় চাপা দিলেন, বললেন—আমি বলেছিলাম, আর তুমি কালো একটু মোটাসোটা বলে তোমার দিকে তাকাতো না বুঝি? ওঃ জ্বলে উঠতেন। দশবার রাধা রাধা বলে বলতেন—শুনলে পাপ হয় এ কথা।

সুরেশ্বর চিন্তার রাজ্য থেকে ফিরে এসে মেজঠাকুমার সঙ্গেই মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিল, উপভোগ করেছিল এই আশ্চর্য সেকেলে অথচ সর্বকালের মাধুর্যময়ী এই রূপসী ঠাকুমাটির কথাগুলি। উত্তরে নিজেও রসিকতা করবার লোভ সামলাতে পারেনি, বলেছিল—তুমি বুঝি তাঁকে পাহারা দিতে হলদিদের দল যখন আসত? ছাদে উঠেও গোনপাড়ার দিকে তাকাতে দিতে না!

হেসে উঠলেন মেজঠাকুমা, সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন—যেন ঠোঁটের ডগায় উত্তরটি উদ্যত হয়েছিল, সেটা তোকে সাবধান করা দেখে বুঝতে পারছিস না। সেইজন্যে তো বলছি ভেতরে চল্। মনসার কথায় আছে মনসা যেন বেটীকে বলেছিলেন—সব দিক পানে তাকিয়ো মা, দক্ষিণ দিক পানে তাকিয়ো না। তোর দাদু ছিলেন কালো এবং আমি যেকালে ভার পেয়েছিলাম সেকালে তিনি বুড়ো হয়েছিলেন। তোর দাদু তোকে দেখে বলেছিলেন—নাতি, তোমাকে দেখে দাদাকে মনে পড়ছে। তিনি রায়বংশের শ্রেষ্ঠ সুপুরুষ ছিলেন। তুমি তার তুল্য কি তার থেকেও সুন্দর হে। তুমি সুন্দর তুমি নবীন। পাঁচজনে কলঙ্ক দিয়ে তোকে আমার নটবর করে তুলেছে। আমাকে ভাবনায় ফেলেছিস তুই। আয়, ওদিকে সেই মুখপুড়ী ছুঁড়ীদের গানের জন্য কান পেতে দর্শনের জন্য চোখ পেতে থাকতে হবে না।

ঘরে এসে ডেকচেয়ারে বসলাম। টানাপাখা আবার চলতে লাগল।

দিনের বেলা খেয়ে না ঘুমিয়ে বিকেলে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম সুলতা, তার মধ্যে স্বপ্ন দেখেছিলাম; কি দেখেছিলাম মনে নেই, তবে তার মধ্যে ঠাকুরদাস ছিলেন, আমার ঠাকুরদাও উঁকি মেরেছিলেন আর পিদ্রা ছিল, গোয়ানপাড়ার মেয়েগুলোও ছিল। এলোমেলো জড়ানো স্বপ্ন। মানে মাথার মধ্যে সেকালের ওই ইতিবৃত্তগুলো মাতালের মদের নেশার মত ঘুরপাক খাচ্ছিল।

স্বপ্নের শেষের দিকটায় ঠাকুরদাসের রক্তাক্ত দেহ ছিল মনে আছে। একটু আতঙ্কের সঙ্গেই জেগে উঠলাম। তখন সন্ধ্যে হয়ে এসেছে—

রঘু চা এনে দিলে।

চা খেয়ে কি মনে হল, ভাবলাম, ঠাকুমা বললেন—ঠাকুরবাড়ী-কাছারী থেকে বেরিয়ে কাঁসাইয়ের ধারটায় গিয়ে পিদ্রা খুন করেছিল ঠাকুরদাসকে। জায়গাটা দেখে আসি!

বেরিয়ে পড়লাম।

কীর্তিহাট গ্রামখানা নদীর ধারে ধারে লম্বা—কলকাতার মত গড়ন। রায়বাড়ী তার এক পাশে। মানে যে দিকটা জুড়ে আছে তার পরে আর অন্যলোকের বসত নেই। নদীর ঘাটে

গিয়ে একটা রাস্তা পড়েছে। তার ওপারেই গোয়ানপাড়া।

গিয়েছি অনেকবার। কিছুই ছিল না। থাকবার মধ্যে জঙ্গল। খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ফিরে এলাম।

গোয়ানপাড়ায় তখন হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি চলছে। গরুকে ডাকছে ছাগলকে ডাকছে। হাঁসকে ডাকছে—আ-তি-তি-তি। আ কোর কোর তি-তি-তি। আ—ছেলেগুলো কোলাহল করছে। বকাবকিও শোনা যাচ্ছে। কলহ নয়। গুরুজনেরা বকছে ছেলেমেয়েদের। আমার পাশ দিয়ে ক'টা গোয়ান মেয়ে কীর্তিহাটে বাজার করে ফিরে এসে নদীর ঘাটে নামল। হাতে মুখে দড়ি বাঁধা কেরোসিনের বোতল, মাথায় একটা ক'রে ডালা। আর একটা করে সরষের তেলের ভাঁড়।

আমাকে দেখে ফিক ফিক করে এ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে হাসলে। আমি প্রাণপণে গম্ভীর হয়ে বিচরণ করছিলাম, বলতে পার শিশিরবাবুর চিন্তামগ্ন আলমগীরের মত। ওদের দেখে ভয়ার্ত যেমন মেকী সাহস দেখায়, তেমনি পোজ নিয়েছিলাম আমার মনে আছে। কিন্তু ওরা ছাড়বার পাত্রী নয়, ওদের উপমা আমাদের পুরাণে, কাব্যে খুঁজে পাই নে। প্রমীলার রাজ্যের কথা শুনেছি। বিস্তৃত বিবরণ নেই। থাকলে বোধহয় উপমা মিলত। ওরা বললে, সেলাম মালিকসাহেব।

আমি বললাম, সেলাম।

—হুজুরের বোখার হয়েছিল। কতদিন জানালাতে দেখি নি। আব্ তবিয়ৎ ভাল হল?

—হ্যাঁ। হয়েছে।

তবুও ছাড়ান দিলে না। বললে, গোয়ানপাড়ার ঘাটে হুজুর?

বললাম, বেড়াতে এসেছি।

—তবে চলেন মালিক হমলোকের গাঁওয়ে।

বললাম, না, তোমরা যাও।

—কোইকে ডেকে দিব হুজুরবাহাদুর?

—না।

—আর তসবীর আঁক না মালিক?

—না।

—এই রোজা মেয়েটা বলে, হুজুরকে বলব, হুজুর হামার তসবীর আঁকো। তা ওর আঁক না হুজুর। উর খুব শখ। আর উ দেখতে ভি খুব সুরত আছে।

এবার খিল খিল করে হেসে উঠল।

আমি নিশ্চয় রাঙা হয়ে উঠেছিলাম। এরা তো সুলতা, অসীমা, সীমা নয়, এদের সঙ্গে আমার পেরে ওঠবার কথা নয়। আর এরা চীৎপুরের বাড়ীর দরজায় যারা পেটের অন্নের জন্য দাঁড়িয়ে থাকে, তারাও নয় যে, পকেট থেকে টাকা দিয়ে ঘরে যেতে বললে কৃতজ্ঞতায় মাথা হেঁট করে মনে-মনে পায়ে মাথা ঠেকাবে। এদের গায়ে হারমাদের রক্ত। এরা কাঁসাইয়ের ধারের জঙ্গলে বাস করা আদিম নারী। আমি ভঙ্গ দিলাম। যথেষ্ট গাম্ভীর্যের সঙ্গে ওদের

দিকে একটা তির্যক দৃষ্টি নিক্ষেপ করে গাঁয়ের মুখে ফিরলাম। ফিরতে গিয়েই দেখলাম, পিছনে জঙ্গলের মধ্যে কে একজন লুকুচ্ছে। আমি গ্রাহ্য করলাম না, চলে এলাম। কিছুটা এসেছি অমনি মেয়েগুলোর তীক্ষ্ণ উচ্চকণ্ঠের ধ্বনি পেয়ে আবার থমকে দাঁড়ালাম। অশ্লীল ভাষায় গালাগাল দিচ্ছে কাকে। একটা কথা কানে এল—এঁঃ, রায়বাবুর বাড়ীর লড়কা। কুর্তার পাকিটে একঠো দামাড় নেহি বাবু খিতাব। যা-যা, ভাগ। নেহি তো নাক কেটে লিবো রে শালা!

বুঝলাম, কোন রায়বংশের গুণধর ওদের পিছু নিয়েছিল। তাকেই এ-কথা বলছে।

দুপুরে নিজে যা করেছি তার জন্য লজ্জায় মরে গেলাম।

এবং তখনই বোধহয় জিতে গেলাম।

যৌবনের ধর্মকে আমি মানি। ব্যভিচারী বলে যারা সংসারে ঘৃণিত, তাদের বিচারও আমি সহানুভূতির সঙ্গে করেছি। কিন্তু হ্যাঙলামি-কাঙালপনা; নারীর সঙ্গে প্রেমের ক্ষেত্রে ছিঁচকে চোরের বা গাঁটকাটার কাজ যারা করে, তাদের ঘেন্না করে এসেছি। আমার এই জ্ঞাতি-পুত্রটিকে দেখে যে ঘেন্না হল তার ওপর, তার থেকেও বেশী ঘেন্না অনুভব করছিলাম নিজের ওপর। বিল্বমঙ্গলের মত চোখ দুটোর ওপর ক্রোধের আর সীমা ছিল না।

খারাপ, অত্যন্ত খারাপ মন নিয়েই ফিরে এলাম।

একটা কথা এক সময় বিদ্যুচ্চমকের মত মনে হল, মানুষের এই পাপ রায়বংশে এমন করে বাসা বাঁধলে কেন?

বাবার কথা মনে পড়ল। মাকে চিঠিতে লিখেছিলেন, সুরেশ্বরকে নারীদের থেকে দূরে থাকতে বলো। যদি নাই থাকতে পারে, তবে যেন বিবাহ করে।

আর একটা কথা মনে পড়ল, প্রকৃতির সঙ্গে পুরুষের সম্পর্ক মানুষ আর মানুষীর মধ্যে দুটিতেই আবদ্ধ রাখতে হয়। বাকি ক্ষেত্রে সম্পর্ক পিতা-কন্যা; মাতা-পুত্রের। কথাটা রায়-বাহাদুর রত্নেশ্বরের। তিনি বলে গেছেন।

গোয়ান মেয়েগুলোকে মনে মনে মা বলতে গিয়েও পারি নি। তোমাকে মনে করতে চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু তোমার মুখ ঢেকে ওদের মুখ ভেসে উঠছিল। এরই মধ্যে কখন এসে পৌঁছে গিয়েছিলাম বিবিমহলের দরজায়। মাথা হেঁট করেই আসছিলাম। হঠাৎ শুনলাম, কে বললে—এই যে!

মাথা তুলে দেখলাম, সেটেলমেণ্ট ক্যাম্পের পেশকার।

লোকটা কালো, রোগা, যারা খুব ধূর্ত হয়। বললে, এই তো বেড়িয়ে এলেন। তাহলে তো ভাল আছেন!

মেজাজ খারাপ হয়ে গেল, লোকটা কি দেখতে এসেছে আমার অসুখ কতটা সত্যি, তাই?

লোকটা বলে চলেছিল—ওঃ, কতক্ষণ এসেছি, আধ ঘণ্টার উপর। চলুন, সাহেব বসে আছেন। মিসেস ঘোষ কাল কলকাতা যাবেন। হঠাৎ ঠিক হয়েছে। তাঁর ছবি এঁকে দেবার কথা আছে। সেটা নিয়ে যাবেন তিনি।

—মানে ? এই রাত্রে ?

—হ্যাঁ। কাল যে কলকাতা যাবেন, সেখানে দেখাবেন তিনি।

কি হয়ে গেল মেজাজ, বললাম, বলবেন, রাত্রে ছবি আঁকা হয় না।

—হেজাক-বাতি ঠিক করে রেখেছি।

—বলবেন, হবে না। পারব না। আমার শরীর ভাল নেই।

—উনি চটে যাবেন। মেমসাহেব ঝোঁক ধরেছেন।

—তাহলে চটতে বলবেন। বিরক্ত করবেন না। বলে আমি ঘরে ঢুকে গেলাম।

সুরেশ্বরের নিজস্ব কর্মচারী ঘোষাল। হরচন্দ্রেরই ভাইপো। সে বললে, কথাগুলো কড়া হয়ে গেল।

তার মুখের দিকে তাকিয়ে সুরেশ্বর বললে, তা হোক !

নায়েব বললে, পরশু থেকে কীর্তিহাটে বুঝারত হবে আজ ঢোল পড়ল। সাহেব নিজে করবেন।

—তা করুন।

—আপনাকে হয়রান করবে এই আর কি !

—কি হয়রান করবে ?

—সঙ্গে সঙ্গে রোদে রোদে ঘোরাবে হয়তো। হয়তো আমাদের কথা শুনবে না। স্বত্বের ঘরে ওরা যা বলবে তাই লিখবে। ওদের তো লম্বা হাত !

—ঠিক আছে। আপনি কাগজপত্র ঠিক করে রাখুন, থাকলে দেখাবেন। না থাকলে বলবেন, কাগজ নেই, অন্যে যা বলছে তাই লিখুন তিনি। তারপর তো মুন্সেফ কোর্ট, ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট, হাইকোর্ট আছে।

চুপ করে রইল নায়েব, কথাটা তার মনঃপূত হল না। সে একটু চুপ করে থেকে মাথা চুলকে বললে, একবার চলুন না সাহেবের কাছে। গিয়ে বলবেন, দেখুন লোকজনের সামনে পেশকার আপনার এইভাবে কথা বললে—

সুরেশ্বর একটু রুক্ষভাবেই বললে—না।

নায়েব চলে গেল। সে বিবিমহলের সেই চারিপাশ খোলা ছাদওয়ালা বারান্দায় ঘুরতে লাগল। মন তিক্ত হয়ে উঠেছে। মনে হচ্ছে এসব ওই ওদের দানপত্র করে চুকিয়ে দিয়ে চলে যায় সে, তাহলে এই হরেন ঘোষ নামক সেটেলমেণ্ট হাকিমের লম্বা হাতটিও আর তার নাগাল পাবে না। সে তখন ঠাকুরদাস পালকেও ভুলে গিয়েছিল। ইচ্ছে হচ্ছিল হুইস্কির বোতল সে এখনি খোলে। এবং তারপর বাজনা বাজায়। রঙ-তুলির মত বেহালাও তার সঙ্গী। সঙ্গেই এনেছে। কিন্তু এই বাজনাটা তার লোকজন থাকলে যেন নিজের কাছেই জমে না। বিশেষ করে এখানকার লোকজন।

সেই বাপের শ্রাদ্ধ থেকে এ পর্যন্ত তার তিনবার আসা হল, এখনও পর্যন্ত বলতে গেলে গ্রামের লোকের কাছে সে অপরিচিতই। এদের যা স্বভাবচরিত্র, সে তার বাবার শ্রাদ্ধের সময় এসে দেখেছিল। সেটা একান্তভাবে লোভ আর খানিকটা সেও লোভ বা আর এক

ধরনের ক্ষুধা—রক্তমাংসের দেহের ক্ষুধা, এই সর্বস্ব। কিন্তু এবার এসে আরও গভীর এবং ভয়াবহ চেহারা দেখছে। বিষয়সম্পত্তি নিয়ে যে ক্ষুদ্রতা এদের এবং যে কুটিলগতিতে সে-ক্ষুদ্রতা পাক খায়, তার তুলনা হয় একমাত্র সাপের সঙ্গে। প্রথমটার তুলনা শেয়ালের সঙ্গে। সত্য বলতে গেলে, এদের সে সহ্য করতে পারে না।

ডিকু বলে, বিলকুল সব হারামী আছে হুজুর।

রোজা অর্থাৎ রোজারিও বলে, বিনা মতলবে কোই বাত করে না মালেক। ঝুটা আদমী, ঝুটা বাত্!

সুরেশ্বরও তাই মনে করে, এদের মধ্যে অস্বস্তিও বোধ করে। এমনকি প্রশংসা কেউ করলেও সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠে। বোধহয় ওরাও জানে সেটা অর্থাৎ সুরেশ্বর রায় তাদের চেনে এটাও ওরা বুঝেছে। তাই কেউ এদিকে ধার ঘেঁষে না। একমাত্র ওই মেজঠাকুমা! এই রায়বাড়ী, এই কীর্তিহাট গ্রামে ওই মহিলাটিই তার পরমাত্মীয়, প্রিয়জন। তিনি তাঁর সঙ্গে আদিরস-ঘেঁষা রসিকতা করলেও মিষ্টি লাগে, তার তোষামোদ করে তাকে তাঁর অন্নদাতা বললেও সে সঙ্কোচ বোধ করে না; মনে হয় না কোন মতলবে বলছেন। তিনি দুপুরে একবার খাবার সময় আসেন, আবার সন্ধ্যার পর ঠাকুরবাড়ী ফেরত পুষ্পচরণোদক নিয়ে তাকে দেন, রাত্রে কি কি খাবার আয়োজন করেছে ঠাকুর তার তদ্বির করে চলে যান। তিনি তো জানেন তার হুইস্কি খাওয়ার কথা, তাই খাওয়ার আগেই চলে যান। হুইস্কির সঙ্গে রাত্তিরের খাবার খেয়ে নিয়ে সুরেশ্বর এসে বসে ওই সামনের মনোরম খোলা বারান্দাটিতে, হাতে বেহালা থাকে। বাজায় আপনমনে। আমেজ লাগে।

আজ এই উত্তেজিত মুহূর্তটিতে সে হুইস্কির বোতলটা খুলে বসে গেল। মেজঠাকুমা এখনও আসেননি। সেজন্য সুরেশ্বর আজ বিরক্ত হয়েছিল মেজঠাকুমার উপর। মনে মনে প্রশ্ন করেছিল, কি দরকার ওঁর রাত্রে আসবার?

প্রায় সেই ক্ষণটিতেই মেজঠাকুমা এসে গিয়েছিলেন। মুখে সুরেশ্বর কিছু বলতে পারেনি। তাই বা কেন, মনটা প্রসন্নই হয়ে উঠেছিল।

মেজঠাকুমা কিন্তু সেদিন ঠিক সেই মানুষটি নন, যাঁর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মুখের হাসি এবং সরস বাক্যে কীর্তিহাটের এই নির্বাসনবাসটি মধুর হয়ে ওঠে।

পুষ্পচরণোদক দিয়ে বললেন, আজ নদীর ওই গোয়ানপাড়ার ঘাটে বেড়াতে গিয়েছিলে?

—হ্যাঁ। ঠাকুরদাস পালকে পিদ্রুগোয়ান ওইখানটায় খুন করেছিল, বললে না তুমি? মনে হল জায়গাটা একবার দেখে আসি।

—হুঁ। তা ডিকু কি রোজারি কি রঘুকে সঙ্গে নিলেই পারতে। একলা গেলে কেন?

—কি বিপদ, আমি কি ছেলেমানুষ, পথ হারাব?

—ওরা তো তাই রটাচ্ছে, তুমি ওদের ছুঁড়িগুলোর ইসারায় পথ হারাতেই গিয়েছিলে। চন্দ্রেশ্বর দেখেছে।

চন্দ্রেশ্বর সুখেশ্বরের ছোট ছেলে।

—ও। হ্যাঁ দেখলাম বটে। গ্রাম থেকে কেউ ওদের পিছু নিয়েছিল। আমি ঘাটে দাঁড়িয়ে ছিলাম বলে জঙ্গলের মধ্যে গাছের আড়ালে লুকিয়েছিল। মেয়েগুলো যা কুৎসিত ভাষায় ওকে গালাগাল করছিল।

—সেটা এবার তোমার নামে রটল।

—রটুক।

—না ভাই। আমার গায়ে লাগে।

একটু চুপ করে থেকে বললেন, কাল থেকে লোক সঙ্গে করে বেরুবি।

—কেন? এখানে সাক্ষী রেখে বেড়াতে হবে নাকি? না, তোমারও সন্দেহ হচ্ছে?

—তুই আচ্ছা গোঁয়ার কিন্তু। রায়বংশ তো!

—বলতে দাও। ওদের বলতে দাও। ওটা আমার প্রাপ্য রায়বংশ বলেই। কিন্তু তোমার সন্দেহ হয় কিনা বললে না তো।

—হলেই বা তোর তাতে কি যাবে-আসবে বল?

বুঝলাম অভিমান।

আবার একটু চুপ করে থেকে বললেন, সায়েবের পেশকারের সঙ্গে ঝগড়া করলি।

—হ্যাঁ, তাও করেছি। দরকার হলে আবার করব!

—ওরা মানে ধনেশ্বর লাফাচ্ছে। প্রণবেশ্বর খুশী। পরামর্শ হচ্ছে—কাল প্রথমেই ওরা বাড়ীর স্বত্বে আপত্তি দেবে। বলবে, বাড়ী দেবোত্তর। মানে প্রণবেশ্বরদের অংশ যা কিনেছ, এই বিবিমহল যা তোমার নিজস্ব, এর সব দেবোত্তর। মানে বিক্রী সিদ্ধ নয়। ভাগ সিদ্ধ নয়। সব তো শুনেছিস।

বিরক্তিতে, ক্ষোভে, ঘৃণায় সুরেশ্বরের মাথায় যেন আগুন জ্বলে উঠল। সে বললে, নিক ঠাকুমা নিক ওরা। ওতে আমার দরকার নেই। নিক।

—না! কণ্ঠস্বর কঠিন হয়ে উঠল মেজঠাকুমার। বললেন, জমিদারের ছেলে হয়ে এই কথা বলছিস তুই? ছি! দিতে ইচ্ছে হয় দিতে পারিস। কিন্তু ঠকিয়ে নিতে দিবি? পরকে ঠকিয়ে নেওয়া যেমন পাপ, জেনেশুনে নিজে ঠকাও তেমনি ঘেন্নার কথা। সে যদি আবার ক্ষমতার অভাবে হয়। শোন, তোকে বলি,—যে-খাতাগুলো তোকে দিয়েছি, তার সবগুলো খোঁজ। ওর মধ্যেই পাবি রায়বাহাদুরের দেবোত্তরের বাইরে কলকাতায় যে ব্যবসা ছিল, শেয়ার ছিল কোম্পানীতে, তার জমা-খরচের খাতা। আমি দেখেছি সে খাতা। তার মধ্যে ইমারত খরচ পাবি। তোর কলকাতার বাড়ী এখানকার বাড়ী সব সেই টাকাতে।

বলে চলে গেলেন মেজঠাকুমা।

তার দিকে সুরেশ্বর তাকিয়ে রইল সবিস্ময়ে শুধু নয়, সসম্ভ্রম দৃষ্টিতে। আজ তাঁর এক নতুন চেহারা দেখেছে সে। একেবারে রাজমাতার মত চেহারা। আশ্চর্য, পুজুরী বামুনের মেয়ে, এমনটা হল কি করে?

* * *

—সমস্ত রাত্রি আমি খাতা উল্টেছিলাম। পাতার পর পাতা। আজ আর ইতিহাস

ঘাঁটতে নয়, নজীর খুঁজতে। ঠাকুমা মনের মধ্যে একটা তেজ বা আগুন জেলে দিয়ে গিয়েছিলেন সুলতা। সে আগুনটা অ্যালকহলের ছিটে পেয়ে জ্বলে উঠেছিল জোরালো হয়ে। ওদের রায়ত কেনা মেরামত-করানো ভিতর-বাড়ীটা ওরা ঠকিয়ে নেবে ?

এদের অর্থগৃধ্নুতার জন্য নীচতার জন্যে ঘেন্না, ওদের জোট বেঁধে আমাকে ঠকাবার চেষ্টায় রাগ —ওদের মেজঠাকুমাকে পর্যন্ত কলঙ্কিনী অপবাদ দেওয়ার কুৎসিত প্রবৃত্তির জন্য ক্ষোভ—এগুলো মিলে আমাকে নিষ্ঠুর কঠোর করে তুলেছিল সেদিন। মদ খেয়েছিলাম মধ্যে মধ্যে, আর খাতাই উল্টেছিলাম পাতার পর পাতা, খাতার পর খাতা।

২

কিছুই পেলাম না। দেবোত্তরের খাতার মধ্যে কোথাও পেলাম না ইমারৎ খরচ। আবার ওল্টাতে লাগলাম। এবার হঠাৎ চোখে পড়ল, একটা টাকা জমা হয়েছে সেইদিকে। সামান্য টাকা, দেড়শো টাকা জমা! মাঃ সোমেশ্বর রায়। দেবোত্তরের ইটের পাঁজা বিক্রয় হয়, সোমেশ্বর রায় অন্দরমহল তৈরীর জন্য খরিদ করেন—তস্য মূল্য বাবদ দেড়শত টাকা! চমকে উঠলাম। এই তো পেয়েছি। অর্থাৎ দেবোত্তর থেকে ইট নিয়েও তার দাম পর্যন্ত সোমেশ্বর রায় দিয়েছেন নিজের তহবিল থেকে। পুরো এক গ্লাস হুইস্কি খেয়ে বেহালাখানা তুলে নিয়ে ভাবলাম বেহালা বাজাব। গভীর রাত্রি। আকাশে পশ্চিম দিকে চাঁদ পাণ্ডুর হ'তে সবে আরম্ভ করেছে। ছোটজাতের এক রকম পাখী আকাশে ক্রমাগত উড়েই বেড়াচ্ছে। সে পাখী তুমি বোধহয় দেখনি সুলতা, কলকাতায় কাটিয়েছ তো সারা জীবন! ওরা চকোর। কাঁসাইয়ের ওপারের জঙ্গল থেকে কোন ফুলের গন্ধ আসছে। বউকথাকও পাখীটাও ডাকছিল। গ্রাম নিস্তব্ধ। শুধু মধ্যে মাঝে গ্রামের কুকুরগুলো ঘেউ ঘেউ করে চীৎকার করছিল। ছড়িটা তুলে নিয়ে টান দিয়েছি; বাজাব—'শুন যা শুন যা পিয়া'। তোমাকেই ভেবেছিলাম মনে মনে! হঠাৎ একটা দমকা বাতাস এল। জমাখরচের খাতাখানা খোলাই ছিল, ফরফর ক'রে ওল্টাতে লাগল। পুরোনো কাগজ ছিঁড়ে যাবে ভয়ে ছড়িটা দিয়েই চেপে ধরলাম এবং বেহালাটা রেখে বন্ধ করতে গেলাম।

হঠাৎ নজরে পড়ল পাতাটায় লেখা—সৎকার খরচ; ঠাকুরদাস পাল খুন হওয়ায় তাহার লাশ সদরে যায়; সদরে লোক পাঠাইয়া তাহার শবদেহ সৎকারের খরচ, পঁচাত্তর টাকা। তার জায় রয়েছে—বারবরদারি যাতায়াত খরচ, তাহাদের খাদ্য খরচ, চন্দন কাষ্ঠ, ঘৃত, নূতন বস্ত্র ইত্যাদি খরচ! ঠাকুরদাস পাল। সেই ঠাকুরদাস! সে খুন হয়েছে। তার সৎকারে চন্দন কাষ্ঠ ঘৃত খরচ করেছেন রত্নেশ্বর রায়।

আবার অন্যমনস্ক হয়ে গেলাম। ওল্টাতে লাগলাম। ঠাকুরদাসের শ্রাদ্ধের খরচ পেলাম। সেই পৃষ্ঠাতেই পেলাম পিদ্রু গোয়ানের পরিবারকে সাহায্য।

একটা আশ্চর্য চেহারা ফুটেছিল রত্নেশ্বর রায়ের। মাথাটা নত হয়ে এল। আক্রোশ ক্রোধ তাঁর চিত্তকে দৃষ্টিকে অভিভূত করতে পারে নি। ঠাকুরদাসকে যে খুন করেছে তার

অপরাধে তুমি তার স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকে অপরাধী করনি।

উল্টেই গেলাম খাতা। হঠাৎ একটা চার অঙ্কের খরচ চোখে পড়ল। পনেরশো টাকা। খরচের বিবরণ প'ড়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। হুজুর বাহাদুরের পত্রের আদেশ অনুযায়ী পিদ্রু গোয়ানের দায়রা মামলায় তাহার পক্ষ সমর্থনের জন্য একজায়গায় খরচ—পনেরশো টাকা।

চমকে গেলাম।

প্রতিটি পাতায় রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায়ের সই রয়েছে। বিশ্বাস করতে পারলাম না। পিদ্রু গোয়ানের দায়রা মামলায় পনেরশো টাকা সাহায্য? তার পরিবার সন্তান-সন্ততিদের সাহায্য করেছেন বুঝতে পারলাম। দয়া করুণা! এও কি দয়া? করুণা? গোয়ান মেয়েটি কি এসে তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়েছিল—বাঁচাও হুজুর! বাঁচাও আমার স্বামীকে! না—? সন্দেহ হচ্ছিল রত্নেশ্বর রায়ের মত ব্যক্তিকেও।

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল শ্যামনগরে চ্যারিটেবল ডিসপেন্সারি আছে—ঠাকুরদাস দাতব্য চিকিৎসালয়! মনে মনে প্রণাম করলাম রত্নেশ্বর রায়কে, বললাম—ক্ষমা কর আমাকে।

সারাটা রাত মদের নেশাতেও ঘুম আসেনি।

সকালবেলা স্নান ক'রে নেশাটা কেটেছিল, কিন্তু রত্নেশ্বর রায়ের চরিত্র নিয়ে যে ঘোরটা লেগেছিল সেটা কাটেনি। মনের মধ্যে একটি কথাই ধ্বনিত হচ্ছিল—অদ্ভুত! অদ্ভুত! চা খাচ্ছিলাম এমন সময় আমার কর্মচারী এসে ডাকলে—বাবু, বুঝারত আরম্ভ হয়েছে। গ্রামের নৈঋর্ত কোণ থেকে। এসে পড়ল বাড়ীর সীমানায়। ওরা বাড়ী দেবোত্তর বলে আপত্তি দেবে।

—ঠিক আছে চলুন। ডিকুকে বা রোজারিওকে ডাকুন। খানকয়েক খাতা নিয়ে যেতে হবে।

বাড়ীতে আসতে দেরী ছিল। নায়েব শঙ্কিত হয়ে ছুটে এসেছিল। নৈঋর্ত কোণ থেকে উত্তর দিকে সেটেলমেণ্ট চলছিল। সাহেব টেবিলের উপর ম্যাপ গেঁথে তা থেকে প্লট বাই প্লট বুঝারত করে চলেছিলেন। লোক অনেক জমেছে। গ্রামের বর্ধিষ্ণু ব্যবসাদার সুরেন দে, রাধাগোবিন্দ ভটচাজ, শিবনাথ ওঝা, নটবর সিং, নন্দ ঘোষ, নটু বাউড়ী, মোটা কালো ইব্রাহিম শেখ, তা ছাড়া ধনেশ্বর, প্রণবেশ্বর এঁরা তো আছেনই।

সাহেব গম্ভীরকণ্ঠে বললেন—এতক্ষণে সময় হল আপনার?

—তাতে আপনার কাজে ব্যাঘাত হয়েছে?

—নিশ্চয় হয়েছে। আপনারা জমিদার। প্রজা যে স্বত্ব বলছে সে সম্বন্ধে আপনাদের সম্মতি কিম্বা আপত্তি দুটোর একটা চাই। না হলে আমার কাজ শেষ হয় না। ওগুলোতে আপনার মতামত কিছু নাই তাই আমি লিখেছি। মানে প্রজার পক্ষেই গেছে। এঁরা আপত্তি দিয়েছেন। লিখেছি। এটাতে কি বলুন?

তবুও বুঝতে পারলাম না। সবে তো পনের বিশ দিন গেছে। প্রজাইস্বত্বের ব্যাপার ঠিক রপ্ত হয়নি।

হঠাৎ পিছনে একটা দুর্বোধ্য হাউহাউ শব্দ শুনলাম। সকলেই ফিরে তাকালে। দেখলাম, একজন বৃদ্ধ, লোলমাংস থলথল করছে, তার মধ্যে হাড়গুলো প্রকট হয়েছে, মাথায় চুল উঠে গিয়ে যে ক' গাছা আছে তা সাদা ধপধপে এবং ব্যোমকেশের মত ঊর্ধ্বমুখী, একমুখ খোঁচাখোঁচা দাড়ি গোঁফ, ভুরু দুটোও পাকা এবং ঘন মোটা। পরনে হাঁটু পর্যন্ত ধুতি, একজন তিরিশ পঁয়ত্রিশ বছর বয়সী ফিটফাট পোশাকপরা ভদ্রলোকের হাত ধ'রে আসছে। চোখে দৃষ্টি নেই, ঘোলাটে চোখের তারা দু'টো শূন্য-লোকের দিকে স্থির নিবদ্ধ, পা দুটো ঠিক পড়ছে না। লোকটা হাউহাউ করে কি বলছে তা বোঝা যাচ্ছে না।

অফিসার বিরক্তিভরে তাকালেন। বললেন—চীৎকার করো না এমন ক'রে!

বৃদ্ধের সঙ্গের ভদ্রলোকটি খাসা ইংরেজীতে বললেন—তার নিজের কথা বলবার অবশ্যই স্বাধীনতা আছে।

হাকিম চটে উঠে বললেন—কে তুমি? ওইই বা কে?

ভদ্রলোক বললেন—ওঁর নাম বহুবল্লভ পাল। উনি এইখানকার বিশ দাগ প্লটের মালিক। আমি ওঁর ছেলে, উনি চোখে দেখতে পান না, সঙ্গে নিয়ে এসেছি। ইংরিজীতেই বললেন।

উরু ভটচাজ, সে প্রৌঢ় লোক, বিচিত্র-চরিত্র মানুষ বলে পরিচয়টা শুনেছিলাম স্থূলতা, কিন্তু প্রত্যক্ষ পরিচয় বিশেষ ছিল না। শুনেছিলাম প্রথম যৌবন থেকে মেজঠাকুরদার থিয়েটারে পার্ট করতেন, তারপর প্রেম করে একটি শূদ্রকন্যাকে নিয়ে কলকাতায় চলে গিয়েছিলেন। বাড়ীর জমি বিক্রী করে কিসের দোকান করেছিলেন, তারপর ফেল পড়ে গ্রামে ফিরে বিয়ে করে রায়বাড়ীতে চাকরীও করেছিলেন। এখন গ্রামে মাতব্বরী করেন। ক্রিয়াবাড়ীর যজ্ঞে উরু ভটচাজ অপরিহার্য। তিনি রান্নাশালে মোড়া নিয়ে বসেন। বাঁ হাতে সিগারেট পোড়ে ডান হাতে হুঁকো থাকে। কোন নেশা নেই এ ছাড়া। ওই খেয়েই ক্রিয়া শেষ ক'রে উঠে যান। তবে এখনও নাকি ব্রাত্যপাড়া থেকে গোয়ানপাড়া পর্যন্ত মেয়েদের কাছে প্রিয়জন। তার জন্য কিন্তু তিনি লজ্জিত নন। কথা-বার্তা খুব ভাল বলেন অবশ্য তার একটা বিশেষ ধরন আছে। উরুবাবু বলে উঠলেন—ব্রিলিয়ান্ট স্টার অব আওয়ার ভিলেজ স্যার। উজ্জ্বল নক্ষত্র। এম. এ'-তে ভাল রেজাল্ট করেছে। আমাদের বহুবল্লভ পালের ছেলে। শ্রীরাধাবল্লভ পাল। উকীল হয়েছেন।

হাকিম বললেন—নরম সুরে বললেন—বেশ তো, কি বলতে চান সেইটে তো পরিষ্কার ক'রে বলতে হবে।

রাধাবল্লভ বললেন—উনি বলছেন এসব হল লাখরাজ।

এবার ধনেশ্বর এগিয়ে এসে বললেন—না। ওগুলি জোতের সামিল।

—এ্যাঁ? জিজ্ঞাসা করলে বহুবল্লভ।

কানের কাছে মুখ এনে ছেলে বললে—ধনেশ্বরবাবু বলছেন—না। এ সব জোতের সামিল! রায়তি স্থিতিবান!

—না। চীৎকার করে উঠল বহুবল্লভ।

হাকিম বললেন—বেশ তো, কাগজ দেখান। লাখরাজ তার প্রমাণ তো দিতে হবে।

—এ্যাঁ?

কানের কাছে মুখ রেখে ছেলে বুঝিয়ে দিলে। তাতে পাল বললে—কখনও খাজনা আমি দিই নাই! কখুনও না! আমার বাবার আমল থেকে! হ্যাঁ!

উকীল বললেন—ভোগদখল সূত্রে নিষ্কর।

হেসে হাকিম বললেন—নিশ্চয় লিখব। তার সঙ্গে ধনেশ্বরবাবুদের আপত্তিও রেকর্ড করতে হবে আমাকে।

—ধনেশ্বরবাবু! আহা—হা! চীৎকার ক'রে উঠল বহুবল্লভ—রায়বংশের মুখ উজ্জ্বল করছে। বাহবা বাহবা!

ধনেশ্বর বললেন—বহুবল্লভ, তোমার ধন হয়েছে, ছেলে এম-এ পাস করেছে, না? তবুও কথাটা হিসেব ক'রে বলো। বুড়ো হাতী মরতে মরতেও সে হাতী! সেকাল হলে—।

বহুবল্লভের উকীল ছেলে বললে—ড্রোনস অব দি সোসাইটি। লজ্জাও নেই এদের!

প্রণবেশ্বরের মুখ লাল হয়ে উঠেছিল, সে বললে—এর মধ্যে ঝগড়ার তো কোন কারণ নেই। বহুবল্লভ যা বলেছে—

—প্লীজ সে বহুবল্লভবাবু! বললে উকীল ছেলে!

—বহুবল্লভবাবু?

—হ্যাঁ, না বললে উনিও নাম ধরে বলবেন!

—বেশ! যে যা বলছে তাই রেকর্ড করুন আপনি স্যার।

বহুবল্লভ তবু থামল না। সে হাউহাউ করে বললে—কীর্তিহাটে বসতবাড়ী আর গোচরের খাজনা মাফ ছিল। কখুনও জমিদার লেয় নাই, পেজাতে দেয় নাই। মাফ করেছিলেন সোমেশ্বর হুজুরের পিতা কুড়ারাম হুজুর। আজ পাঁচপুরুষ আমাকে নিয়ে ভোগ করে আসছি। ই আমাদের স্বত্ব হয়েছে। আজ লোব বললেই দোব আর জমিদার পাবে? এইটো হাকিমের বিচার?

হাকিম এবার নিজেই চীৎকার করে বললেন—বিচার আমি করব না। সে পরে হবে। আমি রেকর্ড করে যাব, যা প্রমাণ পাব সব।

হঠাৎ মনে পড়ে গেল আমার, স্থলতা, রায়বংশের পাঁচালী।

কীর্তিহাটে বাস্তু জমি গোধন চারণ ভূমি
মা কালী চরণে নমি দিলাম নিষ্কর
মাঠেতে পুকুর খুঁড়ি সিচ দিনু তিন গাড়ি
মৎস্য খাবে লোকে ধরি রুই কাৎলা পর।

আমি এগিয়ে গিয়ে বললাম—আমার কথাটা লিখে নিন।

—আপনার আবার ভিন্ন কথা আছে নাকি?

—আছে। ধনেশ্বর কাকা বোধহয় জানেন না। না-হলে আপত্তি দিতেন না। বহুবল্লভ

পাল যা বলেছেন তা সত্য। কীর্তিহাটে বাস্তুজমি গোচর নিষ্করই বটে। কুড়ারাম রায়-ভটচাজমশায় দিয়ে গেছেন। তার সঙ্গে মাঠের পুকুরের সিচ এবং রুই কাৎলা ছাড়া মাছও সাধারণ লোককে ধ'রে খেতে দিয়ে গেছেন।

—তার নজীর চাই হে। তার নজীর চাই।—গম্ভীর ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললেন ধনেশ্বরকাকা।

আমি বললাম—আছে নজীর। দেখাব। কুড়ারাম রায়-ভট্টাচার্য মহাশয়ের নিজের জীবনের পাঁচালী আমি পেয়েছি, আমি পড়েছি, আমি দেখাব।

সকলে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। সে স্তব্ধতা ভঙ্গ করে বৃদ্ধ বহুবল্লভ বার্ধক্যজড়িত কণ্ঠে প্রায় চীৎকার ক'রে বললে—পেনাম! পেনাম! তোমাকে পেনাম বাবু! কই তুমি কই! রাধা। বাবু কই? নিয়ে চল কাছে।

ছেলে হাত ধরে বৃদ্ধকে কাছে নিয়ে এল। সে আমার হাত ধরলে প্রথম। তারপর হেঁট হতে গেল, আমি বাধা দিলাম।

—না। বয়সে আপনি অনেক বড়।

—বয়সে বড়? তুলসীপাতা তুমি বাবু। নিখুঁত বেলপাতা। পোকালাগা চক্রলাগা পাতা ফেলে দিতে হয়। ওই ধনেশ্বরবাবুদের মত। তুমি নিখুঁত। মাথায় করতেই হবে গো। পেনাম না লাও, নমস্কার লাও। কই, মুখে একবার হাত বুলিয়ে দেখি!—হ্যাঁ। বটে। বেশ লম্বা গো। লাগাল পেতে বেঁকা কোমর সোজা করতে হয়। নাক টিকলো। চামড়া মাখনের মত। বা বা বা! গোটা গাঁয়ের লোক আশীর্বাদ করবে তোমাকে। তোমার ঠাকুরদাদার বাবা রায়-বাহাদুরকে দেখেছি আমি। ছেলে-মানুষে। ঠাকুরদাস পালের পেথম পক্ষ মারা গেলে আমার পিসীর সঙ্গে রায়বাহাদুর তার পেয়ারের ঠাকুরদাস পিসের বিয়ে দিয়েছিল গো। তিনি ছিলেন এক জবর লোক! তুমি তার বংশের ছেলে বট।

হয়তো কিছুটা নাটুকেপনা আমার মধ্যে আছে সুলতা। আমি ভেবে দেখছি। নইলে ওইভাবে রাত্রে চীৎপুরে দেহ-ব্যবসায়িনীদের দান করে রূপকথার রাজপুত্র সাজতে চাইব কেন? নাটুকেপনা বলতে পার আবার অভিজাতপনা বলতে পার। আবার রায়বংশের ধারাও বলতে পার। আমাকে সেদিন সেটেলমেণ্টের সাহেব ঠাট্টা করেছিল। আমি যে মাত্র ওই পাঁচালীর কথা বললাম এবং বললাম—ভোগদখলকারীদের লাখ্‌রাজ দাবীতে আমার আপত্তি নেই, অমনি তার ক্রিয়া একটা হয়েছিল। যেটার জন্যে বহুবল্লভ পাল প্রবল উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলে। যে কথার পিঠে বা জবাবে ধনেশ্বর-কাকার দল একেবারে চুপ ক'রে গেল—কোন কথা বলতে পারলে না। কিন্তু সায়েব কথা বললে—বেশ অ্যাক্টিং করার মত ভঙ্গি, প্রচ্ছন্ন শ্লেষ মিশিয়ে বলে উঠল—দেখুন—দেখুন আপনাদের জমিদার সাড়ে আট আনার মালিক—কি মহান্ সত্যবাদী দেখুন।

অভিনয় যখন অভিনয় বলে ধরা পড়ে তখন তার মত বিশ্রী এবং পীড়াদায়ক আর কিছু হয় না।

কজন মুখ টিপে হেসেছিল। এমন কি বহুবল্লভ পালের উকীল ছেলেটি পর্যন্ত। কিন্তু তাতে আমার গায়ে একটুও ছেঁকা লাগে নি।

আমি চলে এসেছিলাম। আমার নায়েবকে বলে এসেছিলাম—আমাদের নিজেদের বাড়ীর পটে এলে যেন আমাকে খবর দেওয়া হয়।

বাড়ী এসে একটা আশ্চর্য তৃপ্তির মধ্যে বসে আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। কলকাতার মাথায় আকাশ অবশ্যই আছে—কিন্তু সে আকাশ মানুষের চোখে বড় পড়ে না। আমি ঝড়ের আকাশ দেখতে ছাদে উঠতাম। রাত্রে নক্ষত্র দেখতে উঠতাম কিন্তু কখনও সাধারণ সময়ে খোলা আকাশের দিকে ভরপুর মন নিয়ে অন্যমনস্কভাবে তাকিয়ে থাকি নি। সেটা এখানে এসে আমাকে পেয়ে বসেছিল। এখানে আকাশের একটা রঙ আছে। ঋতুতে ঋতুতে পাল্টায়। সেদিন আকাশটা ছিল ঘষা কাঁচের মত। মানে ধুলো উঠেছিল বাতাসের স্তরে। তারই উপরে খাঁ-খাঁ-করা আকাশে একজোড়া বড় আকারের কালচে রঙের পাখী—দুটি ডানা স্থিরভাবে মেলে দিয়ে পাশাপাশি উড়ে আসছিল। পক্ষীমিথুন তাতে সন্দেহ নেই। কল্পনা করছিলাম—তোমাকে নিয়ে এই বিবিমহলে জীবনটা এইভাবে স্থির পাখা বিস্তার করে ভেসে থাকার মত কাটিয়ে দেব। জমিদারী, বিবিমহল, রায়বাড়ি এ-সবের উপর আমার আকর্ষণ তো ছিল না, সে তুমিই সাক্ষী দেবে, কিন্তু সেদিন ঘোর লেগেছিল। বহুবল্লভের প্রণামের অনেক দাম। ওর উকিল ছেলে আজ মুখ টিপে হাসলেও কাল আমার কাছে নত হবে। ওকেই না হয় এখানে ম্যানেজার রাখব। নতুন উকীলের আর কত উপার্জন, উকীল ম্যানেজারের একজন দরকার হবে।

পারমানেন্ট সেটেলমেণ্টের আগে থেকে জমি নিয়ে আইন বদলাতে বদলাতে উনিশশো পঁয়ত্রিশ সালে মহাভারত হয়ে উঠেছে। বেঙ্গল টেনেন্সী এ্যাক্টের আয়তন দেখলে চমকে উঠতে হয়। পঞ্চম আইন, ষষ্ঠ আইন, সপ্তম আইন, অষ্টম আইন এসব সেকালের। তখন প্রজাকে এনে আটক কয়েদ ক'রে খাজনা আদায় করতে পারত জমিদারেরা। তারপর মাঠে ধান ক্রোক করে আদায় করতে পারত খাজনা। সেই আমলে সোমেশ্বর রায় বীরেশ্বর রায় জমিদারী করে গেছেন। তারপর ওসব আইনের অষ্টম আইন বাদে সব উঠে গেছে। জমিদার-প্রজার মধ্যে সরকারের চোখে ভেদ নেই। এখন সব মুনফেসী সাবজজ কোর্টের এলাকার বিচারের মধ্যে গিয়ে পড়েছে। আদায়-তহশীল সেরেস্তা থেকে মামলা সেরেস্তা বড় হয়ে উঠেছে। এখন একজন উকীল রাখলে মন্দ হয় না। ভেবেছিলাম বিকেলে লোক পাঠাব।

হঠাৎ এরই মধ্যে কি ক'রে ঠাকুরদাস পাল উঁকি মেরে মুখ বাড়ালে বলতে পারব না। ঠাকুর-দাস পাল—বহুবল্লভের পিসেমশাই হত।

বহুবল্লভ তো বলতে পারবে ওই কথাটা! ঠিক করলাম নিজেই যাব বিকেলে বহুবল্লভ পালের কাছে।

দুপুরে মেজঠাকুমা এসেছিলেন—তাঁকে বললাম কথাটা। মেজঠাকুমা আশীর্বাদের ছলে অনেক গুণগানই বল আর বাস্তব গানই বল করতে করতে ঘরে ঢুকেছিলেন। তিনি বললেন—সারা-গ্রামে ধন্যি ধন্যি উঠেছে।

কথাটা চাপা দিয়ে আমি বহুবল্লভের ওখানে যাবার কথা বললাম। তিনি খুঁতখুঁত করলেন প্রথমটা। তারপর বললেন—তা যাস। শুনেছি আমার শ্বশুরের হুকুম ছিল আমায়

শাশুড়ীর উপর। বিকেলে তিনি বের হতেন ঝি আর চাকর নিয়ে। বিশেষ করে বাউড়ী বাগদী চুয়াড় পাড়ায় তিনি গিয়ে দেখতেন কার বাড়ীর চাল থেকে ধোঁয়া উঠছে কার উঠছে না। মানে কার রান্না চেপেছে কার চাপেনি। বাড়ী থেকে চাল যেত তাদের বাড়ী। ভদ্র শূদ্র গরীব কারুর অসুখ বেশী শুনলে খোদ কর্তা যেতেন দেখতে—চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে। তা যেতে পারিস। সঙ্গে লোক নিয়ে যাস।

মেজাজটা যাকে জমিদারী ভাষায় 'সরিফ্' বলে তাই হয়ে গেল। বিকেলে গেলাম বহুবল্লভের বাড়ী। সদ্‌গোপ পাড়া মাটির দেওয়াল—কোঠাবাড়ী খড়ের চাল ঘর। রাস্তা সঙ্কীর্ণ, একখানা গরুর গাড়ী যায়। বহুবল্লভের-ঘরের চালে টিন। পোঁতা বা ভিত বাঁধানো। বাড়ীর সামনেটার পাকা থামদেওয়া পাকা মেঝে। পাল চোখে অন্ধ হলেও শনের গোছা টানিয়ে ঢেঁড়ায় পাক দিয়ে দড়ি কাটছিল। তকলীতে সুতা কাটার মত। বসেছিল একখানা তক্তাপোশের উপর উপু হয়ে।

আমার সঙ্গে মানে পিছনে লোকও জুটেছিল—দুটো কুকুরও চেঁচাচ্ছিল। আমি সামনে দাঁড়িয়ে বললাম—পালমশাই, আমি আপনার কাছে একবার এলাম!

দৃষ্টিহীন চোখ সামনে তুলে পাল বললে—কে? তারপর আমার কাপড়জামা এবং ল্যাভেণ্ডার সাবানের গন্ধ শুঁকে বললে—হাকিম মশায়—

—না। আমি সুরেশ্বর রায়।

—আঁ! চমকে উঠল পাল। তারপর চীৎকার করে বললে—ওরে রাধা! ওরে অ রাধা! গেলি কোথা রে বাপু?

আর একজন প্রবীণ এসে দাঁড়াল এবং নমস্কার করে আমাকে আহ্বান ক'রে বললে—আসুন আসুন। বলে ঘর থেকে দেশী ছুতোরের হাতে শালকাঠের তৈরী ভারী চেয়ার এনে পেতে দিয়ে বললে—বসুন।

পাল বললে—কে? বেজো না কে?

—হ্যাঁ।

—রাধা কোথা? রাধা?

—সে হাকিমের কাছে গিয়েছে।

—হাকিমের কাছে? কচু-পোড়া খেয়েছে—নিকাপড়া শিখে উকীল হবে! হাকিম ছাড়া আর চিনলে না কিছু। বসুন বসুন বাবা, বসুন। আজ সমস্তদিন তোমার নাম করেছি গো!

—আমি একটা কথা জানতে এসেছি আপনার কাছে।

—ওই আমবাগানটার আর পুকুরটার কথা। ওটোতে বাবা কিছু গোল আমাদের আছে। ওটো রায়বাহাদুর আমাদিগে দানটান করেন নাই। যখন আমার পিসীর বিয়ে হয় উনিই খুব ধ'রে পড়ে বিয়ে দেয়ায়েছিলেন। পিসী আমার ডাগর হয়েছিল। বারো বছর বয়স্কম হয়েছিল। তা তখন পিসের বয়স আমার, তা—পঁয়তিরিশ হবে বইকি! একটুকুন বেমানান হয়েছিল তো!—তা আমার ঠাকুরবাবা—রায়বাহাদুরদের কথা মেনে

বিয়ে দিয়েছিল। তাখন ওই বাগান আর মণ্ডল পুকুর ঠাকুরবাবাকে ভোগ করতে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন—ভোগ কর্ তু। কিন্তু গাছ কাটতে পাবি না—, পুকুরের মাছ খাবি—কিন্তুক পুকুর বাগান বেচতে পাবি না। এই বিত্তান্ত বটে মশায়। দেখ বাবু, তুমি আজ এমুনি করে সত্যি কথা বললে—আমি মিছে কি ক'রে বলি?—

আমি বললাম—না, ওর জন্যে আমি আসিনি।

চোখ স্থির ক'রে পাল বললে—তবে?

—আমি কয়েকটা কথা জানতে এসেছি ঠাকুরদাস পাল সম্পর্কে।

—অঃ। তিনি মহাশয় লোক ছিলেন গো। যেমন গ্যাহ তেমনি ক্ষ্যামতা আর তেমুনি সাহস। দুদ্দান্ত সাহস—দুদ্দান্ত লোক। আপনকার ঠাকুরবাবার বাবা রায়বাহাদুরের চেলা গো! আর আরও ছিল—কমলদাদা অন্তপান। তোমার ঠাকুরবাবার বাবার পেথম নাম তো কমলাকান্ত। মামা পুষ্যি নিয়ে নাম দিলে রত্নেশ্বর। অঃ শুনেছি, আমরা তো তখন জন্মাই নাই। মামা ভাগ্নেতে সে ভয়ানক ঝগড়া। বলে—মামা গুলী করতে গিয়েছিল ভাগ্নেকে। সেই তো ঘরে আগুন লাগল পিসেদের গাঁয়ে। তাতে তোমার ঠাকুরবাবার বাবাকে বাঁচাতে ছুটল পিসে, বাঁচালে, ইদিকে পিসের প্রথম সংসার জলন্ত চাল চাপা পড়ল। আবার শেষটায় যে কি হল—

—কি হল—তাই জিজ্ঞাসা করতে এসেছি আপনাকে।

—সেটাতে পিসের দোষই বটে। বুয়েছেন—ঠিক কথাটি কেউ জানে না। সি কাক পক্ষীতেও না! তবে—দোষ পিসের বটে। ক্যানে বলছি—শোনেন। পিসের ছেলে আমাদেরই হামজুটি—এই বছর তিন চারের বড় হবে। সি থাকত কীর্তিহাটে। থাকত আপনকার ঠাকুরবাবা—দেবেশ্বর বাবুমহাশয়ের কাছে। হ্যাঁ, তিনি একটা বাবুমহাশয় বটে। চেহারায় যেমন কার্তিক। তেমুনি মেজাজ। ইংরিজী নেকাপড়াতে পণ্ডিত। বাঘ মারতে যেতেন। ঠোঁট বেঁকিয়ে একটা হাসি ছিল তার। সি মশায় ছুরির মতন। বুয়েছেন। আমার দাদা ঠাকুরদাস পিসের বড় বেটা তাঁর কাছেই থাকত। কলকাতা গেলেন বড়বাবু, সেও কলকাতা গেল। তাকেও পড়াতে চেয়েছিলেন রায়বাহাদুর। তা তার হল না। লেখাপড়া ছেড়ে ওই বড়বাবুর সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করত। শিকারে যেত। তা পরেতে দুম্মতি—গোয়ানপাড়ার পিদ্রু গোয়ানের বুন ছিল—তার নাম ছিল ভায়লা। মশায় সে এক মেয়ে বটে। যেমন রঙ তেমনি চেহারা। সি দেখেছি আমরা। তাকেই সে বার করে নিয়ে ভাগলো। এইতে পিদ্রু খুব খাপ্পা। একে গোয়ান তার ওপর ছিল মারহাট্টা গুণ্ডা ডাকাত। সে রায়বাহাদুরের কাছে লালিশ করলে। রায়বাহাদুর ঠাকুরদাস পিসেকে বললে—তোর ছেলেকে সাজা নিতে হবে। কি হল ঠাকুরদাস পিসের—সে বললে—সাজা কিসের? সে বেটাছেলে। মেয়েটার বিচার কর। দেখ সেই হারামজাদী আসলে দোষী। রায়বাহাদুর খুব ধমকালে। মশায়—সেদিন সেখানে সে ঘরে মাছি ঢুকবার হুকুম ছিল না। ছিল পিসে, পিদ্রু আর খোদ রায়-বাহাদুর নিজে। পিসের দুম্মতি—সে বললে—তা হলে আমিও সব ফাঁস করে দোব হ্যাঁ। কি ফাঁস করে দেবে, কি বিত্তান্ত তা কেউ জানে না মশায়, জানত পিসে, জানতেন রায়বাহাদুর।

তা লোকে অনুমান করে মশায় যে রায়বাহাদুরের সঙ্গে তার বুন মামলা করেছিলেন জানেন তো। মানে রায়বাহাদুর পুষ্যবেটা আর মেয়ে হল আসল। রায়বাহাদুর মামলা করেন নাই, টাকা দিয়ে মিটিয়েছিলেন। সেই তারই কোন গুহ্য কথা বোধহয় হবে। তাই ফাঁস করে দোব ব'লে পিসে বেরিয়ে এসে পিদ্রকে বললে—আয় শালা গোয়ান ওর বিচার রায়বাহাদুর করবে কিরে, তোতে আমাতে হোক। আয়। এই তখুনি রায়বাহাদুর ইশারা দিয়ে থাকবেন। তাই পিদ্র বেরিয়ে এল, দুজনে হাতাহাতি করতে করতে নদীর ঘাট পর্যন্ত গেল। ঘাটটার নাম গোঘাটা। মানে ওই গোচরের পাশে তো। যেটা নাখরাজ ছিল আপুনি স্বীকার করলেন। ওই ঘাটে গরুতে জল খেতো। এখন লোকে বলে গোঘাটা মানে গোয়ানঘাটা! পিসে যেছিল ওই গোয়ানপাড়াতেই। মেয়েগুলোর সঙ্গে ভজিয়ে দেবে ভায়লার দোষ। বলছিল সে তাই—আয় তোদের বিটী গোলার কাছে শোন কার দোষ। কিন্তু ওই ঘাটে গিয়েই পিদ্র একবারে এই এক হাত লম্বা ছোরা বার করে আচমকা দিলে বসিয়ে পিসের বুকে। অঃ সে ঘড়া ঘড়া রক্ত পড়েছিল!

একটু চুপ করে থেকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম—পিদ্রর মামলায় অনেক টাকা খরচ হয়েছিল—

—হ্যাঁ। বড় উকীল দিয়েছিল। রায়বাহাদুর দিয়েছিলেন, তাই গুজব মাশায়।

—কেন?

—ক্যানে? একটু চুপ করে থেকে পাল বললে—সঠিক বলতে তো পারব না। এতবড় নোকটা—ধার্মিক নোক—কীর্তিমান নোক—সন্দেহ করলে পাপ হয়। নোকে বলে—দোষ তো পিসের বেটার। পিদ্রর অপমান তো পিসের বেটাই করেছে। ঝোঁকের মাথায় করেছে। এই বলে দয়া হয়েছিল তার। আবার দুচারজন বলে মশায়, ওই যে পিসে বলেছিল, আমিও তাহ'লে ফাঁস করে দোব তাই জন্যে রায়বাহাদুর পিদ্রকে হুকুমই দিয়েছিলেন—দে সাফ করে!

কথাটা মনে লেগেছিল আমার স্থূলতা। এটাই সম্ভব। একটু চুপ করে থেকে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম—ঠাকুরদাস পালের কে আছে বংশে?

পাল বলেছিল—পিসের ছেলের ছেলের ছেলে, মানে ছেলের নাতি আছে। সে এখন মস্ত লোক, ব্যারেস্টার সাহেব। সে জাতকুল এখানকার সব ঘুচিয়ে মুছিয়ে সাহেবী কাণ্ড। পিসের ছেলে ভায়লাকে নিয়ে কলকাতা পালিয়েছিল। বাবা খুন হল, রায়বাহাদুরের ভয়ে এল না। পিসী ছাদ্দটাদ্দ করলে। উদিকে তোমার ঠাকুরবাবার কাছে টাকা কিছু নিয়ে সে কলকাতায় ব্যবসা করলে। ভায়লাকেও ছেড়ে দিলে। এখানে বিয়ে ক'রে গিয়েছিল, সে বউ লিলে না। বউটার ভাগ্যি ভাল মরেও গেল। ত্যাখন সে করলে কি, বেহ্ম হয়ে গেল মাশায়। তখন বেহ্ম হওয়ার খুব ধুম হল। বিয়ে করলে বেহ্ম বাড়ীতে। অবস্থা তখন ভাল করেছিল। তারপরেতে ভগবানের মার। ব্যবসা ফেল হ'ল। একবারে ফেল হল। ধাক্কাটা সইতে পারলে না। মরেও গেল। বউ ছেলে কোথায় যাবে, গেল বাপের বাড়ী। তারপরেতে ছেলে লেখাপড়া শিখে উকীল হল। লাতি বিলাত গেল। ব্যারেস্টার

হয়ে এল। মস্ত লোক এখন। তবে শুনেছি নাকি গুজব বটে মাশায়—ওই ছেলের সব খরচ মায় লাতির বেলাত যাবার খরচ সে সব রায়বাহাদুর দিয়েছিলেন। না হয় তোমার ঠাকুরবাবা মানে বড়বাবু দিয়েছিলেন। দেবেশ্বরবাবু মহাশয়। তারা আর এখন পাল লয়। ঘোষ হয়েছে। মিস্টার রমেশচন্দ্র ঘোষ ব্যারেস্টার!

আমি চমকে উঠলাম। স্থলতা, মনে হল কংসাবতীতে প্রলয় বন্যা এসেছে, সেই বন্যায় আমরা দুজনে দুদিকে ভেসে যাচ্ছি। তবুও মনে আশা করেছিলাম, ঐ রমেশ ঘোষ তোমার বাবা নন। কিন্তু সন্দেহ রইল না. পালের ছেলে উকীল ফিরে এসে যে ঠিকানাটা দিলে সেটা তোমাদেরই।

আবার আমি রায়বংশের অতীতের অন্ধকারের মধ্যে অন্ধের মত ছুটলাম, কোথায় আলো। কোথায় আলো বলে। আলোর বদলে আগুনের কুণ্ডতে প'ড়ে যদি ছাই হয়ে যাই তাও এ থেকে ভাল।

হঠাৎ দিন চারেক পর কৃষ্ণযবনিকা যেন তুলে দিলেন ভাগ্যবিধাতা। হঠাৎ এল ব্রজেশ্বর। মনে আছে ব্রজেশ্বরকে, যে আমার নামে পরিচয় দিয়ে যেতো আসতো শেফালির বাড়ীতে? যে আমাকে বলত রাজাভাই। সেই অতি মিষ্টমুখ, বাক্যবিদ্ সুন্দর চেহারা ব্রজেশ্বর। ধনেশ্বর-কাকার বড় ছেলে। যে অতিচতুর রায়বংশধরটি আমাকে মূর্খ প্রতিপন্ন করেছিল, সেই ব্রজেশ্বর? মনে আছে? হ্যাঁ, সেই হঠাৎ এল কীর্তিহাটে। তার আসার ভঙ্গিও বিচিত্র।

তখন আমি অন্ধকারে অন্ধের মত কাগজের স্তূপের মধ্যেই ডুবে আছি। কিন্তু সেটা বিষয় বা সম্পত্তির জন্য নয়! ওরা বাড়ীর স্বত্বে আপত্তি দিয়েছিল। বলেছিল, এ কারুর ব্যক্তিগত নয়। এ দেবোত্তর। এজমালী অবিভাজ্য।

আমি সেই খাতাখানা দেখিয়েছিলাম। দেবোত্তরের খাতায় ইটের পাঁজা অর্থাৎ ভাটা বিক্রয় দরুণ জমা। শ্রীল শ্রীযুক্তবাবু সোমেশ্বর রায় মহাশয়ের অন্দর মহল তৈয়ারীর জন্য দেবোত্তরের যে ইটের ভাটা হইতে ইট লয়েন তাহার মূল্যবাবদ জমা মাঃ শ্রীল শ্রীযুক্ত সোমেশ্বর রায় মহাশয়। টাকাটা সামান্য, সাড়ে তিনশো টাকা।

ওরা চমকে গেল। দেখলে। তারপর আর কথা বললে না, আপত্তিটাও তুললে না। বুঝলাম ব্যক্তিগত জমাখরচের খাতাখানা ওদের হাতেই আছে। কিন্তু এইভাবে ছোট একটা ইটের জমাখরচ দেবোত্তরের খাতায় লুকিয়ে বসে আছে তা অনুমান করতে পারেনি।

সম্পত্তির জন্য আমি খাতা ঘাঁটছিলাম না। ঘাঁটছিলাম ওই ঠাকুরদাস পালের খুনের অন্তরালে কোন্ অনুমানটি সত্য তাই আবিষ্কারের জন্য। ওই সামান্য কি বলেছিলেন ঠাকুরদাস পাল তার জন্য রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর তাঁকে খুন করালেন? রত্নেশ্বর রায়ের পাপপুণ্যে আমার কিছুই করবার নেই। ওর ভাগ বা উত্তরাধিকার নেই। উত্তরাধিকার থাকে বিষয়ের। তা আমি পেয়েছি। কিন্তু এ যে তাঁর পাপ, যদি এটা সত্য হয়, তাঁর পাপই হয়, তবে সেই পাপ যে প্রচ্ছন্ন কলির মত ছুরি বাড়িয়ে এগিয়ে আসছে তোমার এবং আমার মধ্যের বন্ধনটা কাটবার জন্যে। এ নিয়ে মনে মনে আমি তোমার সঙ্গে কথা বলেছি। তুমি যেন কেঁদেছ।

মুখ ফিরিয়ে বসেছ। তারপর বলেছ—এর পর আর হয় না তোমার সঙ্গে আমার বন্ধন। আমিও ভাবছি, ঠাকুরদাস পাল এমন কোন মর্মান্তিক কথা বলেছিল? সে কথা তিনি বলার পরই কি আমিই পারব তোমার সঙ্গে জীবন বাঁধতে? আমি পাগলের মত কাগজ ঘাঁটছিলাম। দেবতার ঘরের সিন্দুকের ভিতর থেকে কাপড়ের টুকরোয় বাঁধা অনেক চিঠি পেয়েছিলাম সোমেশ্বর রায়ের আমলের। বহু বিচিত্র চিঠি। কাত্যায়নী দেবীর আরও ক'খানা সেই ধরনের প্রেমপত্র ছিল, ল্যাণ্ড-হোল্ডারস অ্যাসোসিয়েসনের চিঠি, রেগুলেশনের নকল পেলাম। নানান জমিদারের চিঠি পেলাম। আর পেলাম রবিনসন নীলকুঠীর কুঠিয়ালসাহেবের একটি চিঠি। তার মধ্যে দেখলাম তিনি তাকে টাকা ধার দিয়েই ক্ষান্ত ছিলেন না, রবিনসনের ব্যবসায়ে জমিদার হিসেবে সাহায্য করেছেন প্রজাদের নীল বুনতে বাধ্য ক'রে, এবং আরও অনেক কিছু ক'রে। একখানা চিঠি ছিল বীরেশ্বর রায় সম্পর্কে। রবিনসন লিখেছে—'মিস্টার রায়বাবু, তোমার ছেলে বীরা এখানে বেশী থাকছে বলে তুমি মনে মনে ভয় পেয়েছ শুনলাম। রেভারেণ্ড হিল আমাকে বলেছেন। চিন্তা করো না। সে আমাদের ভালবাসে, আমার ছেলে জনি এবং মেয়ে মেরীর সঙ্গে তার খুব ভাব। আমরা তাকে ভালবাসি। দুর্দান্ত সাহসী ছেলে। তবে আমরা তাকে মুর্গী বীফ হ্যাম খাওয়াইয়া ক্রীশ্চান কখনই করিব না। মেরী ইংরেজ মেয়ে। সুতরাং চিন্তা করো না।"

বীরেশ্বর তখন ষোল বছরের।

আরও চিঠি পেয়েছিলাম—একখানা প্রিন্স দ্বারকানাথের। তিনি জানতে চেয়েছিলেন জমিদারী সম্পর্কে কতকগুলো তথ্য। সোমেশ্বর গ্রামে এসে শুধু জমিদারীর খাজনার সঙ্গেই নয় মাটির সঙ্গেও জড়িয়ে পড়েছিলেন বলে এসব তথ্য তাঁর নখদর্পণে ছিল।

আর একখানা চিঠিতে বর্ধমানের জাল প্রতাপচাঁদের কথা ছিল। দ্বারকানাথ লিখেছিলেন —শ্মশান হইতে পলায়ন করিয়াছে, মরাটা ভান, ইহা প্রায় আরব্য উপন্যাসের সিন্দুক ওড়ার মতই অবিশ্বাস্য। যাহা হউক সঠিক সকল ঘটনা না জানিয়া ইহাকে আমি সমর্থন অসমর্থন কিছুই করিতেছি না। অগ্রে জানিয়া যাহা সিদ্ধান্ত করিব, তদনুসারে কর্ম করিব। পরে এ বিষয়ে আপনাকে সমুদয় জ্ঞাত করাইব।

আর একখানা পত্রে ছিল—"আপনি গ্রামে বসিয়া পৌত্তলিকতা এবং তন্ত্রমন্ত্র ইত্যাদি বিকৃত আচার লইয়া আছেন ইহাতে আমার দুঃখ হয়। আপনি কলিকাতায় আসুন। মাননীয় শ্রীরামমোহন রায় মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করুন। আমি নিশ্চিত বলিতে পারি আপনার মতের পরিবর্তন হইবে। তাহা ছাড়া অর্থ লইয়া জমিদারী কেনায় আমাদিগকে ভুলাইয়া ইংরাজেরা ব্যবসা-বাণিজ্য সব হস্তগত করিয়া লইতেছে। বাণিজ্যই লক্ষ্মী। সুতরাং আমাদিগকে ব্যবসায়ের ক্ষেত্রেও অগ্রসর হইতে হইবে।"

এসব যখন পড়ছিলাম তখন মনের মধ্যে সেকালটা ভেসে উঠেছিল কিন্তু সে আমলের ইতিহাসকে জানার প্রলোভন আমার ছিল না।

আমি জানতে চাচ্ছিলাম ওই ঠাকুরদাস পাল আর রত্নেশ্বর রায়ের কথা। তাতেই আমি এমন মগ্ন হয়ে গেছি যে, শুধু অতীতই বা কেন, বর্তমান কালের আর কিছু মনে ছিল না

আমার। কলকাতা তুমি সব অনেক দূরে চলে যাচ্ছে যেন। আমি ১৯৩৬ সালের এপ্রিলের শেষে কীর্তিহাটে চোখ মেলে বহুবল্লভ পালের উকীল ছেলে, হাকিম হরেন ঘোষ, রায়বংশের ভাঙা কুঁজোদেহ ধনেশ্বর-কাকা, শিবু পণ্ডিতের আধুনিক সাহিত্যের আলোচনা, সুরেন দের কাছে সেকালের ছ আনা আট আনা মন ধানের দামের কথা, উরু ভটচাজের মুখে দানীবাবু গিরিশবাবুর বক্তৃতার কথা শুনতে শুনতেও রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায়ের আমলে বাস করছি, আর তাঁকেই জেরা করছি। বলুন—কি হয়েছিল বলুন।

এদিকে ওইদিনের ওই ঘটনার পর গ্রামটা গোটা যেন ছুটে আমার কাছে এগিয়ে এল। সে এক বিস্ময়কর ঘটনা মনে হল আমার। তিন চার বার এসেছি, বাবার শ্রাদ্ধে ক্রিয়াকর্মের সময় সকলকে মিষ্ট ভাষায় সবিনয়ে সম্ভাষণ করেছি, তারাও মিষ্ট কথা বলেছে, তুষ্ট হয়েছে বলে হেসেছে, কিন্তু তবু কাছে আসে নি। যা হয়েছে দূরে দূরে দাঁড়িয়েই হয়েছে। কিন্তু চারদিন আগের ঘটনাটির ফলে এমন একটা কিছু হয়ে গেল যাতে তারা একেবারে দরজা ঠেলে এসে ঘরে ঢুকে চেপে বসল। হেসে বললে—এলাম আমরা।

শুধু ভদ্রজনেই নয়; গ্রামের যাদের আমরা ব্রাত্য বলি তাদের দল এল নালিশ নিয়ে, বললে—আমাদের এইটে বিচার করে দ্যান।

বেশ মদ্যপান ক'রে আবেগবিভোর হয়ে এসে হাজির হল, বললে—লইলে আমরা আর কার কাছে যাব আজ্ঞে? বলে দ্যান!

ওদের প্রথম মামলা নিয়ে মনে হল খুনের মামলার রায় দিতে হবে। সে এক স্বামী-স্ত্রীর বিরোধ। বুড়ো হাটু বাউড়ী একটি যুবতী মেয়েকে সাঙা করেছিল। যুবতীটি ঘর করতে করতে একটি নব যুবকের সঙ্গে প্রেম করে। তা নিয়ে পাড়ায় হাঙ্গামা অনেক হয়। মারধরও হয়। অবশ্য মেয়েটাকে। এবং ছোঁড়াটাকে কানও মলতে হয়, কিন্তু শেষে মেয়েটা এর সর্বস্ব হরণ করে ছোঁড়াটাকে নিয়ে পাশের গাঁয়ে পালিয়ে গেছে। সেও কীর্তিহাটের সামিল আমাদেরই জমিদারী। মেয়েটা মরিয়া হয়ে আমার সামনেই ঘোমটা খুলে বললে—আমি যাব নি। খাব নি, উর ভাত খাব নি। বুড়ো মড়ার গায়ের গন্ধে আমার ঘুম হয় না!

আমি বিচার করে দিলাম—মেয়েটা যা টাকা গয়না ঝসন নিয়ে এসেছে তা ফেরত দিতে হবে। আর ও ওই যাকে বরণ করেছে তার কাছেই থাকবে।

সাধুবাদ পড়ে গিয়েছিল। মেনে নিয়েছিল তারা।

এমনি আর একটা নালিশ সেদিন এসেছিল, গোয়ানপাড়ার নালিশ। মেয়েরা ছিল না। ছিল পুরুষরা। নালিশটা এই—হুজুর মালেক, তোমার জমিনে হামি লোক বাস করি। লেকিন সিটিলমেণ্টে গীর্জের মালিক কেনো হলদী বুড়া হোবে। যে মুখপাত্র হয়ে এসেছিল সে নতুন লোক, তাকে দেখি নি। তাকে দেখে মনে হয় না সে মানুষ অন্ততঃ গোয়ানপাড়ার মানুষ! সে যেন এক গল্পলোক বা স্বপ্নলোকের মানুষ! লোকটার দিকে চেয়ে ছিলাম। হঠাৎ রায়বাড়ীতে শাঁখ বাজল। উলু পড়ল। কিছু বুঝলাম না। লোকটার দিকেই দৃষ্টি ফেরালাম। এমন সময় কে যেন ছুটে এল, গোয়ানদেরই ছেলে। সাদা ক'রে বহু নিয়ে আইলো বড়কা বাবুর বড়কা ছেলিয়া। বিরজাবাবু। এই মস্ত বহু। বহুত ফেশন খবসুরত

ভি। আর বিরজাবাবু বঁটিয়া পোশাক পিহিনকে আইলো। বহুৎ বড়া আদমী হইয়াছে। বড়া নোকরী মিলল উনকে। বাপরে—বাপরে—ক্যা কায়দা!

ওদের আর নালিশ করা হল না। ছুটে সব একসঙ্গে চলে গেল। এ লোকটাও চলে গেল।

চুপ করে বসে ছিলাম কিন্তু মনটা চঞ্চল এবং ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। বুঝেছিলাম ব্রজেশ্বর ফিরেছেন এতদিন নিরুদ্দেশের পর কোন এক হতভাগিনীর মস্তক ভক্ষণ ক'রে। কিন্তু বড় চাকরী পেয়েছে বড়লোক হয়েছে সেটা খুব মাথায় এল না। কোন ধনবানকে ঠকিয়ে তার একমাত্র কন্যাকে বিয়ে করে অদৃষ্ট ফিরলে বিস্ময়ের কিছু থাকত না। এ চাকরী!

আজ মেজদি পর্যন্ত আসেন নি! মনটা বিষণ্ণ হয়ে গেল। বোধহয় ওই বধূটির জন্য। রঘুকে বললাম—বেহালাটা দে।

বেহালাটা নিয়ে বাজাতে গিয়ে একখানা ফটোর দিকে চোখ পড়ল। পুরনো ফটোগ্রাফ, ফেড হয়ে গেছে। রায়বাহাদুর রায়বাহাদুর হয়েছিলেন ১৮৮২ সালে, সেই সময়ের চোগা চাপকান পাগড়ি পরা ফটো, হাতে সনদ। বলতে ভুলেছি, সেকালের কতকগুলো ফটো কাছারীতে পড়ে ছিল, কাঁচ ভেঙে, ফ্রেম ভেঙে, সেগুলো আমি নিয়ে এসেছিলাম। রায়-বাহাদুরকে বললাম—

—তোমার একেবারে মুছে যাওয়া উচিত ছিল।

রঘু এসে ডাকলে—মেজঠাকুরমা আসলেন!

—ডাক এইখানে! নিচে যে ঘরটায় এখন বাইরে লোকজন বসে সেইখানে বসেছিলাম। মেজদি এখানে না-আসা নন। কেউ না থাকলে আসেন।

রঘু বললে—আরও মাইয়াছেলিয়া আছে।

—আরও মেয়েছেলে?

—নতুন বহু লিয়ে আসছেন।

—অ। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেই উঠে গেলাম।

মেজদি আমাকে দেখেই বললেন—দেখ ভাই নাতি, ব্রজ কেমন বউ এনেছে। তুই এইবার বিয়ে কর ভাই। নাতবউ, এই হল সুরেশ্বর, তোমার দেওর। আর আমার চুলের কালো রঙ। মুখের হাসি। অন্নদাতা। রায়বাড়ীর পঞ্চপিদীমের ঘিয়ের পিদীম।

আমি অবাক হয়ে গেলাম সুলতা! চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। এ কি বউ! এ যে পরমাসুন্দরী মেয়ে।

বউটিও অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে ছিল। সঙ্গে রায়বাড়ীর গণ্ডা দেড়েক আইবুড়ো মেয়ে। দেখতে তারা সুন্দরী। বিয়ের বয়স চারটের বেয়ে যাচ্ছে। তারা নতুন বিয়ে এবং নতুন বউয়ের রসে মগ্ন। গা-টেপাটেপি ক'রে হেসে যাচ্ছে।

আমি বললাম—নমস্কার!

মেয়েটিও বললে—নমস্কার।

বললাম—বসুন! তোরা ব'সরে! মেজদি, এদের সব জলটল খেতে দাও!

আইবুড়ো মেয়েদের মধ্যে সব থেকে বড় জগদীশ্বর-কাকার মেয়ে অর্চনা, সে বললে —জল তো শুধু খাব না। তোমার বাজনা শুনব। ব্রজদা বললে, বউ গান জানে। তুমি বাজাও বউ গান করবে।

অবাক লাগল, প্রমত্ত নটরাজ জগদীশ্বর-কাকার মেয়েটি এমন!

মেজদি বললে—আর তুই নাচবি!

—সে আমি কেন? তুমি নাচবে!

—কেন লা। আমি নাচব কেন? বিয়ে বিয়ে ক'রে ক্ষেপেছিস্, দাদার সামনে ধেই ধেই করে নাচ। দাদা তা হলে বিয়ে দিয়ে দেবে। গতি হবে একটা!

এরই মধ্যে ডাক শোনা গেল—ভাই রাজাবাহাদুর! কই, কোথায়? ওরে বাপরে! করেছে কি তুমি রাজা, এ যে সত্যি সত্যি মহারাজা হয়ে বসে গেছ ভাইয়া!

এসে হাজির হল ব্রজেশ্বর। সেই হাসিমুখ, এতটুকু অপ্রতিভতার চিহ্ন নেই। পরনে স্যুট। চমৎকার চেহারা হয়েছে। দেহের শীর্ণতা আর নেই। এসেই হাতখানা চেপে ধরলে। আমি স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম। একটু একটু করে সে বিবর্ণ হতে লাগল। হঠাৎ আমাকে টেনে বললে—একটু এখন তাড়াতাড়ি আছে ভাই। পরে আসব। একটা কথা বলে যাই।

ব্রজেশ্বরের হাত ধরে আমিই টানলাম। বললাম—মেজদি, তুমি এদের খাওয়াও। আমি ব্রজদার সঙ্গে কথা বলি।

ওকে টেনে একবারে নিরিবিলি ঘরে নিয়ে গিয়ে বললাম—কি ব্যাপার?

হেসে বললে—অনেক ব্যাপার রাজা। শেফালির ব্যাপারটার জন্যে তোমার কাছে আমার অনেক লজ্জা। মাফি মাংছি ভাই। মাফি কিয়া যায় রাজা! উ ভাই হামার কসুর হুয়া। স্রেফ নেশার ঝোঁকে বলে ফেললাম আমি সুরেশ্বর রায়। ট্যাক্সিতে চাপিয়ে জানবাজারের বাড়ীর কাছে গাড়ী দাঁড় করিয়ে, বাড়ীর দরজায় আজেবাজে কথা বলে ওদের কাছে খাতিরটা জমিয়েছিলাম ব্রাদার। ঝোঁকে পড়ে গেলাম। জ্ঞান ছিল না। হিহি করে হেসে বললে—জ্ঞান কোনকালে নেই। করি কি বল! রায়বাড়ীর নামটা আর ওই দালানটা ছেলেবেলা থেকে মাথা খেয়েছে। শেফালিকে বললাম বাঁধা রাখব। বাড়ী ভাড়া করলাম। টাকা তুমি একশো টাকা দিয়েছিলে, আর মাড়োয়ারীর বাড়ী হচ্ছিল, লোহার কড়ি ছিল, তাই দুখানা বেচে টাকা প্রথমটা জুগিয়েছিলাম। ইটও কিছু বেচেছিলাম। শেষে দেখলাম ধরা পড়ব। ভেগে গেলাম রাজা। তোমার কাছে আসতে সাহস হল না, লজ্জাও হল। শেষ বুদ্ধি মাথায় খেলল। ঘুরছি চৌরঙ্গী ধ'রে। তোমার বাড়ী যাব বলে যেতে না পেরে দক্ষিণ-মুখো হাঁটা দিয়েছি। কাবলী ছোলাভাজা পকেটে, চিবুচ্ছি। হঠাৎ দেখলাম মহারাজা অজিতেশ্বর প্রসাদের বন্ধ ফটকটা খোলা, দরজা দিয়ে তিনখানা মোটর বেরিয়ে গেল। ফটকের সেন্ট্রিটা খট ক'রে পা ঠুকে সেলাম করলে। বুঝলাম রাজাসাহেব এসেছেন—ওঃ, মনে হল, সা—লা, রাজা যদি একটা হ'তাম এমনি। গাছতলায় বসে থাকতে থাকতে ফন্দি এল মাথায়। মাথায় ধুলো মাখলাম, কাপড়টা খানিকটা ছিঁড়লাম। জামাটার পকেটটা ছিঁড়লাম। বসেই রইলাম, পথের দিকে তাকিয়ে। এক সময় দেখলাম রাজার গাড়ী ফিরছে। গিয়ে ফটকের

সামনে দাঁড়ালাম। গাড়ী ভেতরে ঢুকল। আমি হেঁট হয়ে নমস্কার করলাম। গাড়ী ঢুকে গেল। আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। সে বিকেল পর্যন্ত। আবার গাড়ী বের হল। ফের নমস্কার। গাড়ী চলে গেল। সন্ধ্যের সময় ফিরল। তখনও দাঁড়িয়ে, তখনও নমস্কার। দাও ভাই, তোমার ভাল সিগারেট দাও।

আমি অবাক হয়ে শুনছিলাম। সিগারেট ধরিয়ে ব্রজেশ্বর বললে, এ ফন্দি আমাকে সুখেশ্বর-কাকা শিখিয়েছিল। মধ্যে মধ্যে পত্র লিখত বড় বড় রাজাকে। লিখত—আমি রাজবংশের ছেলে, আজ নিঃস্ব, চাকরী করতে পারি না, লেখাপড়া শিখি নি। বড় দুঃখে আছি। সাধারণের কাছে হাত পাততে পারি নে। একটা সংস্কৃত শ্লোক লিখত "যাচনা মোঘা বরম অধি গুনে নাধমে লব্ধকামাঃ।" টাকা আসত কিছু কিছু। সেই ফন্দি মাথায় গজিয়েছিল। যাক, সন্ধ্যের সময় বারবার তিনবার আমাকে দেখে রাজাসাহেব জিজ্ঞাসা করে পাঠালেন, কি চাই? বললাম—কাগজ দাও লিখে দি। লিখে দিলাম—"প্রিন্স অব কীর্তিহাট স্টেট, ওয়াণ্টস টু টেল হিজ পেথেটিক স্টোরি।"

বাস, ডাক এল। গেলাম।—ওই বললাম—আমি কীর্তিহাটের প্রিন্স, আমরা সিন্স দি টাইম অব আকবর শাহ প্রিন্স। ইংরেজ টাইমে আমাদের উপর অনেক অত্যাচার হয়েছে। আজ গরীব। কিন্তু ইওয়োর হাইনেস, শান্তিপুরের ধুতি ছাড়া পরতে পারি না, সিল্কের জামা ছাড়া গায়ে দিতে পারি না। স্কিন ছড়ে যায়। আজ আপনি যদি সাহায্য না করেন তবে মরে যাব।

রাজা বললেন,, তোমার চেহারা দেখে বুঝতে পারছি তুমি ঝুটা বাত বল নি। কিন্তু কিছু টাকায় তোমার কি হবে? চাকরী কর। বললাম—ইওয়োর হাইনেস, লেখাপড়া জানি না। বাধা দিয়ে রাজা বললেন, কিছু দরকার নেই, তোমার সহবৎ আছে, ইউ নো ম্যানারস। তুমি আমার ছেলের একজন এডিকং হয়ে থাকবে। মাইনে পাবে। তুমি বিয়ে করেছ। বুঝলাম বিয়ে হওয়া-না-হওয়ার উপর মাইনে নির্ভর করছে। বললাম, করেছি। মাইনে হল দেড়শো টাকা। ফ্রি কোয়ার্টার। এবং পোশাক সুট তাছাড়া চুস্ত পাজামা শেরওয়ানী তাও পাব।

চলে গেলাম সেখানে। মাস কয়েক পর রাজা ধরলেন, ক্যা মতলব? তুমি বহু আন না, রূপেয়া ভেজো না। ক্যা মতলব? বললাম—হুজুর, বউ শ্বশুরবাড়ীতে আছে, যাব আর নিয়ে আসব।

ভেবেছিলাম রাজা, পালিয়ে এসে আর যাব না। মানে বউ কোথা পাব? কলকাতায় এসে কিন্তু বউ পেয়ে গেলাম। হঠাৎ দেখা হয়ে গেল এক পুরনো বন্ধুর সঙ্গে। এক নারী-কল্যাণ আশ্রমের পাণ্ডার সঙ্গে। চাঁদা তুলে আশ্রম চালায়, বড় বড় ধনী লোক চাঁদা দেয়। অনাথা বিধবা কলঙ্কিনী কুমারী এইসব মেয়েদের আশ্রয় দেয়। খেতে পরতে দেয়। বিয়ে দিয়ে দেয়। আবার পেট্রনদের মনোরঞ্জনের জন্যেও এদের কাজে লাগায়। মেয়েগুলো বলতে গেলে কয়েদীর মত থাকে। দু-চারটে ভাল আশ্রম আছে। সে বললে—তার জন্যে ভাবনা কি। বউ দিতে পারি। এস। তুমি বন্ধু লোক। একটি মেয়ে আছে বুঝেছ, খুব

সুন্দরী, বয়স একটু হয়েছে, বিধবা। দেওর অত্যাচার করেছিল। মেয়েটা চীৎকার করে লোক-জানাজানি করে। কেসে দেওরের কনভিকশন হয়ে গেছে। কিন্তু শ্বশুরবাড়ীতে স্থানও গেছে। কোর্ট থেকেই নিয়ে এসেছি। কিন্তু নানা ঝঞ্ঝাট ওকে নিয়ে। বিদেয় করতে চাই। দেখ, বিয়ে দিতে পারি। দেখলাম, বয়স আমার সমান হবে হয়তো। তাতে আমার কিছু যায় আসে না। বিয়ে ক'রে ফেলেছি। ওখানে নিয়ে যাবার সময় সব বলেছিলাম। সরমা ভাল মেয়ে। কিন্তু ওর সন্দেহ এখনও আছে আমি ফেলে পালাব। তাই এবার কুমার-বাহাদুরের কাজে কলকাতা এসেছি, কুকুর কিনতে হবে। একজোড়া ফার্স্টক্লাস অ্যালসেসিয়ান চাই। আমার উপর ভার পড়ল। ও আমার সঙ্গ ছাড়ল না। বললে—সঙ্গে যাব আমি। আর ছুটি নাও, তোমার দেশে গিয়ে তোমার বাবা-মাকে প্রণাম করে আসব। ভাল লাগল। মনে একটা বাসনাও ছিল একবার সেজেগুজে কীর্তিহাটে আসব। আমার এখানকার পজিশনটা দেখাব। বেশী দেখাবার ইচ্ছে ছিল সুখেশ্বর-কাকাকে। জান রাজা, এই লোকটিকে মেরে আমার ভাইটা পাগলা গারদে গেছে তাতে আমার একবিন্দু দুঃখ নেই। আমার বাবা মাতাল বজ্জাত গোঁয়ার সব। কিন্তু সুখেশ্বর-কাকা ছিল স্নেক—পাইথন অজগর! বাবারে বাপরে! তা সে নেই কিন্তু তার ছেলেরা আছে। তারা দেখুক। এখানে এসে শুনলাম তুমি আছ রাজা। আর যা করেছ না তা রাজার মতই করেছ। লোকে ধন্য ধন্য করছে।

সিগারেটটা ফেলে দিয়ে বললে—দেখ, আমি লেখাপড়া শিখিনি, আমার অভাবে স্বভাব নষ্ট হয়েছে, মিথ্যে বলি হরদম, তোমার অনেক আছে, তোমাকে হিংসেও করতাম। তা এখনও করি। মাঝে মাঝে করি। সব সময় করি না। বিলিভ মি। আবার ভালও বাসি। আমি শেফালির ওখানেও গিয়েছিলাম। এবার না। এর আগের বার কুমার সাহেবের সঙ্গে চারদিনের জন্যে এসেছিলাম। সেই সময়। শেফালি খ্যাংড়া নিয়ে তেড়ে এল। আমাকে তো জান। আমি মানাতে জানি। বললাম, তাই মার। পিঠ পেতে দিচ্ছি তারপর বসে একটু পান টান করে কিছু টাকা দিয়ে বললাম—দেখ আমি যাই হই বেইমান নই। না হলে আসতাম না। আর বড়বংশের ছেলেও বটে। তখন ও তোমার কথা বললে। বললে, হ্যাঁ ওই একটা মানুষ বটে! বললে সব কথা। আমি রাজাভাই, পাপী মানুষ, আমি ব্রজেশ্বর, কিছুদিনের মধ্যেই ওখানে ঘুন হয়েছিলাম। সন্দেহ হল কোনখানে নিশ্চয় ঢুকেছ। পথে ঘুরে বেড়িয়েই তো প্রথম সাহস সঞ্চয় হয়। প্রথম কলকাতায় গিয়ে চীৎপুরের ট্রামে ঘুরতাম। সন্ধ্যে থেকে দশটা পর্যন্ত। তারপর পায়ে হেঁটে। তারপর সুড়সুড় করে মুড়ি দিয়ে ঢুকলাম। তারপর হাঁক ডাক মেরে। কিন্তু দেখলাম রাজার ছেলে এসেছিল দুঃখীর দুঃখে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে, রাজার ছেলের মতই ফিরে গেছে। ঢোকে নি কোথাও। সেলাম দিলাম। কুর্নিশ!

আমি অবাক হয়ে শুনলাম। বিচিত্র চরিত্র এই মিষ্টমধুর পাষণ্ডটিকে কি বলব খুঁজে পেলাম না।

ব্রজেশ্বর বললে—কিছু বল রাজাভাই। আমি ভাই অকপটে সব বলেছি তোমাকে, দিব্যি গেলে বলতে পারি, একটি মিথ্যে বলিনি।

বললাম—কি বলব ভাই ভাবছি। বলবার কিছু পাচ্ছিনে ব্রজদা।

—ব্রজদা না বলে প্রজাদা বলো। তুমি রাজা। কিন্তু শুনলাম মদ খাচ্ছ!

—তা খাচ্ছি।

—অবাক বলতে হবে। মদ খেয়েও তুমি—। মুখের দিকে তাকাল।

জিজ্ঞাসা করলাম—কি?

ব্রজেশ্বর বললে—আমি খবর সব নিয়েছি। মদ খেয়েও তোমার মন ওদিকে ছোটে না?

—কোন্ দিকে?

—কোন্ দিকে আবার? শিব ছুটেছিল মোহিনীর পেছনে। এখানে পটোরা গান গায়—শিব বাঙ্গিনীর পিছনে বাঙ্গীপাড়ায় ঘুরত। ব্রহ্মা মদ খেয়ে নিজের কন্যা সন্ধ্যার দিকে তাকিয়েছিল। মানুষের কথা বাদই দাও। মদ খাও, খেয়ে মন ছোটে না? এখানে এমন সোনার চাঁদ গোয়ানপাড়া—ছুঁড়িদের যেমন দেহ, তেমনি রঙ্গ। ওরা একসঙ্গে মেমসাব, আবার দণ্ডকারণ্যের শবরী! তুমি এখানে মদ খেয়ে, ছবি এঁকে, বেয়ালা বাজিয়ে কাটিয়ে দিলে!

চুপ করে রইলাম। মনে মনে যাচাই করছিলাম সুলতা। ব্রজেশ্বর পাষণ্ড হোক, মূর্খ হোক, যা-হোক, কথায়বার্তায় রস রসিকতা যারই ফোয়ারা ছুটিয়ে থাক, তার মধ্যে দুপুরের রৌদ্রের মত একেবারে সাদা এবং প্রখর উত্তাপের মত সত্যের বাতাবরণ সৃষ্টি করেছিল। আবহাওয়া কথাটা বলব না, খাপ খাবে না এখানে। ব্রজেশ্বরকে মিথ্যে বলতে ইচ্ছে হয় নি।

—প্রিন্স ব্রাদার!

—ভাবছি ব্রজেশ্বরদা। না-ভেবে তো বলা ঠিক হবে না।

—জান? কেন জিজ্ঞেস করছি জান?

—কেন?

—দেখ, সুখেশ্বর-কাকা একেবারে 'ঔরংজেব' ছিল। সে যদি ভাই অমনি বাদশাহীর আসরে প্রিন্স হয়ে জন্মাত, তবে ঠিক ওই খেল খেলত। ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট ছিল—ঠিকেদারীও করত, আমাকে নিয়ে আমার বেনামে ঠিকেদারী চালাত। বলেছি তো—নেটিভ স্টেশনে পর্যন্ত চিঠি লিখত কায়দা করে—তাতে মধ্যে-মাঝে বিশ-পঞ্চাশ-একশোও এসেছে। রায়বাড়ির সম্পত্তি, দাদুর মত ধুরন্ধর, তার কাছ থেকেও বেনামে বন্দোবস্ত নিয়েছে। আমি জানতাম বলে কিছু কিছু টাকার ভাগ আমাকে দিত। কিন্তু তার চেয়েও বড় কাণ্ড করেছিল—রায়বাড়ীর সব মোক্ষম দলিল-কাগজপত্র হাতিয়ে রেখেছিল। দাদু যে

দাদু, সেও জানতে পারে নি। তিনি সেরেস্তা থেকে অনেক কাগজ-খাতা সরিয়ে রেখেছিলেন। তিনি ঠাকুরের সিন্দুক থেকে গহনা বের করে গালিয়ে বিক্রি করলেন। জমা-খরচের জোচ্চুরিতে মারলেন। কিন্তু সুখেশ্বর-কাকা সেই সময় সরালেন রাজরাজেশ্বরের মুকুট থেকে পাথর আর সরালেন কখানা দলিল, কখানা বাঁধানো খাতা। একখানা খাতা ইংরিজীতে লেখা—বীরেশ্বর রায়ের ডায়েরীগোছের। আর একখানা রায়বাহাদুরের ডায়েরী। বুঝেছ।

—সে-খাতা কোথায়? সোজা হয়ে বসেছিলাম আমি।

—সুখেশ্বরকাকা একটা শক্ত ট্রাঙ্কে ভরে রেখেছিলেন নিজের শোবার ঘরে—মাথার শিয়রে। মধ্যে মধ্যে বলতেন, এই তোমাদের মানে তোমার বাবার সম্পর্কে; বলতেন, ভারী হিংসে ছিল তাঁর। যোগেশ্বরদার ও হতেই হবে। যজ্ঞেশ্বরদার হবে দেখবি। তোমার মা যখন যজ্ঞেশ্বরজেঠার দেবোত্তর পত্তনী নিলেন, বাড়ী কিনলেন, তখন বলেছিলেন, বাবা মরুক, তারপর পাশা উল্টে দেব আমি। মোক্ষম অস্ত্র আমার কাছে আছে।

অধীর হয়ে উঠেছিলাম আমি, বলেছিলাম,—আমি টাকা দেব ব্রজদা, তুমি দিতে পার সুখেশ্বর-কাকার ছেলেদের কাছ থেকে এনে ওই খাতা—

—সবুর রাজাভাই। সবুর কিজিয়ে। উ বিলকুল দপ্তর হামারা পাশ হ্যায়। গোপেশ্বর যেদিন খুন করলে মেজকা'কে, তার দিনতিনেক পর ঠিকেদারীর বিল করবার জন্যে খাতা বার করতে গিয়ে সেই ট্রাঙ্ক আমি খুলেছিলাম। এবং সেই সময় কি মনে হল, ওই দপ্তরটি আমি বের করে নিয়েছিলাম। সে আমি কিছু পড়েছিলাম। ইংরেজী লেখা, সেই কতকালের লেখা পড়তে পারি নি আমি, কিন্তু রায়বাহাদুরের ডায়েরী আমি পড়েছি। ডায়েরী খুব সংক্ষেপ বটে। তবে তার মধ্যে মাঝে মাঝে বড় বড় লেখা আছে। মানে দিল খুলে লিখেছেন। অনেক বড় বড় কথা। ভাল ভাল কথা তাতে আছে।—মধ্যে মধ্যে এমন চিত্তচাঞ্চল্য হয়, কামার্ত হইয়া উঠি, তখন দিগ্‌বিদিক জ্ঞানগম্য সব তিরোহিত হইয়া যায়। মন বলে, তুমি ধনী জমিদার-পুত্র, তুমি পৃথিবীতে আসিয়াছ ভোগ করিতে। না করিলে তুমি মূর্খ। তোমার অধিকারের মধ্যে সবই তো তোমার। ইচ্ছা করিলেই পাইতে পার। কেন মিথ্যা মূর্খের মত সংযম করিয়া নিজেকে পীড়া দিতেছ? মধ্যে মধ্যে এমন চিত্তচাঞ্চল্য ঘটে যে, নিজেকে স্থির রাখিতে পারা সুকঠিন হইয়া ওঠে। দুরন্ত ক্রোধ হয় সবকিছুর উপর। ইষ্ট-নাম করিতেছি। তাহাতেই বা শান্তি কোথায়? আজ স্ত্রীকে, সকলকে তিরস্কার করি। কাছারীতে উগ্র হইয়া থাকি। দেহধারণের একি পাপ, একি শাস্তি!

ব্রাদার, সে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। আমি যে আমি, আমার ভয় লেগেছিল পড়তে! কিন্তু কথাগুলো তো সত্যি। নিজেকে খতিয়ে দেখেছি। তফাৎ—তিনি ছুটতেন না, আমি ছুটি পিছনে পিছনে। গালও খেয়েছি কত মেয়ের কাছে—। তা তোমার—

—আমার ভয় লাগে ব্রজেশ্বরদা, আমার ভয় লাগে। বাবার সব কথা মনে পড়ে যায়। মায়ের মুখ মনে পড়ে। কেমন একটা দুরন্ত ভয় লাগে আমার। নিজেকে শান্ত করি কি করে জান? শান্ত করি, যাকে ভাল লাগে, তার ছবি আঁকি। ছবিতে তাকে অন্যে চিনতে পারে না, আমি পারি।

—রাজা! মুখের দিকে তাকিয়ে রইল ব্রজেশ্বর। তারপর বললে, বুঝতে ঠিক না পারলেও, ঝাপসা ঝাপসা বুঝছি। তোমাকে সেলাম।

—কিন্তু সেই খাতাগুলো আমাকে দেবে ব্রজেশ্বরদা? বিশ্বাস কর, আমি কাউকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করতে সেগুলো ব্যবহার করব না।

—রাজাসাব, সে আমি জানি। খাতাগুলো আমি লুকিয়ে রেখে গেছি। জানি না উইয়ে খেয়েছে কিনা। যদি না খেয়ে থাকে, আমি দেব তোমাকে। দেব কেন? দিয়ে রেখেছি সুরেশ্বর। কলকাতা যাবার সময় সঙ্গে নিতে পারিনি ভয়ে। কোথায় যাবে। ওবাড়িতে রাখিনি। কে হাতাবে। এই বিবিমহলে—ওই কোণে একটা কুঠরী আছে। তাতে আছে সব ভাঙা ছবি, কাঠকাটরা; দেওয়ালে একটা খোলা আয়রণচেষ্ট গাঁথা ছিল—আমি তারই মধ্যে রেখে গেছি—ন্যাকড়াটার ওপর কালি দিয়ে লিখে দিয়েছিলাম—"রায়বাহাদুরের শ্রাদ্ধের ফর্দ" ইত্যাদি। সে কেউ নাড়ে নি বলেই আমার বিশ্বাস, যদি তুমি এবার এসে ফেলে না-দিয়ে থাক। ও-ঘরটায় বীরেশ্বর রায়ের বন্দুক-টোটা থাকত। দরজাটা খুব মজবুত। মদও থাকত। তারপর কাঠকাঠরা ঢুকেছিল বাড়ী যখন তোমার বাবা মেরামত করান তখন। তুমি ওটাকে সাফটাফ করাও নি তো?

—ভেবেছিলাম করাব। রঙ-তুলির ছবির আড্ডা করব। কিন্তু ছোট আর আলো কম বলে করি নি। কই চল, দেখ কোথায় রেখেছ?

—এখুনি?

—এখুনি।

বাধা পড়েছিল। অর্চনা আর মেজঠাকুমা এসে ঘরে ঢুকলেন। অর্চনা বললে—বাবাঃ বাবাঃ, দু' ভাইয়ে কি এত কথাবার্তা চলেছে গো, যার আর শেষ নেই? আমরা পিত্যেশ করে বসে থাকব কত?

মেজঠাকুমা বললেন—আমি বলি নি ভাই। অচি আমাকে সামনে করে এল। বলে, বান বিঁধলে তোমাকেই বিঁধবে। ব্রজকে ছেড়ে দাও ভাই সুরেশ্বর। বাড়ী থেকে ডাকতে এসেছে। বউয়ের ঘুম পেয়েছে। এতটা পথ এসেছে। আমরা আজ ওদের ফুলশয্যা করব। বুঝেছ। এখানে তো কিছু হয় নি।

—আর একটু, পাঁচ মিনিট দাঁড়াও, ঠাকুমা। পাঁচ মিনিট। তারপর না-হয় ব্রজদার ফুল-শয্যাতে আমি বাজাব, ব্রজদা গাইবে, সুন্দর গলা ওর। আর কে নাচবে তা ঠিক তোমরাই করে দেবে।

মনটা আমার সত্যই খুশি হয়ে উঠেছিল সেই মুহূর্তে। ব্রজেশ্বর যা দিয়েছে, তাতে আমার মন একেবারে ভরে গিয়েছে। অতীতকালেরই একটা মোহ আছে। রায়বাড়ীর অতীত কাল, সে আমার অতীতকাল; একান্তভাবে আপনার। যার মধ্যে সূত্র পাব, যা ধরে আমি কেন এমন হলাম, সেই সত্য জানতে পারব। আরও আকূতি ছিল, তোমার এবং আমার মধ্যে যে-ব্যবধান হঠাৎ আবিষ্কার করেছি, তা কি পূর্ণ করা যায় না। এর মূল্য তোমার কাছে কতটা মনে হচ্ছে জানি না—

* * *

দীর্ঘক্ষণ স্তব্ধ হয়ে শুনেই চলেছিল সুলতা, কোন কথা বলে নি। এক বিচিত্র সত্য অতীত-কালের মধ্য থেকে এসে সামনে দাঁড়িয়ে তাকেও অভিভূত করেছিল। তার অতীতপুরুষে ছিল এক ঠাকুরদাস পাল। রত্নেশ্বর রায়ের অনুগৃহীত জন। কেমন একটা অস্বস্তি তার মনে হচ্ছিল বইকি! সে রত্নেশ্বরকে রক্ষা করতে গিয়ে তার স্ত্রী-পুত্রকে বাঁচাতে পারে নি। তাকেই আবার রত্নেশ্বর খুব সম্ভবত পিদ্রু গোয়ানকে দিয়ে খুন করিয়েছিলেন। তাতে একটা ক্ষোভও হচ্ছিল তার। ওই অস্বস্তি এবং এই ক্ষোভ দুই মিলিয়ে একটা কি তৈরী হয়েছিল, তার মূল্য নিশ্চয় সে অনুভব করেছে।

এতক্ষণে সে সুরেশ্বরের কথার জবাবে বললে—মূল্য অনেক মনে হচ্ছে সুরেশ্বর। না-হলে এতকাল পরে সব সম্পর্ক চুকিয়ে দেবার পর তোমার এই ছবিগুলির সামনে নির্বাক হয়ে বসে তোমার কথা শুনছি কেন? বয়স অনেকটা হয়েছে। এইভাবে সারারাত্রি জেগে গল্প শোনার তো কথা নয়। বল তুমি। থেমো না। রাত্রি একটা পার হয়ে গেছে। বল।

ঢং করে ঘড়িতে একটা ঘণ্টা বাজল। সুলতা বললে, ক্লকটা ফাস্ট আছে, দেড়টা হয় নি এখনও। একটা বাইশ। বল।

ব্রজেশ্বর খুঁজে পেয়েছিল দপ্তরটা। আমি খুলে দেখেছিলাম তৎক্ষণাৎ। আমার হাত কাঁপছিল। কেন তা জানি না। বেশ ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছিল। ব্রজেশ্বর বলেছিল—রাজা, হল কি তোমার?

হেসে বলেছিলাম—জানি না।

সে বলেছিল—আমায় দাও। গিঁটটা অনেক দিনের। মজে গেছে।

সেও খুলেছিল অনেক কষ্টে। দু'খানা খাতাই ছিল তাতে। একখানা ডিমাই আট পেজী। চামড়ায় বাঁধানো ছিল। সেটা আমার হাতে দিয়ে বলেছিল—এইটেই ইংরেজীতে লেখা বীরেশ্বর রায়ের। আর এটা রত্নেশ্বর রায়ের। একেবারে পুরো ডিমাই সাইজের। সেটা বাংলায়।

এর মধ্যে এসেছিল অর্চনা।—হল তোমাদের?

ব্রজেশ্বর বলেছিল—হল।

—কটা বাজছে মনে আছে? এগারটা।

সুরেশ্বর সুলতাকে বললে, আজ দেড়টা বাজে। সেদিন এগারটা বাজছিল তখন। ও-ঘরে ক্লক-ঘড়িতে ঘণ্টা বাজা তখনও শেষ হয় নি।

ব্রজেশ্বরদা আমাকে বলেছিল—চল রাজা, তুমি আমার বাসী ফুলশয্যাতে বাজনা বাজাবে, এ আমার খুব ভাল লাগছে। তুমি বাজাবে, আমি গাইব। নাও, তোমার বেহালাটা নাও।

চুপি চুপি বলেছিল—একটু খেয়ে নেবে নাকি? রাত্রি হয়ে গেছে—।

—না। চল।

ব্রজেশ্বরদা সেদিন ভাল গান গেয়েছিল। তবলা বাজিয়েছিল ব্রজেশ্বরের সৎ-কাকা। মেজ-ঠাকুরদার দ্বিতীয় পক্ষের এক ছেলে। ওই করেই সে একরকম ফেরে এ অঞ্চলে। নেশা করে। চমৎকার তার হাত।

শেষে গান গেয়েছিল মেজদি এবং অর্চনা। ব্রজেশ্বর কিছুতেই ছাড়ে নি। অনুরোধ ছিল তার অর্চনাকে। কিন্তু অর্চনা ধরেছিল—মেজদিকে গাইতে হবে।

মেজদি অগত্যা গেয়েছিলেন সাদামাটা একখানা কীর্তন। তাও মাঝপথে ছেড়ে দিয়ে বলেছিলেন—দূর! সব মাটি করে দিলাম। আমার হয় না বলছি। সত্যিই হচ্ছিল না। সুতরাং শেষ করবার কথাও কেউ বলে নি।

তারপর ধরেছিল অর্চনা। সুলতা, মেয়েটার গলা যেন মধুঢালা। কি বলব তোমাকে। কাজী নজরুলের গানের খুব চল তখন। নজরুলের গজল গাইলে। আমি বেহালায় ছড় টানছিলাম ওর মুখের দিকে তাকিয়ে। নেশা লাগছিল। গান শেষ করলে অর্চনা, তখনও আমি ছড়ি টানছি।

অর্চনা বললে—এখনও ছড়ি টানো যে!

ছড়িটা তুলে বললাম—তাইতো!

ঠাকুমা খিল খিল করে হেসে উঠলেন। বললাম—তা হাসতে পার মেজদি। অর্চনার কাছে ঠকে গেছি।

ঠাকুমা বললেন—দেখো যেন প্রেমে পড়ো না ভাই-বোনে। গান শুনে প্রেমে পড়ার নজীর আছে। আমার দাদাশ্বশুর সায়েবী-মেজাজের মানুষ ছিলেন। এ-দেশের মেয়ে তাঁর চোখে ধরত না।

—ঠাকুমা! শাসিয়ে উঠল অর্চনা।

ঠাকুমা দমলেন না, বললেন—এক বন্ধুর বাসরে গানে-বাজনায় আমার দিদিশাশুড়ীর কাছে ঠকে এমন প্রেমে পড়লেন যে, সেই কলকাতায় বসে থেকে বিয়ে করে, ব্যাণ্ড বাজিয়ে ঘরে ঢুকলেন।

—এমন অসভ্য তুমি! ঠাকুমাগুলো এমনিই হয়।

উঠে গেল অর্চনা। সকলে হেসে উঠল। ব্রজেশ্বরদা বললে—এ-বাড়িতে এমন মেয়ে একটাও নেই।

রাত্রি তখন প্রায় দুটো।

বাড়ী ফিরে এসে অনেকটুকু মদ্যপান করেছিলাম। খাতাগুলো সামনে ছিল। যে আনন্দটুকু নিয়ে ফিরে এসেছিলাম, তা তখন উত্তেজনায় পরিণত হয়েছে। ভয় হচ্ছে। আবার অদম্য কৌতূহল!

* * *

সে-কৌতূহল দমন করতে পারি নি। খুলে পড়েছিলাম।

মোটা কাগজের খাতা। পাতাগুলো হলদে হয়ে এসেছে। মধ্যে মাঝে লালচে ছাপ। কোণগুলো আপনাআপনি দুমড়েছে-কুঁকড়েছে। নেড়ে দেখলাম, ভেঙে যাচ্ছে। সন্তর্পণে

নাড়তে হবে। বেশ টানা লেখা। বোধহয় কুইন-পেনে লেখা। লেখা ভাল কিন্তু টান আছে, আর কালি ওই লাল-হলদে রঙের বিবর্ণতার মধ্যে অস্পষ্ট হয়ে এসেছে। একটুক্ষণ মন দিয়ে দু-চারটে লাইন পড়তে পড়তে টানের ছাঁদটা আর্টিস্টের লাইনের ঢংয়ের মত চোখে পড়ে, অক্ষর স্পষ্ট হয়ে উঠল।

This is not my diary. I don't keep my diary and don't like to keep diary like others. What is the use of writing what you do everyday ? You do the same thing—today—tomorrow—day after tomorrow, you eat you drink you do this and that—you sleep. It seems to me that it is ludicrous to write them every night—before you retire. But this is something else. Something has happened today, that very seldom happens. Wonderful something, memorable something ! That's why I am writing down –in details lest I should forget them. It is just like writing down a poetry—you hear from a poet, which will never be published.

অনেক উচ্ছ্বাস আছে। তারপর নিজের পরিচয় দিয়েছেন। পড়তে পড়তে মনে হল দাম্ভিক উগ্র শক্ত সাহসী বিলাসী এক রসিক মানুষ সামনে এসে দাঁড়ালেন।

I am Bireswar Roy, son of Someswar Roy of Kirtihata. I can easily say—Prince of Kirtihata—I am. My father is really the king of the place. But he is a coward, he is shrewd—and he is—devoted to idolatry. I am opposed to it. I don't believe in it. Neither do I believe in other —theory or thesis about God. No I do not, I don't believe in Rev. Hill's preachings also. I do not believe what Raja Rammohon Roy says. But my father—is an affectionate father. I love him. Still I have ignored his repeated request to marry—where is the girl—that will be my wife ?

স্ত্রী হবার মত নিজের যোগ্য কন্যা বাংলা দেশে তিনি খুঁজে পান নি। কলকাতায় সাহেবদের পাঠশালা থেকে হিন্দু কলেজে কিছুদিন পড়া-শোনার পর দেশে এসেছিলেন বাপের সঙ্গে।

এখানে এসে রেন্ডারেণ্ড হিলকে বাড়ীতে রেখে বীরেশ্বরের পড়ার ব্যবস্থা করেছিলেন সোমেশ্বর। এখানে আরও আকর্ষণ পেলেন বীরেশ্বর। নীলকর রবিনসনের বাড়ী। তাঁর ছেলে-মেয়ের সঙ্গে মেলামেশার আকর্ষণ তাঁকে এখানে বাঁধলে। তার সঙ্গে শিকার করে, ঘোড়ায় চড়ে, হিল সাহেবের কাছে পড়ে, এক অদ্ভুত মানুষ হয়ে উঠলেন। না পড়লেন শাস্ত্র,

না পড়লেন দর্শন, এমন কি হিল সাহেব বাইবেলখানা বার দুই পড়িয়ে আর পড়াতে পারেন নি। কিন্তু ইংরেজী ভাষায় পারঙ্গম হলেন। জীবনী পড়লেন। আইন পড়লেন এবং ঘোষণা করলেন, তিনি ঈশ্বর-ফিশ্বরে বিশ্বাস করেন না। কালীকে মানেন না! রাজরাজেশ্বর নামক নুড়িকেও মানেন না। ব্রাহ্মদের ব্রহ্মাকেও মানেন না। ইংরেজদের গড, মুসলমানদের আল্লা, কিছুকেই না।

I do not believe in anything, any form of God—not in Kali not in that round shaped stone—not in Brabma, not in God nor in Allha.

এর সঙ্গে তিনি শিখলেন গান। কণ্ঠস্বর ভাল ছিল না কিন্তু কালোয়াত হবার খুব একটা ঝোঁক ছিল।

এই বীরেশ্বর রায় তাঁর যোগ্য কন্যা দুনিয়াতে অন্তত এই বঙ্গদেশে, যেখানে অষ্টমবর্ষে গৌরী হিসাবে বধূ-বরণ করতে হয়, সেখানে পাবেন কোথায়? রবিনসনের কন্যা ছিল কিন্তু সেদিকে মন টেনেছিল কি না কেউ বলতে পারে না। তিনি লেখেন নি। বরং লিখেছেন, আমার হাসি পায় যখন জন রবিনসন এবং তার বোন মেরী কথায় কথায় কপালে বুকে কাঁধে হাত দিয়ে ক্রশ আঁকে। এরা একেবারে মূর্খ কুঠিয়াল। বোধ করি ওদের দেশের লাঠিয়াল ছিল। শব্দ দুটো ইংরিজীর মধ্যে ব্যবহার করেছেন।

তিনি সেদিন স্মরণীয় ঘটনার খাতা হিসেবে এই খাতা আরম্ভ করে লিখছেন—

Today—26th April 1842, 14th Baisakh 1250 B. S. is a memorable day for me. I have found her out. She is she—whom I have wanted all my life and have searched her even in my everyday dreams. Yes—she is the she.

৪

বীরেশ্বর রায় গিয়েছিলেন, সুলতা, বন্ধুর বিয়েতে বরযাত্রী। কলকাতা জীবনের বন্ধু। সম্পর্কে ভাই। সোমেশ্বরের মামাতো ভাইয়ের ছেলে। কুড়ারাম ভটচাজ বিয়ে করেছিলেন কালীঘাটে এক গরীব ব্রাহ্মণের মেয়েকে—তা বলেছি। বিনিময়ে তিনি তাঁর শ্যালকের ভাগ্যের পথ খুলে দিয়েছিলেন। তাকে নিজের অধীনে কোম্পানীর সেরেস্তায় ঢুকিয়ে-ছিলেন। তিনিও নিজের ভাগ্য গড়ে নিয়েছিলেন যথাসাধ্য। রায় বংশের তুলনায় তা তেমন কিছু না-হলেও যথেষ্ট করেছিলেন। কালীঘাট তখন গ্রাম মাত্র। কালীঘাট ছেড়ে তিনি কলকাতার ভিতরে উত্তরাঞ্চলে বড় বাড়ী করেছেন। ছেলে ইংরিজী লেখা-পড়া শিখেছে। নাম হয়েছে। তারই বিয়ে,—বিয়ে চব্বিশ পরগনার দক্ষিণ অঞ্চলে জয়নগর-মজিলপুরের কাছে। কন্যাপক্ষ গ্রামের জমিদার এবং মানী লোক। এ বিয়েতে বীরেশ্বর গিয়েছিলেন। সোমেশ্বরের মামাতো ভাইয়ের ছেলে বীরেশ্বরেরই সমবয়সী এবং সম্পর্কে খুড়তুতো ভাই।

বিয়ের আসরে বাঈজী-নাচ হয়েছিল—সেই আসরে তিনি বসেছিলেন, মগ্ন হয়ে গিয়েছিলেন। নাকি খুব ভাল গাইছিল বাঈজী। বাঈজীর একটি মেয়ে ছিল, সেও তার সঙ্গে সুর দিচ্ছিল। গাইছিল ভৈরবী।

ঠিক ঠিক জায়গায় বাহা-বাহা এবং মোহর বকশিস করেছিলেন। এমন সময় একটি কিশোরী মেয়ে এসে দাঁড়াল। আশ্চর্য সপ্রতিভ এবং আশ্চর্য রূপ। গৌরাঙ্গী নয় শ্যামাঙ্গী কিন্তু অপরূপ তার লাবণ্য। তখন মেয়েরা---সে দশ বছর বয়স থেকে—চিকের ভেতরে বসে। পথে হাঁটে মুখ নিচু করে। ক্ষণে-ক্ষণে লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে ষাট বছরের বৃদ্ধ থেকে বারো বছরের বালককে দেখে—; সেই আমলে সেই তের-চৌদ্দ বছরের কিশোরী এসে তার সামনে দাঁড়িয়ে বলেছিল, নমস্কার! আপনাকে বাসরে বর ডাকছে।

মুখের দিকে তাকিয়ে বীরেশ্বর সবিস্ময়ে বলেছিলেন, আমাকে?

—হ্যাঁ! আপনি তো বরের ভাই! রায়বাবু!

—হ্যাঁ। কিন্তু—

—কিন্তু কিছু নেই, বর বাসরে বিপদে পড়েছেন।

—বিপদে পড়েছেন?

—হ্যাঁ। গান গাইতে গিয়ে মান গিয়েছে। মান বাঁচাতে আপনাকে ডাকছেন। বীরেশ্বর কৌতুক অনুভব করেছিলেন। বরের হয়ে বাসরে তাঁকে গান গাইতে হবে? হিন্দু প্রথা সামাজিক আচার বহু কিছুকেই তিনি বরদাস্ত করতে পারতেন না। কিন্তু বিয়ের বাসরে একটা রোমান্স আছে এটা তিনি মানতেন।

কণ্ঠস্বর যেমনই হোক, নবযুবক বীরেশ্বরের গায়ক-খ্যাতির জন্য লোলুপতা ছিল। থিয়েটারের দলে সিরিয়াস অ্যাক্টরের সিরিও কমিক কি কমিক পার্টে খ্যাতির জন্য এবং কমিক অ্যাক্টরের সিরিয়াস পার্টে নামের জন্য যেমন লোলুপতা থাকে—এও তাই আর কি। তবে গানে জ্ঞান এবং দখল তাঁর ছিল। শিক্ষার ক্ষেত্রে বীরেশ্বরের ফাঁকি ছিল না। তিনি শিকারীও ছিলেন, তিনি লিখেছেন—

"I have never missed my bullet shot at a target nor have I ever erred in 'tal' in any recital of any Raga."

যে ঘটনাটা ঘটল তারই ওপর লিখেছেন ওটা।

বাসরে যেতেই বর বললে---ভাই বীরা, তুমি মান রাখ ভাই। এই ইনি আমার দিদি-শাশুড়ী। গান শুনে বললেন—ওরে, হরু ধোপা বাইরে এসেছে, ওর গাধা হারিয়েছে। বলে ঘরে ঢুকেছে। বল, এ তার গাধা নয়! তারপর এমন গান শোনালেন এঁরা যে, বাজাতে গিয়েও হেরে গেলাম।

হেসে বীরেশ্বর বললেন—আগে ওঁদের অনুমতি হোক!

ঠাকুমা বললেন—তোমার অনুমতি হোক ভাই রায়হুজুর, তুমি বসবে আমাদের ঘরে, এতে আমাদের অনুমতি লাগে! তুমি এসেছ শুনে অবধি আমাদের উঁকিঝুঁকির সীমা নেই। সবাই দেখেছি। আর বলব কি, যাকে বলে মজে যাওয়া তাই গেছি। এই বয়সে

আপসোস হচ্ছে, কেন সেকালে জন্মেছিলাম।

বীরেশ্বর ঘরে ঢুকে বরের আসনের পাশে বসেছিলেন। বাজনার সরঞ্জামের অভাব ছিল না। তবলা পাখোয়াজ থেকে তানপুরা সব।

বীরেশ্বর পাখোয়াজ টেনে নিয়ে ঘা দিয়ে দেখেছিলেন সুন্দর করে বাঁধা আছে। ময়দার লেপনেও হাত দিতে হয়নি। বলেছিলেন—নিন ঠাকুমা, আরম্ভ করুন।

—আগেই আমরা?

—আমি তো বাজাচ্ছি!

—বেশ। নে লা, ভাই ভবানী, নে। রায়হুজুরের বাজনার সঙ্গে আর কে গাইবে? তুই নে!

এই সেই মেয়ে যে তাঁকে আসরে ডাকতে গিয়েছিল। সে বললে—না, উনি গাইবেন আমরা শুনব। দায় তো বরের ঠাকুমা, কনের তো নয়। বর গাইতে পারে তো ওকে আমরা ছেড়ে দেব নইলে বেঁধে রাখব। তা ওঁর বদলে উনি এসেছেন, ছাড়িয়ে নিয়ে যান!

বর বললে— না-না। আপনি গান। সত্যি বলতে আপনার গান শোনবার জন্যেই বারাকে ডেকেছি। নইলে রাখুন না আমাকে বেঁধে। ছাড়ানটা চাচ্ছে কে? তা ছাড়ান কি এ বাঁধনের পর মেলে কারুর?

ঠাকুমা বলেছিলেন, তোমরা বড় চতুর জন্তু নাতজামাই। বাঁধন ছিঁড়ে পালাও। আবার রাতচরা গরুর মত রাত্রে চরে এসে ভালমানুষ সেজে দাঁড়িয়ে থাক গোয়ালের সামনে।

মেয়েরা খিল-খিল করে হেসে উঠেছিল। বীরেশ্বরের মনে খট করে লেগেছিল কথাটা। তিনি গলাটা ঝেড়ে পরিষ্কার করে নিয়ে বলেছিলেন, বেশ আমিই গাইছি। কে বাজাবে? বরকে বলেছিলেন, তুই ধর ঠেকা দিয়ে যাবি!

—না-না। ওই উনিই ধরবেন।

—কে?

সেই মেয়েটিকেই দেখিয়ে দিয়েছিল নারায়ণচন্দ্র।

বীরেশ্বর পাখোয়াজটা পাশে রেখে তবলা বাঁয়া এগিয়ে দিয়ে বলেছিলেন নিন। এবং তানপুরাটা নিয়ে সুর দেখে ধরেছিলেন সাধারণ গান।

"কালার লেগেছে রূপ নয়নে।

কালার—।

লেগেছে রূপ নয়নে—এ-এ-এ, লেগেছে!

কালার!"

তবলার কোমল হাতে হলেও চটাং শব্দে ঠিক ধরতার সময় চাঁটির শব্দ তুলে ক্ষিপ্রগতিতে মেয়েটির আঙুলগুলি যেন নেচে উঠল—নাচের জলদ তালে চলা হাল্কা প্রণয়ের মত। তবলা বোল বলে মুখর হয়ে উঠল, একেবারেই পরান দিয়ে বাজনা ধরেছে। বিস্ময়ের সীমা রইল না তাঁর। এ মেয়ে কে?

হঠাৎ মেয়েটি তালে চাঁটি দিয়ে বললে—হুঁ !

অর্থাৎ তাকে ধরিয়ে দিচ্ছে, যাচ্ছে যাচ্ছে ধর। হেসে সামলে নিলেন বীরেশ্বর। তারপরই বুঝতে পারলেন বাজিয়ে আড়ি মারছে। ঠোঁটের উপর ঠোঁট চেপে ধরে মুখ রাঙা করে যেন রোষ ভরে বাজিয়ে চলেছে। আবারও হেসে তিনিও ধরলেন বাঁকা পথ। খেলতে লাগলেন। জলদ থেকে জলদতর করলেন গতিকে।

কালার লেগেছে রূপ নয়নে। কালা-র
লেগেছে রূপ নয়নে রূপ নয়নে রূপ নয়নে
কালা-র। লে-গে-ছে রূপ নয়নে-এ
কা-লা-র। লেগেছে।

ঘরখানা সঙ্গীতের শব্দতরঙ্গে ভরে উঠেছে। কথা গৌণ হয়ে গেছে। খেলছে কণ্ঠে সুর আর তবলার বোল। ঝর ঝর ঝর ঝর শব্দে জলপ্রপাত ঝরছে অথবা ঝমো ঝমো ঝমো শব্দে একখানা বাসন মেঝেতে পড়ে গড়িয়েই চলেছে দ্রুত থেকে দ্রুততর গতিতে। শ্রোতাদের নিঃশ্বাস ফেলবার অবকাশ নেই। শব্দের মধ্যেও তারা একটা লড়াই চলছে বুঝতে পারছে। অকস্মাৎ বীরেশ্বর অনুভব করলেন তিনি একটি অক্ষর উচ্চারণের মত সময় কখন হারিয়ে ফেলেছেন, এবারই তবলায় গানে সমাপ্তির ছেদ পড়বে; ওস্তারবে তবলায় চাঁটিঝাঁ—কিন্তু তাঁর তখনও একটি অক্ষর বাকী থেকে যাবে। কা-লা-র কা লা পর্যন্ত বলা হবে র অক্ষরটি অনুচ্চারিত রাখতে হবে, তিনি হেরে যাবেন। মুহূর্তে তিনি সামলে নিলেন, কা লা দুটি অক্ষরকে জুড়ে ক্লা ক'রে নিলেন এবং গাইলেন কালার লেগেছে রূপ নয়-নে-ক্লার ! মেয়েটি ফিক করে হেসে তবলায় সমাপ্তির ধাঁ মেরে বললে, আপনার সঙ্গে আমি পারি ! বাবা, এ দৌড়ে কলকেতা পৌঁছুনো যেতো।

বীরেশ্বর আশঙ্কা করেছিলেন, সে উচ্চহাস্যে ব্যঙ্গ করে এই অতিসূক্ষ্ম ভুলটুকু, যা এদের কারও কাছে ধরা পড়ে নি, তাকে ধরিয়ে দিয়ে তাঁকে অপদস্থ করবে। কিন্তু তারও উপর বেশী হয়েছিল বিস্ময়। এ মেয়ে কে ? তিনি জানেন, তিনি দেখেছেন, সঙ্গীতে জন্মগত প্রতিভা নিয়ে অনেকে জন্মায়। অত্যন্ত প্রত্যক্ষ। এ যে তাই তাতে তাঁর সন্দেহ রইল না ! কিন্তু এ মেয়ে কে ?

গোটা ঘরখানা স্তব্ধ হয়ে ছিল। শ্রোতাদের বিস্ময় এবং অভিভূত ভাবটা এখনও কাটে নি ! কয়েক মুহূর্ত পর ঠাকুমা জিজ্ঞেস করলেন, একটা হার-জিত যেন হল ! তা' জিতল কে রে ভবানী ?

—উনি ঠাকুমা। চমৎকার হেসে মেয়েটি বললে।

ঠাকুমা বললেন—তাতে লজ্জা নেই। বীরু রায় কত বড় বড় ওস্তাদ রেখে গান শিখেছে। তোর বিদ্যে তো ভগবৎদত্ত। তোর বাবার 'ঔরুসের' ফল। তবে তোর ঐ বাবা তোকে সাধতে দেয় এই যা, নইলে এতদিন ভাতের হাঁড়ির কালি আর উনোনের ছাই চাপা পড়ত। তা এইবারে তুই একটা গান শুনিয়ে দে। দেখবি গানে রায়বাবু তোকে ঠকাতে পারবে না।

সঙ্গে সঙ্গে বীরেশ্বর পাখোয়াজ কোলে তুললেন। মেয়েটি বললে—থাক।

বীরেশ্বর বললেন—সে কি? না-না, তা হবে না। তা হলে বুঝব আমাকে যোগ্যই মনে করছ না তুমি!

ঠাকুমা বলে উঠলেন—তা বটে ভাই। যোগ্য বর মিলল না বলে মেয়ের বিয়েই দিলে না বাপ। কুল মেলে তো পাত্র মেলে না। পাত্র মেলে তো কুলে মেলে না।

—কি বলছ ঠাকুমা। তা হলে আমি উঠে যাচ্ছি।

—।।। হাত জোড় করে বীরেশ্বর বললেন—ঠাকুমার দোষে আমায় অপমান করে চলে যাওয়াটা ঠিক হচ্ছে? বসুন। গান আমাকে শোনাতেই হবে।

ভবানী বসেছিলেন। এবং তানপুরাটা তুলে নিয়ে কানে একটু মোচড় দিয়ে সুরটা ঠিক করে নিয়ে চোখ বুজে মৃদু স্বরে সুর মিলিয়ে নিয়েছিলেন। তারপর থেমে গেলেন। বরকে বললেন—আপনি তানপুরাটা ধরুন না।

নিজে পদ্মাসন হয়ে বসে হাতজোড় করে চোখ বুজে সুর তুললেন। শুরু হল মৃদুকণ্ঠে সুর বিস্তার। আ-আ-আ ধ্বনির সূত্রে গাঁথা একখানি সুরের মালা বুনছেন যেন।

বীরেশ্বর তাঁর বিবরণে তাই লিখেছেন।

তারপর সুর উচ্চ থেকে উচ্চতর হল—সঙ্গে সঙ্গে বাণী প্রকাশ পেলে তার মধ্যে।—আ—গৌরী—।

মাথাটি এপাশ থেকে ওপাশে নাড়ছিল যেন চোখ বুঁজে গৌরীকে সে দেখছে।

—আ—গৌরী লউটি যায়ে
নয়নে লোর, কাঁপে অধর।—অ
গৌরী লউটি যায়ে।

বীরেশ্বর রায় লিখেছেন, **Madam--cupid—has been burnt to ashes—and God Siva has vanished.**

তাঁর দিকে না তাকিয়ে চলে গেছেন: গৌরী অপমানিতা বোধ করে কাঁদতে কাঁদতে ফিরছেন।

বীরেশ্বর লিখছেন, **very carefully,** অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে বাজনা শুরু করলাম আমি। শুধু ঠেকা দিয়ে। বিলম্বিত লয়ের সঙ্গে মিলিয়ে। ওর সঙ্গে আড়ি দিতে ইচ্ছে হল না আমার। তার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলাম অবাক হয়ে। মনে হচ্ছিল ধ্যানস্থ হয়ে গাইছে।

এলায়ে কেশ যোগিনী বে-শ
মাখলি অঙ্গে ভস্ম শে-ষ
হোথা মহেশ, জাগে চমকি,
হিয়া কাতর রে—

পাখোয়াজ জলদে বেজে উঠল। কণ্ঠস্বরে সুরও দ্রুত হল। মাথা দ্রুত নড়ছে মেয়েটির। তারপর আবার বিচিত্র কৌশলে দ্রুত লয় থেকে ফিরে এল সে শান্ত মন্থর লয়ে—

নারদ চলে গিরিবর-ঘর
মনোহর বর যোগী-শ্বর
আওয়ে আওয়ে তব ঘরপর
যাচি গৌরী কর-রে।
জাগে বসন্ত উঠয়ে গৌরী
তনু কাঁপে থর-থ-র রে॥

অত্যন্ত শান্তভাবে গাইলেন ভবানী। কলা-কৌশলের বাহুল্য এতটুকু বিস্তার করেন নি। বীরেশ্বর একবার জলদে তাকে টেনেছিলেন। সে তাল রেখে এগিয়ে গিয়েও এমনভাবে শান্তগতিতে ফিরল এবং তাঁকে ফেরাল যে, তিনি মনে মনে তারিফ না করে পারলেন না। গান যখন শেষ হল, তখন গোটা বাসরটি যেন হরগৌরীর বাসরের আশীর্বাদের আভাসে ভরে উঠেছে। মেয়েটি তখনও বসে আছে। তারপর একসময় চোখ মেলে তাকিয়ে চারদিকটাকে দেখে নিয়ে, একটু হেসে নমস্কার করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বীরেশ্বর শুধু বললেন—এ ভগবানের আশীর্বাদ।

সুরেশ্বর বললে, বীরেশ্বর লিখেছেন, I could find no other expression than this—ভগবানের আশীর্বাদ। Is there any other expression ? No.

তিনি ওইখানেই খুড়তুতো ভাইয়ের শ্বশুরকে বললেন, এই মেয়েটিকে আমি বিয়ে করতে চাই। আপনি সম্বন্ধ করে দিন।

তিনি বিব্রত হয়ে বললেন, বাবা, তুমি রাজপুত্র। মেয়েটি —

—মেয়েটি কি ?

—ও এখানকার একজন ভদ্রলোকের পালিতা কন্যা। মহেন্দ্রচন্দ্র যৌবনে চাকরীর সন্ধানে বেরিয়ে মিশনারীদের চাকরী নেন, তাদের সঙ্গে আসামে গৌহাটিতে গিয়েছিলেন। সেখানে কে এক সাধক-দম্পতির সঙ্গে পরিচয় হয়ে ভক্ত হয়ে পড়েন। এ-কন্যা তাঁর। সাধু পাগল হয়ে যান। সাধুর স্ত্রী ওঁদের আশ্রয়ে থাকেন। তারপর তিনিও মারা যান। কন্যাটিকে মহেশকে দিয়ে যান। বলে যান, যেখানে-সেখানে, যার-তার হাতে যেন এ-কন্যার বিয়ে না দেন। কুলীনদের ঘরে তো কন্যা কুমারী থাকে! তা যার-তার হাতে দেবার মেয়ে ও নয়। চরিত্রও একটু অদ্ভুত। কখনও যেন কেমন কেমন, আবার বেশ সহজ। হাসিখুশি। গান-বাজনায় জন্ম থেকে সিদ্ধ বলতে গেলে। মহেশচন্দ্র নিজে শিক্ষিত মানুষ। লেখাপড়াও শিখিয়েছেন। কিছু কিছু ইংরিজী জানেন। অসম সাহস। আনন্দময়ী। আনন্দেই থাকে।

—মেয়েটির পালকপিতাকে বলুন একবার। আমাকে যোগ্য পাত্র মনে করেন কিনা দেখুন!

মেয়ের পালকপিতা বলেছিলেন, অযোগ্য তোমাকে কি করে বলব? তবে? একটু

ভেবে বলেছিলেন, কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করব ?

—করুন।

—তুমি মদ্যপান কর ?

—করি।

—তাহলে ?

—যদি ছেড়ে দি !

—ছেড়ে দেবে ?

—দেব।

অনেকক্ষণ তার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলেছিলেন, দাঁড়াও বাবা, ওকে একবার জিজ্ঞাসা করে আসি। ওর অমতের জন্যই কয়েক জায়গায় আমার পছন্দ হলেও সম্বন্ধ ভেঙে দিয়েছি। ওকে জিজ্ঞাসা করে আসি।

বীরেশ্বর লিখেছেন, I began to pace up and down. I was mad for her. At last her father came back with a smiling face, and I know—that she has given her consent —she has liked me. A great joy—a victory. Yes, a victory it was.

মহেশবাবু বলেছিলেন. কন্যা এখন আমার, আমিই সম্প্রদান করব। মেয়েটির পিতা ছিলেন সাধক। পাগল হয়ে কামাখ্যা পাহাড়ে পড়ে মারা গেছেন। তাঁর নাম ভবানীও জানে না। বলতে মানা আছে। তুমিও জিজ্ঞাসা করো না।

—বেশ। তাও করব না। কিন্তু আমার বাবাকে বলবেন, কন্যা আপনার।

—হ্যাঁ, তা বলব আমি।

—আমি বিবাহ করে বাড়ি ফিরব। দিন দেখুন।—দিন মিলেছিল একদিন পরেই। সেই দিনই বিবাহ করে তিনি বাড়ী ফিরেছিলেন।

সুলতা, এরপর দেখ, ছবির মধ্যে আবার একটা মস্ত ফাঁক।

রায়বংশের জীবনে সেদিন এমন একটি জট পাকাল যে, তার মধ্যে বাঁধা পড়ে গোটা রায়-বাড়ীর সারা অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে উঠল। এবং ধারাবাহিকতা পর্যন্ত ওই জটের মধ্যে জড়িয়ে হারিয়ে গেছে।

অথচ ১৮২৪ সাল থেকে ১৮৪৫ সাল পর্যন্ত রায়-বাড়ীতে বহু কাণ্ড ঘটে গেছে। যা বিস্ময়কর অথচ তার কোন কারণ খুঁজে পাই নি।

সব থেকে বিস্ময়কর বিমলাকান্ত রায়বাড়ী থেকে চলে গেলেন। বারো বছর বয়সে জামাই হয়ে এ-বাড়ীতে এসেছিলেন। সোমেশ্বর রায়ের প্রতিশ্রুতিমত সম্পত্তির অর্ধেকের মালিক তিনি। বীরেশ্বর রায় বিমলাকান্তের উপর ছেলেবেলা থেকেই বিদ্বিষ্ট ছিলেন। একেবারে দেখতে পারতেন না। বিমলাকান্ত শান্ত, শ্রীমান পুরুষ, মিষ্টভাষী, গান-বাজনা বুঝতেন কিন্তু ও থেকে দূরে সরে থাকতেন। স্ত্রী বিমলাও উগ্র প্রকৃতির ছিলেন, স্বামীর উপর কথায় কথায় রেগে উঠতেন, কলহ করতেন, বিমলাকান্ত হেসে সহ্য করে যেতেন। বিমলাকে তার মায়ের

ব্যাধি মৃতবৎসা রোগে ধরল, সন্তানের পর সন্তান মারা গেল। শোকে মাথা খারাপ হল তাঁর। পাগলামিতে যা সামনে পেতেন, তাই ছুঁড়ে আঘাত করতেন সামনের মানুষকে। বিমলাকান্ত আঘাত সহ্য করে সামলাতেন। তিনি বলতে গেলে অহরহ আগলে থাকতেন তাঁকে। এক ভাই বীরেশ্বরের সঙ্গে ছিল প্রীতি। কিন্তু বীরেশ্বর এবং বিমলাকান্তকে এক স্থানে রাখেন নি সোমেশ্বর। বিমলাকান্ত কলকাতায় থাকতেন। বীরেশ্বর থাকতেন কীর্তিহাটে। জন রবিনসন নীল কুঠিয়ালের পুত্রের সঙ্গে দুর্ধর্ষপনা করে বেড়াতেন। পাদরী হিল সাহেবের কাছে পড়তেন।

হঠাৎ বীরেশ্বরের জীবনে পরিবর্তন ঘটল। তিনি বিবাহ করলেন ভবানীকে। এবং বললেন, তিনি থাকবেন কলকাতায়।

বিমলাকান্তকে সোমেশ্বর লিখলেন, কীর্তিহাটে এস।

তখন সোমেশ্বরের শরীর ভেঙেছে। তিনি যেসব সম্পত্তি কুড়ারাম রায় ভট্টাচার্যের পর কিনেছিলেন এবং রায়দের সেই জমিদারীই বেশী, তা সব দেবোত্তর করে ট্রাস্টি নিযুক্ত করলেন ছেলে এবং জামাইকে। অ্যাডভাইসার রাখলেন রামব্রহ্ম স্মৃতিতীর্থকে এবং গিরীন্দ্র আচার্যকে।

বীরেশ্বর বিবাহ করে কলকাতায় তখন জীবনে ফিরবার চেষ্টা করছেন। প্রতিশ্রুতিমত মদ ছেড়েছেন। বধূ ভবানীকে নিয়ে আনন্দে থাকেন জানবাজারের বাড়ীতে। বাড়ীটা তখন ছোট ছিল। কিন্তু বেশীদিন থাকা তাঁর হল না। বাপের অসুখের জন্য ফিরে আসতে হল কীর্তিহাটে। কীর্তিহাটে এসে স্বতন্ত্র বাসের জন্য বিবিমহল তৈরী করালেন। ওই বাড়ীতে থাকবেন। তাঁর বাপের দেবোত্তরের দলিলের তিনি বিরোধী ছিলেন। তিনি বলেছিলেন—সম্পত্তির অংশ ভাগ্নেকে ভগ্নীপতিকে দিতে আমার আপত্তি নেই, কিন্তু দেবোত্তর রায়বংশের, দেবোত্তরে ভগ্নীপতি ট্রাস্টি কেন হবে? কিন্তু সোমেশ্বর তা শোনেন নি।

তাঁর ওই স্মরণের খাতায় এসব লেখা আছে, তার সঙ্গে আছে কয়েকটা বিনিদ্র আনন্দরজনীর কথা। অকপটে সব তিনি লিখে গেছেন।

তারপর মারা গেলেন সোমেশ্বর। বীরেশ্বর স্ত্রীর অনুরোধেই কোন বিরোধ করলেন না দলিল নিয়ে; কীর্তিহাটে বিমলাকান্তের কর্তৃত্বে হস্তক্ষেপ পর্যন্ত করলেন না। সেই বৎসর ১৮৪৫ সালে জন্ম হল কমলাকান্তের। শুধু কমলাকান্তেরই জন্ম নয়, বীরেশ্বর রায়ের নিজেরও সন্তান হল। প্রায় একসঙ্গে।

একসঙ্গে ভবানী এবং বিমলার সন্তান হল। দুদিন আগে পরে। তার ফল হল বিচিত্র। মৃতবৎসা রোগ এবারে বিমলার ভাল হল, ভবানীকে ধরল। গ্রামের লোকে বললে, খুঁজে দেখুন রায়বাবুরা, কোন শাপশাপান্ত কোথাও আছে।

বীরেশ্বর বললেন, থাক শাপ। চেঁচাতে বারণ করছি, চেঁচালে চাবুক মারব।

এরই বৎসর-খানেকের মধ্যে বিমলা আত্মহত্যা করলে। তার বাতিক হয়েছিল—মরে গেল, তার ছেলে মরে গেল। কমলাকান্ত দু' বছরের ছেলে, নীচে বাগানে খেলা করছিল। বিমলা বারান্দায় এসে চীৎকার করে উঠল, ঝোপে সাপ আছে। কমলাকান্ত সেই দিকেই ছুটছিল। বিমলা বারান্দা থেকে লাফিয়ে নীচে পড়ল ছেলেকে ধরতে। এবং মারা গেল তৎক্ষণাৎ।

ভবানীই মানুষ করতে লাগলেন কমলাকান্তকে। বীরেশ্বর তাকে তখন থেকেই রত্নেশ্বর বলে ডাকতেন।

তারপর তার দু'বছর পর হঠাৎ একটা কিছু ঘটল। বীরেশ্বর আবার মদ ধরলেন। এবং আক্রোশ হল বিমলাকান্তের উপর আর ওই দুগ্ধপোষ্য চার বছরের কমলাকান্তের উপর। স্ত্রীর উপর বিমুখ হলেন। জন রবিনসন অর্থাৎ জুনিয়র রবিনসন তখন নীলকুঠির মালিক হয়েছে। তার ওখানে গিয়ে সময় কাটাতে লাগলেন। মদ্যপান, শিকার—এই দুই নেশাতে প্রমত্ত হয়ে উঠলেন। তারপর বিরোধ বাধতে লাগল বিমলাকান্তের সঙ্গে। ধীরে ধীরে বিরোধটা যেন একটা গুহাবাসী হিংস্র জন্তুর মত বাইরে আসতে লাগল। দুটো জ্বলন্ত চোখ ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছিল। বীরেশ্বর নিজেই লিখেছেন, আমার ক্রোধ, সে ঘুমভাঙা জন্তুর মত গুহা থেকে বাইরে বেরিয়ে আসছে আমি বুঝতে পারছি। **I am helpless.**

ফলে বিমলাকান্ত ছেলে কমলাকান্তকে নিয়ে একদিন একটা পর্ব উপলক্ষে শ্যামনগর যাচ্ছি বলে গিয়ে আর ফিরলেন না। ওখান থেকে চলে গেলেন কলকাতায়। নিজে ভাগ্য গড়বেন বলে। বীরেশ্বরকে চিঠি লিখলেন, "তোমার পৈতৃক সম্পত্তি তুমি নির্বিবাদে ভোগ কর। আমি সন্তুষ্টচিত্তে অকপট আশীর্বাদ করিয়া বিদায় লইলাম। আর কীর্তিহাট ফিরিব না। তুমি চাহিলে যাহা শ্বশুরমহাশয় আমাকে দিয়াছিলেন, তাহা দলিল করিয়া ফিরাইয়া দিব।"

তার পর একবছর পর যা ঘটল তা আরও মর্মান্তিক।

বীরেশ্বর তখন কীর্তিহাটে—এই বিবিমহলে বাস করছেন। একদিন সকালে কাঁসাইয়ের উপর যে বিবিমহলের ঘাট, সেই ঘাটে ভবানীর একটি গহনার পুঁটুলী পাওয়া গেল; সে গহনাগুলি তাঁর গায়ে থাকত, কিন্তু ভবানীকে পাওয়া গেল না।

একটা দহ ওখানে ছিল। কিন্তু তখন ভরা কংসাবর্তা। আশ্বিনের মাঝামাঝি দু কূল ভরে বইছে নদী। তবু পাঁচখানা গ্রামের জেলে এল। জাল টানলে সেই দহে। কিন্তু কোন চিহ্ন পাওয়া গেল না।

এই দেখ একখানা বড় ছবি। এটাকে এঁকেছি আবছায়ার মধ্যে। এটা গাঢ় কালি দিয়ে, কালের যবনিকা টানি নি। দেখ, আলো জোর পড়লেই দেখতে পাবে, আভাসে একটি নারীদেহ যেন হারিয়ে যাচ্ছে। দেখতে পাচ্ছ? তারপর অবশ্য এদিকটা গাঢ় কালো। যবনিকা পড়ে গেছে। ঢেকে রেখেছে সবকিছু। তারই মধ্যে গাঢ়তর কালো রঙে আঁকা একটি পুরুষকে পাবে। দেখ। ওই বীরেশ্বর রায়। উন্মাদ। কালপুরুষের মত অট্ট হাসছেন। ওঁর সেই খাতাতে বড় বড় করে লেখা আছে—

Am I going mad? Yes --It is madness!—Let it come.

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত